দ... আসন্ন বলিয়া নৈরাশ্য প্র...
...তেছেন, তাঁহারা অতিশয়োক্তি করি...
...বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। বাঙ...
...বস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ...
... জনসাধারণই উদ্বেগ প্রকাশ ...
জনসাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ ...
আবহতত্ত্ববিদ্‌গণের রিপোর্টের উপর ...
করিয়া এ বৎসর সুবৃষ্টি না হইয়া যা...
এবং তাহার ফলে ভাল ফসল হইবে, ...
ভরসায় মিঃ কেসি বাঙলা হইতে ...
রপ্তানির ব্যবস্থা করেন। বাঙলার ...
পরিস্থিতি যে সংকটজনক, তৎস...
বাঙলার সরকারী মহলে কতটা চৈতন্...
হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের তুষ্ণীভাব ...
...ঝা যাইতেছে না। তবে বা...
খাদ্যব্যবস্থা যে উদ্বেগজনক, তাহা সব...
নয়াদিল্লীর সরকারী মহলেই স্বীকৃত...
এবং বাঙলা হইতে যাহাতে চাউল র...
না হয়, তৎসম্বন্ধে তথা হইতে ...
আসে। নয়াদিল্লীর এই নির্দেশের ...
বাঙলার অন্নবস্ত্রের বিধাতা "পুর...
বিশেষ করিয়া মিঃ কেসি বাঙলার খাদ্য...
সম্পর্কে কোনরূপ মতামত প্রকাশ ...
নাই হয়ত তাহা করিতে লজ্জা ...
করিয়াছেন। কিন্তু বাঙলায় দুর্ভিক্ষ...
...সিয়া, তাহা দিল্লীর কর্তৃপক্ষও স...
...তেছেন না এবং খাদ্য সমস্যা স...
...ই নৈরাশ্যকে তাঁহারা আমল দি...
না, তাঁহারা এই আশ্বাস দি...
যে, শ্যাম দেশে ৫ লক্ষ মণ ...
...নির অপেক্ষায় আছে এবং ...
...য়া গেলেই উহা বাঙলার ...
...সিয়া ভিড়িতে পারে। তবে...
...পরিমাণ চাউল পাওয়া গেলেও ...
...নের জন্য আরও ৫ লক্ষ মণ ...
ঘাটতি থাকিয়া যায়, তাহা তাঁহারা ...
করিয়াছেন। মোট ঘাটতির পরিমা...
লক্ষ মণের মধ্যে ৫ লক্ষ মণ 'যদি'র...
নির্ভর করিতেছে এবং বাকি ৫ ল...
সম্পর্কে এখনও কোন কিনারা হয়...
...সে সম্বন্ধেও তাঁহার আশা-ভরসা...
...নাইতে ছাড়েন নাই। ভারত স...
খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ আ...
হাচিংস, উক্ত বিভাগের পরামর্শদা...
সমারসেট্‌ বাটলারের সমভিব্যাহারে...
দেশে বিমানযোগে গিয়াছেন।
তথাকার চাউল রপ্তানির ...
কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আ...
করিয়াছেন। এ সমস্ত আয়োজনই ...
সন্দেহ নাই, যদিও ফলাফল ভবি...
গর্ভে নিহিত। কিন্তু শ্যাম কিংবা ...
হইতে চাউল বাঙলায় আসিয়া পৌঁ...
...বলি এবং বণ্টন ব্যবস্থার ঘাটি ...
তাহা লোকের লভ্য হইবে কি? ...

নির্বিচারে গুদামে পচাইয়া ...ঘত কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ব- ...লোকের অভাব বাঙলার ...মহলে নাই। গত পঞ্চাশের ...এই শিক্ষাই দেশবাসী লাভ ...য়াছে। একদিকে কলিকাতার বোটানি-ক্যাল গার্ডেনে ও বাঙলার অন্যান্য নানা ...ন হাজার হাজার মণ খাদ্যসম্ভার ...য়াছে, অপর দিকে লক্ষ লক্ষ লোক ...হারে অতি শোচনীয়ভাবে কীটপতঙ্গের ...প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সরকারী অযোগ্য-...এই দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে না। ...টের উপর সরকারী ব্যবস্থাই আগাগোড়া ...ত্রুটিপূর্ণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও ...যোগ্যতার পরিচায়ক যে, কোন সরকারী ...শ্বাসবাক্যেই আর ভরসা পাওয়া যায় না। ...হারা স্বদেশপ্রেমিক, দেশের ধনপ্রাণের প্রতি ...হাদের বাস্তবিকই দরদ আছে, তাঁহাদের ...স্তে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত অন্ন কিংবা ...ন্য কোন সমস্যারই সমাধান হইবার আশা ...খা যায় না।

শাসন বিভাগীয় সংস্কার

রোন্যাল্ড কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাঙলার শাসন বিভাগীয় কতকগুলি সংস্কার সাধিত হইয়াছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসী সেদিন সাংবাদিকদের একটি সম্মেলনে এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সরকারপক্ষের এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মন্ত্রীদের কার্য যাহাতে সুপরিচালিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এবং বাঙলার যুদ্ধোত্তর গঠন পরিকল্পনা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এই 'সংস্কার' প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলার শাসন বিভাগীয় ব্যবস্থায় আগাগোড়া গলদ ঢুকিয়া রহিয়াছে এবং উহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন, ইহা আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু মন্ত্রীদের কার্য সুপরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সংস্কার মন্ত্রিমণ্ডল-বিহীন বাঙলার সিভিলিয়ানদের পরামর্শ সম্বল করিয়া সেই সংস্কার সাধনে ব্যগ্রতা অবলম্বন কেন করা হইল, ইহাই প্রশ্ন। এই সংস্কার সাধন করিবার পূর্বে বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে সংস্কার ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব ছিল। মিঃ কেসীর যদি স্পর্ধা থাকিত, তবে স্বচ্ছন্দে তিনি ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করিয়া বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিতে পারিতেন। তবে না করিয়া এই সংস্কারে ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে স্বতঃই লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া সিভিলিয়ানী আমলাতন্ত্রকে মন্ত্রিমণ্ডলের অনুপস্থিতির এই অবসরে কায়েম করিয়া লওয়াই এই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য। গভর্নরের উপদেষ্টারা সকলেই সিভিলিয়ান এবং তাঁহারা সিভিলিয়ানী কূটচক্রের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন উহা স্বাভাবিক। এই সিভিলিয়ানগণের সংগে দেশের প্রকৃত স্বার্থের প্রতি কোন দরদ প্রদর্শন করেন নাই, প্রকৃতপক্ষে তেমন মনোবৃত্তিই ইহাদের নাই। ইহাদের উদ্যোগ এবং পরামর্শে পরিচালিত সংস্কার দেশের প্রকৃত স্বার্থ-রক্ষার সহায়ক হইবে। দেশের লোকের ইহা বিশ্বাস করা কঠিন হইবে। তারপর কয়েকটি নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলে কিংবা শাসন বিভাগকে সুবিন্যস্ত করিলেই অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না; শাসন বিভাগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই দুর্নীতি হইতে শাসন বিভাগকে মুক্ত করিতে হইলে, দেশ-সেবার প্রবৃত্তিসম্পন্ন কর্মচারীদের প্রভাব সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দুষ্টলোকদের সাজা দেওয়া দরকার; কিন্তু সেজন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে দুর্নীতির ব্যাপক সমস্যার কিছুই সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই। সরকারী পদ মান প্রতিষ্ঠার সুযোগ লইয়া যাহারা দেশের রক্ত শোষণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, সর্বাগ্রে তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধানের দিকেই দৃষ্টিদান করা উচিত ছিল। প্রস্তাবিত সংস্কারে তাহা হয় নাই, এতদ্দ্বারা জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে সিভিলিয়ানী দলই নিজেদের মতলব বানাইয়া লইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনের ফলে ভারতের কেন্দ্র এবং প্রদেশ-সমূহে বিশেষ রকম পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে, ভবিষ্যতের সেই দিনের আশংকায় বাঙলার সিভিলিয়ানী দল নিজেদের ঘাঁটি আগলাইয়া রাখিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন আমাদের ইহাই সন্দেহ হইতেছে। নতুবা এজন্য এতটা তাড়াহুড়া করিবার দরকার ছিল না। শাসন বিভাগে এতদিন যদি দুর্নীতি চলিয়াই থাকে, তবে না হয় আরও কয়েক মাস চলিত। তাঁহারা সেজন্য অপেক্ষা করা নিজের স্বার্থের পক্ষে নিরাপদ নহে বলিয়াই বোধ হয় এত ত্বরান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা সার্থকতা লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না। শাসন বিভাগে জনসাধারণের প্রভাব প্রবর্ধিত হইবেই, তাঁহারা কূটকৌশল প্রয়োগে রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।



কাজের ফাঁকে

ফটো শিল্পী : শ্রীবীরেন সিংহ

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেশে ও বিলাতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—গত ৫ই আশ্বিন বাঁকুড়া জেলার তালডাঙা থানার এলাকায় ১নং ইউনিয়নে তেলীভাঙা বাঁধের উমেশচন্দ্র নায়েক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সে ও তাহার পরিবারস্থ আর সকলে কাজের অভাবে মধ্যে মধ্যে অনাহারে ও অল্পাহারে থাকিতে বাধ্য হইত—সেইজন্য সে আহারের অভাবে পূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুদিন হইতেই বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত হইয়াছে। বাঙলার অন্যান্য স্থান হইতেও অন্নাভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দুর্গোৎসবের সপ্তমী দিন হইতে যে ঝড় ও অতিবর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন স্থানে শস্যহানি হইয়াছে—এমন আশঙ্কার কারণ আছে। তবে শস্যহানির পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্রে বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব-সম্ভাবনা আলোচিত হইতেছে। বাঙলা সরকার ও ভারত সরকার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব নিবারণকল্পে কি করিতেছেন, তাহা এখনও দেশের লোক জানিতে পারিতেছে না। সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় যে এবার ফসল ভাল হইবে না, তাহা সরকারও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আশা করিতেছেন, সরকারের গুদামে যে ধান ও চাউল মজুত আছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবে এবং ব্রহ্ম হইতেও হয়ত কিছু চাউল আমদানী হইতে পারিবে।

সময় থাকিতে সতর্ক হইবার যে কথা বলা হইতেছে, তাহাতে কি ফল ফলিবে, তাহা বলা দুঃসাধ্য।

"জাতীয় সেনাদলের" বিচার—আগামী ৫ই নবেম্বর দিল্লীতে সুভাষচন্দ্র বসুর "জাতীয় সেনাদলের" লোকের বিচার আরম্ভ হইবে। বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষ সমর্থনের আয়োজন হইতেছে। গত ২০শে অক্টোবর লাহোর হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, মুসলীম লীগের দল হইতে ঐ সেনাদলের মুসলমান নায়কদিগকে জানান হইয়াছিল, মিস্টার জিন্না ব্যবহারজীবীরূপে তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু নায়কগণ বলিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের আস্থাভাজন, তাঁহারা মিস্টার জিন্নাকে চাহেন না।

সুভাষচন্দ্রের দলের দলপতি মেজর-জেনারেল লোকনাথমকেও দিল্লীর লাল-কেল্লায় আনা হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, বৃটিশ ও জাপানী সেনাদলের কয়জন কর্মচারীকে সাক্ষী করা হইবে। লর্ড ওয়াভেল, জেনারেল অচিনলেক ও জেনারেল ঘমশীতা সাক্ষী করিয়া ডাকা

দেশের কথা

(২২শে আশ্বিন—৫ই কার্তিক)

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—"জাতীয় সেনাদলের" বিচার—নির্বাচনের উদ্যোগ পর্ব—অনাচারের বিবরণ—দুর্গোৎসবে সাম্প্রদায়িক অনাচার

হইবে। প্রথম ২ জন মালয় ও ব্রহ্ম ত্যাগকালীন অবস্থা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় সাক্ষী কি অবস্থায় ভারতীয় সেনাদল আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

'হিন্দুস্থান টাইমস্' সংবাদ দিয়াছেন—পাঞ্জাব সরকার "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" বিচারে দম্বার পরিচয় দিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"এই সেনাদল জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য গঠিত হয় নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। আন্তর্জাতিক ব্যাপার যে আইনে পরিচালিত হয়, তদনুসারে ইহারা অভিযুক্ত হইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচিত হইবে।

সুভাষচন্দ্রের মাল্য বিক্রয়—দিল্লীতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে "আজাদ হিন্দ্ লীগ" কি উপায়ে "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। লীগ ঐ কাজের জন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র যে স্থানেই বক্তৃতা করিতেন, সেই স্থানেই ২০।২৫ হাজার লোক সমবেত হইত—বহুদূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে নরনারী আসিত—রৌদ্র বা বৃষ্টি কিছুতেই তাহাদিগের উৎসাহ ক্ষুন্ন হইত না। সুভাষচন্দ্রও এক এক সময়ে ৩ হইতে ৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিতেন। তিনি যে স্থানেই বক্তৃতা করিতেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে মাল্যদান করা হইত। তাঁহার বক্তৃতার পরে সেই মালা নীলাম করা হইত। প্রথম দিনের নীলামে এক লক্ষ টাকায়, দ্বিতীয় দিনের নীলামে ২ লক্ষ টাকায়, তৃতীয় দিনের নীলামে ৩ লক্ষ ও শেষদিন ১২ লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। একদিন নীলামে একজন পাঞ্জাবী তাহার সমগ্র সম্পত্তির বিনিময়ে মালা কিনিয়াছিল। পরদিন যখন ফুল শুকাইতে থাকে, তখন সে তাহা বুকের নিকটে লইয়াছিল ও পূজা করিত।

সেনানায়িকা লক্ষ্মী—গত ১৩ই অক্টোবর কলম্বো হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মালয়ে ও সিঙ্গাপুরে "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" "ঝান্সীর রাণী" দলের সংগঠনকারী ও নেতৃত্বকারী ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী বৃটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং এখন রেঙ্গুনে আছেন। তিনি মাদ্রাজের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুহিতা—তিনি ডাক্তারী শিখিয়াছিলেন এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের সহিত যোগ দেন ও "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" নারী বিভাগ গঠিত করেন। ঐ বিভাগ ঝান্সীর রাণীর নামে পরিচিত হয়—ঐ বিভাগের নারীরা অস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করেন। ব্রহ্মে জাপানীদিগের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সেনাবিভাগ লোপ পায় এবং কুমারী লক্ষ্মী কয়মাস "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলে" চিকিৎসকের কাজ করেন। গত এক মাসকাল তিনি বৃটিশের সাহায্য করিয়াছেন। "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" অধিকাংশ লোকের মত তিনিও জাপানীবিরোধী।

শাসন পরিষদে স্যার আকবর হায়দারী—স্যার সুলতান আমেদ বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলারের পরামর্শদাতার পদ পাইয়া শাসন পরিষদের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আগামী ৩১শে অক্টোবর হইতে তাঁহার স্থানে স্যার আকবর হায়দারী অস্থায়ী সদস্যের কাজ করিবেন।

গান্ধীজীর সফর—গত ১০ই অক্টোবর পুণা হইতে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে, মহাত্মাজীর বাঙলা সফরের দিন পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে কথা ছিল, তিনি ২রা নবেম্বর কলিকাতায় আসিবেন এবং প্রায় ৬ সপ্তাহকাল বাঙলায় ও আসামে অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু তিনি ঐ দিনের পরে কলিকাতায় আসিবেন এবং কবে আসিবেন, তাহা পরে প্রকাশিত হইবে। বাঙলায় যাঁহারা তাঁহার সফরের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা পরে তাঁহার আগমন সময় ঘোষণা করিবেন।

বিমান দুর্ঘটনা—গত ১৯শে অক্টোবর বর্ধমান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—গুসকরা গ্রামে শ্রমিক বসতির উপর একখানি বিমান পতিত হয়। একখানি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ৫জন লোককে চিকিৎসার্থ বর্ধমানে ফ্রেজার হাসপাতালে আনা হয়। তাহারা সকলেই দগ্ধ হইয়াছিল। হাসপাতালে এক জনের ও তাহার দুহিতার মৃত্যু হইয়াছে।

পদ্মার ভাঙ্গন—নদীয়া জেলার দাসুড়দিয়ার নিকটস্থ গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবার পদ্মা সারা সেতুর ৩ মাইল দূরবর্তী গোলাবনগরের নিকটে ভাঙ্গন আরম্ভ করিয়াছে; গোলাবনগর ও ভদ্রপাড়া গ্রামদ্বয় এবং বাহাদুরপুরের কতকাংশ নদীগর্ভে গিয়াছে। প্রায় এক শত পরিবার (প্রায় এক হাজার লোক)

গৃহহীন ও সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখনও ভাঙগন চলিতেছে।

নির্বাচনের উদ্যোগ—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সভ্য নির্বাচনের আয়োজন হইতেছে। মুসলিম লীগ যেমন সর্বত্র মুসলমান সভ্য নির্বাচনের জন্য লীগের মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিতেছেন, তেমনই জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ লীগ প্রার্থীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন। গত ১০ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে মিস্টার নুরী প্রকাশ করিয়াছেন জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন—প্রার্থী নির্ধারণকল্পে শীঘ্রই "পার্লামেন্টারী বোর্ড" গঠিত হইবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ মনে করেন—লীগ পরিকল্পিত "পাকিস্থান" প্রস্তাব জাতির মধ্যে অকল্যাণকর। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কংগ্রেসের সহিত একযোগে প্রচারকার্যাদি করিবেন। মিস্টার নুরী বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ে লীগের সহিত জাতীয়তাবাদী দলের প্রবল প্রতিযোগিতা হইবে।

বিহারের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রায় এক শত ৫০ জন কংগ্রেসী মুসলমান গত ১৮ই অক্টোবর সাদাকাত আশ্রমে সমবেত হইয়া স্থির করিয়াছেন, জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসী মুসলমানগণ সর্বত্র নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন। মিস্টার জিন্না যে বলিয়াছেন, মুসলিম লীগই ভারতে মুসলমানদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, তাহা সত্য নহে।

ওদিকে মিস্টার জিন্না মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং পাঞ্জাবের গভর্নরকে লীগ বিরোধী বলিয়া আক্রমণ করিয়াছেন।

বাঙলায় কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৭ জন সভ্য নির্বাচিত হন—৮জন অ-মুসলমান, ৬জন মুসলমান ও ৩জন য়ুরোপীয়। বর্তমানে যে ৬জন মুসলমান সভ্য আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পরিষদের সভাপতি স্যার আব্দার রহিম একজন; জাতীয়তাবাদী দলের স্যার আবদুল হালিম গজনভী আর একজন। যাহাতে জাতীয়তাবাদী প্রার্থীরাই মনোনীত হন, সে চেষ্টা হইতেছে। অ-মুসলমান কেন্দ্রসমূহের মধ্যে এবার বঙ্গীয় মহাজন সভা অন্যতম। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবার কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচনপ্রার্থী।

বাঙলার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সভ্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নভার নিম্নলিখিত ৩জনে গঠিত সমিতিকে প্রদত্ত হইয়াছে:—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, মিস্টার আসরফউদ্দীন চৌধুরী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

দুর্গত মৃত—বাঙলা সরকারের হিসাব অনুসারে গত ১১ই অক্টোবর হইতে ১৬ই অক্টোবর—এই ৬ দিনে কলিকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে ২৫ জন দুর্গতের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর ২৪ জন দুর্গত হাসপাতালে নীত হইয়াছিল। ইহা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের জের। কতদিনে এই জের মিটিবে তাহা কে বলিতে পারে? কলিকাতার হাসপাতালেই এখনও এইরূপ মৃত্যু ঘটিতেছে। মফঃস্বলে—সমগ্র বাঙলায় প্রতি দিন এইরূপ কত দুর্গত ঔষধপথ্য ও শুশ্রূষা না পাইয়া মৃত্যুপথের যাত্রী হইতেছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যাইবে কি? এই সব মৃত্যুর জন্য কে বা কাহারা দায়ী? আর ইহা কাহার পক্ষে লজ্জার বিষয়?

অনাচারের অভিযোগ—গত ১৩ই অক্টোবর আজমগড়ে ৬০ হাজার শ্রোতার নিকট জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামাকালে বালিয়া জিলায় অনুষ্ঠিত নিষ্ঠুর বর্বরতার ও অত্যাচারের অভিযোগে পুলিশের ও সমর বিভাগের ৫জন বৃটিশ কর্মচারীকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন:—

ইহারা গুলী চালাইয়াছিল বলিয়া আমি ইহাদিগের সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছি না। যখন কোন জাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন অপর পক্ষ গুলী চালাইলে তাহাতে দুঃখ করিবার কি থাকিতে পারে? আমি তাহাদিগকে যে নিষ্ঠুর বর্বরতার ও অত্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছি, তাহা কোনরূপে—কোন যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না।

পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে নাকি যুক্তপ্রদেশের বহু বৃটিশ রাজকর্মচারী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা পারিলে তাঁহাকে অবিলম্বেই কারাগারে রুদ্ধ করিতেন। কিন্তু ঐ সকল কর্মচারী অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন কি?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাঙলায় ঐরূপ অত্যাচারের তদন্ত করিতে বলিয়াছেন। মেদিনীপুরে ও কলিকাতায় তদন্তই যথেষ্ট হইবে।

খানাতল্লাস—গত ১৩ই অক্টোবর ভারতরক্ষা নিয়মের বলে পুলিশ এলাহাবাদের 'ভারত' পত্রের কার্যালয়ে খানাতল্লাস করিয়াছে। 'ভারতে' রেওয়া রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পাণ্ডুলিপি হস্তগত করিবার জন্যই নাকি রেওয়া রাজ্যের নির্দেশে খানাতল্লাস হয়। রেওয়া রাজ্যের পুলিশের লোকও এলাহাবাদের পুলিশের সঙ্গে ছিলেন। খানাতল্লাস হইয়াছে বটে, কিন্তু যে পাণ্ডুলিপির জন্য খানাতল্লাস, তাহা পুলিশ হস্তগত করিতে পারে নাই। সামন্ত রাজ্যের অধিকার কিরূপ?

দুর্গোৎসবে সাম্প্রদায়িক অনাচার—ব্যবস্থা পরিষদসমূহের আসন্ন নির্বাচনের পূর্বেই এবার বাঙলার নানা স্থানে দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মুসলমানগণ বাধা ঘটাইয়াছে। ১৭ই অক্টোবর বিসর্জনের দিন—কলিকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরে কয়খানি প্রতিমা যখন [illegible] ঠাকুর রোড দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পাটকলের "কুলীলাইন" হইতে অতর্কিতভাবে ইষ্টক প্রক্ষেপ আরম্ভ হয়। কয়খানি প্রতিমা ভাঙিগয়া যাওয়ায় সেদিন আর বিসর্জন হয় নাই—পরদিন হইয়াছিল। বাঙলার গভর্নর এ সম্বন্ধে কলিকাতার মেয়রকে তাঁহার পত্রোত্তরে যে পত্র লিখেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি কলিকাতায় থাকিয়াও ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত কলিকাতার উপকণ্ঠে ঐ সাম্প্রদায়িক দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট হইতে পান নাই।

ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রেকাবী-বাজার, পাঁচগা, পাইকপাড়া, আবদুল্লাপুর ও রামপাল ইউনিয়নগুলিতে এবার প্রথম রাজপথে মসজিদের সম্মুখে বাদ্য নিষিদ্ধ করিয়া প্রতিমা বিসর্জনের জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা করায়, বহু হিন্দু সেই ব্যবস্থার প্রতিবাদে প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ রাখিয়াছেন।

রংপুর জিলার লালমণিরহাটে মুসলমানগণ দুর্গা প্রতিমা ভঙ্গ করায় যে হাঙ্গামা হয়, তাহাতে পুলিশ গুলী চালায় এবং লোক হতাহত হয়।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে এবার পুলিশ চাষাঢ়া রোডে হিন্দুর প্রতিমা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করায় যথাকালে প্রতিমা বিসর্জন করা হয় নাই।

এই কয়টি স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও এক সম্প্রদায়ের লোকের অনাচারের বা পুলিশ কর্তৃক রাজপথে হিন্দুর অধিকার সঙ্কোচের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় খাকসার নেতা—গত ২১শে অক্টোবর খাকশার নেতা আল্লামা মাশরিকী কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গৃহে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এক দল লোক এত গোলমাল করিয়াছিল যে, পুলিশ ৩বার লাঠিচালনা করে এবং ৪ ঘণ্টাকাল সভার কার্য পরিচালনা অসম্ভব হইয়াছিল। যাহারা গোলমাল করিয়াছিল, তাহারা মুসলিম লীগের লোক—এই কথা আল্লামা মাশরিকী বলেন এবং অভিযোগ উপস্থাপিত করেন—পুলিশ মুসলিম লীগের পক্ষাবলম্বন করিতেছিল।

সত্যবতী দেবী—বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী সত্যবতী দেবীকে যখন বন্দিদশা হইতে মুক্তিদান করা হয়, তখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য মরণাহত। গত ২১শে অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে কয়দিন দিল্লীর যক্ষ্মা হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক ছিল। তাঁহার মৃত্যুর ৩ দিন মাত্র পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহাকে দেখিতে যাইলে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুই চাহি না।" তিনি ভারতের তরুণদিগকে দেশের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দুও প্রদান করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় নৃত্য

শ্রীমতী ঠাকুর

নৃত্য জীবনী শক্তির চরম বিকাশ। যে-সব কলা দ্বারা মানুষ তাহার সৌন্দর্যানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের গভীরতম মূল নৃত্যরস হইতে প্রাণসঞ্চয় করে। অন্যান্য কলা সৃষ্ট হইবার বহু পূর্বে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত, আড়ম্বরহীন নৃত্য দ্বারা তাহার অনুভূতি প্রকাশ করিয়াছে—অপরের হৃদয়ে সেই রস সঞ্চারিত করিবার জন্য এই সরল কলাই তখন তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। আদিম মানবের বাদ্যযন্ত্র ছিল না, ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সে তখনও শিখে নাই, প্রতিমা নির্মাণের যন্ত্রপাতি তাহার ছিল না, চিত্রাঙ্কনের সরঞ্জাম তাহার কাছে তখনও অজানা। অনুভূতি প্রকাশ করিবার একমাত্র পন্থা ছিল তাহার নিজের দেহ; সেই দেহ সে সাবলীল ছন্দে তালে তালে আন্দোলিত করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, ভয়-ঘৃণা প্রকাশ করিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল—নৃত্যও তাহার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সুকুমার কলায় পরিণত হইল; মানুষ নৃত্য দ্বারা তাহার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম অনুভূতিকে রূপ দিতে শিখিল।

সলীল ছন্দে, তালমানযোগে দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আন্দোলন দ্বারা মানুষ যখন তাহার জীবনীশক্তির চরম সত্তাকে সপ্রকাশ করিয়া তুলে তখনই তাহা নৃত্যের রূপ ধারণ করে। নৃত্য তখন মানুষের নব নব সৌন্দর্যানুভূতি, সত্যের সঙ্গে তাহার অন্তরতম পরিচয় নব নব রূপে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ করে। তাই শুদ্ধ, অকৃত্রিম নৃত্য সম্পূর্ণ বাধাবন্ধহীন। দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তাহাকে রুদ্ধ করা, কুসংস্কার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করার অর্থ আর কিছুই নয়—তাহার অফুরন্ত জীবন উৎসকে রুদ্ধ করা, তাহার স্বাধীনতাকে পঙ্গু করা। আমাদের দেশের হৃদয় একদিন স্বতঃস্ফূর্ত, বাধাবন্ধহীন আনন্দের নৃত্যচ্ছন্দে আন্দোলিত হইয়াছিল, আজ সেই ধারা বন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী নট-নটীদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্ধকূপের সৃষ্টি করিয়াছে। রোগজীর্ণ, বিষাক্ত, বিলাস-ব্যসনীদের উত্তেজনা দানেই আজ তাহার চরম আনন্দ, পরম লাভ। ক্ষুদ্র হৃদয়ের অবসর বিনোদন ও ক্ষণস্থায়ী চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ করাকেই এখন নৃত্যের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের সুপ্তবুদ্ধি পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে; নৃত্যের বিকৃত বিকলাঙ্গ দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্জীবিত হইতেছে। ভারতীয় নৃত্যের নবজীবন সন্ধিক্ষণের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ভারতের উচ্চাঙ্গ ও জনপদ নৃত্যের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

সাঁওতাল, কোলি, ভীল প্রভৃতি অনুন্নত জাতির ভিতরে যে-সব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে রহিয়াছে ফসল কাটা, নবান্নের আনন্দ অথবা বৃষ্টিপাত, ঝঞ্ঝাবাত, ভূতপ্রেতের লীলাখেলা। বসুন্ধরার আদিম সন্তান নৃত্যযোগে প্রয়োজনমত কখনো প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছে, কখনো তাহার দাক্ষিণ্য মুখের কামনা করিয়াছে। ডমরু ঢোলের বৈচিত্র্যহীন তালের সঙ্গে সে তখন তাহার দেহের ছন্দ মিলাইয়া নাচিয়াছে। সে নৃত্য অমার্জিত, কিন্তু তবু কখনও কখনও তাহাতে হিল্লোলের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্ধবৃত্তাকারে তাহারা নাচে, গান গায় ও মধ্যস্থলে দুইজন পুরুষ মাদল বাজাইয়া তীক্ষ্ণ চীৎকার ও উন্মত্ত নৃত্যে স্ত্রীলোকদিগকে দ্রুততর নৃত্যে উত্তেজিত করে। পুরুষেরাও কখনো মূল নর্তকরূপে অপ্রসন্ন দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য অথবা দর্শকের মনে বিচিত্র ভাব সঞ্চারের জন্য নৃত্য করিয়া থাকে। অসভ্য সমাজে ইহাদের প্রতিপত্তি অসীম; সমাজ তাহাদিগকে ভক্তিভরে পূজা করে।

আমাদের দেশের জনপদ নৃত্য বলিতে প্রধানত গুজরাতের গরবা, মালাবারের কৈকট্টকলি, উত্তর ভারতের কাজরী ও মণিপুরের রাস-লীলাই বুঝায়। ইহাদের মূলে ধর্মের অনুপ্রেরণা, অঙ্গভঙ্গীতে ইহারা সুমার্জিত ও আঙ্গিকের দিক দিয়া যে ইহাদের যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নৃত্যগুলি পুনরাবৃত্তি-বহুল বলিয়া দর্শকের মন সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তৎসত্ত্বেও ইহাদের মাধুর্য ও প্রাণশক্তি অস্বীকার ক



নটরাজ শিব

যায় না। গুজরাতের গরবাতে যথেষ্ট লালিত্য ও প্রাণশক্তি আছে, কিন্তু পদভঙ্গির অভাব; মালাবারে কৈকট্টকলিতে সবল অঙ্গ সঞ্চালন ও বিচিত্র পদভঙ্গির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু মাধুর্যের অভাব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে, একমাত্র গুজরাতের জনপ্রদ নৃত্যেই স্ত্রী-পুরুষেরা যেমন পৃথক পৃথক মণ্ডলীতে নৃত্য করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়ে সম্মিলিত হইয়াও নৃত্য করিবার রীতি প্রচলিত আছে। নর্তকীরা বহু ছিদ্র বিশিষ্ট মৃৎপাত্রে জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া অথবা মস্তকে সুগঠিত পিত্তল কলসী ধারণ করিয়া মনোরম অঙ্গভঙ্গিতে চক্রাকারে নৃত্য করে; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও রসগীতি গায়, করতালি দিয়া তাল লয় রক্ষা করে। কখনও কখনও দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-খণ্ড দিয়া নাচিবার সময় তাল বাজায়; অজন্তা ও অন্যান্য প্রাচীন চিত্রে ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে সঙ্গীত সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; তখন কেবলমাত্র মাদলের তালে শুদ্ধ স্বাধীন নৃত্য আরম্ভ হয়; অঙ্গভঙ্গি তখন সবল হইয়া উঠে ও পদসঞ্চালন দ্রুত-তর গতিতে হইতে থাকে।

জনপদ নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী রাস-লীলাতেই সর্বাধিক সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন হয়; আঙ্গিকের দিক দিয়াও উন্নত বলিয়া রাসলীলাকে উচ্চাঙ্গ নৃত্য-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মণিপুরের রাসলীলা ভক্তিরসে পরিপূর্ণ—গোপ ও গোপিগণের আবেষ্টনীতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণনা করাই এই নৃত্যের উদ্দেশ্য। রাজবাড়ীতে রাসলীলার নাচ শিখানো হয়, ও দেশের জনসাধারণ রসের দিক দিয়া ইহার বিচার করিয়া ইহার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। রাসলীলায় তরুণীরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে গোপীরূপে নৃত্য করে ও রাধার ভূমিকায় বালককে নামানো হয়। তরুণীদের নৃত্য অপেক্ষাকৃত শান্ত ও সরল; তরুণ ও বয়স্কদের নৃত্য সবল ও ছন্দ-বৈচিত্র্যবহুল। নাচের তাল রক্ষা হয় মৃদঙ্গের জ্ঞাতি, খোল সংযোগে।

উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যে প্রধান; উত্তর ভারতের কথক, দক্ষিণ ভারতের ভরত নাট্যম ও মালাবারের কথাকলি ও মোহিনী নাট্যম। পরিতাপের বিষয় এই সব কয়টি নৃত্যই ব্যবসাদার নটনটীর কবলগ্রস্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল বিত্তশালীদের ঘৃণ্য লালসাগ্নি উদ্দীপ্ত ও চরিতার্থ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। যে দুষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই সব নৃত্যের চর্চা আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে এই মহৎকলার প্রাণবন্ত সৌন্দর্য ও পূর্ণাবয়ব আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। মুসলিম সভ্যতার প্রভাবে উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য কঠিন ও জটিল তাল লয়ের সৃষ্টি করে, সে-তাল প্রকাশ করিলে তবলার বোল পদধ্বনিতে শোনা যায়। শুধু তাহাই নহে; হাবভাব, নিতম্ব ও কটি সঞ্চালন, কটাক্ষভঙ্গি, স্কন্ধান্দোলন, এক কথায় সর্ব অঙ্গের চালনা ও ভাবপ্রকাশ শুদ্ধমাত্র দর্শকের হৃদয়ে পাশবিক আনন্দ দানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই সব নৃত্যে বিকাশপ্রাপ্ত আঙ্গিকের সন্ধান মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, কিন্তু বেশির ভাগই হীন ও অশ্লীল।

দক্ষিণে প্রচলিত ভরত নাট্যম্ শুদ্ধ হিন্দুকলা। ভরত নাট্যে যে-সব 'মুদ্রা' দ্বারা দেবদেবী, পশুপক্ষী ও বিভিন্ন অনুভূতির প্রকাশ করা হয় সেগুলি এই নৃত্যের মুখ্য বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।



বাউল-নৃত্যে রবীন্দ্রনাথ
(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত)

উত্তরের কথক নৃত্যের তুলনায় ভরত নৃত্যে পদ সঞ্চালনের কারুকার্য নাই এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনও অপেক্ষাকৃত কর্তিত ও সংযত। মালাবারের মোহিনী নাট্যম অনেকটা ভরত নাট্যের ন্যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্য মরণোন্মুখ—সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণের সব কয়টি উচ্চাঙ্গ নৃত্যই কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরাই নাচিয়া থাকে—অতি অল্প বয়সেই বালিকারা পুরুষ পেশাদারের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন নিয়ম রীতিমত পালন করিয়া নৃত্য-কলায় পারদর্শিনী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব নৃত্যে আজকাল কেবলমাত্র শুষ্ক আঙ্গিকের পরিচয় পাওয়া যায়, শুদ্ধ কলার চিহ্ন মাত্র নাই। যে-নৃত্য সৃষ্টি করে না, কেবলমাত্র পুনরানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, তাহার যে এই গতি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি।

আজকাল কথাকলি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ও এ সম্বন্ধে প্রচুর বাক্য-বিন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলার প্রয়োজন। এদেশের সর্বত্রই নর্তক-নর্তকী, গায়ক-গায়িকা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অভিনয় করিয়া থাকে; বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। মালা-বারে ইহারা কথাকলি নামে পরিচিত—'কথা' অর্থ 'গল্প' ও 'কলি' অর্থ 'নাট্য'। কথকলির অভিনেতারা অন্যান্য প্রদেশের নট-নটীর ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে না; তাহারা মূক অভিনয় করে, তবলা ও মন্দিরা সহযোগে নাচে ও তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুইজন গায়ক গল্পগুলি গান গাহিয়া শুনায়। মুক্ত আকাশের নীচে অভিনয় হয় ও সূর্যোদয় পর্যন্ত আনন্দোৎসব চলে। অভিনেতারা বৃহৎ চুনটদার জামাকাপড় পরে ও বিচিত্র প্রসাধনের দ্বারা এক প্রকার অভিনব মুখোস নির্মাণ করে। কথাকলি নৃত্যের কটাক্ষ, মুখের মাংসপেশী নিয়ন্ত্রণ, নানাপ্রকার 'মুদ্রার' ব্যবহার ও বিশেষত পদদ্বয়ের সম্প্রসারণ দ্বারা নৃত্যকে প্রাণদান প্রভৃতি আঙ্গিক অত্যন্ত দুরূহ ও বহু বৎসরব্যাপী কঠিন সাধনা ব্যতীত এই কলায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। নয় দশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই বালিকাকে নৃত্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হয় ও পূর্ণ যৌবন লাভ না করা পর্যন্ত নর্তকীকে কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া জীবনযাপন করিতে হয়।

কথাকলি ঠিক নৃত্য নয়, নৃত্যনাট্যও নয়। বরঞ্চ মুখোসপরা তামাসা-নাচের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য অধিক; নৃত্যকলা ইহাতে স্ফুরিত হয় না। নৃত্যের প্রারম্ভেই যবনিকান্তরালে দুই একটি আবাহন নৃত্য করা হয় ও তারপর প্রত্যেক শ্লোক বা গান গাওয়া শেষ হইতেই অভিনেতারা চক্রাকারে 'কলসম' নৃত্য করে। তারপর স্ত্রী চরিত্রের 'সরি' নৃত্য ও রাজহংস বা ময়ূরের পক্ষী-নৃত্য করা হয়।

কথাকলি নৃত্যে শক্তি ও তেজঃপ্রধান, কিন্তু অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে পদ সঞ্চালনের যে কারুকার্য ও গতিচ্ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় ইহাতে তাহার অত্যন্ত অভাব। অভিনেত্রী-দিগকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও যে কেন তাহাদের নৃত্য এত রূঢ় ও অপক্ক রূপে প্রকাশ পায়, তাহা অনেক সময় বুঝিয়া উঠা যায় না। কথাকলি গণ্ডীবদ্ধ বলিয়া পুনরানুকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট ও মাঝে মাঝে তাহার বস্তুতান্ত্রিকতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু আঙ্গিকের দিক দিয়াই আজ কথাকলি আমাদের কৌতূহল ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সুকুমার কলা হিসাবে এই নৃত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যের ন্যায় আজ মৃত।

[illegible]

মাত্র কুড়ি বাইশ বৎসর হইল এদেশে নৃত্যকে বিষাক্ত পরিবেষ্টনী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনে স্থান দিবার চেষ্টা করা হইতেছে ও সংগীত চিত্রাঙ্কণের ন্যায় নৃত্যও সুকুমার কলা হিসাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। তাই আজকাল সংগীতের মজলিসে, স্কুলকলেজের আমোদ-অনুষ্ঠানে, পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব আনন্দে নৃত্য চর্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কণ্ঠসংগীতের সংগে মিলাইয়া কেবলমাত্র তালসংযুক্ত পদ সঞ্চালন থাকিলেই তাহা পূর্বের ন্যায় এখনও নৃত্য নামে নন্দিত হয়। সেই নৃত্যকলা এখন 'ফ্যাশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কোনো রকম শিক্ষা-দীক্ষা না লইয়াই চ্যারিটি-রিলীফ ফণ্ডের অজুহাতে যত্রতত্র নৃত্য করা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখনও কি এই সরল তত্ত্বটি বুঝিবার সময় হয় নাই যে, নৃত্য অর্থহীন অংগপ্রত্যংগ বিক্ষেপের মূল্যহীন সমষ্টিমাত্র নহে। এখনও কি দেশবাসী বুঝিবে না যে, নৃত্য অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায় একনিষ্ঠ ও আজীবন সাধনা সাপেক্ষ কলা বিশেষ। অতি অল্প সংখ্যক নর্তক নর্তকীই এ যাবত অর্থহীন অংগসঞ্চালন ত্যাগ করিয়া প্রকৃত নৃত্যরসে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। এবং ইহাদের ভিতরেই বা কয়জন সত্য সত্য হৃদয়ংগম করিয়াছেন যে নৃত্যের ন্যায় উচ্চাংগের সুকুমার কলায় পারদর্শী হইতে হইলে তাহার প্রতি কি অবিচল নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়? বেশীর ভাগই তো দেখিতে পাই দুই একদিনের ছন্নছাড়া শিক্ষায় দুই একটি নৃত্যেই সন্তুষ্ট। তাহাতে তো শুধু লোক ভুলোনো চলে—সে তো কলা নহে। তাই সামান্য যে কয়জন প্রকৃত নৃত্য কলা হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাধনা করিতেছেন তাঁহারা সত্যই প্রশংসনীয়। সমাজের বাধাবন্ধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সাহসের ভরে লোকচক্ষুর সম্মুখে নৃত্যকলা দেখাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারাও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যাগত নৃত্য দেখাইয়াই সন্তুষ্ট। তাঁহাদের নৃত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নাই। পেশাদার নর্তকেরা যে দৈন্য বহু সাধনালব্ধ আংগিকের দ্বারা লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহাদের নৃত্যে তাহা বারবার ধরা পড়ে। ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা যে কাহারও নাই এমন নহে, কিন্তু আছে অতি অল্পসংখ্যক গুণীর ভিতরে। তাঁহারা যে শুধু গভীর সাধনার [illegible] নৃত্যে [illegible] করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা যে শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যাগত নৃত্য সর্বাংগসুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে, তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান যুগের রুচি-অনুযায়ী তাঁহারা নৃত্যের প্রাচীন বিষয়বস্তুকে নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত গুণীর চরম লক্ষ্য ত ইহাও হইতে পারে না; তিনি সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে নব নব বিষয়ের কল্পনা করিতে হইবে, নব নব রূপে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে হইবে—জরাজীর্ণ বৃদ্ধাকে নবীনবেশে সজ্জিত করিয়া তিনি কেন বিড়ম্বিত হইবেন? জীবনীশক্তির যে দ্রুত, অবিশ্রান্ত স্পন্দন আমরা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি সুকুমার কলা সেই জীবনের, সেই জীবনীশক্তির বাণীই তো প্রকাশ করে। অতি সনাতন ভাবনা কামনা একদিন যে রূপ, যে বর্ণ নিয়া প্রকাশিত হইত তাহার সংগে আমাদের অদ্যকার সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ সংগ্রাম, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কোথায় যোগসূত্র? সুকুমার কলা কি কখনো মৃত-দগ্ধ চিন্তা ও অনুভূতির অন্ধকূপে প্রাণ-ধারণ করিতে পারে? নৃত্য ত শুধু তাল লয় যোগে অংগসঞ্চালন নয়, নৃত্য ত সুচারু পদক্ষেপের নামান্তরও নয়; আংগিকের উৎকর্ষ নৃত্য নয়, অংগবিন্যাস দ্বারা সুদর্শন আলিম্পন সৃষ্টি করাও নৃত্য নয়। প্রকৃত নৃত্যের চরম আদর্শ আমাদের জীবনের স্পন্দানুভূতি প্রকাশ করা, সত্য ও সুন্দরকে উন্মোচন করিয়া আমাদের চক্ষুর গোচর করা। জিজ্ঞাসা করি, রাধা-কৃষ্ণ, শিবপার্বতী নৃত্য কি যথেষ্ট নাচা হয় নাই, প্রচুর দেখা হয় নাই? এখনও কি ধর্মের আচ্ছাদনে আবৃত কুসংস্কারের নাগপাশ ছিন্ন করিবার সময় হয় নাই? এ যুগের মানবের কি নিজস্ব কোনোও অনুভূতি, কোনো স্পন্দন, কোনো আশা, কোনো আদর্শ নাই? তাহাদের কি কিছুই বক্তব্য নাই—মানব-সংসারের চিরন্তন দীপান্বিতায় প্রজ্জ্বালিত করিবার কোনো প্রদীপ নাই? বাহির হইয়া আসুক এ দেশের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী মোহমুক্ত হইয়া, প্রকাশ করুক তাহাদের আশা-অনুভূতি আপন সবল কণ্ঠে, শুধু কর্মে নয়,—সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে, সংগীতে ও নৃত্যে। —(গুজরাতি হইতে অনুদিত)।



[illegible]

ভীমরতী

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

দিবালোকেও রাজপথে লোক চলাচল বিরল, কিন্তু সে তীব্র ধ্বনি চতুর্দিকের ইঁটের প্রাচীর ও ঘন বনজঙ্গল ভেদ করে শহরতলীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। একটি শকুনি বসেছিল নীচের প্রাকারে, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে উড়ে গেলো।

অজয় পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েও নড়লো না। সাধকের আচরণ তার চিত্তে নূতন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো। সে মূর্ছিতা রমণীর মুখের ওপর ক্ষিপ্রহস্তে কয়েকটি রেখা টেনে দিল কালো ও সাদা রঙের আর একদিকের দেওয়াল হতে একটি পর্দা সরিয়ে ফেলে অনাবৃত করলে বৃহৎ এক খণ্ড দর্পণ।

দেহটি কয়েক মুহূর্ত পরে নড়ে চড়ে উঠে পড়লো সেইটির সম্মুখে। মুখাকৃতি দেখালো ভয়ংকর। মৃত ব্যক্তির মত প্রাণহীন অথচ রোষান্বিত, ঘৃণাব্যঞ্জক।

সাধু বললে, "এই সেই বিশ্বাসঘাতক—"

অজয় বললে, "আমি বিশ্বাসঘাতক নই, আমি এসেছি প্রজাদের আবেদন নিয়ে।"

তন্ত্রসাধক এবার বিস্মিত হলো।

অজয় বলে গেলো প্রজাদের কথা। অদ্ভুত সে কাহিনী। মাঠের চাষী, বনের কাঠুরিয়া, কামার ও ছুতোর, গাড়ির চালক, দোকানদার ও দরজী, কবি, শিক্ষক ও চিকিৎসক সকলেই হাটেবাজারে, মেলায় মেলায় বলে বেড়াচ্ছে, গান গেয়ে ও নাটক করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান দুর্বৃত্তকে নিহত করে সেই জায়গায় গণতন্ত্র স্থাপন করতে চায়। পূর্বতন রাজবংশের যারা নিজেরা লুকিয়ে থেকে প্রজাদের ওপর এই অসহনীয় শোষণ ও উৎপীড়নের অংশ গ্রহণ করছে না তাদের প্রত্যাবর্তন ওরা চায় না। তারা বলছে যে, আগেকার যুগে রাজারা প্রজাদের ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতো না। হয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিত, না হয় বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে প্রজাপালনে যত্নবান হতো। মিথ্যা আত্মগরিমায় আত্মগোপন করতো না—প্রজাপালন ছিল রাজার একমাত্র ধর্ম, প্রজাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের প্রাণ ধারণ করা হতো নিরর্থক—

মন্ত্রী বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠলো, "কী এত বড় স্পর্ধা—মিথ্যা কথা বিশ্বাস করবেন না মহারাণী। প্রজাদের আমি ভাল করেই চিনি, ওরা হচ্ছে একান্ত রাজভক্ত, রাণী অন্তপ্রাণ—"

অজয় বললে, "ঠিক কথা, রাজভক্তের সংখ্যাই বেশি, তারা এখনও রামরাজত্বের স্বপ্ন দেখে—রাজার লোকেরা তাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি অপহরণ করে নিয়ে গেলেও তারা রামায়ণখানা বার করে মানস-রথে চলে যায় অযোধ্যা-পুরীতে; তবে দুঃখের বিষয় তাদের কাছে মহারাণী সৌদামিনী ও রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের পদাশ্রিত যে কোন সামন্ত রাজার কোন তফাৎই নাই।"

"মিথ্যা কথা, মহারাণী যেদিন প্রকাশ্য-ভাবে রাজপথে পদার্পণ করবেন, সেদিন দেখে নিও সদাগর প্রজাদের আনন্দাশ্রুর বন্যায় ভক্তির শতদল—"

অজয় বাধা দিয়ে বললে, "কিন্তু গলিতে গলিতে মন্দিরে প্রাঙ্গণে, নদীর ঘাটে, কুটীরে কুটীরে ধ্বনিত হবে নূতনতর শোষণের হাহাকার— "

অজয় নাটকীয় ভঙ্গীতে বক্তৃতা শুরু করলো দুই কারণে—প্রথমত কথার অন্তরালে কর্তব্য নির্ধারণ করবার চেষ্টায়; দ্বিতীয়ত মন্ত্রীবরকে পুনরায় কথা বলে আবিষ্ট করে দেওয়ার সুযোগ না দেওয়ার জন্যে। পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বাঙালী মেয়েটিকে দুর্বৃত্তের কবলে ফেলে গেলে সে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না। হয়ত এক মুহূর্ত দৃষ্টির বহির্ভূত হতে দিলে আর দেখতে পাবে না। দাক্ষিণী লম্পটের কাছে চাতুর্যে পরাজিত হতে সে চাইল না। সে বুঝেছে যে, মেয়েটির মাথা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়নি, কিন্তু শক্তিমান মনের সম্মোহনে আচ্ছাদিত। বেচারি নিজেকে চিনতে পারছে না। একবার যেমন করে হোক চিনিয়ে দিতে পারলে স্মৃতিলোক উদ্ঘাটিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক কথায় তা সম্ভব নয়, তাহলে তাকে দেখেও ত' সংজ্ঞা ফিরে আসতে পারতো। অজয় প্রতিজ্ঞা করলো যে, যেমন করে পারে সে সাধকের সম্মোহন-জাল ছিন্ন করবে এবং স্বয়ং সজ্ঞানে তার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারলে উপায় নাই। তার ভয় হলো যে কৃষ্ণদেব রায়ের সমসাময়িক যুগের সঙ্গে নিজের পরিচয় এত অল্প যে, নিছক কথার বন্যায় প্রহসন গতিশীল রাখা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে সোজাসুজি দেশকাল উপেক্ষা করে ব্যক্ত করবে ভবিষ্যদ্‌বাণী।

বলে গেলো—"মন্ত্রী আজ তোমরা প্রজাদের দুঃখের কথা স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করছো। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছ যে, প্রজাদের এ নিষ্ফল বিলাপ ত' আবহমানকাল থেকে হয়ে আসছে, ঐ ত' ওদের নিয়তি। বড় জোর দু দশটা পান্থশালা গঠন করে আর কুয়ো খুঁড়িয়ে দিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে যাবে ভাবছো। ভুল, মন্ত্রী ভুল—ভাবী কালের চক্ষুষ্মান কবিরা আরও বড় মহাকাব্য লিখবে যখন তখন শুনতে পাবে যে রাম রাজার আর অশোকের প্রজারাও শান্ত ও অন্ধ হয়ে থাকে নি—তারাও বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে রীতিমত গর্বভরে আপন পথে এগিয়ে গেছে, আর বুদ্ধিমান রাজারা গেছে তাদের সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে। সে রাজারা নিতান্ত নির্বোধ আর অন্ধ যারা আত্মগরিমা ও বংশ মর্যাদায় ভুলে বেতনভোগী ঐতিহাসিক গীতিকারের কাছে নিরবধি প্রশস্তি শুনে এসে ভেবেছে প্রজারা বুঝি একান্ত অনুগত। ভুল মন্ত্রী, সম্পূর্ণ ভুল—দেখতে পাচ্ছনা বাঙলা দেশটা। রাজা প্রজার মধ্যে প্রভেদ কোথায়, কত সুস্পষ্ট। হাটে হাটে, মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াও, কোথাও শুনতে পাবে না রাজার নাম। শুনবে কবির নাম, শুনবে সদাগরের গল্প, শুনবে এমন সব সাধনার কথা যার মধ্যে রাজা রাজড়ার কোন স্থান নাই—"

মন্ত্রী বাধা দিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে, "শুনতে চাই না সে ম্লেচ্ছদেশের কথা।"

অজয়ের মনে হলো সাধু এবার শঙ্কিত হয়ে পড়েছে, সে থামলো না। বরং আরও উৎসাহিত হয়ে বলে গেলো—"সাধনার কথা বলছি না, সেও ত' আর এক প্রকারের অন্ধ আত্মরতি—আমি বলছি বড় বড় বিদ্রোহের কথা। হৃদয়ের বিদ্রোহে অস্ত্রের ঝঞ্জনা নাই মন্ত্রী, কিন্তু সে বিদ্রোহ বড় নিষ্করুণ, বড় গভীর ও বড় ব্যাপক—"

"শুনতে চাই না যত মিথ্যা কথা—" হুংকার থামিয়ে দিয়ে মহারাজ্ঞী সগর্বে স্মিত হেসে বললেন, "বেশ ত' ত্রিবংকুর বল বল—মন্ত্রী ওকে বলতে দাও, বাঙলা দেশের কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে। আমি বোধ হয় পূর্ব জন্মে বাঙালী ছিলাম—তবে সদাগর তুমি এত কথা জানলে কেমন করে, তুমি ত' বালক।"

অজয়ের হাসি পেলো। ইংরাজি ভাষায় এই সকল কথা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ বোধ হলো—সে গলার স্বর নামিয়ে গল্প বলবার ভঙ্গীতে বললে, "আমাকে তন্ত্র সাধকেরা

ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে দেশে—অদ্ভুত সুন্দর দেশ, পাহাড় পর্বত নাই কিন্তু নদীর—"

মন্ত্রী দুজনার মধ্যে এসে অধৈর্য হয়ে বললে—"রাজকার্যের সময় চলে যাচ্ছে, সংবাদ পেলাম এবারও কৃষ্ণদেবরায় স্বয়ং আসছেন। শুনেছি—"

মন্ত্রীর কথা উপেক্ষা করে রাণী সৌদামিনী অজয়কে বললেন—"তারপর বল সদাগর—অস্পষ্ট ছবি দেখতে পাচ্ছি যেন—"

অজয়ের বাক্যস্ফুট হবার পূর্বেই সে পিছন হতে আকর্ষণ বোধ করলো আর সহসা নীচে নেমে গেল। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বে মুহূর্তে সে দেখলো যে, তন্ত্রসাধক এক হস্তে রমণীর দৃষ্টি আচ্ছাদিত করে আর এক হস্তে কুঠারাঘাত করে ছিন্ন করে দিল একটি মোটা কাছি। পদতলের ভূমি এত শীঘ্র ধ্বসে গেলো যে, অজয় পিছন হতে বলিষ্ঠ হস্তের আলিঙ্গন হতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টাও করলো না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সহসা গাঢ়-অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে অজয় সহসা এসে পড়লো বড় বড় মশালের আলোতে আলোকিত ধূম্র-মণ্ডিত ও দুর্গন্ধময় এক রাজসভাতে।

মঞ্চের ওপর শূন্য সিংহাসনের আশে-পাশে সভাসদবর্গ, নীচে অজয়ের দুই পার্শ্বে কয়েকটি শৃঙ্খলিত বন্দী—সকলে নিশ্চল, প্রাণহীন ও নিষ্কম্প—কোন শাপ বলে পাষাণে পরিণত হয়েছে যেন। একমাত্র গতিশীল হচ্ছে কালো কালো দেওয়ালের ওপর নৃত্যশীল মশালের আলো আর বীভৎস মুখোসধারী পথ প্রদর্শকের দীর্ঘ ছায়া।

সভামঞ্চের দক্ষিণ দিক থেকে এলোমেলো বাতাস আসছিল কোন অদৃশ্য প্রবেশ পথ দিয়ে, তবু ধোঁয়াতে শ্বাসরোধ হয়ে এল অজয়ের। দৃষ্টির বিভ্রম কেটে গেলে সে আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলো। বাতাসের প্রবেশ পথে কয়েক জোড়া অঙ্গারের মত জ্বলন্ত চক্ষু। পূর্ব রাত্রির সেই নরমাংস খাদক শৃগালের কথা স্মরণ হতে অজয় পেছিয়ে আসতে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়লো সামনে। দেখলো আততায়ীর এক হস্তে উদ্যত খড়্গ ও আর এক হাতে লৌহ শৃঙ্খল। আপানার কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠলো, "শালা ভীমলী দেবী দেখনে আয়া—"

পরিচিত কণ্ঠস্বরে অজয়ের সংবিৎ ফিরে এল। সে এক খণ্ড প্রস্তর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো খড়্গধারীর বুকের ওপর ও পর মুহূর্তে উন্মত্তের মত লাফিয়ে উঠে কেড়ে নিল খড়্গ। অতর্কিত ও দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না আপানা এবং প্রকাণ্ড মুখোসটিতে দৃষ্টিপথের অনেকখানি রুদ্ধ ছিল। সে আর্তনাদ করে সরে যেতে গিয়ে একটি ধাতু মূর্তির প্রসারিত হস্তে বাধা প্রাপ্ত হলো ও সেই সঙ্গে অজয় খড়্গের উল্টা দিক দিয়ে আঘাত করলো তার মাথায়।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলি কাণ্ড ঘটে গেলো। পদতলে লুণ্ঠিত দেহটিকে ডিঙিয়ে গিয়ে অজয় বহির্পথ খুঁজতে লাগলো পিছন দিকে উন্মত্তের মত, সামনে যাবার সাহস নাই। সেই জোড়া জোড়া অঙ্গার চক্ষুগুলি তখনও স্তব্ধ হয়ে দেখছিল তাকে।

সহসা নারী কণ্ঠস্বর কানে এলো। অজয় ভূমিতল হতে আপানার মুখাবরণটি তুলে নিয়ে পরে ফেললো। শৃঙ্খলিত বন্দীর ধাতু মূর্তির বড় বড় নৃত্যশীল ছায়া সেদিকটি অস্পষ্ট করে রাখলেও মুখোস ও খড়্গ রক্ত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রইল। ধীরে ধীরে শৃগালের ভীড়ের মধ্যে দুইটি মনুষ্য মূর্তি দেখা গেলো।

মন্ত্রী মহারাজ্ঞী সৌদামিনীকে মঞ্চের শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বসলো পাশে। অজয় বুঝতে পারলো যে সভাসদগুলি হচ্ছে ধাতু বা প্রস্তরমূর্তি। তারা স্তব্ধ ও নির্বাক হয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে অদ্ভুত নিষ্করুণ এক নাটক দেখলো।

—"ঐ দেখুন সেই বিশ্বাসঘাতক মূর্চ্ছার ভান করে পড়ে আছে। কাপুরুষ হাজার হোক সদাগর শ্রেষ্ঠীপুত্র ত' বটেই। ধনী পুত্রের নধর দেহে এতখানি ক্লেশ সহ্য হবে কেন? হতভাগা প্রজাদের দুঃখে বিগলিত হয়ে গিছলো।"—ক্রোধে কণ্ঠরোধ হয়ে এল মন্ত্রীর।

সৌদামিনী শিরে হাত রেখে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "কিন্তু মন্ত্রী বাঙলা দেশের কথা আমাকে এত উতলা করে কেন বলতে পারো? ওদেশের নামেতে কি কোন যাদু আছে?

মন্ত্রী গর্জন করে উঠলো—"ওটা ত' একটা ভূত-প্রেতের দেশ, ওখানে রাজমর্যাদা নাই, রাজবংশের গৌরব কাকে বলে তা ওরা জানে না। লোকগুলো জানোয়ারের মত নিজেদের মধ্যে রাজা নির্বাচন করে নেয়। যাক ও দেশের কথা মহারাণী, আপাতত আপনার শৃগালবাহিনী অভুক্ত রয়েছে—তা ছাড়া আপনার পিতৃদেবের এই সভাসদবর্গকে শাপমুক্ত করতে হলে শোণিতের অর্ঘ্য প্রদান করতে হবে। দেখছেন না এরা সবাই স্তব্ধ হয়ে শুধু এক কথাই বলছে—রক্ত চাই, রক্ত চাই, রক্ত চাই—"

রমণী অস্বাভাবিক তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো—"রক্ত চাই!"

অজয় খড়্গটিকে কঠিন করে ধরলো। কি একটি ইঙ্গিত পেয়ে শৃগালের দল তাকে পাশ কাটিয়ে ভূমি লুণ্ঠিত দেহটিকে আক্রমণ করলো। মূর্চ্ছিত আপানার আর্তধ্বনি পর্যন্ত করবার অবসর রইলো না। মশালের রক্ত আলোকের নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সেই বীভৎস দৃশ্য প্রতিক্ষেপে বীভৎসতর হয়ে উঠতে অজয় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত শব্দ থেমে যেতে সে দেখলো যে শৃগালের দল চলে গেছে। আর অদূরে মঞ্চের ওপর সিংহাসনের নীচে সাধু সন্ধ্যাকে অঙ্কে নিয়ে সমাধিস্থ হয়ে বসেছে। উভয়ে সংজ্ঞা শূন্য। অজয় খড়্গ উত্তোলন করে এগিয়ে গেলো, কিন্তু নরহত্যা করতে পারলো না। ধ্যানমগ্ন সাধু মূর্তিটি শান্ত সৌম্য ভাব অবলম্বন করেছে। রমণীটি মৃন্ময় দেবী স্বরূপিণী প্রতীয়মান হলো। সে খড়্গ হস্তে শৃগালের সুড়ঙ্গ পথেই ঢুকে পড়লো। সুশীতল ঝড়ো বাতাস হলো তার দিগ্‌প্রদর্শক ও অল্প সময়ের মধ্যে সে এসে পড়লো সেই বহু পরিচিত পর্বতের এক নিভৃত গহ্বরের মধ্যে।

সে স্থান হতে সমুদ্র অদৃশ্য হলেও নিকটে। তরঙ্গের মত্ত উচ্ছ্বাস কানে গেছলো দিবালোক দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে অজয়ের মধ্যে নূতন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। ভাবছিল ছুটে গিয়ে দারোগাকে এনে দেখাবে সে দৃশ্য, কিন্তু সেই সঙ্গে পদশব্দ কানে আসতে চকিতে এক কবরের ধ্বংসাবশেষের পাশে লুকিয়ে পড়লো।

তন্ত্রসাধকের বিশাল ন্যুব্জ দেহ বেরিয়ে এল সেই সুড়ঙ্গ পথে। অন্ধকারেও ক্লান্তির লক্ষণ নাই। মূর্তিটি ধীরগতিতে সমুদ্রের পথে অদৃশ্য হয়ে যেতে অজয় নূতন করে কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেললে। ফিরলো সে সুড়ঙ্গ পথে। তার শ্রান্তি উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। ফিরতি পথে বাতাসের সাহায্য না পেয়ে বার বার আঘাত পেলো অন্ধকারে এবং অবশেষে মশালের রক্ত আলো দেখা দিল। সেগুলি প্রায় স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু আপানার মাথার খুলিটি ও কয়েক খণ্ড অস্থি প্রথমেই চোখে পড়লো। বাতাসে উদ্বেল মশালের আলোকে ধাতু মূর্তিগুলিকে বেপমান মনে হলো।

মঞ্চ শূন্য। অজয় অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশপথটিকে খুঁজতে খুঁজতে দেখলো যে এক প্রান্ত হতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ও সেই দিকের অন্ধকার গাঢ়তর। তারপর দেওয়াল হতে একটি মশাল তুলে এনে যা দৃশ্য সে দেখলো, তাতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে এলো। পঙ্কিল ও কর্দমাক্ত প্রবেশপথটি জুড়ে রয়েছে কয়েকটি বিষধর সর্প ও তাদের অসংখ্য ছানা। সে যে এই পথেই এসেছে, সে কথা সে বুঝতে পারলো রন্ধ্রটির দুর্গন্ধে ও পিচ্ছিলে। উপর হতে কোন খাঁচা নেমে এসে থাকবে। বর্তমানে ওঠবার কোন অবলম্বন নাই।

অজয় দ্বিতীয় রন্ধ্রের মুখের কাছে ফিরে গিয়ে বাম পার্শ্বে প্রচ্ছন্ন একটি দ্বার দেখতে

পেলো এবং অল্প আয়াসেই খুলে ফেললো সেইটি। মশালের আলোকে একটি অপরিচ্ছন্ন সোপান শ্রেণী দেখা গেলো এবং আরও উপরে উঠে গিয়ে সে বিস্মিত হয়ে দেখলো যে, একটি পরিচ্ছন্ন শয়নকক্ষে এসে পড়েছে এবং তারই এক প্রান্তে নিদ্রিতা তার সহপাঠিনী সন্ধ্যা। আসবার পথের মধ্যে দু'একটি কাষ্ঠাসন ব্যতীত আর কিছুই নাই। একটির ওপর কয়েকটি ফল ও আর একটির ওপর ধাতু পাত্রে জল রক্ষিত রয়েছে। সবই অপ্রত্যাশিত প্রতীয়মান হলো। অজয় তার মুখাবরণটি খুলে ফেলে বসলো মেঝের ওপর। খড়্গ ও মশাল রাখলো আর এক পাশে। ছাদের এক ভগ্ন অংশ ও ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে তখনও দিবালোক দেখা যাচ্ছিল।

অজয়ের মনে পড়লো সন্ধ্যার কানের ঐ কালো দাগটি তাকে এক সময় আকৃষ্ট করতো। মেয়ে ছাত্রীদের মধ্যে তার চলা-ফেরার মধ্যে একটি সহজ সচ্ছন্দ ভাব তাদের সকলকেই বিস্মিত করতো। কিন্তু শ্রান্ত, পান্ডুর দুর্বল দেহ প্লাবিত করে এত অপর্যাপ্ত লাবণ্য কোন উৎস থেকে আসছে সে ভেবে পেলো না। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে উঠে মাথায় হাত দিয়ে ঘুম ভাঙবার চেষ্টা করলো। সময় অধিক নাই।

মহারাজ্ঞী তন্দ্রার ঘোরে ভুল বকছিল। কত বড় বড় রাজা মহারাজার নাম, ষড়যন্ত্র, ক্রুদ্ধ তিরস্কার—কত মিনতি, সদাগর বল, বাঙলা দেশের কথা শোনাও—

সময় বেশি নাই। অজয় উচ্চৈঃস্বরে বললে, "সন্ধ্যা, তুমি সন্ধ্যা—ওঠো জাগো।"

তন্দ্রাচ্ছন্ন রমণী কাতর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "স্বপন, সেই স্বপন—যেও না স্বপন, আমি তোমায় ভালবাসি স্বপন, বাঙলা দেশের কথা বল সদাগর।"

অজয় বাঙলা ভাষায় বললে, "স্বপন তোমার ভেঙেছে, ওঠো সন্ধ্যা—চলো পালিয়ে চলি এ ভীষণ স্বপ্নপুরী থেকে।"

শরীরের স্পর্শবোধে সন্ধ্যার সমস্ত দেহ কেঁপে উঠলো। অজয় বললে, "মনে পড়ে আমরা এক সংগে এম-এ পড়তাম, প্রফেসার গোস্বামীর কথা মনে পড়ে সন্ধ্যা?"

রমণী চমকে দাঁড়িয়ে উঠলো ঋজু হয়ে ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত—"কে তুমি? সেই বিশ্বাসঘাতকের প্রেতাত্মা প্রতারণা করতে এসেছে"—তীব্র চীৎকার ধ্বনি থামিয়ে দিল অজয় হাত দিয়ে। দংষ্ট্রাঘাতে ছিঁড়ে গেল হাতের চামড়া।

অজয় বললে, "মনে পড়ছে না সন্ধ্যা? কলকাতা থেকে বেড়াতে এসে দারুণ দুর্যোগের মধ্যে সমুদ্র দেখতে এলে—মনে আছে একদিন কলেজ স্ট্রীটের রাস্তায় কী ভীষণ জল তুমি আর নমিতা আটকে পড়েছিলে—"

রমণী এবার বিস্ময় বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলো তার মুখের প্রতি। অজয় বলে গেলো "বল সন্ধ্যা, বাঙলা কথা বল, তাহলে তোমার এ স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে—"

সন্ধ্যা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অস্পষ্ট বিলম্বিত স্বরে বলে গেলো আপন মনে 'তবে রাণী সৌদামিনী কে? কৃষ্ণদেব রাও কে? চোগাদেব?"

"ও হচ্ছে পাঁচ শ' বছর আগেকার কথা। সব ধ্বংস হয়ে গেছে। যাবারই ত কথা। রাজার রাজত্ব ত' কালের পটভূমিকায় ছায়া-চিত্রেরই মত ক্ষণস্থায়ী—শাশ্বত হচ্ছে মানুষ। আমরা বাঙালীরা সে সত্য জেনেছি নদীমাতৃকার ভাঙাগড়া খেলার মধ্যে। চলো সন্ধ্যা, পালিয়ে যাই—"

"তুমি তাহলে অজয়—'

"হ্যাঁ, আমি অজয়—"

সন্ধ্যা মুক্তির আনন্দে উত্তেজিত হয়ে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়লো।

তারপর মূর্চ্ছিতা মেয়েটিকে কাঁধে ফেলে অজয় নেমে গেলো, খড়্গ ফেলে, মশাল হাতে।

সূর্য অস্তমিত হয়েছে ততক্ষণে পাহাড়ের পিছনে। অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। মশালের আলোক হতে তারা ক্ষীণ চন্দ্রালোকে এসে পড়লো। তারপর অজয় তার ভার বহন করে ধীরে ধীরে উঠে গেলো পাহাড়ের শিখরে। শহরের কেহ কেহ সে যুগল মূর্তি দেখে থাকবে, কিন্তু তন্ত্র-সাধকের বিচরণ ক্ষেত্র ভিন্নদিকে অজয়ের চলা শেষ হলো দিবারম্ভে। ভিজাগাপট্টম-গামী এক মোটর লরী চালককে সে বললে যে তারা তীর্থযাত্রী, চলেছিল সীমাচলম, কিন্তু সহধর্মিণী অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে হবে ওয়াল্টেয়ার হাসপাতালে। লোকটি দয়াপরবশ হয়ে তুলে নিল।

অজয় অবশ্য কর্মস্থানে ফেরে নি। লক্ষ্মীনারায়ণ সকলকে বলে থাকেন যে, সে গেছে ভীমলীসুন্দরীর অতল গর্ভে, কিন্তু তন্ত্রসাধক আজও দেশ-দেশান্তরে হন্যা হয়ে ঘুরেছে বিশ্বাসঘাতক আপ্পানার সন্ধানে। প্রতিহিংসার অনল তার তন্ত্র-সাধনার নিষ্ঠাকেও অতিষ্ঠ করে দিয়েছে।

(সমাপ্ত)

বাঙলার প্রাচীন চিত্রকলার কথা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

এ কথা আজ অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা নিজেদের দেশের শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি এতদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, দরদ দিয়া সে সকল দেখিবার



গ্রহ মাত্রিকা

কোন আবশ্যকতা বোধ করি নাই। বিদেশীয়রাই এদেশের চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য এবং লোক-শিল্পের প্রতি সকলের অগ্রে মনোনিবেশ দান করেন।

বাঙলা দেশের অতি অল্পসংখ্যক মনীষী গ্রন্থ রচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ ও চিত্রমুদ্রণ দ্বারা শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত "সীতারাম" উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে উদয়গিরি ও ললিতগিরির বর্ণনা প্রসঙ্গে আছে—"ললিতগিরি—বর্তমান নালতিগিরি বৃক্ষশূন্য, প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ ও বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। আশ্চর্য, হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলে পুতুলগড়া শিখিতে হয়। আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না!"

বঙ্কিমচন্দ্র যখন শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা করেন, সে সময়ে আমাদের বাঙলা দেশের ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয় নাই। আর্যজাতির সূক্ষ্ম-শিল্প সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে সকলের পূর্বে শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমানি "সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্প চাতুরী" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮১ সালের ভাদ্রের 'বঙ্গদর্শনে' সেই পুস্তকখানির একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা করিয়াছিলেন। ইউরোপে 'ফাইন আর্ট' বলিতে কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টিকে বুঝায়। শ্যামাচরণবাবু তাঁহার প্রতিশব্দরূপে 'সূক্ষ্ম-শিল্প' এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সূক্ষ্ম শিল্প শব্দটি যে 'ফাইন আর্টে'র প্রকৃত সংজ্ঞা নহে সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। বর্তমানকালে আমরা 'ফাইন আর্ট' বুঝাইতে ললিতকলা বা চারুশিল্প এই দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি।

শ্যামাচরণবাবু যখন গ্রন্থ রচনা করেন তখন, গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে মিস্টার লক নামক একজন ইংরাজ অধ্যক্ষ ছিলেন। লক্ সাহেব বাঙলা দেশের ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং কালীঘাটের পটুয়াদের ছবি দেখিয়া, শিল্পীদের সৌন্দর্য জ্ঞান ও অশিক্ষিত পটুত্বের প্রশংসা করেন।



গণপতি হৃদয়

সে যুগের পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ চারু-



চম্পিতা লোকনাথ ভট্টারকা

শিল্পের প্রতি কতকটা মনোযোগী হইয়াছেন এবং এই সত্যটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে. কেবলমাত্র বিদেশীয়দের প্রশংসার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না বাঙলার বিভিন্ন পল্লীতে যে সকল শিল্প নিদর্শন আমাদের অবহেলায় বিনষ্টপ্রায় হইতেছে, আজ তাহাদের রক্ষার জন্য এবং পৃথিবীর সমক্ষে সে সকলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের শিল্পধারা হইতে বিভিন্নরূপে বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঙলার শিল্পধারা যে এক সময়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ইহা দেশীয় ও বিদেশীয় বিশেষজ্ঞেরা সকলেই স্বীকার করেন। বাঙলার চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবলমাত্র বাঙলার প্রাচীন চিত্রশিল্প সম্বন্ধেই সামান্য আলোচনা করা হইল।

বাঙলার চিত্রশিল্পের আদি নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তবে, এ বিষয়ে বেশী অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। পাল রাজাদের সময়ের চিত্রশিল্পের যাহা কিছু নিদর্শন আমরা পাই, সে সকলের বেশীর ভাগই গ্রন্থের মলাট বা দেবদেবীর চিত্ররূপে দেখা যায়। এখানে প্রসঙ্গত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙলার ইতিহাসে' মুদ্রিত, প্রথম মহীপাল-দেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র প্রথম পৃষ্ঠ ও প্রথম পত্রের চিত্রের উল্লেখ করিতেছি। পালরাজাদের পূর্বের বাঙলার কোন চিত্র পাওয়া গিয়াছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন যখন বাঙলা দেশে আসেন, সে সময়ে তিনি এদেশবাসীর চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া প্রশংসা করেন। তৎকালে বাঙলা দেশের বৌদ্ধবিহারে এবং মন্দিরগাত্রে—অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গুহামন্দিরের গাত্রে যেরূপ ফ্রেস্‌কো চিত্র আছে, সেইরূপ—চিত্র অঙ্কিত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে পারা যায়, বাঙলা দেশেও এক সময়ে নানা বর্ণরঞ্জিত ফ্রেস্‌কো চিত্রের প্রচলন ও সমাদর ছিল। এদেশের আবহাওয়ার দোষেই হউক বা রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণেই হউক সে সমুদয় চিত্র-নিদর্শন এখন বিলুপ্ত। বাঙলার ইতিহাস পাঠে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা



ভগবতী তারা

চলে যে, পাল রাজাদের রাজত্বকালে—খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙলার চিত্রশিল্প বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। খ্যাতনামা ভিনসেণ্ট স্মিথ সাহেব পালযুগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—পাল রাজত্বকাল ছিল সংস্কৃতি ও শিল্প সমৃদ্ধির যুগ। তৎকালে ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল ভাস্কর্য্য, চিত্রাঙ্কন এবং মিশ্রধাতুর (ব্রোঞ্জ) মূর্ত্তি নির্মাণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বারেন্দ্র-ভূমে ইঁহারা বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ বহু-শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল। সেই সকল শিল্পীদের দান আমরা এখনও কোন কোন স্থানে সামান্য ভাবে দেখিতে পাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে আমরা পাল যুগের যে সকল চিত্রের নিদর্শন পাই, তাহার বেশীর ভাগই তালপাতায় অঙ্কিত। যাঁহারা চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগী এবং প্রাচীনকালের চিত্রের অঙ্কন রীতি বা 'টেক্‌নিক্‌' উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি', 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' এবং শিল্পানুরাগী চিত্রসংগ্রাহক কলিকাতার শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয়ের সংগ্রহশালা দেখিয়া আসেন। ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত চিত্র সম্বন্ধে ১৯২৯ অব্দের "রূপম" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশি হইয়াছিল।

পাল রাজাদের পরবর্তী, সেন রাজা আমলের চিত্র-নিদর্শন কোথাও দেখি পাওয়া যায় নাই। স্বাধীন বাঙ পাঠান সুলতানদের আমলে বাঙলা সাহি যেমন নানা দিক দিয়া প্রসিদ্ধ ল করিয়াছিল, তেমনি চিত্রশিল্পীরাও এ নব প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। সে সম প্রাচীন বৈষ্ণব চিত্রাবলী এখনও একবা দুষ্প্রাপ্য নহে। তবে দুঃখের কথা এই বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু মূল্যব পুঁথি এখনও যেমন মুদ্রিত হয় ন তেমনি, পাঠান আমলের বা বৈষ্ণব যুগের পঞ্চদশ শতাব্দী এবং ষোড়শ শতাব্দী প্রথমার্ধ পর্যন্ত দেড়শত বৎসর কাল নানা প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ এবং শা অশান্তির মধ্যে যে সকল শিল্পী বহু চিত্রাঙ্কন দ্বারা চিত্রকলার শ্রীবৃদ্ধিসা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগু সংগ্রহের উপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। য তাহা হইত, তবে আমরা ঐ যুগের ব শিল্প-নিদর্শনের সহিত পরিচিত হই পারিতাম।*

---

*রবি-বাসরের অধিবেশনে পঠিত।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২১

কাব্য এবং কাব্যপরতার রসপিচ্ছিল পথে এইভাবে অগ্রসর হইলে অশোক এবং শক্তি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়া পড়িত বলা কঠিন। কিন্তু পরদিন হইতে 'সমাজ-সংসার মিছে সব' জাতীয় মতবাদকে আপাতত মনের গহন কোণে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া শক্তি সংসারেরই বাস্তব পথে পা বাড়াইল।

একটু অদ্ভুত ছন্দের একটা অনুভূতি লইয়া প্রত্যূষে তাহার ঘুম ভাঙিল। মনে হইল, এ গৃহ তাহার যতটা আপন, গৃহস্বামী যেন ঠিক ততটাই নহে। গৃহস্বামীর নিকট হইতে সে প্রচুর আদর সোহাগ এবং মর্যাদা লাভ করিয়াছে; পাচক এবং পরিচারকের নিকট হইতে সে প্রভুজনোচিত সম্মান পাইয়াছে: সংসারের ধন-ভাণ্ডারের চাবি তাহার অঞ্চলে বাঁধা; সুতরাং হিসাব মতো এ গৃহের গৃহিণীর পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত মনে করিতে সে বিশেষ কিছু বাধা অনুভব করিল না। অথচ গৃহ তাহার যতটা নিকটে আগাইয়া আসিল, গৃহস্বামী যেন ঠিক ততটাই দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। গৃহস্বামীকে অতিক্রম করিয়া এভাবে গৃহকে স্বীকার করিবার কোনো যুক্তি শক্তি নির্ণয় করিতে পারিল না। কিন্তু এই সংসারের পথে বিচরণ করিতে করিতেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতে কোনো একদিন গৃহস্বামীর সহিত মুখোমুখী দেখা হইয়া একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হইয়া যাইবে, হয় ত' এমনই একটা প্রত্যাশার সুনিশ্চয়তা মনের মধ্যে বহন করিয়া সে সংসারের পরিচর্যায় আত্ম-নিয়োগ করিল।

অশোক ল কলেজে গমন করিলে সে বিনোদকে দিয়া একটা হিসাবের খাতা কিনিয়া আনাইল। তাহার পর প্রথম দিনের মজুদ তহবিলের তায়দাদ একদিকে জমা করিয়া এই তিনদিনে তাহার হাত দিয়া যে সকল খরচ হইয়াছে তাহা খরচের পর্যায়ে লিখিয়া ফেলিল। অশোকের টেবিল হইতে সমস্ত জিনিসপত্র নামাইয়া টেবিল ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া তকতকে করিল। তাহার পর প্রত্যেকটি জিনিস ভাল করিয়া মুছিয়া মুছিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

টেবিল গোছানো শেষ হইলে ব্যস্ত হইল অশোকের জামা-কাপড়ের আলনা লইয়া। ব্যবহার করা অগোছাল ধুতি শার্ট পাঞ্জাবী প্রভৃতি নামাইয়া রাখিয়া প্রথমে সে কাঠের আলনাটার ধুলো-ময়লা মুছিয়া পরিষ্কার করিল, তাহার পর ভাল করিয়া কুঁচাইয়া পাট করিয়া বস্ত্রগুলো তাহার উপর সাজাইয়া রাখিল।

বারান্দায় একটা লম্বা কাঠের পাত্রের উপর অশোকের আট দশ জোড়া জুতা সাজানো থাকিত। অশোক যখন কলেজ হইতে ফিরিল তখন শক্তি বিনোদকে দিয়া সেগুলোর ধুলো-কাদা ঝাড়াইয়া সাজাইয়া রাখাইতেছে।

দ্বিতলের বারান্দায় পদার্পণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া অশোক বলিল, "ব্যাপার কি শক্তি?"

মৃদু হাসির দ্বারা সে কথা শেষ করিয়া শক্তি বলিল, "একটু শীগগির এসেছ, না? এগারোটার সময়ে ত' আসবার কথা।"

পথে একজন ফেরিওয়ালা কি যেন হাঁকিয়া যাইতেছিল: বোধ করি তাহা শুনিয়াই বিনোদ তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অশোক বলিল, "হ্যাঁ, একটু শীগগির এসেছি। একজন প্রোফেসার দয়া ক'রে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাই একঘণ্টা আগে ছুটি হ'ল।" তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিল আলনা খাট প্রভৃতির উপর দৃষ্টিপাত পূর্বক সবিস্ময়ে বলিল, "বাঃ! একেবারে ভোল ফিরে গেছে দেখছি! কোথায় কোথায় শ্রীহস্তের ছোঁয়াচ লেগে হাসি ফুটেছে, তা একবার মাত্র চোখ ফেলেই ব'লে দিতে পারি।" তাহার পর হাতের বইখাতাগুলো ধপ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়াই তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া বলিল, "তাই ত! রাখি এখন কোথায়?"

শক্তি বলিল, কেন, যেখানে রেখেছিলে?"

"এমন সুন্দর করে তুমি গুছিয়ে রেখেছ, আর এসেই আমি অগোছ করব?"

শক্তির মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল: বলিল, "অগোছ যদি না করবে ত' হ'লে গোছাব আমি কী, তা বল?"

"অগোছ গোছাতে ভাল লাগে তোমার?"

শুধু আমার কেন, সব মেয়েদেরই পুরুষ মানুষের অগোছ গোছাতে ভাল লাগে। তবে সব পুরুষের অবিশ্যি সমান নয়।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া সুমিষ্ট হাসিয়া বলিল, "একটি পুরুষের অগোছ গোছাতে সব চেয়ে বেশী ভাল লাগে।"

"কোন সে পুরুষ শুনি?"

"আন্দাজ কর না।"

"স্বামী মহাপ্রভু?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, স্বামীর চেয়েও তার স্থান উঁচুতে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল "স্বামীর চেয়েও যার স্থান উঁচুতে সে ত পাষণ্ড। কে সে পাষণ্ড শুনি?"

"স্বামী হব হব ক'রে যে লোভ দেখিয়ে রেখেছে, সে।" বলিয়া শক্তি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

শক্তির কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "লোভ দেখিয়ে রেখেছে, অথচ হচ্ছে না। পাষণ্ডই বটে! কিন্তু সে পাষণ্ডর স্থান স্বামীর চেয়ে উঁচুতে বলছ কেন?'

শক্তি বলিল, "স্বামী ত' হাতের ফল, আর সে গাছের। তা হ'লে উঁচু নয়?"

ঘাড় নাড়িয়া অশোক বলিল "উঁচু। কিন্তু কি ফল শক্তি? মাকাল ফল, না কলা?"

শক্তি বলিল, "মাকাল ফলের মতো লাল, কিন্তু মর্তমান কলার মতো মিষ্টি।

সংসারকে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিয়া আলোচনাটা ক্রমশ 'সমাজ-সংসার মিছেসব'-এর দিকেই গতি চালাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু সহসা তাহাতে বাধা পড়িল। দেখা গেল পলিতকেশ মুণ্ডের মতো একটা কোনো গোল পদার্থ যেন বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অতি সন্তর্পণে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই 'আপাত বর্শার' প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে বিনোদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বুঝা গেল, বস্তুত তাহা বর্শা নহে, পরন্তু একটা ঝুল-ঝাড়া। অশোক এবং শক্তি বিশ্রম্ভালাপের মতো কোনো সরস ব্যাপারে যদিই বা নিমগ্ন থাকে, বোধ হয় মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া বিনোদ নোটিশের হিসাবে ঝুল ঝাড়াটা কক্ষের মধ্যে প্রথমে আগাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রূকুটিকুঞ্চিত চক্ষে অশোক বলিল "কি হবে ওটায়?"

উত্তর দিল শক্তি: বলিল, "ঝুল ঝাড়তে হবে। জায়গায় জায়গায় ভারী ঝুল জমেছে।"

তাহার পর প্রসন্ন নেত্রে বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "এরই মধ্যে কি ক'রে পেলে বিনোদ?"

এক মুখ হাসি লইয়া বিনোদ বলিল, "আর তখন যে রাস্তায় হাঁকছিল? দাদাবাবু যখন এলেন?"

"ও, তাই তাড়াতাড়ি নেমে গেলে? কত দাম নিচ্ছে?"

"চোদ্দ আনা বলেছিল, এখন সাত আনা বলছে। পাঁচ আনায় বোধ হয় রাজি হবে। নোবো দিদিমণি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় নেবে। পয়সা তোমার কাছে আছে?"

"আছে।"

"তা হ'লে দাম চুকিয়ে দাও।"

ঝুল ঝাড়া লইয়া প্রসন্ন মুখে বিনোদ প্রস্থান করিল।

মাকাল ফল এবং মর্তমান কলার আলোচনায় আপাতত ইতি পড়িল। দেখা গেল, ঝুল ঝাড়া শুধু মাকড়সার জালই নষ্ট করে না, কাব্যের জালও করে।

বৈকালিক চা-পানের পর নিজের ঘরে বসিয়া অশোক জুরিসপ্রুডেন্স পাঠ করিতেছিল। ঘণ্টাখানেক পড়িবার পর মনটা সবেমাত্র বিরক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময়ে আকাশ ভাঙিয়া শ্রাবণের ধারা নামিল। বহি বন্ধ করিয়া ক্ষণকাল সে জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিমগ্ন করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময়ে গুণ গুণ করিয়া কণ্ঠে উপস্থিত হইল রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গান—শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে'। মনে পড়িল, শক্তির কণ্ঠস্বর ছিল দরদী এবং সুমিষ্ট। এতদিনে সেই কণ্ঠস্বর কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে জানিবার জন্য এ কয়েকদিন সর্বক্ষণ তাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া আছে, কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাব বশত এ পর্যন্ত সে বিষয়ে ইচ্ছার অতিরিক্ত কোনো কিছুই হইয়া উঠে নাই। মনে হইল, এখন শ্রাবণের ধারার সহিত সঙ্গীতের ধারা মিলাইতে পারিলে বর্ষা দিনের অপরাহ্ন কালটা সরস হইতে পারে।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অশোক শক্তির সন্ধানে কক্ষ হইতে নির্গত হইল। শক্তির শয়ন কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরজা বন্ধ দেখিয়া টোকা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'শক্তি আছ?' উত্তর না পাইয়া একটু ঠেলা দিতেই দরজা খুলিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ঘরে কেহও নাই। দরজা ভেজাইয়া দিয়া বাথরুমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল বাথরুমের দরজা খোলা, সুতরাং বাথরুমেও কেহও নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিবার পূর্বে একবার উঁকি মারিয়া যাদবচন্দ্রের ঘরটাও দেখিয়া লইল। অবশেষে নিচে নামিয়া আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল।

ভাঁড়ার ঘর হইতে ভাঁড়ারের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং সংসারের অপরাপর খুচরা দ্রব্যাদি বারান্দায় বাহির করিয়া ফেলিয়া শক্তি এবং বিনোদ একযোগে সুতীব্র যুদ্ধকার্য চালনা করিতেছে। উভয়ের হস্তে একটি করিয়া ঝাঁটা এবং সেই ঝাঁটা দুইটার মারাত্মক আঘাতের আশঙ্কায় ভীত হইয়া নেঙটি ইঁদুর, আরশুলো, টিকটিকি, মাকড়সা প্রভৃতি গৃহাশ্রয়ী প্রাণিগণ নিজেদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বাগ্রতায় যে সে-দিকে পারে ছুটিয়া পলাইতেছে। অশোক যখন নিচেরতলায় হাজির হইল, তখন শক্তি গোটা চার-পাঁচ আরশুলো ঘর হইতে বারান্দায় ঝাঁটাইয়া বাহির করিতেছে। সবগুলো ঘরের বাহির হইলে বিনোদ সেগুলোকে গৃহের বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে সদর দরজার দিকে আগাইয়া লইয়া গেল।

আরশুলো নির্বাসনে উভয়ের উৎসাহ এবং উদ্যমের বহর দেখিয়া অশোকের বিরক্তিও বোধ হইল, হাসিও পাইল। কিন্তু আপাতত হাসি দমন করিয়া গম্ভীরমুখে সে বলিল—"এই বৃষ্টির মধ্যে আরশুলোগুলোকে অমন ক'রে ঝেঁটিয়ে বাড়ির বার ক'রে দেওয়া খুব সদয় ব্যবহার হচ্ছে না শক্তি। আরশুলোরা কিন্তু নিরীহ প্রাণী।"

ঝাঁটা হাতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে শক্তি বলিল, "যতক্ষণ উড়ে এসে গায়ে না বেড়ায়, আর যতক্ষণ পাশের বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ নিরীহ প্রাণী; তা নইলে একটুও নয়।"

"তাই বুঝি ওদের পাশের বাড়ি পাঠাচ্ছ?"

"না, সামনের বাড়ি পাঠাচ্ছি।"

"কেন, সামনের বাড়ির ওপর রাগ কেন?" তাহার পর সহসা ব্যাপারটা খেয়াল হইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "এ কিন্তু তোমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড শক্তি! বিধাতা যদি তোমাকে দর্শনীয় করে সৃষ্টি করে, সে বেচারাকে দুটি গুণগ্রাহী চক্ষু দিয়ে থাকেন ত' কি এমন অপরাধ তার বল? সেজন্যে একান্তই যদি কিছু করতে হয় ত' আরশুলোর ব্যবস্থা না ক'রে বড় জোর পর্দার ব্যবস্থা করতে পার। সামনের বাড়িতে সে না হয়ে আমি যদি হতাম তাহ'লে আমিও ত ঠিক ঐ কার্যই করতাম।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শক্তি বলিল, "ছি, ছি, বোলো না! তুমিও ঐ কাজ করতে?"

উৎসাহসহকারে অশোক বলিল, "নিশ্চয় করতাম। সাধ্য কি হোত আমার, তোমার হাত থেকে নিস্তার পেতে।"

আরশুলোগুলোকে বাড়ির বাহির করিয়া দিয়া বিনোদ ফিরিয়া আসায় শক্তি এ কথার উত্তর দিবার সুযোগ পাইল না।

অশোক বলিল, "এত কষ্ট করে আরশুলোগুলোকে বৃষ্টিতে স্নান করাবার কি দরকার? মেরে ফেললেই ত' লেঠা চুকে যায়।"

বিনোদ বলিল, "আমি ত' তাই চেয়েছিলাম; কিন্তু দিদিমণির হুকুম একটিও আরশুলো মারা হবে না।"

শক্তির দিকে চাহিয়া অশোক বলিল, "তার মানে?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কি হবে কতকগুলো নিরীহ প্রাণীর প্রাণ নিয়ে।"

শক্তির কথা শুনিয়া নির্গমোদ্যত হাস্যকে কোনপ্রকারে রোধ করিয়া গম্ভীর মুখে অশোক বলিল, "কিন্তু আমাদের বাড়িতে মেরে ফেললে ও কাজ ত' করা হবে না শক্তি।"

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কেন?"

"আমাদের বাড়িতে ত' আরশুলোরা নিরীহ প্রাণী নয়, পাশের বাড়িতে অবশ্য নিরীহ প্রাণী।" বলিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল।

পূর্বেকার উক্তির হিসাবে শক্তির এ কথার বিশেষ কিছু উত্তর ছিল না। আরক্ত স্মিতমুখে স্খলিত আঁচলটা আর একবার ভাল করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইয়া ঝাঁটা হস্তে সে পুনরায় আরশুলোর সন্ধানে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

মাকড়সা-আরশুলো প্রভৃতির বিরুদ্ধে আরও মিনিট পনেরো ধরিয়া আক্রমণ চলিল। তাহারই এক ফাঁকে শক্তিকে একান্তে পাইয়া অশোক বলিল, "বিনোদকে আমি ডিস্‌মিস করব।"

বিস্মিত-কণ্ঠে শক্তি বলিল, "ও মা! কেন?"

"তার ওপর আমি রেগেছি।"

"কেন?"

"সে আমাকে বঞ্চিত করতে আরম্ভ করেছে।"

"কি থেকে বঞ্চিত করছে?"

"ভাল জিনিস থেকে;—যে জিনিস দেখবার লোভে সামনের বাড়ির ছেলে হাঁ করে জানলায় রাতদিন দাঁড়িয়ে থাকে।"

কথা শুনিয়া নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাস্যে শক্তির মুখ ভরিয়া উঠিল; বলিল, "ছিঃ! হিংসে করতে নেই।"

চাপা গলায় অশোক বলিল, "চাকরের ওপর হিংসে আবার কি! রাগ, রাগ!"

"হিংসে থেকেই রাগ হয়।"

"হয় হোক। যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে দু-তিন দিনের মধ্যেই বিদেয় করব!"

"বিদেয় করলেই কি রক্ষে আছে?—আবার এসে জুটবে।" বিনোদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া অশোক এবং শক্তি পিছন ফিরিয়া দেখিল, জঞ্জাল ফেলিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া বিনোদ আসিতেছে।

তীক্ষ্ণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক বলিল, "তুই কার কথা বলছিস?"

বিস্মিত-কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আমি ত আরশুলোর কথা বলছি। আপনি?"

ওদিকে কৌতুক দেখিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসিতে হাসিতে শক্তি অস্থির হইয়াছিল; বলিল, "উনি আমার কথা বলছেন।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনোদ বলিল, "আপনার কথা বলছেন? তার মানে?"

"তার মানে, দু-তিন দিন পরে উনি আমাকে হোস্টেলে বিদেয় করবেন।"

হোস্টেলের কথা শুনিয়া বিনোদ অতিশয় বিরক্তি বোধ করিল; বলিল, "এখনো সেই হোটেলের কথা ধরে রয়েছেন?" তাহার পর জমা-করা জঞ্জালের স্তূপের নিকট বসিয়া পড়িয়া ঝুড়িতে জঞ্জাল তুলিতে তুলিতে বলিতে লাগিল, "জগৎ শুদ্ধ লোকের বাড়ি থেকে লেখাপড়া হচ্ছে, আর আপনারই কেন হোটেলে যেতে হবে, তা ত' বুঝিনে!"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "কিন্তু বাড়ি আমার কোথায় বিনোদ? এ ত পরের বাড়ি। পরের বাড়িতে কতদিনই বা থাকা যায়, তা বল?"

অসঙ্গত কথা শুনিয়া বিনোদ অর্ধপূর্ণ জঞ্জালের ঝুড়ি লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "এ যদি পরের বাড়ি, তাহলে নিজের বাড়ি কেমন, তা জানিনে। দেখে-শুনে ত মনে হয় আপনার বাড়িতেই আমরা রয়েছি।"

অশোক বলিল, "আমরা মানে কারা? আমিও না-কি?"

"তাই-বা নয় কেমন করে বলি।" বলিয়া বিনোদ জঞ্জাল ফেলিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিনোদ অদৃশ্য হইলে উচ্ছ্বাসের সহিত অশোক বলিল, "শুনলে ত? আমি পর্যন্ত। আর কখনো পরের বাড়ি বলতে সাহস কোরো না। এবার থেকে নিজের বাড়ি বোলো।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "নিজের বাড়ি বলবার অধিকার হলে নিজের বাড়িই বলব। আপাতত পরের বাড়ি একান্ত যদি না বলি ত' বলব পাষণ্ডর বাড়ি।"

শক্তির কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "সে কথা সত্যি! গৃহিণী করেছে, অথচ স্ত্রী করে না।" তাহার পর বিনোদের ফিরিয়া আসিতে খুব বেশি বিলম্ব হইবে না মনে করিয়া, সহসা কণ্ঠস্বর গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিল, "আরশুলো-সংহার লীলা আর কতক্ষণ চলবে বল ত?"

শক্তি বলিল, "সে লীলা ত' শেষ হয়েছে, এখন বাকি শুধু জিনিসগুলো ঝেড়ে-ঝুড়ে ঘরে তোলা। কেন, কি দরকার?"

"এমন জমাট বর্ষার দিনটা শুধু কি পোকা-মাকড় নিয়ে নষ্ট করতে হবে? ইচ্ছে হচ্ছিল একটু গানের আসর বসাতে।"

চকিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "কে গাইবে? আমি?"

অশোক বলিল, 'আহা হা! একান্তই যদি না গাও, শ্রোতা হতে ত আটক নেই!"

"না, তা নেই। কিন্তু সে ত অনেক পরের কথা। জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। তারপর খানিকটা বিশ্রাম, তারপর স্নান, তারপর চা খাওয়া, তারপর গান।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তাহলে ত দেখছি সাতটার আগে শেষ, তারপরে পৌঁছোবার আশা নেই।"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "আছে বলে ত মনে হয় না।"

বস্তুত, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পূর্বেই গানের আসর আরম্ভ করা সম্ভবপর হইল। কিন্তু হইলে কি হয়; অশোকের সেদিনকার অদৃষ্টলিপিতে শক্তির গান শুনিবার সৌভাগ্যের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। চা-পানের পর শক্তি আসিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে; কি উদ্দেশ্যে বসিয়াছে তাহা অবশ্য ঠিক বোঝা যাইতেছে না, বাক্স হইতে হারমোনিয়মটা বাহির করিয়া আনিলেই সে কথা স্পষ্ট হয়, এমন সময়ে পথে প্রণবের মোটরের হর্ন শোনা গেল।

মনে মনে অশোক বলিল, 'মাটি করলে দেখছি!' মুখে বলিল, "প্রণব এল।" নৈরাশ্যজনিত আঘাতটা কিন্তু প্রণবকে দেখিয়াই অপসৃত হইল; প্রসন্নমুখে বলিল, "এস, এস প্রণব!"

শক্তি বলিল, "আপনার ধুতি-জামা দেখে মনে হচ্ছে আপনি বাড়ি হয়ে এসেছেন,— মালতীকে নিয়ে এলেন না কেন প্রণববাবু?"

স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "নিয়ে আসতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বেচারা এত বেশি দমে আছে যে, কিছুতেই আসতে রাজি হ'ল না।"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দমে আছে কেন?"

একটু ইতস্তত করিয়া মৃদু হাসিয়া প্রণব বলিল, "মিস্ মুখার্জি সম্বন্ধে তোমাদের দুজনের কাছে সে একটা অসঙ্গত প্রস্তাব করেছিল, সেই লজ্জায়। অবশ্য তুমি যে সেই প্রস্তাবের পথে অলঙ্ঘনীয় বাধা, সে কথা তখন তার জানা ছিল না।"

চকিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "এখন জেনেছে না-কি?"

প্রণব বলিল, "ঠিক জেনেছে, তা হয়ত বলা যায় না; কিন্তু এখন তার মনে প্রবল সন্দেহ হয়েছে; আর, সে সন্দেহ হয়েছে তোমাদের দুজনের কথাবার্তার সুর থেকে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বাধার কথা যখন জানা ছিল না, তখন ত' লজ্জার কোন কথাই নেই। জানা থাকলেও কিন্তু লজ্জার কথা থাকত না; অন্তত শক্তির কাছে।"

মৃদু হাসিয়া প্রণব বলিল, "এ কথার তাৎপর্য বুঝলাম না।"

অশোক বলিল, "এ কথার তাৎপর্য এই যে, জেনে-শুনেও মালতী যদি শক্তির পক্ষে উন্নততর ব্যবস্থার প্রস্তাব ক'রত, তা হ'লেও লজ্জার কথা থাকত না, বরং কৃতজ্ঞতার কথাই থাক্‌ত।"

প্রণব বলিল, "অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে, বাজিৎপুরের ব্যবস্থার চেয়ে পার্ক-সার্কাসের ব্যবস্থা উন্নততর ব্যবস্থা। কেমন, ঠিক কি না?"

"কেন, সে বিষয়ে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?"

মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল, "না, না, একটুও নেই; সে বিষয়ে আমার সঠিক ধারণাই আছে। তোমারও আছে; তবে অসঙ্গত বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে তুমি যখন এমন একটা বেখাপ্পা কথা বলে ফেলেছ, তখন ভোট নিয়ে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করা যাক্। দ্বিগুণ ভোটে আমরা তোমাকে হারিয়ে দেবো, এ আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু ভোট লওয়ার কথাটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, বিনোদ আসিয়া একটা চিঠি দিল, যাহা পাঠ করিয়া উদ্বিগ্ন মুখে অশোক বলিল, "কে আনলে এ চিঠি?"

বিনোদ বলিল, "একটি ছোকরা বাবু।"

"বাইরের ঘরে বসিয়েছিস ত?"

ঘাড় নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, অপেক্ষা করতে বল, আমি আসছি।"

বাহিরে তখন বৃষ্টি কমিয়াছে। কিন্তু একেবারে থামে নাই। অশোক বলিল, "শ্যামবাজার থেকে প্রমীলা বউদি অবিলম্বে যেতে লিখছেন। তোমার গাড়িটা নিয়ে যাব প্রণব?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রণব বলিল, "নিয়ে যাবে না ত' কি, আমার গাড়িটা শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তুমি ভিজতে ভিজতে জলকাদা ভেঙে ট্রামের ফুটবোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে শ্যামবাজার যাবে?"

স্মিতমুখে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশোক বলিল, "ধন্যবাদ। তোমার গাড়ি নিয়ে গেলে দুটো সুবিধে হবে। প্রথমত, প্রমীলা বউদিদির অনুরোধ মত অবিলম্বে পৌঁছনো যাবে; আর দ্বিতীয়ত, আমি না ফেরা পর্যন্ত বাড়ি পালাবার তোমার উপায় থাকবে না।" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আলমারিটা একবার খুলবে চল শক্তি।"

পাশের ঘরে উপস্থিত হইয়া আলমারি খুলিয়া শক্তি বলিল, "কি চাই বলো।"

অশোক বলিল, "গোটা পঞ্চাশেক টাকা

দাও। অসুখের বাড়ি, সঙ্গে কিছু টাকা থাকা ভাল।"

পাঁচখানা নোট গণিয়া দিতে দিতে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ কার?"

অশোক বলিল, "প্রমীলা বউদিদির স্বামী কেশবদাদার।" তাহার পর নোটগুলো পকেটে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "দাদা মানে আত্মীয় ঠিক নন্, গ্রাম-সুবাদে দাদা।"

"কি রোগ?"

অশোকের মুখে বিষণ্ণ-মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তা ভাল, রাজ-রোগ। যে রোগে মধ্যবিত্ত পরিবার ধনে-প্রাণে মারা যায়।"

এতক্ষণ শক্তি অশোকের সহিত কতকটা বিরস গভীর সুরে কথা কহিতেছিল, রোগের নির্দেশ শুনিয়া চকিত কণ্ঠে বলিল, "থাইসিস্ নাকি?"

"হ্যাঁ, থাইসিস্।"

ব্যগ্রস্বরে শক্তি বলিল, "আর তুমি সেখানে যাচ্ছ?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "যেখানে দরকার সেখানে না গিয়ে আর কোথায় যাব তা বল?"

এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া মিনতিপূর্ণকণ্ঠে শক্তি বলিল, "কিন্তু রোগীর বেশি কাছে যেয়ো না; বুঝলে? কিছুতেই বেশি কাছে যেয়ো না। কথা কইলে থুতুর বাষ্প কতদূর যায় জানো? চার ফুট। কাশলে সাত ফুট।"

"আচ্ছা গো, আচ্ছা; তোমার ভয় নেই। রোগী থেকে সওয়া সাত ফুট দূরে থাকব।" বলিয়া স্মিতমুখে অশোক প্রস্থান করিল।

(ক্রমশ)

দেখু-ভেক

অ·কৃ·ব

* আবোল তাবোল *

সুকুমার রায় এখন স্বর্গে আছেন, কিন্তু মর্ত্যের লোক আজিও তাঁহাকে ভোলে নাই, তাঁহার আবোল তাবোলের জন্যই আজিও তাঁহাকে স্মরণে রাখিয়াছে।

তিনি আবোল তাবোল লিখিয়াছিলেন ছোটদেরই জন্য। কিন্তু আমার মনে হয়, আবোল তাবোল কিছু বড়দের জন্যও লিখিত হওয়া দরকার; কেননা, ছোটরাই একমাত্র ছোট নয়। বড়দের মধ্যেও বহু ছোট আত্মগোপন করিয়া আছে। আমি তাই ভাবিতেছি বড়দের জন্য আবোল তাবোল কিছু লিখিব—কবিতায়। 'সিরিয়াস্' কবিতা লিখিবার ছলে অনেকে আবোল তাবোল কবিতা লিখিয়া থাকেন, আমি আবোল তাবোল কবিতা লিখিব বলিয়াই আবোল তাবোল কবিতা লিখিব। আবোল তাবোল লিখিতে গিয়া যদি কবিতা কখনো 'সিরিয়াস্' হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পাঠক-পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন, এ বিশ্বাস আছে। বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা যে কত ক্ষমাপরায়ণ, তাহার প্রমাণ বহু পাইয়াছি।

* * *

আমার প্রস্তাবিত এই নূতন ধরণের কবিতার একটি স্বরচিত নমুনা দিতেছি:

'মনে নাই কোন্ আঁধার ফাগুন রাতে
মাথায় গান্ধী টুপী
হাতে কেরোসিন কুপী
(তুমি) এসেছিলে চুপি চুপি
আমার এ আঙিনাতে।
যামিনী তখন মগন গভীর ঘুমে
কত ফুলরেণু লুটায়ে পড়েছে ভুমে
বনানীর অঞ্চল
নাহি আর চঞ্চল,
(শুধু) কোনো কোনো পাখী দিতেছে তালিম
যে গান গাহিবে প্রাতে
আকাশ সে রাতে ছিল যে চন্দ্রহারা
ছিলো শুধু তার বুকে অগুণ্তি তারা
তবু তো অন্ধকারে
আমার বন্ধ দ্বারে
না হেনে আঘাত ফিরে গেলে তুমি
কেরোসিন কুপী হাতে
বারেক চাহিয়া দেখিলে না হায়
আমি যে রয়েছি ছাতে!
সেই হতে আমি কত যে যামিনী জাগি
হে বন্ধু, তব ফেরার লগন লাগি'।
হে ফেরার অভিমানী
ফিরিবে না আর জানি,
সীমার মাঝারে তবু কাঁদে মন
অসীমের ইসারাতে।"

যাঁহারা কবিগুরুর 'দ্রুষ্টলগ্ন' পড়িয়াছেন, তাঁহারা সন্দেহ করিতে পারেন, ঐ কবিতাটির ছায়া লইয়াই আমি এই আবোল তাবোল কবিতাটি রচনা করিয়াছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছায়া লইয়া আমি লিখি নাই, লেখা হইয়া গেলে পর দেখিলাম ছায়া আসিয়া গিয়াছে।

* * *

আরেকটি নমুনা:

যুগেরে মুহূর্ত ডেকে কয়
'শোনো শোনো যুগ মহাশয়,
কথা আছে, কবো কানে কানে।"
যুগ বলে, 'আরে রে মুহূর্ত!
তুই তো বেজায় দেখি ধূর্ত!
ব্যস্ত আছি অনন্ত ধেয়ানে,
বিরক্ত করিস্ এ সময়?
তোর কথা মোর তরে নয়।"
শুনিয়া মুহূর্ত কয় "আচ্ছা!
দেখ তবে আমি কার বাচ্ছা।"
বলি' মহা রোষ ভরে
হাঁক দিল উচ্চৈঃস্বরে
"ভাই সব, যারা আছ সাচ্চা
চলিয়া এসো হে চটাপট্
যুগেরে করহ বয়কট।"
শুনি' সব মুহূর্তেরা
ত্যজিল যুগের ডেরা,
শুরু হলো জোর ধর্মঘট।
সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার!
কাণ্ড যেন কোন্ সে ক্ষ্যাপার!
মুহূর্ত যুগের সনে
গেল মিশে সেই ক্ষণে
বিষম পাকায়ে গেল জট।
শেষ হয়ে গেল মনান্তর
মুহূর্তেরে যুগ কহে "ভাই।
তুমি আছ তাই আমি আছি,
আমি আছি, তুমি আছ তাই।"

যুগ ও মুহূর্তের ঝগড়া ও সন্ধি বর্ণনা করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ জটিল করিয়া তুলিয়াছি। কোন কোন পাঠক ও পাঠিকা ইহা হইতে নানাপ্রকার দার্শনিক তত্ত্ব টানিয়া বাহির করিবেন হয়তো। আমি কিন্তু অকপটে স্বীকার করিতেছি, আমি কবিতাটি আবোল তাবোল হিসাবেই রচনা করিয়াছি।

আবোল তাবোল রচনা প্রতিভা-সাপেক্ষ। তাহা না হইলে লোকমাত্রেই সুকুমার রায় হইতে পারিতেন। 'সিরিয়াস্' লিখিতে গিয়া আবোল তাবোল অনেকেই লিখিতেছেন। আমা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাসম্পন্ন কোনো কবি যদি বড়দের জন্য কিছু কিছু আবোল তাবোল রচনার ভার নেন, তাহা হইলে বাঙলা সাহিত্যের কিছু উপকার হয়।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসি ফিরিয়া আসিয়া আবার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিলাত যাওয়ার পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—বাঙলায় এবার আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। তিনি বিলাতে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট উক্তি না করায় বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। এদিকে দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে বাঙলায় আবার দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথায় কর্মচারীরা বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন ও খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধীয় অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইতেও পারিতেছেন না। তাঁহারা বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিবার প্রয়োজনও স্বীকার করিতেছেন। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিস্টার হাচিংস—খাদ্য বিভাগের পরামর্শদাতা মিস্টার বাটলারকে লইয়া—ব্রহ্মে অবস্থা কিরূপ তাহা পরিদর্শন জন্য বিমানে ব্রহ্মে গিয়াছেন। তাঁহাদিগের আশা, তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে অন্তত কিছু চাউল ভারতে আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। প্রকাশ, শ্যামে প্রায় ৫ লক্ষ টন চাউল মজুদ আছে—রপ্তানী করা সম্ভব। যাহাতে সে জন্য জাহাজ পাওয়া যায় খাদ্য বিভাগ সে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হিসাবে দেখা যায়, ঐ ৫ লক্ষ টন চাউল যদি পাওয়া যায়, তাহাতেও অভাব ঘুচিবে না। কারণ, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে চাউলের ঘাটতি—দশ লক্ষ টন।

বাঙলার অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাহার পরে—দুর্গাপূজার সময় যে বাত্যা ও প্রবল বর্ষণ হইয়াছে, তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

মিস্টার কেসীকে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদগুলির সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি—

(১) শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় লিখিয়াছেন—গত ৫ই আশ্বিন বাঁকুড়া জিলার তালডাংগা থানার এলাকায় ১নং ইউনিয়নে দেবীভাঙ্গাবাঁধ গ্রামে উমেশচন্দ্র নায়কের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। ঐ গ্রামে ১২ ঘর অনুন্নত জাতির বাস। কিছুদিন হইতেই উমেশের পরিবারবর্গ সময় সময়—কার্যাভাবে—অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছিল না। সে অনাহারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

(২) ওন্দা থানার রামসাগর ইউনিয়নে তেলীবেড়িয়া গ্রামে বিমলা দাসী গত ১লা অক্টোবর অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কয়মাস পূর্বে তাহার স্বামীর অনাহারে মৃত্যু হইয়াছিল। ঐ গ্রামের এক ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় আপনার কন্যাকে এক টাকা ১৪ আনা মূল্যে কোন বারবনিতার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল—কৃষক সমিতি বালিকার উদ্ধার সাধন করিয়াছে।

বাঁকুড়া অতি দরিদ্র জিলা। কয় বৎসর পূর্বে যখন গোপীনাথপুরে এক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু ঘটে, তখন সরকারী কর্মচারীরা প্রথমে তাহা অস্বীকার করিয়াছিল। বিজয়কুমার বসু তখন বাঙলা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য। তিনি পরে তথায় গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে ঐ অনাহারে মৃত্যু প্রমাণিত হইয়াছিল:

আমরা কি আশা করিতে পারি, মিস্টার কেসী এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন? আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাঁকুড়া জিলায় কয়মাস হইতেই অন্নাভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে—নিরন্নগণ বাঁকুড়া শহরেও অভিযান করিয়াছিল। তখন ম্যাজিস্ট্রেট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—লোকের উদরপূর্তি হওয়া ত পরের কথা।

লোকের মৃত্যু না হইলে যে লোকরক্ষার দায়িত্ব উপলব্ধি হয় না, ইহা কিরূপ কথা? আজ বাঙলায় যে অবস্থা তাহাতে সরকারের পক্ষে যে বিশেষ সতর্কতা ও অনলস প্রচেষ্টা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

বিলাতের সংবাদপত্রসমূহও মনে করিতেছেন—মিস্টার কেসীর পক্ষে সংবাদপত্রসমূহকে প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করা কর্তব্য ছিল এবং তিনি তাহা না করায় যেভাবে সুযোগ হারাইয়াছেন, তাহা পরিতাপের বিষয়।

আমরা জানি, সরকারের "দুর্ভিক্ষ"—জনসাধারণের ধারণার সহিত এক নাও হইতে পারে। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। সেই সম্বন্ধীয় কমিশন (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) বলিয়াছিলেন—সরকারী নথীপত্রে "অন্নকষ্ট" ও "দুর্ভিক্ষ" ভিন্ন করা হয় এবং অন্নকষ্ট ও অভাব যত প্রবল হয় ততই সরকারী কর্মচারীরা দুর্ভিক্ষ তখনও হয় নাই বলেন -এমন কি যখন অর্থ দিয়াও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না, তাহার পূর্বে তাঁহারা দুর্ভিক্ষ স্বীকার করেন না।—

"It seems as if, as the Scarcity and want became more intense, the official use of the term 'famine' was gradually pushed back into narrower and narrower limits."

হয়ত সেই প্রথানুসারে বাঙলা সরকার বলিবেন, বাঙলায় আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। কিন্তু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ যে মৃদুভাবে এখনও বিদ্যমান এবং ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি যেমন সহজেই প্রদীপ্ত হইতে পারে, তেমনই আবার প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা যে "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনের আড়ম্বর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বহু অর্থ ব্যয়িত হইলেও তাহাতে বাঙলা সঠিক সংঘবদ্ধ ও স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। তাহাতে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা ব্যয় কি অপব্যয় তাহা বিবেচনা করাও আমরা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি।

সেদিন মিস্টার কেসী বলিয়াছেন, দামোদর উপত্যকায় যে কাজ করা হইবে, তাহা আমেরিকার টেনেসী উপত্যকার কাজের মতই হইবে। আমরা তাঁহার এই কথায় কি বুঝিব? অবশ্য দামোদর নদের উপত্যকা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা হইয়াছে, তাহার কার্য শেষ হওয়া ত পরের কথা—আরম্ভ হইবারও পূর্বে বোধ হয়, মিস্টার কেসী স্বদেশে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি যদি "টেনেসী ভ্যালী এডমিনিস্ট্রেশনের" সভাপতি মিস্টার ডেভিড লিলিয়েন্থসের প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিয়া থাকেন, তবে—অবশ্যই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, তাঁহার পুস্তকের অপর নাম "ডিমক্রেসী অন দি মার্চ"। সেই পুস্তকে তিনি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন, গণতন্ত্র ব্যতীত ঐরূপ কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। স্বৈরশাসন শাসিত এদেশে কিরূপে সে কাজ সম্পন্ন হইতে পারিবে?

এদেশে যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া—নানারূপ কীটপতঙ্গের দ্বারা কত খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা বুঝাইয়া লোককে সাবধান করিবার কার্যে অর্থব্যয় করিতেছেন। প্রথম কথা—এই সব বিজ্ঞাপন কাহাদিগের জন্য? যদি ইহা এ দেশের কৃষক ও সাধারণ মহাজনদিগের জন্য হয় তবে বিজ্ঞাপন ইংরেজীতে প্রকাশের উপযোগিতা কি? তাহার পরে কথা—উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—"যে স্থানেই সম্ভব—অধিক পরিমাণে শস্য রাখিবে; শস্য যদি বস্তায় রাখ হয়, তবে বস্তা যেন পরিষ্কার হয়—বস্তা মেঝে

হইতে উচ্চে এমনভাবে রাখিবে যে, সেগুলি যেন দেওয়াল স্পর্শ না করে।"

ইহা ভারত সরকারের উপদেশ। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, বাঙলা সরকার গুদামে মেজের উপরেই শস্যপূর্ণ বস্তা রাখিতেছেন এবং তাহাতে শস্যের বিকৃতি অনিবার্য। তবে তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া সে কাজ করেন, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু যদি অজ্ঞতাই ঐরূপে শস্যরক্ষার কারণ হয় তবে সেই অজ্ঞতা কি দণ্ডার্হ বলা যায় না?

ভারত সরকার গুদামের প্রাচীর চূণকাম করিতে সদুপদেশ দিয়াছেন। যে স্থানে গুদামের প্রাচীর টিনের, সে স্থানে কি হইবে? গুদামের প্রাচীর ও ছাদ টিনের হইলে উত্তাপে শস্য বিকৃত হইবে মনে করিয়াই কি ভারত সরকার সেরূপ গুদামে শস্য রক্ষা কল্পনাও করিতে পারেন নাই?

ইহার পরে ইন্দুরের উপদ্রব নিবারণ। ভারত সরকার উপদেশ দিয়াছেন—যে গুদামে ইন্দুর ঢুকিতে না পারে, সেইরূপ গুদামে শস্য রাখিবে—কোথাও ছিদ্র থাকিলে, তাহা কাচভাঙা ও সিমেণ্ট দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবে—নর্দমার মুখে লোহার জাল দিয়া ইন্দুরের প্রবেশ অসম্ভব করিবে এবং গুদামের দরজা যাহাতে ভালরূপ বন্ধ হয়—তাহাতে ফাঁক না থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বাঙলা সরকার ছিদ্রযুক্ত টিনের বেড়া দেওয়া গুদামে শস্য রাখিতেছেন।

কিন্তু তাহাই কি সব? যে সকল কর্মচারীর জন্য অনাবৃত স্থানে থাকিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য পচিয়াছে, তাহাদিগকেও দণ্ড দান করা হয় নাই। সেই অপচয়ের অপরাধ কি সরকার অনায়াসে ক্ষমা করিয়াছেন?

সময় থাকিতে ব্যবস্থা না করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা আমরা মিস্টার কেসীকে বিবেচনা করিতে বলি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকার আপনাদিগের অন্নসত্রে যে খাদ্য দিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও যে খাদ্য বিতরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকের শক্তি থাকে না—লোক তাহাতে ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়। তাঁহারা যে লোককে বাজরা খাইতেও বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়? যাঁহারা বাঙলার লোককে বাজরা খাওয়াইয়া স্বাস্থ্যহীন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অপরাধ কিরূপ? যে খাদ্যে লোক অনভ্যস্ত, তাহা গ্রহণ করিয়া যে বহু লোক পীড়িত—এমন কি মৃত্যুমুখে পতিতও হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনাচারের ত কথাই নাই। সে কথা যেমন দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন তেমনই রোল্যাণ্ড কমিটি বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিবারণের কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে?

সরকারী কর্মচারীদিগের কিরূপ ভুল হয় আর সেই ভুলের ফল দেশের লোককেই ভোগ করিত হয়, তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এইস্থানে প্রদান করিতেছি।

গত ৪ঠা জুলাই বিলাত যাত্রার পূর্বে গভর্নর কেসী যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বাঙলায় খাদ্য হিসাবে মৎস্যের প্রয়োজন আমি অবগত আছি। দুর্ভিক্ষের সময় যে ধীবরগণ বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার সর্ববিধ চেষ্টাই হইতেছে। বাঙলার নদীতে ও খাঁড়ীতে মৎস্যের অভাব নাই। যাহাতে ধীবরগণ আবার মৎস্য ধরিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রথমেই বাঙলায় পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষের সুবিধার জন্য ডিম ও পোণা বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে...........বরফের পরিমাণ পর্যাপ্ত না হইলে শহরে মৎস্য সরবরাহে অসুবিধা ঘটে। বরফ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীর চেষ্টায় কলিকাতায় বরফ সরবরাহ বর্ধিত হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার বেসামরিক লোকের ব্যবহারার্থ শতকরা ৫০ ভাগ অধিক বরফ দেওয়া হইতেছে। এই পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ মৎস্য-ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে নাই। আমি ইহার কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছি।'

তিনি ফিরিয়া আসিবার পরেই তাঁহার সরকারের ডিরেক্টর অব ফিসারিজ ডক্টর সুন্দরলাল হোরা মৎস্য সরবরাহের স্বল্পতার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

(১) পুরাতন জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মাছ ধরিবার মত শক্ত নাই;

(২) অধিক মূল্য দিলেও নূতন জাল বুনিবার ও পুরাতন জাল সারিবার জন্য আবশ্যক সূতা পাওয়া যায় না;

(৩) নূতন ও পুরাতন জাল রক্ষার জন্য যে আলকাতরা প্রয়োজন, তাহা পাওয়া যায় না এবং তাহার পরিবর্তে যাহা ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাহাতে সূতা নষ্ট হয়;

(৪) মাছধরা নৌকার পাইন ছিঁড়িয়া গিয়াছে—নূতন পাইনের কাপড় পাওয়া যায় না;

(৫) সছিদ্র নৌকা সংস্কারের জন্য কাঠ, পেরেক, আলকাতরা পাওয়া যায় না;

(৬) মাছ রক্ষার জন্য লবণ পাওয়া যাইতেছে না;

(৭) কেরোসিন তেলের অভাবে রাত্রিকালে মাছধরা যায় না। —ইত্যাদি।

যদি মিস্টার কেসী এই বিষয় বিবেচনা করেন, তবে তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন—বরফের সরবরাহ বাড়াইলেই মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি হয় না।

মিস্টার কেসী যেমন—ডক্টর হোরাও তেমনই একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। আজ ২ বৎসর পরে যখন বাঙলা সরকার ধীবরদিগের দিকে কৃপাদৃষ্টি দিতেছেন, তখন তাহাদিগের শতকরা কতজন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা কি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? বঙ্গোপ-সাগরের কূলে দীঘা গ্রামে কি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করিলে কুমার শ্রীমান দেবেন্দ্রলাল খাঁ প্রকৃত সংবাদ দিতে পারিবেন। দীঘায় যাহা হইয়াছে—অনেক স্থানেই তাহা হইয়াছে।

গত দুর্ভিক্ষের প্রাবল্যকালে বাঙলায় আসিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য কুমার স্যার জগদীশপ্রসাদ যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, (১০ই সেপ্টেম্বর) তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

ধীবরদিগকে জলপথবহুল জেলাসমূহে নূতন জাল দিয়া সাহায্য করিতে হইবে। সে ২ বৎসর পূর্বের কথা। তখন যদি বাঙলা সরকার সে কথায় কর্ণপাত করিতেন, তবে অনেক স্থানে ধীবরগণ মরিয়া উজাড় হইয়া যাইত না—মৎস্য সরবরাহও কষ্টসাধ্য হইত না। অর্থাৎ দেশের লোকও এই পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত হইয়া স্বাস্থ্য হারাইত না।

কিন্তু যাঁহাদিগের নির্মম উপেক্ষা লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছে, তাঁহারা সে কথায় মনোযোগ দেন নাই। তাঁহারা নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে বলিয়াছিলেন, ভগবান যাহাদিগকে মারেন, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? অর্থাৎ ভগবান বহু লোককে মারিয়াও তাঁহাদিগের বেতন লাভের পথ পরিষ্কৃত রাখিয়াছেন। আর সেই সময় যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকল সকলেই অবগত আছেন। এজেণ্টের মারফতে সরকারের জন্য খাদ্যশস্য ক্রয় অসমর্থনীয় হইলেও বাঙলায় তাহাই হইয়াছিল এবং একজন সচিব ব্যবস্থা পরিষদে সদম্ভে বলিতে লজ্জানুভব করেন নাই, যাঁহাকে বাঙলা সরকারের এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি মুসলিম লীগের পক্ষপাতী।

আমরা বলিয়াছি, বাঙলায় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের জের মিটে নাই। বহু লোক সেই সময়ে অনাহারে বা অপূর্ণাহারে দুর্বল হইয়া আছে—সহজেই রোগগ্রস্ত হয়। সরকার পর বৎসরের ফসল ভাল হইলেও চাউলের যে মূল্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছেন, তাহাতে অধিকাংশ লোকই পূর্ণাহারে বঞ্চিত। এ বৎসর ফসল ভাল হয় নাই—হইবেও না।

এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে সময় থাকিতে সাবধান হইয়া আবশ্যক উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য।

বিজয়া যাত্রা

শ্রীমহাদেব রায়

বৎসরের মধ্যে বিজয়ার ন্যায় বাৎসল্যের বাসর আর কবে মিলিবে? বন্ধু-অবন্ধুর এমন বাহু-বাহবি বিলাস বিজয়া বই আর কবে হইত?

বউ-কাটকি শাশুড়িরও আজ বকাবকি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ সন্ধ্যায় সে আর বক্-বক্ করিতেছে না। বড় দুঃখের দুঃখিনী বধূকে বরাভয়-দানে আজ তার বরদার রূপ। বড়াই ছাড়িয়া কত বরাঙ্গনা আজ বিনতির ভরেই যেন বিলুণ্ঠিতা। বঙ্গীয় সাহেবেরা ক্ষণেকের জন্য বগলস ছাড়িয়াছেন; বক্‌শি হাতে-হাতে বকশিস আদায়ের ভরসা পাইয়াছে। বড়বাবুর কাছে বড়-মুখে দাঁড়াইয়া আজ আর বড় একটা ব্যর্থতার আশঙ্কা নাই। তাই বড় গলায় ইহারা বড়-মানুষির বর বর্ণনা শুধু করিয়াছে—বিজয়া-যাত্রা ব্যর্থ হইবার নহে।

বছর ভরিয়া বনি-বনাও থাক না থাক, আজ বঙ্কিম-গতির বক্র বিহার বর্জন করিয়া বহু বান্দাই বন-বন করিয়া বিজয়া জানাইতে ব্যস্ত।

বিজয়ার ব্যাপারে "ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ"-দের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বাহাত্তুরে বৃদ্ধও যে বক্রপৃষ্ঠ ঋজু করিয়া বাঁকা লাঠি ছাড়িয়া বাঁকা কোমর সোজা করিয়া বিজয়ার আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল, ইহার মধ্যে কি এতটুকু ব্যঙ্গ আছে না ইহাকে ব্যর্থ বিলাস বলিতে পারি? বাঁকা আজ সবই সোজা বাঁকা কথার বাঁক সোজা বাঁকা মুখেও হাসির বোঝা।

বদান্যতার অন্ত নাই। ব্যয়-কুণ্ঠ ব্যক্তির কাছেও আজ বঞ্চিত হইবার ভয় নাই। বহু সঞ্চয়ী কৃপণ বিত্তবানও বিজয়ার জন্য ব্যয়-কুণ্ঠাকে বিসর্জন দিয়া বন্ধুবান্ধবকে অন্ততঃ বাঁদিয়ার দানা দিয়া বিদায় করিতে বাধ্য হন। বাজারে হাজার কণ্ট্রোল হইলেও বিজয়ার সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করিবার উপায় নাই। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই।

মনে পড়িতেছে—বঙ্কিমের বিজয়ান্তরাল-বর্তী 'দশ-প্রহরণ-ধারিণী' মন্ত্র। বঙ্গের বল-বিধানে "বলমাধেহি বলময়ি" মন্ত্রে বিজয়া সার্থক। বিজয়ার বর্ণ বর্ণনা করিতে বর্ণমালাকেও বুঝি বা বিবর্ণ হইতে হয়। 'বিজয়া' নামটিই বৈশিষ্ট্যে বড়। 'শরতের' 'বিজয়া' পর্যন্ত ব্রীড়া-বিনয়ের বিশিষ্ট বৈভবে বিভবময়ী হইয়া 'বিলাস-বিহারী'র বিলাসকে বিগত-প্রাণ করিয়া ছাড়িয়াছে, বক-ধার্মিক বিড়াল-তপস্বী 'রাসবিহারী'র রাসকে হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

বড় বে-আদবকে জব্দ করিয়া বিশ্ব-জননীর বিজয়ার রূপ। তাঁহার সেই বল-দর্পিতা মূর্তি প্রকাশের—কৃপা-বিতরণের ভরসা কি এই দেশেই আজ ব্যর্থ হইবে?

বৃষভ-বাহন বিষ্ণুর গৃহে বিজয়া করিতে আসিয়া আজ বড়ই বিমনা। বিশিষ্ট আলিঙ্গনে বাধিত করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, এমন দিনে এত বিমনা কেন বন্ধু? বৃষ-বাহন বলিলেন, "বলিব কী ভাই, এমন দিনে বান্ধবী তোমার বড়ই বিক্ষুব্ধ। বিশ্বের পরিপালনের ভার বহন করিতে দাঁড়াইয়া তুমি নাকি বড়ই লোল দিয়াছ। আর, আমি নাকি বিশ্বধ্বংসে বদ্ধোন্মাদ—এবার বঙ্গদেশে গিয়া তিনি বড়ই বিষাদ লইয়া ফিরিয়াছেন। ছেলে দুইটাকে পর্যন্ত তাহার দাদু-দিদিমারা ভাল বিদায় দিতে পারে নাই; কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে। হাজার হোক, দাদু-দিদিমার প্রাণ! যে যে বস্ত্রে গিয়াছে, সেই বস্ত্রেই ফিরিয়াছে। শুধু কি তাই? গণেশটার তিন দিনে কি চেহারা হইয়া গিয়াছে! উদরে যেন দড়ি পড়িয়া গিয়াছে। কার্তিকটার অমন বাবরি চুল—তিন দিনে যেন জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীকে তো খুব বাঁকা কথাই শুনিতে হইয়াছে—"কি রঙ্গ দেখাইতে আর এসেছ মা? অত রঙ্গ আর ভাল লাগে না। ব্যঙ্গেরও একটা সীমা আছে?' সরস্বতীকে বলিয়াছে, 'কেউ আর প্রাণের টানে তোমার পূজো করতে পারছি না করছি—পেটের দায়ে। তুমিও যেয়ে ঢুকলে আমাদের উপর অকৃপাময়ী লক্ষ্মীর চুপড়ির মধ্যে। ঋণে ঋণেওয়ালা প্রকাশক কুবেররা নীলামের ডাকে তোমার পূজোর ফুল কিনতে চাইছেন। বাসি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাই ব্যর্থ আশায় ছুঁড়ে দিচ্ছি ঐ চুপড়ির মধ্যে।' আগে আমার গৃহিণী গেলে সেখানে আনন্দের হাট পড়িয়া যাইত ভাই। এতটুকু নিরানন্দ হইলে ইঁহার প্রাণেও লাগে, সন্তানদের প্রাণেও লাগে। ব্রহ্মা একজন বিশিষ্ট কবি-সন্তান পাঠাইয়াছিলেন সেখানে কিছুদিন আগে। সে এই 'আনন্দ-ময়ী'র উৎসবে একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—এমন উৎসবে একজন অনাথাও যদি দ্বারে 'ম্লানমুখে বিষাদে বিরস' হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তবে সমস্ত উৎসব, সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ। আর আজ কি অবস্থা জান? কার্তিক গণেশ নূতন ছড়া শুনিয়া আসিয়াছে—

'দিগম্বরী ন্যাংটা মেয়ে, ন্যাংটা করে দিলি!'
—ভিড় করেছে দেশ-দুনিয়া—
কাপড়ের রব তুলি।
'অন্নপূর্ণা' কিসে মা তুই?
ফসল বিহীন হ'ল এ ভূঁই
বস্ত্র বিনে ঘরে ঘরে দিচ্ছে গলায় দড়ি,
বেঁচে আছে কষ্টে যারা, নাইক কানা-কড়ি,
পড়ল পেটে দড়ি,
ঘোর বেঘোরে আঘাটায় প্রাণ গড়াগড়ি।

অন্ন, বস্ত্র দুইএরই হাহাকারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। তাই তোমার বদনাম তোমার বান্ধবীর মুখে। দেখিয়া শুনিয়া বিজয়া যাত্রা করিতে বাহির হইয়াছি। চল ব্রহ্মার কাছেও বার্তার বিবরণ দিই গিয়া। শুনিয়াছি—তাঁহার নিকট বঙ্গলক্ষ্মী দরখাস্ত পেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলা-ধানের ব্যবস্থায় কন্যাকে আশ্বাস দিয়াছেন।

বিষ্ণুর সঙ্গে বৃষবাহন ব্রহ্মার গৃহে বিজয়া যাত্রা করিতে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেই ব্রহ্মা বলিলেন, আমার সৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে কপটতায়। দৈববলকে আচ্ছন্ন করিয়া সর্বত্র দৈত্যবলের ক্রিয়া চলিয়াছে। যে দেশ দৈব শক্তিতে পরম বিশ্বাসবান ছিল, সেও সেই আস্থা হারাইয়াছে।

মহেশ্বর বলিলেন—সে কথা সত্য। শুনিলাম শক্তির সম্মুখে বসিয়া কোন সন্তান বলিয়াছে—আমরা ওসব শাক্তটাক্ত মানি না—আমরা বৈষ্ণব। পূজারী দীন-ভাবে নিবেদন করিতেছে—মা, সম্প্রদায়ে, সম্প্রদায়ে দেশ ভরিয়া গেল। সর্বদেবের তেজে তেজোময়ী সেই সম্মিলিত শক্তির মহিমা প্রকাশ কর মা।

বিষ্ণু বলিলেন—আমি হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। পালনের ভার লইয়া আজ বিব্রত। যে মধুর সম্পর্কে প্রীতির রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলাম সেখানে অতি ক্ষুদ্র আত্মকেন্দ্রিক ভাব। ব্যবস্থাকর্তা বিনায়ক চটুরাজ বরজলালের বিবাহ বাড়িতে মণ মণ চিনি, ভাল ভাল শাড়ি, ধুতি পাঠাইয়া দিল কেননা বরজলাল জবরদস্ত। তেলা মাথায় তেল দিলে নিজের গদি কায়েম থাকিবে। অথচ বরজলালের প্রতিবেশী বনমালী ভট্টাচার্যের গৃহিণী শতচ্ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডে বক্ষ আবৃত করে কি করিয়া সে ভাবনা একবারও ভাবিল না। গ্রামে গ্রামে দলাদলি তো আছেই, বর্ণ-বৈষম্যের তেমনই ছড়াছড়ি—এখন ব্ল্যাক মার্কেটের কড়াকড়ি টিকিবে কেন? প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য সৃষ্টি-কর্তার কাছে আমাদের তাই শুভ সৃষ্টির আকুল প্রার্থনা।

ব্রহ্মা বলিলেন—ত্রি-শক্তির সমন্বয়েও যদি প্রতিকার না হয়, তবে আর হইবে কিসে? দেবসভার সম্মিলিত শক্তিতে চিরদিন অসুর শক্তি ধ্বংস হইয়াছে, আজ হইবে না? তিন জনের শক্তি দিয়া কেন্দ্রস্থলে তিন প্রতিনিধিকে কাজে নামাও। তাহা না হইলে, সন্তানদের দুষ্কৃতের দুর্ভোগ কাটিবে না। আমার এখনও ভরসা আছে—ইহাতেই দুর্গতির অবসান হইবে।

বৃষভবাহন বিশেষ আনন্দে বম্ বম্ করিয়া গণ্ডবাদ্য করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—বিজয়ার মিষ্টিমুখ একটু করে

একটা তাজ্জব কাহিনী

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

[কাহিনীটা তাজ্জবই বটে। পাঠকরা বিশ্বাস করবেন কি না জানিনা। তা না-ই বা করলেন; অনেক গল্পই অনেকে বিশ্বাস করেন না, তাই বলে শুনতে আপত্তিটা কিসের? আমি গল্পটা শুনেছিলুম একজন সৈন্যের মুখে। যেমনটি তার মুখে শুনেছিলুম ঠিক তেমনটি বলে যাচ্ছি, অবশ্য যতটা আমার মনে আছে।......]

রাত্রি গভীর। আকাশে চাঁদ নেই, থাকবার কথাও নয় কেননা সেটা ছিলো কৃষ্ণপক্ষের রাত। অবশ্য তারা আছে আকাশ-ভরা। অসংখ্য তারা। কার সাধ্য তাদের গুণে শেষ করে? কালো আকাশের গায়ে তারা প্রাণপণে ঝিকমিক্ করছে, কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে আলো পাঠাতে পারছে না অতদূর থেকে।

আমাদের তাঁবুতে সবাই বিশ্রাম করছে—কেউ ঘুমিয়ে, কেউ শুয়ে। বাদ শুধু আমি আর আমার তিনজন সহ-সৈনিক। আমাদের পালা পড়েছিলো সে রাতের তাঁবুর চার কোণে জেগে পাহারা দেওয়া। আমাদের শত্রুরা পরাজিত বটে, কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ এখনো ছাড়েনি। হঠাৎ অতর্কিতে দু'চারজন এসে আড়াল থেকে গুলী ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। এ ভাবে অতর্কিত আক্রমণে আমাদের দলের কয়েকজন সেরা সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের একজন গুপ্তচর এসে খবর দিয়েছে সে নাকি ওদের দু'জন গেরিলা-যোদ্ধার কথোপকথন শুনেছিলো আড়াল থেকে লুকিয়ে। ওদের মতলব রাতের বেলায় হঠাৎ একবার দল বেঁধে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে আমাদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। সেই থেকে আমরা সাবধান হয়ে আছি, দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই পাহারা থাকে যেন শত্রু অতর্কিতে আক্রমণ করতে না পারে।

যে রাতের কথা বলছি সে রাতটা ছিলো অদ্ভুত রকম কালো আর থমথমে। সে যেন দম বন্ধ করে চুপচাপ কি একটা ভয়ানক ব্যাপারের আশঙ্কায় অপেক্ষা করে আছে। আমি অবস্থার ফেরে পড়ে সৈন্য হলেও আমার মনটা তখনো ছিল কবিত্বে ভরা। মনে মনে আমারই তৈরী কবিতা আওড়াতে লাগলুম:

শোনো শোনো ওগো কালো আকাশের তারা,
কেন মিছে করো ঝিক্‌মিক্ ঝিকমিক?
তোমাদের আলো আকাশেই হলো হারা,
এলো না ধরায় আলোকের ঐ ধারা,
তোমাদের ডাকে মন তবু দিলো সাড়া,
তাই তো দুচোখে চেয়ে দেখি অনিমিখ।
তোমরা কাদের আঁখি-তারা নাহি জানি,
চেয়ে আছে কারা ধরার ধুলার পানে?
দেখিছে কি তারা, করিছে কি কানাকানি:
মানুষে মানুষে এত হায় হানাহানি।
প্রাণে প্রাণে কভু হবে না কি জানাজানি?
পাশবিকতায় পশু যে লজ্জা মানে!
আকাশের তারা, আজি এ নিশীথ রাতে
চারিদিকে হেরি নীরব অন্ধকার।
ধুলার ধরায়, তোমাদের বহু নীচে,
দিনের আলোরে রাখিয়া অনেক পিছে,
হিংসা ও দ্বেষ মনে হয় সবি মিছে........

কবিতাটি আর শেষ করা হলো না। আমার গজ বিশেক দূরে যে একটা ছোট অথচ বেশ ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা গাছ ছিলো তার পাতাগুলো হঠাৎ খস খস আওয়াজ করে নড়ে উঠলো। নিঃশব্দ আবহাওয়ায় ঐ সামান্য আওয়াজও আমার কানে সাড়া জাগালো। তা ছাড়া বিনা বাতাসে গাছের মাত্র একটা অংশের পাতা অমনভাবে নড়ে ওঠা সন্দেহজনক বই কি! স্পষ্টই বুঝতে পারলুম অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে শত্রু-পক্ষের এক বা একাধিক গেরিলা সৈন্য ঐ গাছে উঠে পাতার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। তার বা তাদের নিশ্চয়ই মতলব ভালো নয়।

ভাল করছি কি মন্দ করছি ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না। কোমরবন্ধ থেকে ছোট্ট বাঁশীটি তুলে নিয়ে তাতে ফুঁ দিলুম। সঙ্গে সঙ্গেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একদল সৈন্য বেরিয়ে এলো। একসঙ্গে অনেকগুলো বিজলী মশাল (torch) জ্বলে উঠলো। ছোট গাছটা আলোকিত হয়ে উঠলো এক মুহূর্তে। আমার নির্দেশে একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক ঐ গাছটিকে এমন ভাবে লক্ষ্য করলো যেন লুকানো লোকটি গাছের যে কোন অংশেই আত্ম-গোপন করে থাক না কেন, একটা না একটা গুলী তাকে ভেদ করবেই।

চেঁচিয়ে বললুম, "যে বা যারা গাছে আছো নেমে এসো। নইলে এখনি গুলী চালাবো।" গুলী খাবার ভয়েই হোক বা যে কারণেই হোক, লুকানো লোকটা নেমে এলো গাছ থেকে। দেখা গেল লোকটা আমাদের শত্রুপক্ষের একজন তরুণ সৈনিক। বয়স হবে বছর তেইশ চব্বিশ। কোমরে একটা পিস্তলের খাপ ঝুলছে, তাতে পিস্তল আছে বলেই মনে হলো। আমাদের হুকুম মতই দু'হাত উঁচু করে সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে এগিয়ে এলো।

তাকে আমরা নিরস্ত্র করে ফেললুম তার পোষাক তন্ন তন্ন করে খুঁজে। গাছটিকেও তল্লাস করে দেখা গেল তার পাতার আড়ালে আড়ালে আর কেউ লুকিয়ে নেই। তখন পরামর্শ হতে লাগলো ছোকরাকে নিয়ে কি করা যায়।

প্রশ্ন করলুম "এখানে কি করতে এসে-ছিলে?"

জবাব হলো "তোমাদের বিবরণ নিয়ে আমার দলের লোকদের দেবো বলে। আমি একজন দেশ-হিতৈষী।"

অর্থাৎ তুমি হচ্ছো আমাদের শত্রুদলের গুপ্তচর। আমাদের গুপ্ত খবর জেনে নিয়ে সেটা দেবে আমাদের শত্রুর কাছে।"

"অর্থাৎ আমার বন্ধুদের কাছে।"

"তোমার সাহস তো কম নয় হে ছোকরা।"

"ভুল করছেন। আমাদের দলের ভেতর আমিই সবার চাইতে বেশী ভীরু। তাই আমায় সবাই ভীরুরাম বলে ডাকে।"

কিন্তু এভাবে প্রাণ হাতে করে গুপ্তচরের কাজ করতে আসা তো ভীরুর কাজ নয়।"

"তা নয় বটে, কিন্তু আমাদের দলের অন্য সবাইকেই আমার চাইতে ঢের বেশী কঠিন কাজ দেওয়া হয়েছে। আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল আপনাদের তাঁবুর বিবরণ সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার। আমাদের দলের ক্যাপ্টেন বলেছিলেন আপনাদের যতগুলো সৈন্যদল আছে তাদের ভেতর আপনারাই নাকি সবচেয়ে বেশী ভীরু আর বোকা। তাই আমাকেই—"

ভীরু আর বোকা আখ্যায় আখ্যায়িত হলে সবাই চটে, আমরাও চটলুম। বললুম, "গুপ্তচরের শাস্তি কি জানো?"

ছোকরা বললো "আজ্ঞে না। গুপ্তচর-গিরিতে এই আমার হাতে খড়ি। এর শাস্তির আইন-কানুন কিছু আমার জানা নেই।"

আমরা সবাই এক বাক্যে বললুম, 'মৃত্যু-দণ্ড'। ছোকরা একটু মাথা দুলিয়ে বললো "মৃত্যুদণ্ড? তা বেশ।" যেন মৃত্যু আর জীবন তার কাছে একই জিনিষ, কোনো তফাৎ নেই।

আমার সন্দেহ হলো ছোকরা নিশ্চয় ভাবছে গুপ্তচরের দণ্ড মৃত্যু মোটেই নয়, আমরা ওর সঙ্গে একটু ইয়ারকি করছি মাত্র। বিষয়টার গুরুত্ব সে মোটেই বুঝতে পারেনি। আমরা সবাই মিলে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু ও যেন আমাদের কথা গায়েই মাখলো না। ওকে তখন আমরা বাধ্য হয়েই ধরে নিয়ে হাজির করলুম আমাদের সেনাপতির কাছে। আমাদের সেনাপতির যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব, তেমনি গলার আওয়াজ এবং কথা বলার ভঙ্গী। তিনি আশীর্বাদ করলে পর্যন্ত মনে হত অভিশাপ দিচ্ছেন, হাসলে মনে হত হুঙ্কার করছেন।

তিনি সমস্ত ব্যাপার শুনে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "এতবড় আস্পর্ধা! আমার

তাঁবুর খবর নিতে ভরসা? আজ ছোকরাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। কৈ হ্যায়!"

সেনাপতির প্রধান ভৃত্য এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। সেনাপতি হুকুম করলেন জহ্লাদকে পাঠিয়ে দিতে। রাজা-রাজড়ার সভায় যেমন সভা-গায়ক থাকে, আমাদের সেনাপতির তাঁবুতে তেমনি সর্বদাই একজন তাঁবু-জহ্লাদ থাকতো। সেই জহ্লাদ এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো।

সেনাপতি হুকুম করলেন যেমন করে হোক ছোকরার মুখ থেকে ওদের দলের সব খবর আদায় করতে হবে—কোথায় কোথায় তাদের ঘাঁটি, কি তাদের প্ল্যান ইত্যাদি। যেন এইসব শয়তান গেরিলা-যোদ্ধাগুলোকে পাকড়াও করে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা যায়।

কিন্তু ছোকরা নির্ভীক, বে-পরোয়া। সে পণ করেছে তার দলের প্রতি, তার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সে কখনোই করবে না। কোথায় কোথায় তার দেশপ্রেমিক বন্ধুরা লুকিয়ে আছে তা সে কিছুতেই বলবে না।

"আচ্ছা দেখা যাক্ আমার এই ঘাতকের হাতে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করে কতক্ষণ থাকতে পারো!" বলে তিনি ঘাতককে, অর্থাৎ জহ্লাদকে ইসারা করলেন। এতক্ষণ ধরে জহ্লাদের যেন ইসারারও তর সইছিল না। এইবার ইসারা পাওয়া মাত্র সে বাঘের মত লাফিয়ে এসে ছোকরাকে ধরে ফেললো। ছোকরা বেচারা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। হোক সে বীর, হোক সে দেশপ্রেমিক। তবু রক্ত মাংসে গড়া মানুষ তো!

আমরাও সৈনিক, তবু আমরা মানুষ। নিষ্ঠুর জহ্লাদের হাতে ছোকরার যে পীড়ন এইবার শুরু হবে তা হয়তো চোখে দেখতে পারবো না। এই ভয়ে আমরা চলে যাচ্ছিলুম। সেনাপতি হুংকার স্বরে বল্লেন "খবরদার কেউ এক পা নড়বে না এখান থেকে। মনে রেখো তোমরা সৈন্য। মেয়েলী মায়াদয়া তোমাদের চলবে না। সবাইকে এইখানে দাঁড়িয়ে জহ্লাদের জহ্লাদি দেখতে হবে। জহ্লাদ, চালাও।"

জহ্লাদ তার কোমর থেকে ছুরি খুলে নিয়ে ছোকরার হাতের তালুর ওপর ছুরীর ফলার ছুঁচোলো মুখটা চেপে ধরে বল্লো "বল্ তোদের আড্ডা কোথায়? বল, বল, নইলে দিলুম ফুঁড়ে।"

ফুঁড়বার আগে ছোকরা বেশ একটু ভয় পেয়েছিলো। খানিকটা ফুঁড়তেই তার মুখের ওপর থেকে ভয়ের মেঘ হু হু করে কেটে গেল। জহ্লাদের ছুরি ছোকরার হাতের তালু ফুঁড়ে এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেল, টস টস করে রক্ত ঝরে পড়লো। আমরা যে যার নিজের হাতের তালু চেপে ধরে চীৎকার করে উঠলুম. কিন্তু ছোকরা হেসে উঠলো হো হো করে। জহ্লাদ ছুরিটা টেনে বার করে ফেললো, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো; ছোকরা রক্ত দেখতে দেখতে অবিচলিতভাবে হাসতে লাগলো। জহ্লাদ প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর একটা হাতুড়ি নিয়ে ছোকরার মাথায় যেখানে সেখানে পিটতে লাগলো। মাথা ফেটে চৌচির নয়, বহু চির হয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো, যেখানে সেখানে বীভৎস রকম থেঁৎলে গেল, কিন্তু ছোকরা দিব্বি হো হো করে হাসতে লাগলো।

সেনাপতি হেঁকে বল্লেন "ছোকরা ভালো চাও তো ভালোয় ভালোয় বলে দাও কোথায় গেলে তোমাদের শয়তান গেরিলা যোদ্ধা-গুলোকে জালে ফেলা যাবে।"

ছোকরা বললে "বলবো না। তোমাদের যা খুশী করো।" জহ্লাদ তখন বিষম ক্ষেপে উঠলো। "বড্ড হয়রাণ হয়ে গেছো ভাই, একটু জিরিয়ে নাও" বলে ছোকরা তার গায়ে হাত দিতেই জহ্লাদ তার ব্যাগ থেকে একগাদা রাক্ষুসে ছুঁচ বার করে ছোকরার গায়ে যেখানে সেখানে প্যাট প্যাট করে ফুঁড়ে দিতে লাগলো। ছোকরা দিব্বি ফুর্তিসে দাঁড়িয়ে একটা ভাটিয়ালী গান গাইতে সুরু করলো।

তাজ্জব ব্যাপার! সকলের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠলো। রক্তারক্তি ব্যাপার, অথচ ছোকরা কিছুমাত্র যন্ত্রণা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? জহ্লাদ তখন আরো ক্ষেপে উঠে ছোকরাকে মাটীতে শুইয়ে ফেলে তার ঐ ভীমের মত শরীর নিয়ে ছোকরার ছোট্ট পাৎলা বুকের উপর দমাদম লাফাতে লাগলো। ছোকরার মুখ থেকে কয়েক ঝলক রক্ত উঠে এলো। ছোকরা তবু কিছু অসুবিধা বোধ করছে বলে মনে হলো না।

তখন সেনাপতি বল্লেন "ছোকরা তো আচ্ছা বেয়াড়া দেখছি। আচ্ছা দেখা যাক বৈদ্যুতিক শক্তির ঠেলায় বাছাধন বাবা বলে কিনা।"

ইলেকট্রিক ব্যাটারী এনে চার্জ করা হলো ছোকরার শরীরে, কিন্তু ছোকরা দিব্বি নিশ্চিন্তভাবে বসে হাসতে লাগলো। সেনাপতি ক্ষেপে উঠে বল্লেন "নিশ্চয় ব্যাটারী খারাপ আছে। দেখ তো কেউ পরীক্ষা করে।" পরীক্ষা করতে গিয়ে 'শক' খেয়ে আমাদের একজন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো। আশ্চর্য! এক সেকেণ্ড যে ব্যাটারীর শক্ খেয়ে ঐ ষণ্ডা লোকটা অস্থির হয়ে উঠলো, তেইশ চব্বিশ বছরের ছিপছিপে ছোকরা ঐ ব্যাটারীরই একটানা শক্ যেন পরমানন্দে উপভোগ করতে লাগলো। একি স্বপ্ন, না সত্য?

তাঁবু জহ্লাদ রাগে গরগর করতে লাগলো। এমন জব্দ সে কখনো হয়নি। তার অবস্থা দেখে আমরা সবাই কৌতুক বোধ করতে লাগলুম। দু একজন হেসেও উঠলুম হো হো করে।

"একটা পুঁচকে ছোঁড়াকে এতক্ষণে ঘায়েল করতে পারলে না, এত বড় অপদার্থ তুমি?" তাঁবু-জহ্লাদকে পরম ঘৃণাভরে বললেন সেনাপতি। "নিয়ে এসো আমার পিছু পিছু। দেখি, আমি পারি কিনা ছোকরাকে শায়েস্তা করে কথা আদায় করতে।"

সেনাপতির সংগে সংগে ছোকরাকে নিয়ে চললো জহ্লাদ, আমরা তাদের পিছু গেলুম। রসুই বিভাগে তখনো উনুন জ্বলছে—চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বালানো থাকে। উনুনের ওপর সেনাপতি চাপালেন এক বিরাট কড়াই, আর কড়াইতে ঢাললেন তেল। তেল যখন টগবগ টগবগ করে ফুটতে লাগলো, তখন আমাদের সেই বন্দী ছোকরার শরীর থেকে পোষাক টোষাক সব খুলে নিয়ে ছোকরাকে ফেলে দেওয়া হলো ফুটন্ত তেলের ভেতর। কিছু না। একটা উঃ কি আঃ পর্যন্ত নয়। ছোকরার ভাব দেখে মনে হলো যেন বিশ্রী গরমের দিনে চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে দিব্বি আরামে অবগাহন করছে।

এর পরও ছোকরার ওপর নতুন কোনো কসরৎ চালাবার ধৈর্য ছিলো না কারো। তাঁবুর ডাক্তার (অথবা মেডিক্যাল অফিসার) এসে ছোকরাকে পরীক্ষা করে বললেন, "ব্যাপার রহস্যময়।" আমরা বললুম, "একথা-টুকু ত আপনি না বললেও চলতো। রহস্যটা কি তাই বলুন।"

ডাক্তার বললেন, "ঐটেই তো রহস্য।"

ছোকরা কড়াইর ভেতর ফুটন্ত তেলে ফুটতে ফুটতে হাসি হাসি মুখে শীস্ দিতে লাগল। শীস দিতে দিতে হাসতে লাগলোও বলতে পারা যায়।

আমাদের তাঁবুর সৈন্যদের ভেতর একজন ছিলো যাকে আমরা ডাকতুম বৈজ্ঞানিক বলে। সে বি এস সি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলো সে। শেষ কালে তারই শরণ নিতে হলো, সে এই তাজ্জব ব্যাপারটার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারে কিনা। সে কয়েকবার মাথা নীচু করে আর কয়েকবার মাথা উঁচু করে গম্ভীর ভাবে বললো. "বুঝতে পেরেছি।" কিন্তু কি সে বুঝতে পেরেছে তা সে কিছুতেই আমাদের বোঝাতে পারলো না। বুঝলুম ভেতরে ভেতরে সে হার মেনে গেছে কিন্তু বাইরে মানতে চাইছে না।

আমরা সবাই মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলুম ছোকরা আমাদের সবাইকে আচ্ছা জব্দ করেছে। এমন কি আমাদের যে অমন জাদরেল সেনাপতি, সে পর্যন্ত নরম হয়ে গেল। আমাদের অনুরোধে ছোকরা কড়াই থেকে নেমে এসে ঝুপ করে

একটা জল-ভর্তি ড্রামে পড়ে বললো, "একটা সাবান আর গামছা দিলে বাধিত হবো।" বাধিতই তাকে করা হোল। সাবান দিয়ে স্নান করে গা থেকে তেল উঠিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে গা'টা বেশ করে মুছে ফেলে সে পোষাক পরলো। যেন কিছুই তার হয়নি। অথচ গায়ের অনেকগুলো জায়গায় ফোসকা পড়ে গেছে, আর সারা শরীরের চামড়া লাল হয়ে গেছে।

জহল্লাদ মাথা হেঁট করে চলে গেল। সেনাপতি কণ্ঠস্বর মোলায়েম করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বললো, "বালক, বলো কোন্ মন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে এতগুলো অমানুষিক যন্ত্রণা তুমি অনায়াসেই সহ্য করে গেলে?"

ছোকরা বললো, "যন্ত্রণাই হয়নি, তো সহ্য করার কথা আসছে কোত্থেকে?"

"এততেও যন্ত্রণা হয়নি? আমাদের সকলের চক্ষু কপালে উঠলো।

"একটুও না।" ছোকরা বললো। "প্রথমে ভয় পেয়েছিলুম বটে। কিন্তু জহল্লাদের ছুরি আমার হাতের এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেতেই দেখলুম একটুও লাগছে না। তখন বুঝলুম আমাদের বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ঠিকই বলেছিলো।"

"কি বলেছিলো তোমাদের বৈজ্ঞানিক ডাক্তার?"

"আমার হাতে কি একটা তার নিজেরই আবিষ্কার করা ওষুধের ইন্‌জেকশ্যান ফুঁড়ে বলে দিয়েছিলো......"

কি বলে দিয়েছিলো সেটা আর তার কাছে কিছুতেই আদায় করা গেল না। যন্ত্রণা দিয়ে যাকে যন্ত্রণা দেওয়া যায় না তাকে ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই বলে ভয় দেখানো হলো না। বাধা হয়েই তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ছোকরা এক পা এক পা করে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পিছনে রেখে গেল গভীর চিন্তায় মগ্ন আমাদের। তবে কি ওদের বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এমন ইন্‌জেকশ্যান বার করেছে যা মানুষের যন্ত্রণাবোধ নষ্ট করে দেয়? সর্বনাশ। ঐ একটি বোধ যদি না থাকে তাহলে ঐ সব গেরিলা-যোদ্ধারা তো সাংঘাতিক বেপরোয়া হয়ে উঠবে। যন্ত্রণার ভয় না থাকলে নির্ভীক হতে আর বাধা কি? আর এই অদ্ভুত আবিষ্কারটা যদি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে? যন্ত্রণা-বোধহীন মানুষকে মানুষ তখন শায়েস্তা করবে কি দিয়ে? আমাদের তাঁবুর বাইরে ঘন অন্ধকার, তাঁবুর ভেতরে আমাদের মন চিন্তার অন্ধকারে ভরে উঠলো।

[এখানেই কাহিনীর শেষ। যে সৈন্যটির মুখে এ কাহিনী শোনা, এর বেশী তার কাছ থেকে আদায় করতে পারিনি।]

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ কি বিশ্বশান্তির অন্তরায় ?

(পূর্বানুবৃত্তি)

[আমেরিকার সবুজ সংঘ কর্তৃক বেতার বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের গত ১৯শে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ কি বিশ্বশান্তির অন্তরায় ?" নামক আলোচনার শেষার্ধ এবং শ্রীযুক্তা বিজয়-লক্ষ্মী পণ্ডিত, ওয়েন ল্যাটিমুর, জন ডব্লিউ ভাণ্ডারকুক এবং রবার্ট জন গ্রেহাম বুথবি প্রমুখ চারিজন প্রধান বক্তার ভাষণের পর প্রকৃত বিতর্ক এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। নিয়ামক মিঃ ডেনী কর্তৃক উল্লিখিত চিত্রতারকা মিস্ জারট্রুড লরেন্সের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণকে আনন্দ প্রদান সম্পর্কে বক্তব্য অনাবশ্যক ও বাহুল্য বোধে প্রকাশিত হইল না।]

নিয়ামক মিঃ ডেনী। ধন্যবাদ, জন ডব্লিউ ভাণ্ডারকুক। এই সব বক্তৃতা শুনিবার পর আমার একটা ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আর তাহা হইতেছে এই যে, আরও তথ্য এবং অধিকতর স্পষ্ট আলোচনা এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিশেষ প্রয়োজন। আজকার সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে অনেকেই আপনাদের প্রত্যেককে হয়ত নানাপ্রকার প্রশ্ন করিবেন; সুতরাং মাইক্রোফোনে আপনা-দিগকে একটু সংযত ও সংক্ষিপ্তবাক্ হইতে হইবে। তবে আমরা ভদ্রমহিলাকে নিয়াই প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করি। ম্যাডাম পণ্ডিত, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি? আচ্ছা বেশ, আসুন।

ম্যাডাম পণ্ডিত। মিঃ বুথবি ভারতের কল্যাণ ও সুশাসন বিষয়ে আপনি যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি একটি প্রশ্ন করিব। তাহা হইতেছে এই ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশে যে বিশ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহা সাধারণভাবে জ্ঞাত আছে কি?

মিঃ বুথবি। আমার জবাব হচ্ছে এই যে, ইংলণ্ডবাসিগণ এ বিষয়ে হোম গভর্নমেণ্ট ও বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট উভয়ের স্কন্ধেই সমান দোষ চাপাইয়াছে। আমরা সকলেই এজন্য মর্মান্তিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছি। অবশ্য, আমাদের দেশে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা যানবাহনের অব্যবস্থা হইতেও বঙ্গীয় সরকার এবং স্থানীয় ফাটকাবাজদের দোষই বেশী বলিয়া মনে করিয়াছেন।

ম্যাডাম পণ্ডিত। মিঃ বুথবি আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে, সুদীর্ঘকাল ব্রিটিশ-শাসনের পরও ভারত সরকার জনস্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু বাৎসরিক মাত্র শতভাগের এগারভাগ ব্যয় করিয়া থাকেন?

মিঃ বুথবি। ম্যাডাম পণ্ডিত, আমি মুহূর্তেকের নোটিশে উত্তর দিতে অক্ষম এমন বহু তথ্যের প্রশ্ন আপনি অবশ্যই করিতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, যানবাহন ও জনস্বাস্থ্য বাবত আমরা বহু অর্থব্যয় করিয়াছি এবং গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ আমরা ভারতবর্ষের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছি।

মিঃ ডেনী। ধন্যবাদ। মিঃ ভাণ্ডারকুক, আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি?

মিঃ ভাণ্ডারকুক। আমার মনে হয় যথা-সম্ভব উন্নতভাবে আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা সংগত। সাধারণ সমস্যা হইতে ইংলণ্ডের সমস্যার যে বৈশিষ্ট্য আছে, মিঃ ল্যাটিমুরও আমাকে এ বিষয়ে সমর্থন করিবেন। মিঃ ল্যাটিমুর যে একটি সর্বতো-ভাবে অসাধারণ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমি তাঁহাকে কিছু প্রশ্ন করিতে চাই। তিনি বলিয়াছেন, কোটি কোটি পরাধীন মানব স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। মিঃ ল্যাটিমুর, আমার মনে হয়, আমি আপনার কথা সঠিকভাবেই উদ্ধৃত করিতেছি।

মিঃ ল্যাটিমুর। হাঁ, বাস্তবিকই সঠিক-ভাবে।

মিঃ ভাণ্ডারকুক। আচ্ছা বলুন তো—এই হিসাবটি আপনি কোথায় পাইলেন? এ যদি সত্য হয়, তবে আজও তাহারা স্বাধীন হয় নাই কেন? ইহা কি সত্য নহে যে, যুদ্ধের পূর্বে ৩৮ কোটি অধিবাসী-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে মাত্র পাঁচিশ সহস্র সৈন্য ছিল?

ম্যাডাম পণ্ডিত। এ প্রশ্নটার জবাব দিতে আমাকে অনুমতি দিবেন কি মিঃ ল্যাটিমুর? ভারত সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, কেহ যে এ্যারোপ্লেনের সঙ্গে লাঠির দ্বারা যুদ্ধ করিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না (উল্লাসধ্বনি)।

মিঃ ল্যাটিমুর। মিসেস পণ্ডিত এইমাত্র যাহা বলিলেন, তাহা আমি সমর্থন করি। পরন্তু আমি ইহাও মনে করি যে যুদ্ধ করিবার মানসিক প্রস্তুতি ও সত্যিকার সংগ্রাম-ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। মিত্রপক্ষভুক্ত জাতিসমূহের নিকট শীঘ্রই এক জটিল সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে; যখন পুনরধিকৃত রাজ্যসমূহের অধিবাসিগণ আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিবে যে, "আপনারা কি জাপানের অধীনতা পাশ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে যাইতেছেন, না নিজ স্বার্থের জনাই আমাদিগকে পুনর্নির্জিত করিতেছেন?" জাপানীরা সম্ভবত তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের জন-সাধারণের হস্তে এমন সব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া যাইবে, যাহা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও কলোনীর হর্তাকর্তারা কখনও তাহাদিগকে দেয় নাই।

মিঃ ডেনী। মিঃ ভাণ্ডারকুক, আপনার বক্তব্য এবার বলুন।

মিঃ ভাণ্ডারকুক। মিঃ ল্যাটিমুর আমাদের ঔপনিবেশিক সম্পত্তির অভ্যন্তরস্থ প্রদেশ-সমূহে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও স্বাভাবিক উপায়েই তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করা উচিত, এই বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। ম্যাডাম পণ্ডিত এবং আপনি ইহা উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদান করিলেও পৃথিবীর অধিকাংশ ঔপনিবেশিক অঞ্চলেই জনপ্রিয় সাধারণতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে না। ইহা কেবল মুষ্টিমেয় কতিপয় প্রতিভাশালী ধনীর রাজত্বই সৃষ্টি করিবে। বিদেশীয় কুশাসন অপেক্ষা দেশীয় কুশাসন অধিকতর শ্লাঘ্য কি না, তাহার উত্তর এখন আমি দিতে পারি না। কিন্তু যখন উপযুক্ত ও সক্ষম বিদেশীয় শাসনের সহিত অপদার্থ দেশীয় মুষ্টিমেয়ের শাসনের তুলনা করা হয়, তখন আমার মনে হয়, সকলেরই বিষয়টি সম্বন্ধে স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

ম্যাডাম পণ্ডিত। একটি সাধারণ নিরাপত্তা পরিকল্পনা (General Security Plan) অনুযায়ী একটি জাতি-গোষ্ঠীর (Family of Nations) সম্ভব আবির্ভাবের কথা আমরা আমেরিকাতে সর্বদাই শুনিতে পাইতেছি। ইহার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও সত্য এবং সদিচ্ছা থাকিয়া থাকে, তবে উক্ত পরিকল্পনায় ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানে বাধা কি?

মিঃ বুথবি। আমি ম্যাডাম পণ্ডিতকে একটি ও মিঃ ল্যাটিমুরকে অপর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। ম্যাডাম পণ্ডিত, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেনের অর্থানুকূল্যে ইংরেজ-শাসিত একটি উপনিবেশ। ইহা নিশ্চয়ই সত্য নহে। ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল এবং ম্যাডাম পণ্ডিত ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট-গুলি ভারতীয়গণ কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে;

ম্যাডাম পণ্ডিত। ভারতবর্ষ আত্মপোষণের সংগে সংগে ইংলণ্ডকেও পোষণ করিয়া থাকে; মুস্কিল এইখানেই।

মিঃ বুথবি। ম্যাডাম পণ্ডিত আমার কথা অস্বীকার করিতেছেন না। সুতরাং ম্যাডাম পণ্ডিতের 'ভারতে জনস্বাস্থ্য বাবত ইংলণ্ড আরও অধিক খরচ করে না কেন' আমার প্রতি এ প্রশ্নের সত্যিকার কোনও যৌক্তিকতা অদ্যকার আলোচনায় নাই, ইহাও স্বীকার করিয়া লইতেছেন। আর মিঃ ল্যাটিমুরকে আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাই—।

ম্যাডাম পণ্ডিত। তামাসা এইখানেই, মিঃ বুথবি কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে টাকাটা আমাদেরই বটে কিন্তু ব্যয়ের কর্তৃত্ব ইংলণ্ডের হাতে। (উল্লাসধ্বনি)।

মিঃ বুথবি। বহু বৎসর যাবৎ রাজস্ব বিভাগ কিন্তু ভারতীয়গণ কর্তৃক সংগঠিত প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টসমূহ দ্বারাই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মিঃ ল্যাটিমুরকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তিনি ভারতীয় জনসাধারণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় জনসাধারণ বলিতে কাহাকে বুঝেন? ১৮ কোটি বর্ণহিন্দু না আট কোটি অস্পৃশ্য, না নয় কোটি মুসলমান? তিনি এবং ম্যাডাম পণ্ডিত জিনিসটাকে কি সত্যিই এত সোজা মনে করেন যে, ভারতের সমগ্র সমস্যাটিকে ভাসাইয়া দিয়া এক সপ্তাহের মধ্যেই তল্পী-তল্পা গুটাইয়া আমরা চলিয়া আসিতে পারি?

মিঃ ল্যাটিমুর। খুব সংক্ষেপে আমি মিঃ বুথবি ও মিঃ ভাণ্ডারকুক উভয়ের প্রশ্নেরই উত্তর দিব। মিঃ ভাণ্ডারকুককে আমার স্বদেশীয় এবং মিঃ বুথবিকে একজন রক্ষণশীল ইংরেজ বলিয়া আমি মনে করি। আমেরিকার বিপ্লবের সময়েও এই একই যুক্তিই দেখান হইয়াছিল যে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী বিবদমান এই তেরটি প্রদেশ যদি ব্রিটেনের কল্যাণকর কর্তৃত্ব হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, তবে ঐসব দেশে অর্বাচীন গুণ্ডা-রাজত্বের সৃষ্টি হইবে।

ম্যাডাম পণ্ডিত। মিঃ বুথবি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষ একটি স্বয়ংশাসিত দেশ। অদ্য অপরাহ্নের সংবাদ হইতে আমি এখানে খানিকটা উল্লেখ করিতে চাই— "অধিকাংশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাই কর্তৃত্ব ত্যাগের নীতির ভয়ানক বিরোধী। এতাবৎকাল তাঁহারা একটি চমৎকার কৌশল শাসন-সৌকার্যার্থে পরিচালনা করিতেন, যাহার মোহ ত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইতেছে এই যে, অসন্তুষ্ট দেশীয় জনসাধারণের মধ্য হইতে একজন সহজবশ্য রাজনীতিককে খুঁজিয়া নিয়া তাহাকে রাজতুল্য প্রভাব ও সমৃদ্ধি প্রদান করা এবং জগৎসমক্ষে তাহাকেই উক্ত জনগণের প্রকৃত নেতা বলিয়া প্রচার করা।"

মিঃ ডেনী। দেখা যাক এবার কতগুলি প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি। আসুন।

জনৈক মহিলা। আপনি কি মনে করেন না মিঃ বুথবি যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় দলের প্রকাশ্য নাৎসী প্রীতি ভবিষ্যৎ শান্তির পক্ষে আশঙ্কাজনক?

মিঃ বুথবি। না, আমি ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, দৃঢ়চেতা ফিল্ড মার্শাল স্মাটসের হাতে উক্ত জনপদ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

মহিলা। ম্যাডাম পণ্ডিত, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিবেন কি যে, ইংলণ্ড আর্থিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের উপর কতটা নির্ভরশীল? ইহা কি সত্য যে, প্রতি পাঁচজন ইংরেজের মধ্যে অন্তত একজনও প্রত্যক্ষভাবে ভারতের অর্থে জীবনধারণ করে?

ম্যাডাম পণ্ডিত। সঠিক সংখ্যাটি বলিতে না পারিলেও ইহা আমি নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইংরেজের নিকট ভারতের মূল্য এত বেশী যে, ভারতবর্ষ হস্তচ্যুত হইলে তাহার সাম্রাজ্যই ধ্বসিয়া পড়িবে। কারণ, তাহার অপর উপনিবেশগুলির বিশেষ কোনও মূল্য নাই। (উল্লাসধ্বনি)।

জনৈক ভদ্রলোক। ভারতের মুসলমানগণ ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। তাহারা সহস্র বৎসর যাবৎ অন্য ধর্মাবলম্বিগণের সংগে একত্র বাস করিয়াছে। তবে ইংরেজগণ শাসন-রশ্মি গ্রহণ করিবার পর আজ কেন তাহারা বিরোধ বাঁধাইতেছে?

মিঃ বুথবি। দেখুন, আমার মনে হয়, এই প্রকার ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাছাড়া, আমি মনে করি না যে, এ বিষয়ে মিঃ জিন্নাও আপনার সহিত একমত হইবেন। মিঃ জিন্না বিশেষরূপে পাকিস্থানেরই দাবী করিয়াছেন। আর এই প্রশ্নের সমাধান কেবল দুইটি লোকের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে; তাঁহাদের একজন মিঃ জিন্না, আর অপরজন হইতেছেন এই সভায় সমাগত বিশিষ্ট মহিলাটির জনৈক আত্মীয়। (উল্লাসধ্বনি)।

ম্যাডাম পণ্ডিত। মিঃ বুথবি বলিতেছেন, মিঃ জিন্না ও আমার জনৈক আত্মীয়ের ঐক্যমত দ্বারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্ভবপর হইতে পারে। আমি আমেরিকার জনগণকে আজ এই কথা বলিতে চাই যে, আমার উল্লিখিত ভ্রাতা এবং মিঃ জিন্না উভয়েই ভারত হইতে ইংরাজ-বহিষ্করণ সম্বন্ধে একমত। (উল্লাসধ্বনি)।

ভদ্রলোক। মিঃ বুথবি, ভারতে ইংরেজ-প্রভুত্বের স্বপক্ষে আপনার নির্দোষ যুক্তি চার্চিল ও অন্যান্যের মানববিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণ্য ভাষণের পর আমেরিকার জনসাধারণ কিভাবে গ্রহণ করিবে?

মিঃ বুথবি। এদেশে আমাদের সম্বন্ধে বহু নিন্দাত্মক সমালোচনা হইয়াছে। তথাপি আমার ধারণা, আমরা এমন অন্যায় কিছু করি নাই। চার্চিল বহু দোষে দোষী হইলেও তাঁহাকে ঘৃণ্য নরদ্বেষী বলিয়া এ পর্যন্ত কেহ দোষারোপ করে নাই। কিন্তু এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমি এ বিষয়ে স্বর্গীয় মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কির মন্তব্য হইতে কিছু উল্লেখ করিতে চাই! তিনি নিজেদের সম্বন্ধে খুব বিরূপ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন "নিগ্রো-দিগকে আমরা পৃথক করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু আমাদের শত্রু নাৎসীদিগের পন্থা হইতে ইহার পার্থক্য এইখানেই যে, আমাদের পন্থা আইনবিগর্হিত; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অধিকার সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।" আমাদের জীবনে সময় সময় এমন মুহূর্ত উপস্থিত হয় যখন অপরের অপেক্ষা নিজের দোষই অধিক বলিয়া মনে হয়। তা যাহাই হউক, আমরা নিশ্চয়ই এই আশা করিতে পারি যে, আপনারা আপনাদের নিজের সমস্যার সমাধান করিবেন।

মহিলা। ম্যাডাম পণ্ডিত, আপনি আপনার সমগ্র কল্পনাশক্তি দ্বারাও আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন কি যে আজিকার বিশ্বময় এই অগ্নিশিখা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল?

ম্যাডাম পণ্ডিত। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাম্রাজ্য-নীতি অনুযায়ী আত্ম-বিস্তারের দুর্দমনীয় প্রলোভনই ইহার কারণ।

মিঃ ডেনী। আসুন বন্ধু জর্জ ফিল্ডিং ইলিয়ট। আপনি এই আলোচনায় যোগ দিবেন কি?

মিঃ ইলিয়ট। শুধু একটি বিষয়ে আমার একটু বলিবার আছে। মিঃ ল্যাটিমুর বলিয়াছেন যে, কোটি কোটি লোক স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। আর ম্যাডাম পণ্ডিত তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—"কিন্তু তাহারা এ্যারোপ্লেনের বিরুদ্ধে যষ্টি দ্বারা যুদ্ধ করিতে পারে না।" আমার মনে হয়, এ বিবরণ সত্য নহে। ম্যাডাম পণ্ডিত উত্তমরূপেই অবগত আছেন যে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যুদ্ধের পূর্বে রাজকীয় বিমান বাহিনীতে মাত্র চার স্কোয়াড্রন এবং এতদ্ব্যতীত ৬০,০০০ ব্রিটিশ সৈন্য ছিল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে তিন লক্ষেরও উপর দেশীয় সৈন্য ছিল এবং সাম্রাজ্য বাহিনীতে ছিল দেড় লক্ষের উপর, এতদ্ব্যতীত ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়েল ফোর্সেও লক্ষাধিক সৈন্য ছিল। আর

সৈন্যগণ সকলেই ছিল ভারতীয় এবং অফিসারগণও অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয়।

ম্যাডাম পণ্ডিত। আমার পূর্বেকার মন্তব্যে একটু ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইল এই যে, ভারতীয় বাহিনী ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অস্ত্র ছিল না।

মিঃ ইলিয়ট। ম্যাডাম পণ্ডিত খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, ইম্পিরিয়েল সার্ভিসের সৈন্যগণ ও ভলান্টিয়ার দলসহ সকলে পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল। ম্যাডাম পণ্ডিত, পরিতাপের বিষয় যে, আপনার এ উক্তিও তথ্যহীন।

ম্যাডাম পণ্ডিত। আমার বন্ধু বোধ হয় জানেন না যে, ভারতীয় সৈন্যগণকে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় না। অধিকাংশ অস্ত্রই ইংরেজের তত্ত্বাবধানে দেরাজে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহা অতি সত্য এবং আজ ভারতবর্ষে যে সকল ইংরেজ কর্তৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারাই ইহার সমর্থন করিবেন।

মিঃ বুথবি। আমার একটি কথা আছে। ইহা সকলেই জানেন যে, মিত্রপক্ষে ভারতীয় সৈন্যগণের ন্যায় অপর কোনও দেশের সৈন্যদলই রণপটুতার পরিচয় দেয় নাই। আমি কখনও শুনি নাই যে, যুদ্ধের পূর্বে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া দেওয়া হইত। (হাস্যধ্বনি)

ম্যাডাম পণ্ডিত। একটি বিষয় আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইহা অস্ত্রসজ্জার প্রশ্ন নহে। সৈন্যদলে ভর্তি হওয়ার সময় ভারতীয়গণকে কোন অস্ত্রই দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা কুচকাওয়াজ (drill) করান হয়। তাহার পর এমন কতকগুলি সর্তে তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয় যে, উহা স্বাধীন-ভাবে ব্যবহার করা কখনও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ যাহাকে ইংরেজেরা সেনাবিদ্রোহ (mutiny) আখ্যা দিয়াছে, তখন হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আর, এখন যদি ভারতীয়েরা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই যে, তাহাদিগকে এমন সকল শ্রেণী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, যাহাদের যুদ্ধই হইল ব্যবসা। তাহারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা ইংরেজের জন্য অথবা বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে না; সামরিক শ্রেণীরূপে তাহাদের গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার জন্যই তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। আজ যদি আমাদের স্বাধীনতা থাকিত মিত্রপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য পৃথিবীকে মুক্ত ও অধিকতর সমৃদ্ধশালী করিবার জন্য আমরা আরও লক্ষ লক্ষ রণনিপুণ যোদ্ধাকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারিতাম। (উল্লাসধ্বনি)

মিঃ বুথবি। ম্যাডাম পণ্ডিতের কথার উত্তরে আমাকে বলিতে হইতেছে, প্রত্যেকেই ইহা জ্ঞাত আছে যে, আমাদের পক্ষের প্রতিটি ভারতীয় যোদ্ধাই স্ব ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

মিঃ ইলিয়ট। মিসেস পণ্ডিতের বক্তৃতাকে এখনও আমি বিদ্রোহাত্মক বলিয়াই মনে করি; তাহার মধ্যে সারাংশ কিছুই নাই। আমি ভারতীয়গণের সঙ্গে একত্র যুদ্ধ করিয়াছি। প্রত্যেকটি ভারতীয় সৈন্যকেই আমি পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত দেখিয়াছি। কাজেই, প্রত্যেক ভারতীয় সৈন্যদলই ইংরেজ অফিসারগণের পূর্ণ কর্তৃত্বে কাজ করে, এ উক্তি সত্য নহে।

ম্যাডাম পণ্ডিত। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এই আলোচনায় কোনও ফল হইবে না। কারণ আমার ধারণা ভারতীয় সৈন্যগণের নিজ নিজ অস্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই। যদি সে কর্তৃত্ব তাহাদের থাকিত তবে ভারতে আজ ইংরেজ বলিতে কেহ অবশিষ্ট থাকিত না। (উল্লাসধ্বনি)

মিঃ ডেনী। দুর্ভাগ্যবশত এ বিতর্কের মীমাংসা করিবার জন্য আজ এখানে কোনও সালিশ উপস্থিত নাই। কাজেই, এ বিষয়ে সত্য আবিষ্কারের ভার আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে। এখন চলুন আমরা একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি। ইত্যবসরে দুইজন বক্তা অদ্যকার আলোচনার সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুতের কাজে মনোনিবেশ করুন।

বিশ্রামান্তে,—

মিঃ বুথবি। এতক্ষণ আমাদের আলোচনা একটি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তন করিয়াছে। আর তাহা হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতি বর্তমান থাকা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত। এক কথায় বলিতে গেলে সমগ্র আলোচনার সারাংশই এই। ধরুন আমরা ভুলই করিয়াছি। কিন্তু কোনও ভুল না করিয়া আজ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি অথবা জাতি কি পৃথিবীতে কোন উল্লেখ-যোগ্য কাজ করিয়াছে? কার্য করিতে করিতেই সমস্যার উত্তম পন্থা আবিষ্কৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্শাল স্মাটস্-এর কথাই ধরুন। কিছুদিন পূর্বেও তিনি আমাদের পরম শত্রু ছিলেন; আর, আজ তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন পরম ভক্ত ও সমর্থক।

আমরা বিশ্বাস করি, ওয়েস্টমিনস্টার বিধি (statute of West Minster) এই উত্তাল, বিক্ষুব্ধ ধরণীর বক্ষে স্বাধীনতার এক মহান স্বীকৃতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে আমরা এক পরম কল্যাণকারী সৃজনীশক্তি-বিশিষ্ট, বিরাট প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করি। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যেও আমরা এমন [illegible] নাই যাহাতে আমাদের সাম্রাজ্যের জাল গুটান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অপর পক্ষে, আমরা বিশ্বাস করি যে, মানবতা ও সংস্কৃতির প্রতি আমাদের বিশ্বস্ত কৃতকার্যতা দ্বারা সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনই আজ সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হইতেছে। ম্যাডাম পণ্ডিত বিকাশ অপেক্ষা বিচ্ছেদেরই অধিকতর পক্ষপাতী। বর্তমানের মৈত্রীকে ধ্বংস না করিয়া আরও নবতর বন্ধন আমরা প্রচলিত করিতে চাই।

মিঃ ল্যাটিমর। উপনিবেশ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রশ্নটি এত সহজ নহে যে, এখানে এক ঘণ্টার আলোচনা দ্বারাই আমরা সমাধান করিয়া ফেলিব। আমেরিকা যদিও সাম্রাজ্যিক ব্যাপার হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে, তথাপি একথা বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকার জনসাধারণ অদ্যকার আলোচনা হইতে এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া (process) সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছে। মানুষের মনস্তত্ত্বের সাময়িক গতি নিরূপণ এবং বিদ্রোহের অপবাদে তাহার চেতনার স্ফুরণকে স্তব্ধ করিয়া তাহার স্বাধীন সত্তাকেও অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করিবার বিপদ কত অধিক তাহাই অদ্যকার বিবেচ্য বিষয়। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, ভারতবর্ষ কেবলমাত্র সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অংশ মাত্র নহে, উক্ত ব্যবস্থার ইহা এক বিশেষ ক্ষেত্র। ভারতের বৈশিষ্ট্যই আজ আপনাদের বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই দেশ সর্বাপেক্ষা উন্নত। আর ইহার পরাধীনতা কায়েম রাখিবার জন্যই আপনারা এই দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। যে কোন শাসন ব্যবস্থা এই প্রকার পরিণতি লাভ করে, তাহাকে খুব প্রকৃতিস্থ বলা চলে না। (উল্লাসধ্বনি)

অনুবাদকঃ শ্রীবিভূতিভূষণ বসু

ব্যবসা বাণিজ্য

বাংলার কৃষি

ডক্টর সুধীর সেন

১৮৯৩ সনের কথা বলছি। ভারত সরকার একজন বিশেষজ্ঞকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন, এখানকার কৃষির অবস্থা তলিয়ে দেখে তার উৎকর্ষ সাধনের পন্থা নির্ণয় করে দিতে। বিজাতীয় হলেও ডাঃ ফোলকার (Dr. Voelcker) নিছক বৈজ্ঞানিকের শুষ্ক দৃষ্টিতেই এদেশকে দেখেন নি। তাঁর বেলা বিজ্ঞানের সঙ্গে মেশানো ছিল দরদ। দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা ও স্থিতিশীল কৃষি—এ দুয়ের অসামঞ্জস্য তাঁকে ভাবিত করেছিল। এ অসামঞ্জস্যের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানেও তা অবান্তর হয় নি। ভারতের জনসংখ্যা অতীতে দ্রুতগতিতে বেড়েছে, ভবিষ্যতেও সে বৃদ্ধি অনিবার্য। সুতরাং আগত ও অনাগত লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনধারণের খাদ্য কোথা থেকে জুটবে, সে এক বিরাট সমস্যা সন্দেহ নেই। চাষীর অবস্থার উন্নতি হয়ত নানাভাবে করা যেতে পারে, কিন্তু ফসল আসে শুধু মাটি থেকে। তাই খাদ্যোৎপাদন বাড়াতে হলে মন দিতে হবে সবার আগে ওই মাটির দিকে। একমাত্র সার প্রয়োগেই তা সম্ভব। সার সরবরাহ জাতির কল্যাণ, এমন কি নিছক জীবনধারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে।

প্রতিকারের কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতের কৃষির উন্নতি নির্ভর করবে সর্বোপরি দুটো জিনিসের উপর—জল আর সার। মাটি থেকে আমরা ফসল নিই, অথচ মাটির উর্বরাশক্তি বাড়ানো দূরে থাক, অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেও আমাদের দৃষ্টি নেই। মাটিকে আমরা কি দিলাম, তারি উপর নির্ভর করে মাটি আমাদের কি দেবে। কি কি সার প্রয়োগ চাষীর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত, তন্ন তন্ন করে তিনি তার সন্ধান করেছিলেন। জ্বালানি কাঠের অভাবে দেশের নানা জায়গায় গোবর ঘুঁটে হিসেবে ব্যবহার করা হয়, কৃষি তাতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কি করে দেশের অরণ্যসম্পদ বাড়ানো যায়, জ্বালানি কাঠ সুলভ হয়, সেদিকে স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। রিপোর্টের এক জায়গায় তিনি বলেছেন—"এই কাঠের ব্যবস্থাই হল বর্তমানে কৃষির উন্নতির সর্বাপেক্ষা বড় উপায়। সব থেকে আগে সব থেকে বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে এখানেই। কারণ তারি থেকে আমি সব চেয়ে বেশি সুফল প্রত্যাশা করি। একবার ভেবে দেখুন—এদেশ শুধু শস্য নয়, সার পর্যন্ত বিদেশে রপ্তানি করে, পুরীষ (night-soil) ব্যবহার করে না, গোবর জমিতে না দিয়ে অনেকাংশে পুড়িয়ে ফেলে। আর এদিকে জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, সুতরাং শস্য সে পরিমাণে না বাড়লে চলবে না। সে শস্যবৃদ্ধির জন্য চাই সবার আগে সার। দেশের এ অবস্থায় সব থেকে বেশি দরকার কাঠের ব্যবস্থা করে গোবরকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সারে পরিণত করে জমিতে দেওয়া।" পুরীষ প্রয়োগের উপর তিনি বিশেষ করে জোর দিয়েছিলেন। জমিকে উর্বরা করবার অতবড় উপাদান বিনামূল্যে পেয়েও শুধু সংস্কারের বশে ভারতবর্ষের চাষীরা তা ব্যবহার করতে নারাজ। সে সংস্কার যেদিন ঘুচবে, সেদিন পৃথিবীর অন্য সব দেশের মত আমাদের দেশেও এ সুলভ অথচ কৃষির পক্ষে মহামূল্য বস্তু সার হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেদিন তাতে করেই কৃষির বহুতর উন্নতি সাধিত হবে।

জলের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—বৃহৎ সেচন-জলাশয় তৈরী, খাল কাটানো, বাঙলাদেশের মত নীচু জায়গায় জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদির দায়িত্ব স্বভাবতই ন্যস্ত হবে সরকারের উপর। তবে পুকুর কাটা, কুয়ো খোঁড়া, বাঁধ দেওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট কাজ চাষীরা নিজেরাই করতে পারে।

ডাঃ ফোলকারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আমাদের লম্বা চওড়া কথা শুনিয়ে যান নি। স্বল্পসম্বল কৃষকের পক্ষে যা সাধ্যাতীত নয় অথচ আশু ফলপ্রদ, তারি প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বিজ্ঞান, বস্তুনিষ্ঠা ও দরদ এই তিনের অনন্যসুলভ সমন্বয় হয়েছিল বলেই তিনি এদেশের সহজ সত্তাকে অত সহজে পেয়েছিলেন

(২)

বর্ষাপতনের পর দুর্ভিক্ষ যখন ভ্রূকুটি করে একেবারে দরজার গোড়ে এসে হাজির, তখন আমাদের প্রথম চেতনা হল, দেশে হয়ত খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। তারপর উৎকট অব্যবস্থায় আরও অনেক মূল্যবান সময় গেল কেটে। দেশে যা রয়েছে তার যথোচিত সংরক্ষণ ও যথাযথ বিতরণের ব্যবস্থা যথাসময় করা হলে দুর্দশা আজ চরম হয়ে উঠত না। যা হোক, আপাতত বক্তব্য এই যে, যে দুর্ভিক্ষ আজ চারদিকে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তাকে যেন শুধু আকস্মিক বলে ভুল না করি। এ বিনামেঘে বজ্রাঘাত নয়। এর সূচনা হয়েছে অনেক কাল থেকে। অতদিন যে মেঘ তিলে তিলে জমে জমে কালো হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের দুর্যোগে হাহাকারের মধ্যে আজ তাই ভেঙে পড়েছে ঝড়ের আকারে।

১৮৯১ সনের আদমসুমারী মতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ছিল ২২ কোটি। আজ তা প্রায় ৪০ কোটির কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। বাঙলাদেশের জনসংখ্যা সে অনুপাতে বাড়ে নি। তা হলেও বৃদ্ধির হার নেহাৎ কম নয়। ১৮৯১ সনে যেখানে ছিল ৪ কোটি, আজ সে জায়গায় বাস করছে ৬ কোটির মত লোক। অথচ যে খাদ্য সমস্যার দিকে ডাঃ ফোলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, গত পঞ্চাশ বছরে তার সমাধানের আমরা কি করেছি? পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশ ও ভারতবর্ষের আরও কয়েকটি অঞ্চলে কৃষির উন্নতি কিছু কিছু হয়েছে সন্দেহ নেই, যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তাকে কিছুতেই যথেষ্ট বলা চলে না। বাঙলাদেশের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নি। অবহেলা ও ঔদাসীন্যে ভারাক্রান্ত হয়ে এখানকার কৃষি অর্ধশতাব্দী ধরে প্রায় একই অবস্থায় অচল হয়ে পড়ে আছে। খাদ্যসামগ্রীর জন্যে আমরা দিন দিন হয়ে উঠছি পরনির্ভরশীল।

এই পরনির্ভরতা কতদূর এগিয়েছে তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে একবার তাকাতে হয় আমাদের বহির্বাণিজ্যের আমদানি-তালিকার দিকে। ১৯৩৮—৩৯ সনে অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধ বাধবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে, বিদেশ থেকে কি পরিমাণ খাদ্যজাতীয় দ্রব্য আমদানি হত, প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত প্রথম তালিকা থেকেই তা পরিস্ফুট হবে।

ভারতবর্ষ চাষবাস নিয়েই থাকুক, কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে শিল্পোন্নত দেশ থেকে শিল্পদ্রব্যের আমদানি করুক, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের রীতি অনুসারে তাতেই তার অর্থনৈতিক কল্যাণ বাড়বে, এমন কথা এক

সময় বেশ ঘন ঘন শোনা যেত। অনেককাল সে যুক্তি দেশীয় শিল্পপ্রসারের পথ রোধ করে রেখেছিল। ক্ষোভের সংগে স্বীকার করতে হবে যে তাতে করে না হল আমাদের শিল্প, না হল আমাদের কৃষি। যে পর-নির্ভরতার তালিকা পরে দিয়েছি, ভারতীয় কৃষির দৈন্য তাতে নগ্ন হয়ে ফুটে উঠেছে। নিজের চেষ্টায় দেশের মাটি থেকে যা পাওয়া উচিত, তার জন্যে উন্মুখ হয়ে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় বাইরের দিকে। কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে এর চেয়ে বিড়ম্বনা, এর মত অকল্যাণ আর কি হতে পারে? নিজের প্রাকৃতিক সম্পদের বলে তালিকায় উল্লিখিত সমস্ত কৃষিজ ও শিল্পজ খাদ্যসামগ্রী ভারতবর্ষ নিজ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাতে পারে। কেবল তাই নয়। এর অধিকাংশ জিনিসই এমন পরিমাণে উৎপন্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, নিজের প্রয়োজন মিটিয়েও যার এক বড় অংশ বিদেশে রপ্তানির জন্য উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। যেখানে উচিত ছিল পরকে জোগানো, সেখানে আমরা হয়ে উঠছি পরমুখাপেক্ষী, পরভৃত। এই কৃত্রিম সৃষ্টিছাড়া পর-নির্ভরতা যে সারাদেশে অলক্ষ্মীরই আসন বিস্তৃত করে দেবে তাতে আর বিচিত্র কি?

(৩)

বাঙলাদেশের বেলা এই পরনির্ভরতা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাঙলাদেশের অংশ হিসেবে প্রথম তালিকায় যা দেখানো হয়েছে তার সবটাই অবশ্য এ প্রদেশে ব্যবহৃত হয়নি। কিছুটা রেলপথে বাঙলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে চলে গেছে। অবশিষ্ট হিসেবে বাঙলায় মোট কি পরিমাণ থাকে অধিকাংশ জিনিসের বেলাই দুঃখের বিষয় তা জানবার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও প্রথম তালিকা থেকে একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে বিদেশ থেকে ভারতে যে সব খাদ্য-দ্রব্যের আমদানি হয়, তার এক অতি বড় অংশ আসে মুখ্যত বাঙলাদেশের বরাদ্দ হিসেবে।

এ তো গেল বিদেশ থেকে আমদানির কথা। তা ছাড়াও বাঙলাদেশকে অত্যাবশ্যক খাদ্যসামগ্রীর জন্যে অনেকখানি নির্ভর করতে হয় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের উপর। ১৯৩৮—৩৯ সনে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রধানত যে সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর আমদানি হয়েছিল, পরিমাণ সমেত প্রবন্ধের শেষে তা তালিকাবদ্ধ করে দেওয়া গেল। (দ্বিতীয় তালিকা দ্রষ্টব্য)

কলকাতার বাজারে গিয়ে সামান্য অনুসন্ধান করলেই দেখা যায় নানাবিধ কাঁচা খাদ্যবস্তুর জন্য বাঙলা দেশকে কি পরিমাণে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সাধারণ অবস্থায় আলু প্রচুর পরিমাণে আসে নৈনিতাল, মহীশূর, আসাম থেকে। প্রসঙ্গ-ক্রমে বলা যেতে পারে যে, বর্মা থেকেও এখানে অপর্যাপ্ত আলু আসত। বর্মা পতনের পর আমাদের চালের বাজারই যে আক্রা হয়েছে তা নয়, আলুর অভাবও গুরুতর হয়ে উঠেছে। কলিকাতা ও বাঙলা দেশের আরো অনেক জায়গায় যে পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয়, তার অধিকাংশ আসে পাটনা, নাসিক, পাণিপথ ও মাদ্রাজের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে। ফরিদপুরের পেঁয়াজে আমাদের কুলোয় না, সে পেঁয়াজ কলকাতায় আসে অতি সামান্য মাত্রায়। একথা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, কলকাতার বাজারে যে নেবু (কাগ্‌জি, ইত্যাদি) পাওয়া যায়; বছরে ন'মাস তা আসে মাদ্রাজ থেকে। মাত্র বর্ষার সময় মাস তিনেক চলে বাঙলার নেবু দিয়ে। ফুলকপি বছরে কয়েকমাস দীর্ঘপথ বেয়ে পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় আসে। টাটকা ফলের তো কথাই নেই। আঙুর আপেল, নাশপাতি, বেদানা ইত্যাদির কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কৃষি বিভাগের বর্তমান অবস্থায় বাঙলার আবহাওয়া এ জাতীয় ফল চাষের পক্ষে সম্ভবত অনুকূল নয়। কিন্তু আমের বেলা সে কথা খাটে না। বাঙলা দেশের বহু স্থলে উৎকৃষ্ট আমের চাষ প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে। তেমনি কমলা নেবুর চাষও একমাত্র দার্জিলিং অঞ্চলেই আবদ্ধ না থেকে আরো অনেক ব্যাপক হতে পারে। মাদ্রাজ এসব ব্যাপারে আমাদের থেকে অনেক বেশি প্রগতিশীল। কলকাতার বাজারে দেখা যায় ইদানীং মাদ্রাজ থেকে আমের আমদানি অনেক বেড়েছে। কমলা নেবুও ওখান থেকে কিছু কিছু আসছে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এসব অঞ্চলে কমলা নেবুর চাষ দ্রুত বাড়ছে। দৃষ্টান্ত আর বাড়াবার প্রয়োজন আছে মনে করি না। আসল কথা অতি সোজা। আমাদের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব মেটাই অনেকটা বাইরের মাল দিয়ে। কিছুদিন হল বে-সামরিক জন-সাধারণের খাদ্য সরবরাহের জন্যে বাঙলা সরকারের এক নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তব্য হল ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে চাল, ডাল, আটা, চিনি, সরষে, তেল নুন ইত্যাদি আমদানির ব্যবস্থা করা। আমাদের দাবী যে অন্যান্য প্রদেশ খুব প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করেছে বা আমাদের দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে তাদের ভাণ্ডার অবারিত করে দিচ্ছে, সে কথা বলা চলে না। বরঞ্চ আমাদের তাগিদ বেশি বলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনিসের দাম যায় চড়ে। বাঙলার এই সরকারী বিভাগ হল বাঙালীর পরমুখাপেক্ষিতার প্রতিমূর্তিস্বরূপ। বাঙলার মত কৃষির দৈন্য ইতিপূর্বে আর কোথাও এইরকম উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। বোম্বাই ছাড়া ভারতের আর কোনো প্রদেশ খাদ্য সরবরাহের জন্য এভাবে পরাধীন নয়। বোম্বাইএর পক্ষে এ পরাধীনতা দুটো কারণে হয়ত মার্জনীয়। সেখানকার মাটি তেমন উর্বর নয়, চাষের জন্য জলের ব্যবস্থা করাও কঠিন। তাছাড়া বোম্বাই শিল্পের দিক দিয়ে

ভারতের অন্যান্য প্রদেশকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। বৃহত্তর ক্রয় ক্ষমতার জন্যে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি করা তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ।

অনেকে আমাদের এই পরনির্ভরতার মধ্যে দুর্ভাবনার কোনো কারণ দেখেন না। বরঞ্চ অর্থনৈতিক নিয়মানুসারে ঘটেছে বলে তাকে বাঞ্ছনীয় বলেই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। পণ্য বিনিময়ে উভয় পক্ষেরই লাভ, এটা অর্থনীতির একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। বাঙলাদেশ পাট বেচে, বদলে অন্য জিনিস কেনে, তাতে ভাবিত হবার কি আছে? বলা বাহুল্য, আমি প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ওকালতি করছিনে। কিন্তু একথা মানতে রাজি নই যে, যে কোনো বিনিময়ই মানুষের পক্ষে লাভজনক। আকাশ থেকে সে যখন মাটিতে পড়ে তখন তা মাটির উচ্চতা নীচতা অনুসারেই নানাদিকে গড়িয়ে যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটলেও বর্ষার জলের এই স্বাভাবিক গতিই কৃষির পক্ষে আদর্শ নয়। যেখানে মানুষ স্বহস্তে স্বচেষ্টায় প্রকৃতির এ দানকে শস্যক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ করে দেয় সেখানেই কৃষি সমৃদ্ধ হয়; মানুষের সম্পদ বাড়ে। অর্থনৈতিক জগতেও স্বতঃনিয়ন্ত্রণই শেষ কথা নয়। আমাদের পণ্য বিনিময়ের পেছনে যত বড় অর্থনৈতিক নিয়মই থাকুক না কেন, তা যে আসলে আমাদের জড়তাপ্রসূত সে কথা মানতেই হবে। যে শ্রমবিমুখতা আজ দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কবল থেকে যেদিন মুক্তিলাভ করব সেদিন আমাদের সম্পদ বহুগুণে বাড়বে, সেদিন পণ্যবিনিময়ের রূপান্তর ঘটবে, আজিকার পরনির্ভরতা ধিক্কৃত হবে। সেদিনই বিনিময় সার্থক হবে, কারণ তা ধনাগমের পথ খুলে দেবে, দারিদ্র্যকে ডেকে এনে চিরস্থায়ী করে রাখবে না। এখনকার পর-নির্ভরতাকে অর্থনীতির নজির দেখিয়ে সমর্থন করা মরণোন্মুখের মতিভ্রম মাত্র। এ যুক্তি জড়ত্বের নজির মাত্র দেউলিয়া হবার যুক্তি। একে অর্থনীতি বলব না, এ হল অনর্থনীতি।

৪

বাঙলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত সংখ্যা নিখুঁৎ নয় একথা সবাই জানেন। কৃষি বিভাগের সংখ্যার উপর নানা কারণে আস্থা স্থাপন করা কঠিন। তবু তার অসম্পূর্ণতা যত বড়ই হোক না কেন, বাঙলা দেশের কৃষির আসলস্বরূপ তাতেই ধরা পড়ে।

আমাদের মোট চাষের জমি হল আট কোটি বিঘার মত। "সাবেক পতিত" ও "ফসল পতিত" জমির পরিমাণ সাধারণত দেখানো হয় তিন কোটি বিঘার উপর। এ সংখ্যাতে ভুলের একটা মোটা অংশ রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আপাতত তাকে আর বিশ্লেষণ করতে চাই নে।

আমাদের কৃষি সম্বন্ধে প্রথম কথা হল এই যে, মাত্র দেড় কোটি বিঘাতে অর্থাৎ মোট চাষের জমির মাত্র তিন আনা অংশে আমরা একাধিক ফসল পাই। বাঙলার মত উর্বর দেশের পক্ষে দো-ফসলী জমির পরিমাণ যে নগণ্য, তা স্বীকার করতেই হবে। অধিকাংশ জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের পক্ষে আজ যে সমস্ত বিঘ্ন রয়েছে, তার কোনটাই অলংঘ্য নয়। সে বিঘ্ন দূর করার জন্যেই আজ সর্বাগ্রে আমাদের তৎপর হতে হবে। কি করে তিন আনার স্থলে অন্তত আট আনা, দশ আনা, বারো আনা জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন হতে পারে সে কথা ভাবতে হবে। যদি অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হয়, তবে তারি কল্যাণে বাঙলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে, অভাবের স্থানে প্রাচুর্য দেখা দিবে, বাঙলা কৃষি সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

মোট জমির বারো আনা অংশেই আপাতত হয় ধান চাষ। পাট চাষে ইদানীং যাচ্ছে এক আনা থেকে ছ'পয়সার মত। আর বাকি দু'তিন আনায় হয় রবি চাষ যথা গম, বার্লি, ভুট্টা, ছোলা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, আলু ও অন্যান্য তরিতরকারী, ফলমূল, সরষে, আখ, তামাক ইত্যাদি।

বিস্ময়ের কথা এই যে, অত জমিতে ধান চাষ করেও আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারিনে, ফাঁক থেকে যায়। বর্মা থেকে চাল টেনে এনে তা পূরণ করতে হয়। এর কারণ হল বিঘা পিছু আমাদের ফলন অত্যন্ত কম, মাত্র ৪ মণের মত। স্পেনের ফলন সাড়ে চার গুণ বেশি, ইতালীর ফলন সাড়ে তিন গুণ। তবে এ দু'দেশে সামান্য জমিতেই ধান চাষ হয়, সুতরাং বিঘা পিছু যত্ন ও খরচ ঢের বেশি করা হয়। শুনতে পাই বিশ বছর আগে নাকি অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ধান চাষের প্রবর্তন হয়। এতদিনে ধান চাষ সেখানে অনেকটা প্রসার লাভ করেছে এবং একর পিছু ফলন হয় প্রায় স্পেনের মতই। অস্ট্রেলিয়ার কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু চীন জাপানের সংগে তো আমাদের অবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সে দুদেশেও জনসংখ্যা বৃহৎ, মাথাপিছু জমির পরিমাণ সামান্য, ছোট ছোট টুকরো টুকরো জমিতেই চাষবাস হয়। তবু প্রতি একরে জাপান আমাদের তিনগুণ, চীন দ্বিগুণ ধান জন্মায়। অথচ বাঙলা দেশের জমির উর্বরতা বেশি, জলের অভাব নেই, সাধারণ আবহাওয়াও ধান-চাষের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল। এ অবস্থায় স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের ফলনও অন্তত চীনদেশের ফলনের সমান হতে পারে। জাপানে কৃষকের চেষ্টার সংগে যেভাবে সরকারী চেষ্টার সংযোগ হয়েছে আমাদের দেশে ভাগ্য-ক্রমে যদি কোনোদিন তা ঘটে তবে আমাদের ফলনও তিনগুণ চারগুণ বাড়তে পারে। শুধু অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির দৌরাত্ম্য থেকে ফসলকে অনেকটা রক্ষা করতে পারলে এবং ডাঃ ফোলকারের ব্যবস্থাপত্র মত আয়ত্তাধীন সকল-প্রকার সার সযত্নে প্রয়োগ করলেই ফলন দ্বিগুণ হবে বলে বিশ্বাস করি।

সে অবস্থায় বাঙালীকে চালের জন্য বাইরের দিকে তাকাতে হবে না। কেবল তাই নয়। ছ'কোটি বিঘার স্থলে তিন কি সাড়ে তিন কোটি বিঘা থেকেই বাঙালীর প্রয়োজন মেটাবার মত চাল উৎপন্ন হবে। আড়াই কি তিন কোটি বিঘা তখন অন্য ফসল জন্মান সম্ভব হবে।

বাঙলার কৃষিতে ধান ও পাটের এতখানি প্রাধান্য কল্যাণকর হয়েছে কিছুতেই বলতে পারিনে। ১৯২৯ সনের পর ব্যবসাবাণিজ্য যখন সারা দুনিয়ায় অচল হয়ে পড়েছিল, তখন ধান ও পাটের দাম নেবে গিয়েছিল অতি নিম্নস্তরে। ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা যখন ফিরল তখনো তার সংগে তাল রেখে সে দাম অনেক বছর পর্যন্ত উপরে উঠতে পারেনি। বর্মায় প্রচুর চাল মজুত থাকায় ও বিচ্ছেদের পরও ভারতের সংগে তার অবাধ বাণিজ্য বহাল থাকায় বর্মা এখানকার চালের বাজারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সস্তা বর্মা চালের প্রতিযোগিতায় এখানকার বাজার ছিল দীর্ঘকাল মন্দা। তখন বছরের পর বছর ধান বিক্রী করে চাষী মণ পিছু পেয়েছে মাত্র দেড় থেকে দু'টাকা।

পাটের আধুনিক ইতিহাস অনেকটা একই রকম। শিথিল ব্যবসার দিনে চাহিদা দ্রুত সংকুচিত হল, তা সত্ত্বেও পাট চাষ সহজে কমতে চায়নি। তার কারণ হল দুটো। প্রথমত, বাঙলার বহু জায়গায় আজ জন্মান হয় ধান নয় পাট। চালের দাম বর্মার দৌলতে অত পড়ে গিয়েছিল যে পাঁচ টাকা মণ পাটের বাজার সত্ত্বেও চাষীর পক্ষে পাটচাষই ধানচাষের চেয়ে বেশি লাভজনক ছিল। দ্বিতীয়ত, ফটকা বাজারের মনোবৃত্তির ছোঁয়াচ চাষীদেরও কিঞ্চিৎ লেগেছে, তা অস্বীকার করা যায় না। যদি আবার কোনো সময় ভাগ্যচক্রের অনুকূল আবর্তনে পাটের দাম ধাঁ ধাঁ করে উঠে যায়, সে সম্ভাবনার প্রলোভন চাষীর মন থেকে সহজে যায়নি। কিছু দিন চলেছিল স্বেচ্ছায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা। কিন্তু তা সফল হয়নি। তার বড় কারণ এই যে, পাট-জমিতে পাট থেকে লাভজনক কি ফসল আবাদ করা যায়। তা নিয়ে সরকারী বা বে-সরকারী মহলে কেউ তেমন করে ভাবেননি ও চাষীকে গ্রহণযোগ্য কোনো ফসল পাটের উপযুক্ত বদলিস্বরূপ বাৎলিয়ে দেননি।

গত যুদ্ধের চাহিদা ও লোভনীয় মূল্যের কথা স্মরণ করে যুদ্ধলাগার পর এবারও চাষীরা প্রচুর জমিতে পাট চাষ করেছিল। ফলে ১৯৪০ সনে অপর্যাপ্ত পাট এসে বাজারকে দিল ভারাক্রান্ত করে। উৎপাদন বা চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যে আইন করে প্রথম পাট চাষের নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হল। এবার চালের দাম উঠেছে আকাশে, বহুকাল পর পাট চাষের থেকে ধান চাষ অধিকতর লাভজনক হয়ে উঠেছে। আট আনা জমিতে পাটচাষের অনুমতি পেয়েও চাষী পাটচাষকে আরো সংক্ষিপ্ত করে ধানই বেশি করে জন্মিয়েছে। এবারকার বাজারে পাটের দাম ত্রিশ চল্লিশ টাকায় ওঠায় বিশেষ

সম্ভাবনা ছিল। ঠিক সে সময় আমেরিকা থেকে এল ৭০ কোটি গজ চটের অর্ডার। সে অর্ডারে চটের দাম খুশিমত কম ধরা হয়েছে বলে এখানকার পাটকলের মালিকেরা মিলে পাটের দাম দিয়েছেন বেঁধে। আঠারো টাকা হল সর্বোৎকৃষ্ট পাটের সর্বোচ্চ মূল্য। দুর্দিনে উৎপাদনের বাহুল্যে দাম যখন নীচে নেবে যায়, তখন তার প্রতিকারের কথা তেমনভাবে ওঠে না। আর এ বছর অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দাম যখন উপরের দিকে উঠছিল তখন তাকে জোর করে দাবিয়ে রাখা হল। শক্তিশালী ষড়যন্ত্র পাটকলওয়ালাদের সম্মুখীন হয়ে বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্বল, নিরুপায় চাষী এভাবে বারবার নিজ প্রাপ্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ এই দুর্বল চাষীদের একত্র করে পাটকলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবার কথা আজ কল্পনা করতে পারিনে। পরিত্রাণের পথ সেদিকে নয়। পরিত্রাণের আসল উপায় হল পাটচাষের অপরিহার্যতাকে দূর করা।

একদিকে গম আটা ডাল সরষে তেল ঘি ফল আলু তরিতরকারী ইত্যাদি আসছে বাইরে থেকে বহু শত মাইল বেয়ে, তার জন্যে আমাদের দিতে হচ্ছে পুরো দাম বা তারো বেশি। আরেক-দিকে কখনো বর্ষা কখনো পাটকলের মালিকদের কল্যাণে আমাদের চাষীর ভাগ্যে তার দুটো প্রধান ফসলেরই উচিত মূল্য জুটছে না। এরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থা দেশের কৃষি বা অর্থনীতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। পাট ও ধানের উপর নির্ভর অমন একান্ত বলেই আমাদের চাষী অমন নিরুপায়, তাকে অমন পদে পদে ঠকতে হয়।

তাই বাঙলার কৃষিকে যেমন করেই হোক আরো অনেক বিচিত্র করে তুলতে হবে। একই জমি থেকে প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন এক জিনিসের বাজার মন্দা হলে অন্য জিনিসের চাষ সম্ভব হয়। তা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জমিতে এমনভাবে ফসল বোনা সম্ভব হবে যাতে করে জমির উর্বরাশক্তিও অনেকটা সংরক্ষিত ও বর্ধিত হয়। তা ছাড়া বৈচিত্র্য এনে দিলে চাষী আর পাটচাষের অধীন থাকবে না, পাট-চাষই তার অধীন হবে। পাটের বাজার দাম লাভজনক না হলে চাষী পাট কমিয়ে অন্য ফসল বুনবে। সেদিনই শুধু পাটকলের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে, চাষীর কাছে তাকে হার মানতে হবে। সেদিন কলের মালিক নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে উচিত মূল্য দিতে প্রস্তুত হবে। বহু অর্থব্যয়ে বহু কর্মচারী নিযুক্ত করে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা এখন চলেছে, সেদিন তা বাহুল্য বলে প্রমাণিত হবে।

দো-ফসলী জমির পরিমাণ বাড়ালে ও ধানের ফলন দ্বিগুণ হলে অন্যান্য একান্ত আবশ্যক খাদ্য সামগ্রীর চাষ বাড়ানো সহজেই সম্ভব হবে। গমের চাষ বাঙলা-দেশে আরো অনেক বাড়া উচিত। মুসুর ছোলা অড়হর, মুগ, কলাই খেসারির জন্য অন্তত আধ কোটি বিঘা জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা দরকার। আলুর চাষ বর্তমানে যথেষ্ট নয়, তার জন্যে মোট জমি বাড়ানো কঠিন নয়। সরষের ফলন বাঙলা দেশের চাহিদার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সমান। জমি বাড়িয়ে মোট ফলন তিন চার গুণ বাড়ানো অসম্ভব মনে করিনে। তা ছাড়া নানাবিধ ফলমূল তরীতরকারী চাষের দিকে বাঙালীকে আরো অনেক মনোযোগী হতে হবে। হর্টিকালচারে আমরা আজ অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি, এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায়ও। ফল চাষ বলে কিছু বাঙলা দেশে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অযত্ন অবহেলায় আমাদের ফল গাছ বড় হয় প্রায় বুনো গাছের মতন। তরী-তরকারী চাষে, বিশেষ করে শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে, ইদানীং অনেকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখনো তাকে যথেষ্ট মনে করার সময় হয়নি। গ্রামে চাষীরা নিজের বাসগৃহের সংলগ্ন জমিতে নেবু, পেঁপে, কুল ইত্যাদির চাষ অনায়াসেই বাড়াতে পারে, তরীতরকারীও অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হতে পারে। আমাদের অভাবগ্রস্ত চাষীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

গোচর ভূমির অভাব বাঙলা দেশে খুব বেশী সন্দেহ নেই। গরু মোষের খাদ্য-হিসেবে নানাপ্রকার সবুজ ঘাসের চাষ কৃষি প্রধান সকল দেশেই হয়ে থাকে। ভারতের নানা অঞ্চলে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে, কৃষির অঙ্গ হিসেবে তা প্রাধান্য লাভ করেছে। বাঙলা দেশে তার সম্ভাবনা কতখানি তলিয়ে দেখতে হবে। এভাবে এখনকার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে কৃষিকে মুক্তি দিতে পারলেই তা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আজিকার দুর্দিনে বাঙলা দেশকে সর্বোপরি এই কথাই মনে রাখতে হবে।

(৫)

একদিকে যেমন ধানপাটের একাধিপত্য বাঙলার কৃষিকে দুর্বল করেছে আর এক-দিকে তেমনি কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরতাকে খর্ব করে রেখেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেই শক্তি ও মুক্তি—শুধু কৃষি নয়, সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের বেলাই তা প্রযোজ্য। সত্যিকার প্রগতি বহুমুখী। জীবনের এক অংশকে একান্ত করে তুললে প্রগতি সহজেই সীমাবদ্ধ হয়। কেবল কৃষিকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে কৃষির উন্নতি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। এ জাতীয় "কৈবল্য" অর্থনৈতিক জীবনে শুধু বৈকল্যকেই ডেকে আনে।

বিদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই শিক্ষা, শিল্প ও কৃষির উন্নতি ও প্রসার একই সময় পাশাপাশি চলেছে। জার্মানীতে আধুনিক শিল্প অতি দ্রুত-গতিতে গড়ে উঠতে থাকে ১৮৭০ সালের পর। সে সময়ই কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিকার্যে সব থেকে বেশি উন্নতি দেখা দেয়। জাপানেও আধুনিক সভ্যতার বহুবিধ উপকরণ যে যুগে গড়ে উঠেছে, ঠিক সে সময়েই কৃষি তার মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার বন্ধন কাটিয়ে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার কৃষিতে গত বিশ বৎসরে বিপ্লব ঘটেছে। শিক্ষা বিস্তার, কল-কারখানা, পথঘাট, রেলওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি নানাদিক দিয়ে রাশিয়ার উন্নতি এ সময় কত সুদূরপ্রসারী হয়েছে গত দু বছরের যুদ্ধে তার প্রমাণ পেয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। এই সমকালীনত্ব আকস্মিক নয়। শিক্ষা, শিল্প, কৃষি এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, নিবিড় কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। একের উন্নতি অন্যের উন্নতির অপেক্ষা রাখে। আমাদেরও আজ সেকথা মনে রাখতে হবে।

অজ্ঞতা যেখানে ব্যাপক চিত্তবৃত্তি যেখানে নিশ্চেষ্ট, কর্মোদ্যম সেখানে জাগতে পারে না। দেশব্যাপী নিরক্ষরতা তাই আজ আমাদের উন্নতির প্রধানতম অন্তরায়, কি কৃষিতে, কি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে।

শিল্পের উদ্ভবে কৃষি লাভবান্ হয় দুদিক থেকে। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা মালের চাহিদা বাড়ে। বিক্রয়ের জন্য চাষীকে দূরদেশের উপর নির্ভর করে থাকতে হয় না। ঘরের কাছেই নূতন বাজার গড়ে ওঠে। বাজারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে তার দৃষ্টি নানাদিক দিয়ে খুলে যায়। উৎপাদন সম্বন্ধেও সে অধিকতর মনোযোগী হয়। দ্বিতীয় উন্নতির কারণ পরোক্ষ হলেও তার সম্ভাবনা আরো সুদূরপ্রসারী। শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নূতন নূতন সহর। ধনোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সহরবাসীর ক্রয়ক্ষমতা ও তার ফলে কৃষিজাত নানাবিধ দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। দুধ, মাছ, মাংস, তরীতরকারী, ফলমূল ইত্যাদি সরবরাহের ভার প্রধানত ন্যস্ত হয় চারি-দিকের গ্রামাঞ্চলের উপর। কৃষি তাতে করে বিচিত্র হয়ে ওঠে। তাছাড়া সহর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার যেসব উপকরণ গড়ে ওঠে গ্রামও তার থেকে বঞ্চিত হয় না। চারিদিকের রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও সুগম হয়, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, চিকিৎসার ব্যবস্থা বহুদূরে পর্যন্ত গ্রামের দিকে প্রসারিত হয়। শহর ও গ্রামের মধ্যে যে কেবল পণ্য চলাচলই সহজ হয় তা নয়, নূতন ভাব নূতন ধারণা গ্রামে প্রবেশ করে, আধুনিকতার স্পর্শে সেখানে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়।

বাংলাদেশের শিল্প-সম্পদ একে তো অকিঞ্চিৎকর। তার উপর কল-কারখানা এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায় ও তার আশে-পাশে। ফলে কলকাতা বিশাল হতে বিশালতর হতে চলেছে। রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে দেখা যায় জনতা কেমন করে জনতাকে আকর্ষণ করে। ভিড়েই ভিড় বাড়ে। কলকাতার বেলা ঘটেছে ঠিক তাই। এখানে শিল্প রয়েছে বলেই আরো শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। লোক বাড়ছে তাই স্কুল-কলেজ বিশেষ করে এখানেই গড়ে উঠছে। এমন কি প্রসার প্রতিপত্তির আশায় চিকিৎসকবৃন্দও এখানে এসেই সমবেত হচ্ছেন আর পরস্পর প্রতিযোগিতায়, কখনো বা সঙ্ঘবদ্ধতায়, চিকিৎসাকে ব্যবসায়ে পরিণত করে তুলছেন। আমাদের নাগরিক জীবনে কলকাতার একাধিপত্যকে মঙ্গল-সূচক বলে মনে করতে পারিনে। কারণ তাতে করে সহর ও গ্রামের প্রভেদ না কমে দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে আরো যেসব সহর রয়েছে, দু'চারটি বাদ দিলে বাকি সবই গড়ে উঠেছে শাসনকেন্দ্র হিসেবে। এ জাতীয় সহর সৃষ্টিতে দেশ তেমন লাভবান হতে পারে না। কারণ এখানে ধনবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা নেই। শিল্পই হলো আধুনিক যুগে সহরের প্রাণ। শুধু শিল্পকেন্দ্রিক সহরই কৃষিকে ও সমগ্র দেশকে নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে।

অনেক সময়ই ভেবেছি যদি ক্ষমতা থাকত তবে শিল্পসমেত এই কলকাতা-হাওড়াকে বিশ-পঁচিশ খণ্ড করে সতীদেহের মত ছড়িয়ে দিতাম বাংলাদেশের পূবে পশ্চিমে, উত্তরে। তাহলে কলকাতার দুঃসহ ঠেলা-ঠেলি কমে যেত। খাদ্যদ্রব্য অতটা পথ বেয়ে এই পরিমাণে এক জায়গায় এসে জড় হত না। দুধ এখানে বিলাসিতার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াত না। ভেজালের অত্যাচারে জীবন অতখানি দুর্বহ হয়ে উঠত না। প্রতি কাঠা জমির দাম দু'হাজার পাঁচ হাজার হত না। ইঁট-পাটকেলের দৌরাত্ম্য কমত, প্রত্যেক বাসগৃহের সঙ্গে খানিকটা জমি ও সবুজের স্পর্শ রাখা সম্ভব হত, আলো-হাওয়া আরো বিশুদ্ধ নির্মল থাকত, মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। আর দেশের অন্যান্য জায়গায় সহর সৃষ্টির ফলে গ্রাম ও কৃষি নানা দিক দিয়ে উন্নত হত। বিভিন্ন সহরের মধ্যে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তাও তখন ঢের বাড়ত, রাস্তা-ঘাট রেলওয়ের উন্নতির দিকে আরো বেশি করে মন যেত। জীবন নানা দিক দিয়ে সুন্দর হয়ে উঠত, আনন্দ বাড়ত।

বলছিলাম, যে শিল্প দেশে আপাতত রয়েছে, তা কেন্দ্রীভূত না হয়ে আরো ছড়িয়ে পড়লে আমাদের পক্ষে মঙ্গল হত। অবশ্য আরো এর চেয়ে বড় কথা হল, দেশের নানা স্থানে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। তাহলে জামসেদপুরে, বার্ণপুরে ইত্যাদির মত নূতন নূতন সহর গড়ে উঠবে। দেশে প্রগতির পথ নানা দিক দিয়ে খুলে যাবে।

গুরুত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিক্ষা ও শিল্পের পরই মনে আসে বাংলাদেশের নদ-নদীর কথা। বাংলাদেশের এই শিরায়-উপশিরায় প্রবাহ যতদিন অব্যাহত ছিল, ততদিন দেশের মাটি সতেজ ও উর্বর ছিল, জল পথে বহুদূরে পর্যন্ত বহু যাত্রী ও পণ্যের চলাচল সম্ভব হত। ভারত সরকারের রেলওয়ে নীতি যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, একথা সবারই জানা আছে। আমাদের নদ-নদীর প্রতি সৎমায়ের মত ব্যবহারের বিরুদ্ধে স্বর্গীয় রমেশ দত্ত মশাই একদিন প্রতিবাদ করেছিলেন, যদিও তা ফলপ্রসূ হয়নি। রেলের পুলে বাধা পেয়ে পেয়ে নদী গেছে নিস্তেজ হয়ে। জল পথে চলাচল প্রায় স্থগিত হয়ে এসেছে। বহু জায়গায় নিরুদ্ধ জল হয়ে উঠেছে ম্যালেরিয়ার আকর বিস্তৃত চাষের জমি বিরাজ করছে কচুরীপানার আশ্রয়স্থলরূপে। তা ছাড়া শীতের দিনে যে নদীকে আমরা শুকিয়ে মারি তারাই বর্ষার দিনে বিরাট প্রতিশোধের মত এসে ক্রুদ্ধ গর্জনে ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের আবাসগৃহ আর ক্ষুধার অন্ন। নদ-নদীর প্রতি এই শতাব্দীব্যাপী অবহেলা দেশের পক্ষে কত বড় অনর্থ, বাংলার কৃষির পক্ষে

কি প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

অনেক বছর ধরে বাংলাদেশে নদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এক প্রস্তাবের কথা শুনে আসছিলাম। বহুকাল প্রতীক্ষার পর সে প্রস্তাব ইদানীং কার্যে পরিণত হয়েছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই নদী বিজ্ঞান-কেন্দ্র দিন দিন নূতন বললাভ করুক, যে প্লাবন ও জলকষ্ট নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে তার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করুক, অন্ততঃ এই আমাদের কাতর প্রার্থনা। বাংলার নদীস্রোতকে যেদিন আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব, বর্ষার বিরাট জলের এক অংশ যেদিন পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে ধরে রেখে নীরস কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে চালান দিতে পারব আর অবশিষ্ট জলের গন্তব্যস্থানে যাবার পথ গভীর ও সুগম করে রাখতে পারব সেদিন বাংলার কৃষির পক্ষে আজ যা বৃহত্তম অন্তরায়, তাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় হয়ে উঠবে, সেদিন বাঙলার চাষী অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির উপদ্রব থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করে আশা ও উদ্যম নিয়ে কৃষি কার্যে তৎপর হলে। দেশমাতৃকার বন্দনা গানে বঙ্কিমচন্দ্র যতগুলো বিশেষণ প্রয়োগ করে গেছেন সেদিন একই কালে নূতন করে তারা সত্য হয়ে উঠবে।

শিক্ষা ও শিল্প বিস্তার, নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচন জলাশয় ও খাল নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট রেলপথ তৈরী, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি যেমন একদিকে অত্যাবশ্যক, তেমনি সুবৃহৎ ও ব্যয়সাধ্য বলে ব্যক্তিগত বা দলগত চেষ্টা এসব ক্ষেত্রে বেশীদূর এগোতে পারে না। তাদের ভার স্বভাবতই ন্যস্ত হয় সরকারের উপর।

গঠনমূলক কার্যের আরম্ভ যতই পিছিয়ে পড়ছে আমাদের সমস্যাও ততই সমাধানের বাইরে চলে যাচ্ছে। ধনবৃদ্ধির আয়োজন নেই, অথচ জনসংখ্যা এক বাংলাদেশেই প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ করে বেড়ে চলেছে। দেশের এ অর্থনৈতিক স্থবিরত্ব দারিদ্র্যকে বছরের পর বছর নিদারুণ করে তুলছে। কেউ কেউ উপদেশ দেন, দারিদ্র্য দূর করতে হলে সবার আগে জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি রোধ কর। কিন্তু শুধু হুকুমেই ত সংখ্যা সঙ্কুচিত হয় না। নানা দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দারিদ্র্য যেখানে প্রবল, জন্মসংখ্যা, শিশুমৃত্যু ইত্যাদিও সাধারণত সেখানেই অত্যধিক। একমাত্র শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মসংখ্যা কমে আসে। তাই আর্থিক উন্নতির জন্যে জনন-নিয়ন্ত্রণের কথা তোলা বর্তমানে একপ্রকার অর্থহীন। আগে উন্নতি হোক, জন্মসংখ্যা তখন স্বতই অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে।

মানুষ যে হারে বাড়ছে নূতন খাদ্য সে হারে বাড়ছে না দেখে ম্যালথাস একদিন আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন। এ অসামঞ্জস্য অধিক দূর অগ্রসর হলে রোগ, অনশন, যুদ্ধ-বিগ্রহ অনিবার্যরূপে এসে জনসংখ্যার টুঁটি চেপে ধরবে।, তাকে এমন ভাবে দাবিয়ে দেবে যেন খাদ্যকে তা বেশী দূর ছাড়িয়ে না যায়। ইউরোপে বিজ্ঞান ম্যালথাসের উপর জয়ী হয়েছে। সেখানকার জনসংখ্যা যেমন বিশাল হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানের কল্যাণে ধনোৎপাদনও তেমনি বহুগুণ বেড়েছে। এদেশের বেলাই কি কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানের অসহযোগ চিরন্তন হয়ে থাকবে? দুঃখ-শোকের মধ্যে ম্যালথাসের আশঙ্কাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে?

(৬)

এতক্ষণ যা বলেছি তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, বহুবার বলা কথারই প্রতিধ্বনি করেছি মাত্র। কোনো নূতন গবেষণামূলক তথ্যের নির্দেশ দেবার দুঃসাহস আমার নেই। আর সত্য বলতে কি, নূতন কথার বাকিই বা কি আছে? দেশের ও বিদেশের পণ্ডিতেরা মিলে প্রায় সবই তো বলে গেছেন। বার বার সমারোহ সহকারে রোগ নির্ণয় হয়েছে। বিজ্ঞতম চিকিৎসকরা মিলে

আধুনিকতম ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। ব্যাধি এই যে দিন দিন মারাত্মক হয়ে উঠছে, তার কারণ রোগ নির্ণয় বা ব্যবস্থাপত্রের ত্রুটি নয়। তার আসল কারণ এই যে, চিকিৎসার যেখানে আরম্ভ, আমাদের বেলা দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেখানেই তার শেষ। আমাদের বাক্য-বহুল উদ্যোগ পর্বের কোথাও যেন আর অন্ত নেই। ডাঙায় সাঁতার কেটে কেটে আমরা হয়রাণ হয়ে গেলাম, এদিকে কর্মের সমুদ্র থাকল সামনে পড়ে। লব্ধ জ্ঞান মস্তক আর পুস্তককে ভারাক্রান্ত করে রাখল, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফল হবার সুযোগ পেল না।

যেখানেই প্রাণ আছে, দৃষ্টি সেখানে আপনা থেকেই খুলে যায়। দেশের কল্যাণের জন্য কি কি গঠনমূলক কার্যের অনুষ্ঠান করতে হবে, তার জন্যে আকাশ-পাতাল হাতড়িয়ে বেড়াতে হয় না। স্থূল দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানেই জ্ঞান নিয়ে ভাণ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। সেখানেই হাতী দেখবার জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সেখানেই কমিশন বসে, অনশন থামে না।

এই দেশজোড়া নির্মম ভাণের অবসান কবে হবে, কবে কোন্ শুভক্ষণে শাসনতন্ত্রে নূতন প্রাণস্পন্দন দেখা দিবে, বহু বিলম্বিত জাতি সংগঠনমূলক অনুষ্ঠানে দেশের সমগ্র দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়োজিত হবে, কে জানে? যদি কোনো দিন সে শুভলগ্ন আসে, যদি কানো দিন অজ্ঞতার দৈন্য ও নিরক্ষরতার লজ্জা নিবারণের দেশব্যাপী আয়োজন দেখা দেয়, নব নব শিল্প বাংলাদেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় আর তাকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় মাঝারি নানা আকারের সহর আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উপকরণ সমেত গড়ে ওঠে, যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের বিপথগামী দুরন্ত নদীগুলোকে আবার পথে আনবার ও পোষ মানাবার ব্যবস্থা হয়, তবে বুঝব আমাদের দিন ফিরেছে, অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়েছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ নিয়ে বাঁচবার অধিকার ও সুযোগ থেকে আমরাও আর চিরকাল বঞ্চিত থাকব না। কিন্তু জাতীয় জীবনে সে বিরাট পর্বের সূচনা আজো অস্পষ্ট, অনিশ্চিত। সে আশার কতকাল ধৈর্য ধরে থাকা যায়?

কিছুদিন আগে বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি মৃত্যুর বিষাদঘন ছায়া এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত। ভাঙন সেখানে এতদূর এগিয়েছে যে, অনেকবার সেখানকার গ্রামগুলোর উদ্ধারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছি। সে গ্রামের চেহারা বদলাতে হলে অবিলম্বে যে সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন, এদেশে তা আশা করা আজো বাতুলতা। তাই সেদিন অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম কি করে গ্রামবাসী নিজের জীবনের বোঝাকে স্বচেষ্টায় খানিকটা লাঘব করতে পারে, অন্তত ক্ষুন্নিবারণের মত খাদ্যের ব্যবস্থা নিজে করতে পারে। ছোট কাজকে তাই সেদিন উপেক্ষা করিনি। বড় অনুষ্ঠানের যেখানে আভাসমাত্র নেই, সেখানে ওই ছোটকেই প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে।

আমাদের বাঁচবার জন্যে যখন কেউ ছুটে আসছে না, তখন বেঁচে থাকার দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হবে। আজিকার এই দুর্দিনে তাই মরণোন্মুখ চাষীকে ডেকে বলতে হবে—ওগো চাষী, তোমার ক্ষুধার অনল যতই দুর্নিবার হোক, তোমাকেই তা শান্ত করতে হবে। তোমার ওই ঘরের সামনের জমিটুকুতে আজ আর অতটুকুও ফাঁক রেখো না, ফলমূল শাক-সবজী যা পার অনশনজর্জর হস্তে তাই তোমাকে লাগাতে হবে। ডাঃ ফোলকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে হবে—ওই যে মাঠে তোমার ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড, তারি থেকে তোমার ক্ষুন্নিবারণের অন্ন উদ্ধার করে আনতে হবে। তুমি পুকুর কাট, বাঁধ দাও, যেটুকু পার জলের যোগাড় কর। গোবরকে আর ঘুটে করে পুড়িয়ো না। ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয়, জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা কর। গোমূত্রকে নষ্ট হতে দিয়ো না। গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে সযত্নে রক্ষা কর, সার করে জমিতে দাও। গোয়ালঘরের যত আবর্জনা আশে-পাশের যত শুকনো খড়পাতা সব সারে পরিণত কর। আর বহুকাল দুর্গন্ধ অস্পৃশ্য বলে যার পাশ মাড়াওনি, আজ তাও তোমাকে কৃষির কাজে লাগাতে হবে সার করে জমিতে দিতে হবে। ভুলো না, সংস্কারের চেয়ে ক্ষুধার অন্ন বড়।

এ উপদেশ নিষ্ঠুর, এ ব্যবস্থা তুচ্ছ, ক্ষুদ্র সামান্য সন্দেহ নেই। বাংলার অগণিত নরনারীর বেলা জীবন আর মরণের মাঝখানে বাকি রয়েছে আজ শুধু ওই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, সামান্য সম্ভাবনাটুকুই।

[প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল দু'বৎসর আগে এবং বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের এক বৈঠকে ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৩ সনে হয়েছিল। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব দু'বছরে বিন্দুমাত্র কমেছে বলে মনে করিনে। তাই এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছি। —লেখক]

প্রথম তালিকা

জিনিষের নাম	ভারতে মোট আমদানী — পরিমাণ	ভারতে মোট আমদানী — মূল্য	বাংলার অংশ — পরিমাণ	বাংলার অংশ — মূল্য
মাখন	৮ হাজার হন্দর	৮·৬ লক্ষ টাকা	৪.৫ হাজারহন্দর	৩·৮ লক্ষ টাকা
চিনি	৭৫·৭ ,, টন	৪৫·৬ ,, ,,	৩ হাজার টন	৪·৭ ,, ,,
টাট্কা ফল		৯ ,, ,,		৪ ,, ,,
আলু	·৮ লক্ষ হন্দর	৩৫·৯ ,, ,,	৫·৯ লক্ষ হন্দর	১৮ ,, ,,
মাছ	৯৪ হাজার ,,	৬·৯ ,, ,,	৪ হাজার ,,	১ ,, ,,
বিস্কিট ও কেক	২৯ হাজার হন্দর	২৪·৭ ,, ,,	৭·৯ ,, ,,	৬ ,, ,,
মিষ্টি জাতীয়	২৩·৮ ,, ,,	১৬·৭ ,, ,,	৭·৭ ,, ,,	৫ ,, ,,
টিন বা বোতলের ফল	৪৩·৯ ,, ,,	১০ ,, ,,	১০ ,, ,,	২·৯ ,, ,,
টিনের মাছ	১৩ ,, ,,	৬ ,, ,,	৩·৮ ,, ,,	২ ,, ,,
উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (প্রধানতঃ ঘি জাতীয়	৩ ,, ,,	১ ,, ,,	১·৭ ,, ,,	৪৪ হাজার ,,
অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য	৭৩ ,, ,,	৩৪·৯ ,, ,,	২৮ ,, ,,	১২·৬ লক্ষ ,,
পণির	১০ ,, ,,	৭ ,, ,,	২·৯ ,, ,,	২·৩ ,, ,,
শাকো ও চকোলেট	৪ ,, ,,	৩ ,, ,,	১·২ ,, ,,	৮৮ হাজার ,,
শর্করা জাতীয় (Farinaceous)	৩৭১ ,, ,,	২৬·৭ ,, ,,	২১৫.২ ,, ,,	১৫ লক্ষ ,,
শিশু ও রোগীর জন্য দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য	৯·৭ ,, ,,	১৮ ,, ,,	৪·৪ ,, ,,	৮·৭ ,, ,,
জ্যাম ও জেলি	১৮ ,, ,,	৬·৭ ,, ,,	৫ ,, ,,	২ ,, ,,
ঘন দুধ ও ক্রীম ইত্যাদি	৬২ ,, ,,	২০ ,, ,,	২৬·৬ ,, ,,	৬·৯ ,, ,,
আচার, চাটনি, সস্ ইত্যাদি	৮·৫ ,, ,,	৫·৯ ,, ,,	২·৯ লক্ষ ,,	১·৯৫ ,, ,,
শর্করা জাতীয়	৭·৭ লক্ষ হন্দর	৫৩ ,, ,,	২·১ লক্ষ ,,	১২·৯ লক্ষ টাকা
শস্য ডাল ও ময়দা				
বিবিধ ডাল	৭০·৬ হাজার টন	৬৯ ,, ,,	৪·৮ হাজার টন	৪·৮ লক্ষ টাকা
ধান, চাল	১৩·৭ লক্ষ ,,	১১·৯ কোটি ,,	২·৮ লক্ষ ,,	২·৩ কোটি ,,
গম	১·৬ ,, ,,	১·২ ,, ,,	৭৬·৮ হাজার ,,	৫৫·৫ লক্ষ ,,
উদ্ভিজ্জ তেল (প্রধানতঃ নারকেল)	৭৬ লক্ষ গ্যালন	৬৪·৬ লক্ষ টাকা	৬৫ লক্ষ গ্যালন	৫২ লক্ষ টাকা
লবণ	৩ লক্ষ টন	৩৭·৮ ,, ,,	৩ লক্ষ টন	৩৭ ,, ,,
মসলা				
সুপারী	১৮ লক্ষ হন্দর	২ কোটি টাকা	১২ লক্ষ হন্দর	১·৩ কোটি টাকা
লঙ্কা	৬৩ হাজার ,,	১০ লক্ষ ,,	৩·৬ হাজার ,,	৫২ হাজার ,,
লবঙ্গ	৭০ ,, ,,	৩৬·৬ ,, ,,	২৭ ,, ,,	১৫ লক্ষ ,,
গোলমরিচ	২৪ ,, -	৪·৬ ,, ,,	১২·৬ ,, ,,	২·৪ ,, ,,
তামাক	৭৮.৯ লক্ষ পাউণ্ড	১ কোটি টাকা	৫ লক্ষ পাউণ্ড	৫৪ লক্ষ টাকা

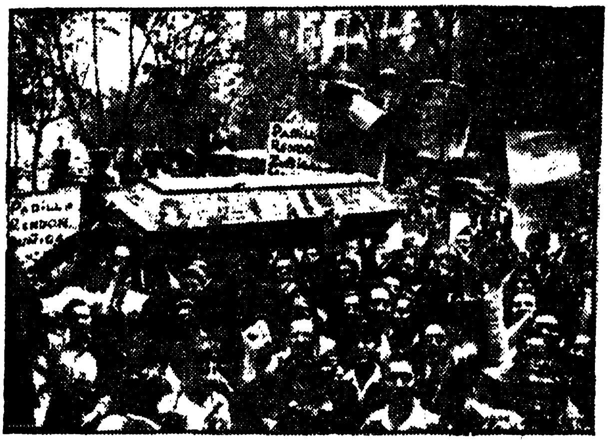
দ্বিতীয় তালিকা

জিনিষের নাম	পরিমাণ	আমদানীর প্রধান কেন্দ্র
গম	৩৬১১ হাজার মণ	পাঞ্জাব, বিহার, যুক্তপ্রদেশ
আটা	১৬২২ ,, ,,	,, ,, ,,
ছোলা	১৭৫৮ ,, ,,	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
অন্যান্য ডাল	৫৯৪২ ,, ,,	বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ
চিনাবাদাম	১০৭১ ,, ,,	মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ
তিসি	৪০৬৪ ,, ,,	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
সরষে	৪০৯৪ ,, ,,	যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম
ঘি	৩৭৯ ,, ,,	যুক্তপ্রদেশ, বিহার
চিনি	৫৬৫৬ ,, ,,	বিহার, যুক্তপ্রদেশ
গুড়	৪০৪৭ ,, ,,	,, ,,
শুকনো ফল	১৪১ ,, ,,	সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি
তামাক	৭৬২ ,, ,,	বিহার, মাদ্রাজ
বিবিধ তেল (কাযজ)	১৭৪২ ,, ,,	বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ

কাহিনী খবর ভবঘুরে

নির্বাচন পর্বের নূতন কৌশল

মেক্সিকোর সভাপতি নির্বাচন পর্বের আয়োজন উদ্যোগে—সম্প্রতি একটা ভারী মজার কাণ্ড ঘটে গেছে—সেটা বোধ হয় আপনারা খবরের কাগজে পড়েন নি। কয়েকদিন আগে মেক্সিকো শহরের "প্যাসিও দে লা রিফর্মা" বলে প্রশস্ত রাজপথটিতে এক কোলাহল-উন্মত্ত জনতাকে দেখা গেল। এঁরা সবাই সভাপতি পদের অন্যতম প্রার্থী মাইকেল আলেম্যানের দলের লোক। এই দলের মাঝখানে কয়েকজন কাঁধে করে নিয়ে চলেছে এক কালো কফিন—তার গায়ে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে সভাপতিপদের নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বী ভূতপূর্ব বৈদেশিক সচিব PADILLAর নাম। আলেম্যানের বাড়ির সামনে এসে শোভাযাত্রীরা জড়ো হলো, কফিনটাকে নামিয়ে রাখলে—তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে চীৎকার করতে লাগলো। মেক্সিকোর নির্বাচন হতে এখনও দশ মাস বাকি। এর মধ্যেই সেখানে নির্বাচনের হুজুক সুরু হয়ে গেছে—এবং রীতিমত গোলমালও বেধেছে। নির্বাচন নিয়ে সেখানে বেশ দলাদলি ঘনিয়ে উঠেছে। সভাপতি পদের প্রার্থী অ্যালেম্যানের মেক্সিকোর সরকারী বৈপ্লবিক দলের সমর্থন পাচ্ছেন—কাজেই তাঁর নির্বাচনের জয়ী হওয়ার অনেক রাস্তাই খোলা। তবে "এজেকুইন প্যাডিলা"ও মনে করেন যে, তিনিই জয়ী হবেন। দেখা যাক কি হয়। আমাদের দেশের নির্বাচন পর্বের তোড়জোড় তো সুরু হয়েছে, ভয় হয় এদেশের ছেলেমেয়েরাও না শেষ পর্যন্ত বিপক্ষ দলের প্রার্থীদের অমনি করে মড়া সাজিয়ে "বল হরি হরিবোল" দেয়।



মেক্সিকোর নির্বাচন-পর্বে—প্যাডিলার কাফন:

চার্চিলের নূতন চাল

কিছুদিন আগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেব ইতালীর "লেক কোমো" অঞ্চলে গিয়ে অবসর যাপন করছিলেন। ঐ সময়ে তিনি একদিন হঠাৎ মিলান শহরে মুসোলিনীর কবর দেখবার জন্যে হাজির হলেন। এতে মিলানবাসীরা সবাই খুবই অবাক হয়ে গেছে। কারণ তারা সবাই জানে এই চার্চিল সাহেব মুসোলিনীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে

কুইসলিংয়ের বিচার

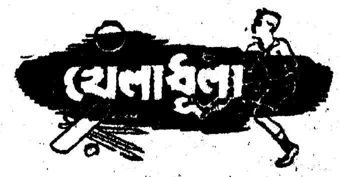
নরওয়ের বিখ্যাত "ভিড্‌কুন্‌ কুইসলিং"য়ের বিচার হয়ে প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে। "কুইসলিং" নামের পেছনে এমন কুখ্যাতি জড়ানো হয়েছে যে, বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী মাত্রকেই আজ "কুইসলিং" আখ্যা দেওয়া হয়, এটা আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু সেই কুইসলিং তার বিচারের সময় কি বলেছেন জানেন—"আমার কার্যকলাপ যদি দেশদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্র বলে গণ্য হয়ে থাকে—তাহলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি আজও এই কামনা করি যে, নরওয়ের জন্য তার বহু সন্তান ভবিষ্যতে আমারই মত বিশ্বাসঘাতক হয়ে উঠবে।"—কুইসলিংএর বিচার করা হয়েছে সাতজন জুরীর সাহায্যে—তার মধ্যে ছিল—একজন প্লাম্বার, একজন কারখানার মজুর, একজন কেরাণী, একজন নাপিত। তিনদিন তিন রাত ধরে কুইসলিংয়ের বিচার চলেছিল। কুখ্যাত কুইসলিংয়ের বিচার সভার শেষ কথাগুলিই হয়তো ভাবীকালে তাঁর নামকে আবার বিখ্যাত করে তুলবে।

বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমানপোত

যুদ্ধের দৌলতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিমানপোত তৈরীর হিড়িকটাই সব চেয়ে বেশী করে পড়েছিল। কিছুদিন আগে যুদ্ধে ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় বিমানপোতটির খবর আপনাদের জানিয়েছি। সম্প্রতি জানা গেছে—আমেরিকার বিখ্যাত বিমান নির্মাতা ডোনাল্ড ডগলাস্ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোত তৈরী করে—সেটিকে উড়িয়ে পরীক্ষা করেছেন। ক্যালিফর্নিয়ার সমুদ্রোপকূলের লংবিচ্ বলে বিমান ঘাঁটিতে এই বিমানপোতটি দেখা দেয়। এই শ্রেণীর বিমানের নামকরণ হয়েছে "গ্লোব মাস্টার"—এগুলির ওজন ৭৭ টন।—১০৮ জন আরোহী নিয়ে এটি আকাশে উড়তে পারবে এবং মাত্র দু'বার থেমে সারা পৃথিবী চক্কর দিয়ে আসতে পারবে। এই ধরণের একটি বিমানপোত তৈরী করার জন্য ডগলাস সাহেব নাকি ইতিমধ্যেই অনেক বায়না পেয়ে গেছেন। যুদ্ধের সময় আমেরিকায় বিমান তৈরীর কারখানাগুলিতে মোট ১৬৫০০০ জন কাজ করতো—যুদ্ধ থেমে যাওয়ায় সে যায়গায় মাত্র ২৬০০০ লোক বিমান তৈরীর কাজে বহাল আছে—বাকি সব লোক বেকার হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে বিমান-পথ খোলার ব্যবস্থায় তাই আমেরিকানরা বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাচ্ছেন। যুদ্ধে ব্যবহৃত আমেরিকান বিমান বাহিনীর বহু এরোপ্লেন সস্তা দামে নীলামে বিক্রী করা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে—মোটরের বদলে—এবার সবাই এরোপ্লেনেই চলাফেরা করবে সেখানে। এদেশের বড় লোকরাও এরোপ্লেন কেনার জন্য টাকার যোগাড় রাখুন।



পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমান—'গ্লোব মাস্টার'



ফুটবল

আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়া হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। ১৯৪১ সালে এই প্রতিযোগিতা প্রথম প্রবর্তিত হইলে বাঙলা দল ফাইনালে দিল্লী দলকে শোচনীয় ভাবে ৫-১ গোলে পরাজিত করিয়া এই প্রতিযোগিতার প্রথম বিজয়ীর সম্মানলাভ করে। ইহার পর ১৯৪২ ও ১৯৪৩ সালে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় না। ১৯৪৪ সালে এই প্রতিযোগিতা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইলে বাঙলা দল ফাইনালে দিল্লী দলের নিকট পরাজিত হয়। এই বৎসর পুনরায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাঙলা দল গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি দূর করিতে সক্ষম হইল। ফুটবল খেলায় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকুক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল সম্প্রতি ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। শীঘ্রই ইহাদের সহিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ফলাফল যাহাই হউক, ভারতের ক্রিকেটের বর্তমান স্ট্যাণ্ডার্ড কোন্ স্তরে তাহা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করা যাইবে। এই সঙ্গে বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

১৯৪৬ সালে গ্রীষ্মের সময় ইংলাণ্ডে একটি ভারতীয় ক্রিকেট দল ভ্রমণ করিতে যাইবে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে। কারণ ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ড হইতে এম সি সির পরিচালকগণ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির নিকট ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া যে সকল খেলোয়াড় অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন তাঁহারাই আগামী বৎসর ইংল্যাণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলে স্থান পাইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। আমাদের অশঙ্কা হইতেছে এই দলে বাঙলার কোন বাঙালী খেলোয়াড়কে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দুই তিন বৎসর পূর্বে এই ভ্রমণ ব্যবস্থা হইলে হয়তো বা সম্ভব ছিল, কিন্তু গত তিন বৎসর বাঙলায় ক্রিকেট পরিচালনায় অন্তর্কলহ যে বিষময় অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে অনেক উৎসাহী বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড়ই বিরক্ত হইয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এমন কি যাঁহারা খেলায় ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারাও বিশেষ একনিষ্ঠতার সহিত খেলার উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। তবে ইহাতে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। যাহাতে বাঙালী খেলোয়াড়গণ নিখিল ভারত স্ট্যাণ্ডার্ডে উপনীত হইতে পারেন তাহার জন্য ক্রিকেট মরশুমের সূচনা হইতেই চেষ্টা করা উচিত। বাঙালীর উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ, আমরা আশা করি, এই বিষয় প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের কলিকাতায় খেলা সম্পর্কে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে অনেক ক্রীড়ামোদী আশঙ্কা করিতেছেন হয়তো বা তাঁহারা অস্ট্রেলিয়ানদের খেলা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপ অবস্থা কখনই হইবে না। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের আপত্তি যখন যুক্তিমূলক তখন ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তাহা না মানিয়া লইয়া পারেন না। বাঙলা হইতে যে অনুরোধ গিয়াছে, তাহা গ্রাহ্য হইবেই।

বীণা ছিল শিক্ষিতা আধুনিক মেয়ে। প্রগতিতে ছিল তার বিশ্বাস। স্বামীকে ভালবেসেছিল গভীরভাবে—কিন্তু স্বামীর সব আদেশকে মেনে নিতে পারেনি। স্বামী ছিল প্রগতি বিরোধী—তাই বাধল বিরোধ। তারপর কি হোল তাদের দু'জনের—স্বামী স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে কী পেল ....তাই এসে দেখুন।

নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে একখানি উপভোগ্য ছায়াছবি

ইউনিটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জের নিবেদন

ইন্দ্রপুরীর

কলঙ্কিনী



মিনার · বিজলী · ছবিঘরে

প্রত্যহ ৩টা ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন।

ইউনিটি ফিল্ম রিলিজ

সহরের একখানি শ্রেষ্ঠ কৌতুককর ছবি!

চার্লি আপনাকে প্রাণখোলা হাসি হাসাবেন।

এশিয়াটিক পিকচার্স-এর

চাঁদ-তারা

শ্রেষ্ঠাংশে: স্বর্ণলতা — ঘোরী

—পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে—

মিনার্ভা ও গণেশ

প্রত্যহ—বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

—বিলিমোরিয়া ও লালজী রিলিজ—

জনবন্দিত ৮ম সপ্তাহে

ফেমাস্ ফিল্মসের

শ্রেষ্ঠাংশে

পৃথ্বীরাজ, বীণা, মজহর

প্রত্যহ: ২-৩০, ৫-৩০, ৮-১৫ প্যারাডাইস

জ্যোতি

প্রত্যহ: ২·৩০·৫·৩০·৮·৩০

৯ম সপ্তাহ

নবীন পিকচার্সের সর্বজনবন্দিত চিত্র

ভর্তৃহরি

শ্রেষ্ঠাংশে

মমতাজ শান্তি, সুরেন্দ্র, অরুণ ও কজ্জন

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিসঃ সিলেট

কলিকাতা অফিঃ ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

কার্যকরী মূলধন

এক কোটী টাকার উর্ধ্বে

জেনারেল ম্যানেজার—জে, এম, দাস

চণ্ডী চরণ ঘোষ ব্রাদার্স কৃত

ভীমরস সালসা

বাত ও রক্তদুষ্টির অদ্বিতীয়

২৪ বি, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড

রঙ্গজগৎ

পূজোর ছুটির মধ্যে গত ১৩ই অক্টোবর এবং ২০শে অক্টোবর যথাক্রমে কলকাতায় নবতম চিত্রগৃহ দুটি, ক্রাউন সিনেমা ও বীণা টকীজের উদ্বোধন কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এখন হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে, আগামী ১৯৪৬ সালের মধ্যে কলকাতায় খুব কম করে আরও আটটি আনকোরা নতুন চিত্রগৃহ খোলা হয়ে যাবে।

* * *

'উদয়ের পথে' ও 'অমরাহী'র সাফল্য প্রগতিশীল লেখকদের রচনার প্রতি চিত্র-প্রযোজকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে দেখা গেল। বর্তমানে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সামনের সারিতে যারা রয়েছেন, তাঁদের অনেকের কাছেই প্রযোজকদের দূতেরা যাতায়াত আরম্ভ করেছে। এঁদের মধ্যে সুবোধ ঘোষও একজন। পরিচালক বিমল রায়ের আগামী দ্বিভাষী ছবির কাহিনী রচনার ভার ইনি পেয়েছেন, তা ছাড়া এখানকার আরও কয়েকজনের গল্প নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং বম্বের কয়েকজন প্রযোজকও তাঁর কাছে গল্পের দাবি করেছেন। তবে সুখের বিষয়, সুবোধবাবু বর্তমানে কেবলমাত্র বিমল রায়ের জন্যই কাহিনী রচনায় নিযুক্ত থাকবেন এবং সে ছবিখানি তোলা না হওয়া পর্যন্ত আর কাউকে ছবির জন্য গল্প লিখবার ভার নিয়ে নিজের বিড়ম্বনা সৃষ্টি করবেন না।

* * *

মিস গ্রেসি ফীলডস্

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

এক পার্টিতে মিস ফীলডসের সঙ্গে দেখা নানারকম কথাবার্তা হ'ল। বড়ই-সরলা, প্রতি কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করেন।

জিজ্ঞেস করলুম, মামজেল কোন কোন দেশ ঘুরলেন? বললেন শুরু তো হ'ল অস্ট্রেলিয়া থেকে। সেখান সাতপাক খেয়ে, নিউগিনি হয়ে, ফিলিপিনে ঢুঁ মেরে, ওকিনাওয়া আলগোছা ছুঁয়ে এই হেথায় কোলকাতা এসে পৌঁচেছি। ভারী ভালো লাগছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম সে কি কথা, কলকাতার ভাপসা আবহাওয়ার নিন্দে তো সব সায়েব মেমই করেন।

গ্রেসি বললেন, তাদের দুমাসের জন্য নিউগিনি পাঠিয়ে দিয়ো; কথাটি বলবেন না।

জিজ্ঞেস করলুম, সে যেন হল, কিন্তু এত যে দেশ ঘুরলেন, গরীব দুঃখীদের অবস্থাটা দেখলেন?

গ্রেসি বললেন, তাই যদি না হবে তবে এত দেশ ঘোরার কি প্রয়োজন ছিল? লণ্ডন, নিউইয়র্কের বড় বড় থিয়েটার, বড় বড় স্টেজ থেকে তো আর আমাকে তাড়িয়ে দেয়নি। তাদের সামনে গাইবার জন্যই তো গৃহত্যাগী হলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, সবাই কি আপনার ইংরিজি গান বুঝল?

বললেন, ভালো করে, প্রাণমন দিয়ে যদি গাও তবে তোমার ভাষা না বুঝেও অন্যের



মিস গ্রেসি ফীলডস্

মনে তোমার হৃদয় বেদনা সঞ্চারিত হবে। যদি অন্যে একদম রস না পায়, তবে বুঝতে হবে, তুমি যা গাইছ তা তুমি নিজেই হৃদয় দিয়ে অনুভব করোনি।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই যে কোটি কোটি গরীব দুঃখী দেখলেন এদের সম্বন্ধে ইংরাজ তো উদাসীন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কোথায়? গ্রেসি বললেন, আমেরিকানদের আরো এগিয়ে আসা উচিত। সে-কথা আমি তাদের বার বার বলেছি।

ভাবলুম মামজেলকে আর বেশি বিরক্ত করা অনুচিত হবে। বললুম বাঙলাদেশ ভারতবর্ষের অনেক কিছু, সুন্দর অনেক কিছু মধুর জমিয়ে রেখেছে। আমাদের গান বাজনা নাচ কিছু দেখলেন শুনলেন?

বললেন, আমার কপাল! কিচ্ছুই দেখা হয়নি। এখান থেকে ওখানে সেখান থেকে এখানে, হেথায় হোথায় পাক খাওয়ায় কিন্তু দিশী জিনিস কিচ্ছুই দেখায় না। আমি আর নিজের থেকে কি বন্দোবস্ত করব বলো। একটা দিশি ফিল্ম পর্যন্ত দেখা হয়নি।

শুনে বড় দুঃখ হল। মিস মেয়ো, বেভেরলি নিকলসের কথা আলাদা—তারা এদেশকে গাল দিতেই এসেছিল। কিন্তু এই সাদাসিধে গানের গাইয়ে তাঁর কপালেও কি ফিপো পেলিটি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না?

মাথা নীচু করে বললুম মামজেল, আমার কাগজ দিশী ভাষায় বেরোয়। আমার কাগজ হাটে মাঠে যায়। আমার কাগজ এদেশের ফীলডসকে represent করে। আপনি গ্রেসি ফীলডস যে এদেশের ফীলডসকে গ্রেস করলেন তার জন্য অভিনন্দন করার অধিকার আমার কাগজেরই।

মামজেল বড় খুশী হলেন। বললেন, সেই ফীলডসকে গ্রেসি গ্রীণ রাখার চেষ্টা করবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করা এবং ওলন্দাজ (ডাচ) গভর্নমেণ্টের সাহায্যার্থে ভারত হইতে কোন প্রকার সমরোপকরণ প্রেরণ করা চলিবে না।

গতকল্য কলিকাতা হইতে ৪ মাইল উত্তরে আলমবাজারে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনোচ্ছু শোভাযাত্রাকারীদের উপর একদল মুসলমানের গুণ্ডামির দরুণ অনুষ্ঠিত দাংগা-হাংগামায় ৫ খানি দুর্গা প্রতিমা ভগ্ন হয় এবং অন্যূন শতাধিক লোক অল্পবিস্তর আহত হয়। এইদিন মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কলটী প্রভৃতি স্থানে প্রতিমা নিরঞ্জনে বিঘ্ন ঘটিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৮ই অক্টোবর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, "সহকারী ভারতসচিব কমন্স সভায় রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ভারতের ব্যাপারে রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদীদের কোন পার্থক্য নাই।

রংপুর জিলা হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, রংপুর জেলার লালমণিরহাটে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনে হাংগামায় গুলী চালনার ফলে একজন হিন্দু নিহত এবং ২২ জন হিন্দু আহত হইয়াছে।

১৯শে অক্টোবর—বাঙলা ও সুরমাভ্যালী হইতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস পদপ্রার্থীদের নাম কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নিকট সুপারিশ করার জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু (চেয়ারম্যান), ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সেক্রেটারী) এবং মৌলবী আশরাফউদ্দীন আহমদ চৌধুরীকে লইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি নির্বাচন বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে।

২০শে অক্টোবর—আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন বিধি ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ব্রহ্মদেশ হইতে নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধৃবাহিনী মোট ১০ হাজার লোকের তিনটি ডিভিসনে গঠিত হইয়াছিল এবং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ঝাঁসীর রাণীর নামানুসারে ব্রিগেডগুলির নামকরণ করা হইয়াছিল।

আজাদ হিন্দ লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য কিভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সংবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। লীগ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু যখনই সভায় বক্তৃতা করিতেন, তখনই তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইত এবং তাঁহার বক্তৃতার পর পুষ্পমাল্যগুলি নীলামে বিক্রয় করা হইত। প্রথম নীলামে ১ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় নীলামে ২ লক্ষ টাকা, তৃতীয় নীলামে ৩ লক্ষ টাকা ও শেষবারের নীলামে ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

২১শে অক্টোবর—কলিকাতার খাকসারদিগের অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মুসলিম লীগের সমর্থক একদল লোক বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে সভায় প্রায় চারি ঘণ্টাকাল যাবৎ তীব্র বিক্ষোভ চলে। পুলিশ এই সময়ের মধ্যে তিনবার লাঠি চালনা করে এবং অনুমান ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে।

ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অকিনলেক ভারতের সশস্ত্র বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় করণের এক পরিকল্পনা অদ্য ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ২৪শে অক্টোবর 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দিবস' পালনের দিন ধার্য করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই অক্টোবর—গতকল্য কমন্স সভায় ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলা হয় যে, বাঙলার খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অযথা উদ্বেগের কোন কারণ নাই বলিয়াই ভারত গভর্নমেণ্ট মনে করেন। বন্দিমুক্তি প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সাধারণভাবে সমস্ত দণ্ডিত বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করা গভর্নমেণ্ট সংগত বলিয়া মনে করেন না।

ভিসি সরকারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পিয়ের লাভালকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] ১৭ই কার্তিক, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 3rd November, 1945. [৫১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ব-সংগ্রামের নূতন অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্দেশক্রমে গত রবিবার দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ভারতের সর্বত্র সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মহাযুদ্ধের অবসানের সংগে সংগে জগতের বিশেষভাবে এসিয়ার নির্যাতিত এবং নিপীড়িত জাতিসমূহের মধ্যে নব-জাগরণের বিপুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ শস্ত্র-সংঘাতের বিরতি ঘটিলেও সংগ্রামের এখনও অবসান ঘটিয়াছে বলা চলে না; তাহার ধারা পবিবর্তিত হইয়াছে মাত্র। শক্তিবর্গের শস্ত্র-সংঘাতের ধারা ছাড়িয়া রাজনীতির কুটিল পথে নির্যাতিত জাতিনিচয়ের অভ্যুত্থান দলন করিবার জন্য প্রভুত্বকামী শক্তিবর্গের সমর-নীতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। একান্তভাবে নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধ করিবার জন্য ইংগ-আমেরিকার রাজনীতিকবর্গ এতদিন বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা এবং মানবতার আদর্শের যেসব কথা প্রচার করিতেছিলেন, যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সংগে সংগে তাঁহারা তৎসমুদয় লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ অপর জাতিকে শোষণ এবং পেষণ করিবার সংস্কার এই সব শক্তিমত্ত সাম্রাজ্যবাদীর অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; রাজনীতির কূটতর সূক্ষ্ম গতি ধরিয়া তাঁহাদের অন্তরের সেই হিংস্র প্রবৃত্তির বীভৎসতা উত্তরোত্তর উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। শোণিত-পিপাসা ইহাদের অনুমাত্রও হ্রাস পায় নাই, বরং আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। একদিকে এই আসুরী শক্তি, অন্যদিকে দীর্ঘ দিনের দলিত এবং পীড়িত মানবজাতির মুক্তিকামনা,—এতদুভয়ের সংঘর্ষের দিকটা পূর্ব-এসিয়ার বর্তমান সংগ্রামের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিণতির উপরই মানব-সমাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিবে—আণবিক বোমার আসুরিক বলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মানবতার প্রেরণা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে কি? যদি তাহা না হয়, বিশ্বজগৎ সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বরতা এবং হিংস্রতার প্রভাবেই অভিভূত হইতে থাকিবে এবং এক মহাযুদ্ধের অবসানে বিশ্বধ্বংসী অন্য এক সংগ্রাম ও সংঘর্ষেরই উদ্বোধন ঘটিবে। প্রকৃতপক্ষে মুখের কথার দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন চাই কাজ। পাশ্চাত্য রাজনীতিকদের মুখে বড় বড় আদর্শের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি; কিন্তু কার্যত দেখিতেছি তাঁহাদের কোন শক্তিরই প্রকৃতির একটুও পরিবর্তন ঘটে নাই। আমেরিকার রাষ্ট্র-নীতিকগণ সমরাদর্শের সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন; কিন্তু কার্যত তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। পরলোকগত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চতুর্বিধ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। বিশ্বমানবের স্বাধীনতার গালভরা কথা মুখে বলিয়া তিনি গোপনে গোপনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতশোষণ নীতিরই আগাগোড়া পরিপোষণ করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যানও সেদিন মার্কিন নৌ-দিবস উপলক্ষে আমাদিগকে অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন। বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে তাঁহার মুখে বাইবেলী রীতিতে উদ্গীত দ্বাদশ অনুজ্ঞার একটি অনুজ্ঞা এই যে, "যেসব জাতি অপর জাতি কর্তৃক তাহাদের সার্বভৌম অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা লাভ করুক, আমরা তাহাই চাই।" মার্কিন প্রেসিডেণ্টের এই উক্তির মধ্যে যদি কিছুমাত্র আন্তরিকতা থাকিত, তবে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ তাঁহার সমর্থন লাভ করিত; কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সুকৌশলে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদিগকেই সমর্থন করিতেছেন। মিঃ ট্রুম্যান সেদিন অনুগ্রহ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়ার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজেরা আমেরিকা হইতে ঋণ-ইজারা সর্ত অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র যদি ব্যবহার করে, তবে অস্ত্রের মোড়ক হইতে ঋণ-ইজারা ছাপ আগে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তিতে ব্রিটিশ-ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের গুলী খাইয়া ইন্দোনেশিয়ার যেসব বীর সন্তান মৃত্যুকে বরণ করিতেছে, তাহাদের অনুপ্রাণিত হইবার কোন কারণ নাই। ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর সুকর্ণ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদত্ত অস্ত্রের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের প্রতিবাদ করিয়া মিঃ ট্রুম্যানের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, পাছে সে চিঠির জবাব দিলে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলন পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়, এই ভয়ে মিঃ ট্রুম্যান সে সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই; এই তো অবস্থা; অথচ একদিন আমেরিকার বীর সন্তানেরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং তাহাদের হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিয়া বৈদেশিক শত্রুর কবল হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করিয়াছিল। আমেরিকার সেই আন্দোলনের ঐতিহ্যে বিশ্বমানব-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হইয়াছে। সেই আমেরিকা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের পশু-শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সাহস করিতেছে না—মার্কিনের এই নৈতিক এবং মানসিক অধোগতি দেখিয়া আমাদের সত্যই দুঃখ হয়। সাম্রাজ্যবাদের পিপাসা সংক্রামক, আজ সেই ব্যাধি মার্কিণ জাতিকেও অভিভূত করিয়াছে এবং তাহাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করিয়া মানব-মহিমা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু এসিয়ার নিপীড়িত জাতি-সমূহের রক্তোৎসর্গের পথেই বিশ্বজগৎ এই পশুপ্রবৃত্তির রাক্ষসী এবং আসুরিক উপদ্রব হইতে মুক্ত হইতে পারে। ভারতের অন্তরদেবতা এসিয়ার হৃদয় মন্থন করিয়া সেই বিশ্বজিৎ যজ্ঞেরই উদ্বোধন করিতেছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়।

ব্রহ্মের জাগরণ

জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সমূলে উৎখাত করিবার জন্য এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দেশভক্ত সন্তানদল জাগিয়া উঠিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কোন প্রতিশ্রুতিতেই আর বিশ্বাস নাই, তাহারা দেশবাসীর হাতে শাসনাধিকার ছাড়িয়া দিয়া মানে মানে সরিয়া পড়ুক, নবজাগ্রত এসিয়ার ইহাই বাণী। ব্রহ্ম, মালয় এবং সিংগাপুর, ব্রিটিশ প্রভুত্বাধীন এই অঞ্চল হইতে আমরা কার্যতঃ বিশেষ কোন সংবাদই পাইতেছি না। জাপানীরা এই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইবার পর এই স্থানের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদীরা সুকৌশলে তৎসম্পর্কিত সকল সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সম্প্রতি ব্রহ্ম দেশ হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বোঝা যাইতেছে সেখানকার রাজনীতিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করিতেছে। স্যার রেজিনাল্ড ডরম্যান স্মিথ ব্রহ্মদেশের গভর্নর। তিনি ব্রহ্মদেশে ফিরিবার মুখে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের স্বাধীনতা সংগ্রামের এইবার পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং ব্রহ্মবাসীদিগকে অতঃপর ইংলন্ডেরই সমানাধিকারসম্পন্ন স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইবে; কিন্তু কার্যতঃ সেখানে ব্রিটিশ প্রভুত্বই কায়েম করিবার কৌশল প্রযুক্ত হইতেছে। ব্রহ্মের স্বদেশপ্রেমিক তরুণ দল নিজেদের শোণিত দিয়া দেশের সেবা করিয়াছিল। এই দল ব্রহ্মবাসীদের সকল সম্প্রদায়ের দ্বারা সমর্থিত। ইহারা ব্রহ্মের নবগঠিত শাসন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একাদশ জনকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, গভর্নর ইহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার স্বদেশবাসীদের আস্থাভাজন ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজী নহেন। বিলাতের 'সানডে অবজারভার' পত্রের সংবাদদাতা এই আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গভর্নরের এই কার্যের ফলে ব্রহ্মে নিদারুণ রাজনীতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হইবে, এমন কারণ রহিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরা জাপানের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার পর ব্রিটিশকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দোল্লাসে প্রমত্ত হইয়াছে বলিয়া যে সব সংবাদ আমরা পাইতেছি, সেগুলির মধ্যে অনেকখানি কারচুপি আছে। প্রকৃত পক্ষে এসিয়ার রাজনৈতিক জাগরণ সর্বাংগীন আকার ধারণ করিতেছে। দেশভক্ত সন্তানের দল বিদেশীর দাসত্ব আর কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নয়, এজন্য আণবিক বোমার বজ্রবলের কাছে বুক পাতিয়া দিতেও তাহারা ভীত নহে। মৃত্যু বরণের পথে অমৃতত্ব অর্জনের এই পিপাসা পশুশক্তির দ্বারা নিবৃত্ত করা চলিবে না।

'ভারত ত্যাগ কর'

কংগ্রেস নির্বাচন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে বাঙলা দেশের প্রতিনিধিগণ মনোনীত হইয়াছেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ নির্বাচন সংগ্রামে কংগ্রেসের আদর্শ বিবৃত করিয়া সম্প্রতি একটি আবেদন প্রচার করিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রামে কংগ্রেস জাতির অন্তরকে জয় করিয়া লইয়াছে। জাতির বীর সন্তানগণ তাঁহাদের হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলিত রাখিয়াছেন। আগষ্ট আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই সত্য সুদৃঢ় হইয়াছে যে, পশুশক্তি প্রয়োগের দ্বারা সে পতাকা অবনমিত করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীদেরও নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পিপাসা সহজে তৃপ্ত হয় না। তাহারা কূটতর নীতি প্রয়োগে ভারতবর্ষে নিজেদের প্রভুত্ব দৃঢ় করিবার দুরভিসন্ধি লইয়াই চলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা সোজাসুজিভাবে তাহারা স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং লইবে যে, এ আশাও সুদূরপরাহত। নূতন সাধারণ নির্বাচনের ছিদ্রপথে ইহারা নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টায় আছে। বলা বাহুল্য, মিঃ জিন্নার পাকিস্থানী দলই এক্ষেত্রে তাহাদের একমাত্র সম্বল। ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি এখনই যদি বিদায় লয়, তবে মিঃ জিন্না এবং তাহাদের অনুগামী লীগওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির বেসাতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিয়া তবে ভারত হইতে যাও—ব্রিটিশ জাতির কাছে মিঃ জিন্নার এই আবেদনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মনের গোপনে ভারতে তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিবার স্বপ্ন রচনা করিয়াছে। আগামী সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র ভারত দেশের স্বাধীনতার প্রকৃত শত্রু এই পাকিস্থানী দলের স্পর্ধাকে চূর্ণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সেই মোহ ভাঙিয়া দিবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসংগে অধ্যাপক হেরল্ড লাস্কির একটি উক্তি আমাদের মনে পড়িতেছে। মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া তিনি সেদিন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ভারতের স্বাধীনতা ও ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করেন। তরুণের দল স্বভাবতই হীনতা ও দীনতার ঊর্ধ্বে থাকে এবং তাহাদের অন্তর মানবতার প্রবৃত্তিতেই বলিষ্ঠভাবে সাড়া দেয়। ভারতের তরুণ মুসলিম সম্প্রদায় মানবতার সেই প্রেরণায় জাগিয়া উঠুক, এবং দীর্ঘ পরাধীনতায় শোষিত দেশবাসীর নিদারুণ দুর্দশা তাহাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলুক! কংগ্রেসই জাতির প্রতিনিধিত্বমূলক একমাত্র প্রতিষ্ঠান; নির্বাচন-সংগ্রামে কংগ্রেসের বিরুদ্ধতায় যাহারা প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিবে। এই বিশ্বাসঘাতক দলকে সায়েস্তা করিবার জন্য তরুণ ভারতের প্রাণশক্তি প্রযুক্ত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বিচার

ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে ভারতের মনোভাব যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার গুরুত্ব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হৃদয়ংগম করিতে পারেন নাই। জনগণের অনুরোধ, নেতৃবৃন্দের সতর্কবাণী সত্ত্বেও তাঁহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর বীর সৈনিক ও সেনানীগণের বিচারের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পক্ষসমর্থনকারী কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও মিঃ আসফ আলি গত ১৫ই অক্টোবর বড়লাটকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে আগামী ৫ই নভেম্বর তারিখে যে বিচার আরম্ভ হওয়ার কথা আছে, তাহা এবং আরও যে কয়েকটি বিচার হওয়ার কথা আছে, তাহা যেন মুলতুবী রাখা হয় এবং বড়লাটের শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত ও প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভার কার্যারম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় জাতীয় বাহিনী-সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন নূতন করিয়া বিচার করা হয়, এই অনুরোধ বড়লাটকে জানান হয়। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পক্ষ-সমর্থনকারী কমিটির অভিমত এই যে, নূতন শাসন পরিষদ গঠিত হওয়ার পর বড়লাট এই সম্পর্কে জনমত আরও ভালভাবে অনুধাবন করিতে পারিবেন। নবগঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এই সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগও পাইবেন। তাঁহারা এই অনুরোধের সংগে এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করিয়াছেন যে, জনসাধারণের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া যদি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল সুদূর-প্রসারী হইবে, এবং আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে বিক্ষুব্ধ জনমত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে, কারণ, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর কার্যের ভিতর দিয়া যে আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল,

সমগ্র ভারতবাসী তাহা গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ও মিঃ আসফ আলি বড়লাটকে লিখিত এই পত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা বা সেনানীদের আইনগত মর্যাদার কোন প্রশ্ন তুলিতে বিরত হইয়াছেন, এই সমস্ত ব্যক্তিকে কোনও অপরাধে আদৌ অপরাধী করা চলে কি না, তৎসম্বন্ধেও বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। তবে এতৎসম্পর্কে তাঁহারা প্রসঙ্গত যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা পত্রে লিখিয়াছেন,—"আজাদ হিন্দ ফৌজভুক্ত এই সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীসহ ভারত প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ আনা হইয়াছে। উক্ত তথাকথিত অপরাধের সহিত ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। ভারতীয় জনসাধারণ ইচ্ছা করিলেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে বলিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করায় এই ব্যাপার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ১৯২৪ সালে তৎকালীন ভারতসচিব মিঃ ওয়েজউড বেন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে কমন্স সভায় বলেন যে, তত্ত্বের দিক হইতে ত্রুটি যতই থাকুক না কেন, ভারত ইতিপূর্বেই 'কার্যতঃ ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভোগ করিতেছে'।" ভারত যদি যথার্থ ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভোগ করিয়া থাকে এবং ভারত যদি ইচ্ছা করিলেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তবে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর যে ব্যক্তিগণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যে প্রচেষ্টা ভারতীয় জনগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখে, তাহা অপরাধ বলিয়া কেন গণ্য হইবে এবং সেই তথাকথিত অপরাধের জন্য কেন এবং কোন যুক্তিতে এই সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক বীর সৈনিক ও সেনানীর বিচার অনুষ্ঠিত হইবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কিন্তু এ পর্যন্ত ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, যে সব ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের কার্যকলাপের দ্বারা তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চিরাচরিত সেই 'মুখে এক, মনে আর' নীতির পরিচয় দিতেছেন। নতুবা বড়লাটের নিকট লিখিত এই পত্রের উত্তরে সমর-দপ্তরের সেক্রেটারী যে উত্তর দান করিয়াছেন, তাহা প্রদানে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন। বিচার বন্ধ না রাখার পক্ষে তাঁহার যুক্তি এই যে, "শুনানী মুলতুবী রাখার অর্থ হইতেছে এই যে, বহুসংখ্যক (যদিও সঠিক সংখ্যা এখনও নির্ধারিত হয় নাই) বিচার কমপক্ষে কয়েক মাস ফেলিয়া রাখা।" কিন্তু এই ফেলিয়া রাখাতে তাঁহাদের আপত্তির কারণ কি? এতগুলি লোকের সুদীর্ঘ বন্দিদশার কথা ভাবিয়াই কি তাঁহারা ব্যাকুল হইয়াছেন? কিন্তু ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতি তাঁহাদের এই দরদ স্বাভাবিক নহে, বিশ্বাস্যও নহে। জনমত আরও অধিক উগ্র হইবার পূর্বেই তাঁহারা তথাকথিত অপরাধে যাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন, তাড়াহুড়া করিয়া তাঁহাদের দণ্ডিত করিতে চান, ইহাই হইল আসল কথা। তাঁহাদের এই ব্যস্ততাপ্রসূত নীতি দেশবাসী কখনও সমর্থন করিবে না এবং ইহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করা হইলেও ভারতবাসী তাহা সহ্য করিবে না। ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁহারা ব্যস্ততার সঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন, তবে তাহার ফল ব্রিটিশের পক্ষে বিষময় হইবে; এবং সেজন্য পরে তাঁহাদিগকে অনুশোচনা করিতে হইবে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের নেতা ফেনার ব্রকওয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরাও সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাই—"বর্মী জাতীয় বাহিনী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর মধ্যে ব্যবহার বৈষম্য কেন করা হইবে?" পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ কোভ বলিয়াছেন—"বর্মিগণের প্রতি যে রাজনীতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈনিক ও সেনানীগণের প্রতিও তাহা প্রদর্শন করা হোক।" কিন্তু মিঃ কোভ হয়ত অবগত নহেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চোখে সত্যের রং সর্বত্র এক নহে, স্থান ও কাল-ভেদে তাহা পরিবর্তিত হয়। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ ও উৎসাদিত হইয়াছিল, কাজেই তাহা তথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদিগকে 'গতস্য শোচনা নাস্তি' এই নীতি অবলম্বন করিয়া কলা-কৌশল অবলম্বন করিতে এবং নরম-সুর কাটিতে হইয়াছে, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অটল অটুট রহিয়াছে, কাজেই ভারতবর্ষে তাহার আদৌ প্রয়োজন নাই, এবং স্থান-কাল বুঝিয়াই তাঁহারা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন।

জাতির কর্তব্য

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ও শিক্ষাদীক্ষার মোহে যখন এ দেশে স্বাজাত্য, স্বধর্ম ও স্বদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা জাগিয়াছিল এবং ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণের দল দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব অলৌকিক ক্ষমতার বলে জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পর রামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশক্তিতে ও শিক্ষাদীক্ষার অলৌকিক প্রভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্মের প্রথম দিগ্বিজয় ঘটে। এই মানব দেবতার জীবনের শেষভাগ কাশীপুরের বাগানবাড়িতে অতিবাহিত হয়। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ পরমহংসদেবের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সাধন-ভজন করিয়া তত্রত্য বাসভবনকে পূত করিয়াছেন; এই দিক হইতে এই স্থানটি কেবল এদেশের নয়, সমগ্র জগতের তীর্থক্ষেত্র। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর ধর্মসাধনার বহু স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুরের এই বাগানবাড়িটি বহুপূর্বেই পরমহংসদেবের স্মৃতি-তীর্থরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এ পর্যন্ত এই তীর্থভূমির সমুচিত সংস্কারের কোন চেষ্টাই হয় নাই। ভারতের নানাস্থান ও আমেরিকা হইতে যে ভক্তবৃন্দ এই তীর্থস্থান পরিদর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা এই পবিত্র ক্ষেত্রের প্রতি উপেক্ষা দর্শন করিয়া ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া যান। স্বামী বিবেকানন্দ এই বাগানবাড়িটি ক্রয় করিয়া তথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন। বেলুড় অপেক্ষা এইস্থানটির প্রতিই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ ছিল। ১৮৯৭ সালের ১৩ই জুলাই তিনি তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহা জানা যায়। সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি স্বামী মাধবানন্দজী চতুষ্পার্শ্ববর্তী ভূমিসহ এই বাটী ক্রয় করিয়া তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আন্তর্জাতিক স্মৃতিভবন প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি এই বাটী ও জমি ক্রয়ার্থে গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই কার্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই অর্থ-সংগ্রহার্থে তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচার করিয়াছেন। এই মহান্ কর্তব্য-পালনে জাতি এ পর্যন্ত কিছুমাত্র উৎসাহ-উদ্যোগ না দেখাইয়া যে প্রত্যবায়-ভাগী হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার আজ সুযোগ উপস্থিত। আশা করি, জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহস্র সহস্র ভক্ত এই সদনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া জাতির অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

শান্তিনিকেতন, কলাভবনের সৌজন্যে



"সে পথ গেছে কোন্‌খানে"— শিল্পী: যদুপতি বসু



মাঠের পারে শিল্পী: নন্দলাল

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" বিচার—"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল" নামে অভিহিত—সেনাদলের লোকদিগকে বৃটিশের বিরুদ্ধে বৃটিশের শত্রুপক্ষে যুদ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিরা যে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার পরে ঐ সেনাদলের পক্ষ সমর্থন জন্য গঠিত কমিটির পক্ষে মিস্টার ভুলাভাই দেশাই ও মিস্টার আশফ আলী ভারত সরকারকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—বড়লাটের শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত ও প্রদেশসমূহে মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিষয় পুনরায় বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের বিচার স্থগিত রাখা হউক। ভারত সরকার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সংবাদ ২৫শে অক্টোবর দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন—এই বিষয় যদি সংকীর্ণ, নিয়মানুগ ও আইনসংগতভাবে দেখা হয় অর্থাৎ উদারতাসহকারে সৈনিকদিগের মনোভাব বিবেচিত না হয়, তবে তাহা শোচনীয়ই হইবে।

প্রকাশ, মাইমিওয় ঝান্সীর রাণীদলের লোকরা আজাদ হিন্দ ফৌজ হাসপাতালের কার্যে নিযুক্ত হইলে—ঐ দলের মহিলারা কর্ণেল লক্ষ্মীর মারফতে নেতাকে পত্র পাঠাইয়াছিলেন—

"আপনি শিখাইয়াছেন—পুরুষ ও স্ত্রী-লোকের অধিকার সমান। আমরা পুরুষের সব শিক্ষাই পাইয়াছি। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার সাহস ও আস্থায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি। আমরা যখন সম্পূর্ণ (সামরিক) শিক্ষা পাইয়াছি, তখন আমাদিগকে কেন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইতেছে না? আমাদিগের অনুরোধ, আমাদিগকে অবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হউক।"

মহিলারা রক্তে এই পত্রে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—ষোড়শবর্ষ মাত্র বয়স্কা বাঙালী বালিকা বেলা দত্ত বোমা-বর্ষণের মধ্যেও "ভারতীয় জাতীয় সেনা-দলের" একটি হাসপাতালে একক—মাসের পর মাস ৮৫ জন রক্তামাশয়গ্রস্ত রোগীর সেবা করিয়াছিলেন। একবার তাঁহাকে ভগ্নস্তূপ মধ্য হইতে বাহির করিতে হইয়াছিল।

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারতে সম্মিলিত পক্ষ জেনারেল ম্যাকআর্থারের "হেড কোয়ার্টার্সের" মারফতে পরাভূত জাপানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র সেক্রেটারী আমরু শিগে-মেটেশুকে দিল্লীতে "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" বিচারে সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু শিগে-মেটেসু অসুস্থতানিবন্ধন আসিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে জাপানী সরকার তাঁহার

দেশের কথা

(৬ই কার্তিক—১২ই কার্তিক)

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" বিচার—বন্দীর প্রতি অনাচারের অভিযোগ—কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচন—বিদেশে সুভাষচন্দ্র—শরৎচন্দ্র সম্বর্ধনা।

পরিবর্তে (একজন নহেন) ৩ জন সাক্ষীর নাম জানাইয়াছেন—রেঙ্গুনে জাপানী দূত রেতেজো সাদা, "স্বাধীন ভারত" অস্থায়ী সরকারে জাপানী রাজনীতিক প্রতিনিধি টেরুও হোবিয়া ও সুনীটী মাটসুমোটো।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য মিস্টার সপ্রু এলাহাবাদে মত প্রকাশ করিয়াছেন—"ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লোকদিগের সম্বন্ধে যদি প্রতিহিংসাদ্যোতক, কঠোর ব্যবস্থা হয় তবে এদেশের লোক তাহাতে বিরক্ত হইবে এবং বৃটেনের সহিত ভারত-বর্ষের সম্বন্ধে তাহার প্রভাবও অল্প হইবে না।" তিনি বলিয়াছেন, ঐ সেনাদলের লোকদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিলে ভুল করা হইবে।

মিস্টার জিন্না ও শিখ—গত ২১শে অক্টোবর লাহোরে পাঞ্জাব সচিব সঙ্ঘের সচিব সর্দার বলদেব সিংহ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—

"পাকিস্থান পরিকল্পনায় শিখদিগের কোনরূপ সহযোগের আশা করা মুসলিম লীগের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। শিখরা কখনই ভুলিবে না যে, সিমলা সম্মেলনের পরে কালকায় আসিবার সময় মিস্টার জিন্না শিখ চালকের ট্যাক্সিতে আসিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।......পাঞ্জাবে শিখদিগের সংখ্যা ভারতে মুসলমানদিগের সংখ্যার মত। যদি মুসলমানেরা ভারতে অ-মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিতে না পারেন, তবে শিখরাই বা কেন পাঞ্জাবে মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিবেন?"

বিদেশে সুভাষচন্দ্র—দিল্লী হইতে প্রকাশিত জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক পত্র 'রিয়াসৎ' পাঞ্জাবের কোন সচিবের সাহায্যে সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ ত্যাগের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাকি আকালী নেতা মাস্টার তারা সিংহের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আকালী দল পাঞ্জাবের কোন সচিবের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন। তারা সিংহ তাহাতে ধৈর্যচ্যুত হইয়া বলেন, ফরোয়ার্ড ব্লকও তাহাই করিয়াছেন। তিনি নাকি বলেন, "ঐ সচিবই কি সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষ ত্যাগের পাথেয় দেন নাই?" সেই কথা নাকি গভর্ণর গ্লান্সীর কর্ণগোচর করা হয় এবং তিনি সচিবকে ডাকিয়া ভয় দেখান,—সচিবের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইবে। সচিব নাকি ভীতি-বিহ্বল হইয়া আপনার কৃতকার্য স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতে ইংরেজের ভক্ত থাকিবার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই জন্যই বৃটিশের সেনাদলে সৈনিক-সংগ্রহকল্পে খালসা ডিফেন্স লীগ গঠিত করা হয়। ঐ সচিবের বন্ধু কলিকাতার 'দেশদর্পণ' পত্রের সম্পাদক নিরঞ্জন সিংহ তালিবকে, চৌধুরী কার্তার সিংহকে এবং আরও কয়েকজনকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য লাহোর দুর্গে ও অন্যান্য স্থানে আটক রাখা হয়। কেহ কেহ নাকি আপনাদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ স্বীকার করিয়া অন্যান্য লোককেও জড়িত করিয়া-ছিলেন এবং সেই সকল লোককেও গ্রেপ্তার করা হয়। এইরূপে নাকি সরকার সুভাষ-চন্দ্রের ভারত ত্যাগের সম্পূর্ণ বিবরণ পাইয়াছেন এবং তাঁহার কার্যপদ্ধতি কি ছিল, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন।

বাঙলায় দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধি—গত ২৬শে অক্টোবর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যুক্ত প্রদেশের ও পাঞ্জাবের সরকারের সহিত ব্যবস্থা করিয়া বাঙলা সরকার গরু ও মহিষ আমদানী করিয়া গৃহস্থদিগের ও ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রয়ের সংকল্প করিয়াছেন। বিক্রয়ের সর্ত—ক্রেতা সরকারের নির্দিষ্ট মূল্যে পশু পাইবেন; কিন্তু তাঁহাকে নির্ধারিত মূল্য প্রদান করা ব্যতীত লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে যে, যতদিন উহা গর্ভধারণক্ষম থাকিবে, ততদিন ক্রেতা বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের অনুমতি ব্যতীত উহা বিক্রয় করিতে পারিবেন না—পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

প্যালেস্টাইনের জন্য ধর্মযুদ্ধ—গত ২৬শে অক্টোবর কলিকাতায় "প্যালেস্টাইন দিবস" পালন উপলক্ষে মুসলমানদিগের এক সভা হয়। মুসলিম লীগের মনোনীত—কেন্দ্রী পরিষদের সদস্যপদপ্রার্থী মিস্টার আব্দার রহমান সিদ্দীকী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। খিলাফৎ আন্দোলনকালে যেমন কোন কোন মুসলমান ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার ও ভারতবর্ষ ত্যাগের ভয় দেখাইয়াছিলেন এবার মিস্টার সিদ্দীকী বলেন, লণ্ডনে বা ওয়াশিংটনে অর্থাৎ ইংলণ্ডে বা আমেরিকার (প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে) যে সিদ্ধান্ত করা হইবে, মুসলমানদিগকে যদি ভয় দেখাইয়া তাহাই গ্রহণ করিবার চেষ্টাই হয়, তবে মুসলমানদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বর্ণে বর্ণে পালিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের মুসলমানরা কখনই তাহাতে সম্মত হইবেন না। ইংলণ্ড বা আমেরিকা প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না—ইহাই ভারতের মুসলমানদিগের দাবী।

যদি সে দাবী পূর্ণ করা না হয়, তবে আরবদিগের সম্বন্ধে সকল অন্যায় কাজ মুসলমানরা দীর্ঘকালব্যাপী ধর্ম-যুদ্ধের আরম্ভ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। মুসলমানরা সেজন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবেঃ এবং প্যালেস্টাইন "এক ও সত্য আল্লার" উপাসনার জন্য নিরাপদ রাখিবেন। সমরাহবান মিস্টার সিদ্দীকী ধ্বনিত করিয়াছেন।

বাঙলার গভর্নর—বাঙলার বর্তমান গভর্নর মিস্টার কেসী নাকি সত্য সত্যই স্বদেশে — অস্ট্রেলিয়ায় — রাজনীতিক ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার জন্য বাঙলার গভর্নরী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। গত ২৬শে অক্টোবর বিলাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। তবে তিনি কবে যাইবেন, তাহা জানা যায় নাই।

শরৎচন্দ্র সম্বর্ধনা—গত ২৭শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কার্শিয়াং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। বোম্বাই নগরের মেয়রের কমিটি তাঁহাকে আগামী ৫ই নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজ সপ্তাহ প্রবর্তন-সভায় সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, তিনি ২রা নভেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৪ঠা বোম্বাই পেণছিবেন এবং ৫ই সভা করিয়া ৬ই বোম্বাই ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবেন। তিনি নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে —কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন সম্পর্কে বর্ধমানে গমন করিবেন।

কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে শরৎবাবুকে সম্বর্ধিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকাকে সম্পাদক করিয়া এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। নভেম্বর মাসের শেষভাগে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়া অর্থ উপহার দান কমিটির অভিপ্রেত।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়—কলিকাতা বাগবাজারে অবস্থিত ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন প্রচার করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে ৫ শত বালিকাকে বিনা বেতনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ান হয়। ভগিনী নিবেদিতা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইয়াছিলেন, বিদ্যালয়ে সেই আদর্শ রক্ষার চেষ্টা হয়। বর্তমানে গৃহের সংস্কার, নলকূপ প্রতিষ্ঠা, ও গৃহের পরিবর্ধন জন্য অর্থ প্রয়োজন। সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা—নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সম্পাদক, ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন—রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে যে গৃহে জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করা স্বামী বিবেকানন্দেরও অভিপ্রেত ছিল। সেই গৃহ ও গৃহ সংলগ্ন ভূমি বহুদিন শূকরের খোয়াড়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখনও তাহা যেভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহা বেদনাদায়ক। মিশন ঐ গৃহ ও গৃহ-সংলগ্ন জমী ক্রয় করিয়া রামকৃষ্ণের আন্তর্জাতিক স্মৃতিসৌধ রূপে রক্ষা করিতে সংকল্প করিয়া সেই কার্যের জন্য অর্থ-প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কার্যের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বন্দীর প্রতি অনাচারের অভিযোগ—শ্রীযুক্ত রামনন্দন মিশ্র পাঞ্জাবের সচিব-দিগকে লিখিত এক পত্রে পাঞ্জাবের গোয়েন্দা পুলিশের অনাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গ্রেপ্তার হইয়া হাজারীবাগ জেলে নীত হন এবং তথা হইতে পলায়ন করিবার পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে লাহোরে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে লাহোর দুর্গে লইয়া যাওয়া হয় এবং তখনই তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করা হয়, তাহা ২৫ ঘণ্টা কাল চলিয়াছিল। ইহার পরেও মধ্যে মধ্যে এইরূপ প্রশ্ন চলিত। তিনি বলেন—

প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালে তাঁহাকে পদাঘাত, চপেটাঘাত, কেশাকর্ষণ ও মুষ্টির আঘাত সহ্য করিতে হইত। তাঁহাকে অন্যান্য সময়েও প্রহার করা হইত। যাহাতে তাঁহার দেহে আঘাতের চিহ্ন না থাকে, সেইজন্য তাঁহাকে কম্বল জড়াইয়া প্রহার করা হইত। সময় সময় তিনি প্রহারফলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার আরও অভিযোগ আছে।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচন—গত ২৫শে অক্টোবর—

(১) বোম্বাই হইতে ভারতীয় বণিক সভা নির্বাচনকেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মিস্টার মনু সুবেদার।

(২) মধ্য প্রদেশের হিন্দী বিভাগ অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শেঠ গোবিন্দ দাস ও শেঠ শিবদাস দাগা।

(৩) মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে ৭ জন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে (গত ২৬শে অক্টোবর) ব্যবস্থা পরিষদসমূহে নির্বাচনের বিজ্ঞাপনপত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে—

(১) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে "ভারত ত্যাগ কর" এই ধ্বনি করিয়া কংগ্রেস নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইতেছে।

(২) এই নির্বাচন সামান্য পরীক্ষা মাত্র—ইহা বৃহত্তর কার্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

বিজ্ঞাপনপত্রে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়দফা প্রধান—

(১) কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ চাহে।

(২) কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়ের ও সকল ধর্মাবলম্বীর ঐক্য, পরমতসহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি চাহে।

(৩) কংগ্রেসের কাম্য—লোক যেন আপন ইচ্ছা ও প্রতিভা অনুসারে পরিণতির সুযোগ লাভ করে।

(৪) কংগ্রেস ভাষার ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশসমূহের পুনর্গঠন চাহে।

(৫) কংগ্রেস যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাহে, তাহাতে শাসনপদ্ধতিতে প্রত্যেক অধিবাসীর অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকিবে।

(৬) কংগ্রেস—প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বায়ত্ত শাসনাধিকার স্বীকৃত রাষ্ট্র সংঘের পক্ষপাতী।

(৭) কংগ্রেস ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের দূরীকরণে ও লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ পদ্ধতির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইবে।

(৮) আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কংগ্রেস স্বাধীন জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

(৯) কংগ্রেস সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনের ও সকল পরাধীন জাতির মুক্তি-লাভের সমর্থন করিবে।

গত ২৬শে অক্টোবর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আচার্য কৃপালনী যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি যেন আগামী নির্বাচনেই অখণ্ড মনোযোগ না দেন পরন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শক্তিবৃদ্ধি ও গঠনমূলক কার্যের বিস্তারে অবহিত থাকেন। তাঁহারা যেন কারারুদ্ধ সহকর্মীদিগের কথা বিস্মৃত না হন।

নির্বাচনে বাধা দূরীকরণ—কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছেন—রাজনীতিক কারণে দণ্ডিত যে সকল ব্যক্তি নির্বাচনের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সরাসরি বড়লাটের নিকট সেই বাধা দূর করিবার জন্য আবেদন করেন, তবে তাহা দূর হইতে পারে।

সত্যবতী স্মৃতিরক্ষা—গত ২৮শে অক্টোবর দিল্লী হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে তথায় সত্যবতী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইবে। সেই অর্থ কৃষক, শ্রমিক ও স্ত্রীজাতির কল্যাণকর কার্যে ব্যয়িত হইবে।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সদস্য নির্বাচন আসন্ন। বাঙলায় সদস্য নির্বাচনের গুরুত্ব যে অসাধারণ তাহা বলা বাহুল্য। বাঙলায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদিগের মধ্যে কত জনকে প্রভাবিত করিতে পারেন, তাহার উপর সচিবসঙ্ঘ গঠন নির্ভর করিবে। মিস্টার জিন্না যে বলিয়াছেন, মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি ও তাঁহার শাসিত মুসলিম লীগ যে পাঞ্জাবে ও বাঙলায় বিশেষ চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঞ্জাবে যে তাঁহার উক্তি বৃথা প্রতিপন্ন হইবে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। অবশিষ্ট—বাঙলা।

বাঙলায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যদি লীগের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করেন, তবে বাঙলার ইষ্ট সাধিত হইবে।

ভোট দিবার সময় বাঙলার মুসলমানদিগকে কতকগুলি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—মুসলিম লীগ বাঙলার কোটি কোটি মুসলমানের কোন উপকার করিয়াছে কি? দুর্ভিক্ষ যে কেবল হিন্দুদিগকেই সর্বস্বান্ত করিয়াছে —বহুলোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, এমন নহে—মুসলমানপ্রধান প্রদেশে মুসলমানদিগের সর্বনাশ অল্প হয় নাই। যে কয়জন মুসলমান মুসলিম লীগের নামে সচিব হইয়া আশাতীত টাকা পাইয়াছেন—তাঁহারা কে—মুসলমান দুর্গতদিগের সাহায্যের জন্য কত টাকা দিয়াছেন? তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও কি মুসলমানদিগেব জন্য অন্নসত্র খুলিয়া নিরন্ন মুসলমানদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন?

আসামের 'শ্রীহট্ট ক্রনিকল' পত্র ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লিখিয়াছিলেন, তখনই তথায় দলে দলে লোক বাঙলা হইতে অন্নাভাবে যাইতেছিল। তাহাদিগের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাহারা কেহ বা রেলস্টেশনে কেহ বা বৃক্ষতলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা যে অত্যাচার ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান —ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতি জিলা হইতে গিয়াছিল।

বাঙলার মুসলমানরা কি মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘের মুসলমান সচিবদিগকে—ভোট দিবার পূর্বেএ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

ইসলাম কখন মিথ্যার অনুমোদন করে না। কিন্তু এই সচিবগণ বাঙলায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই বলিয়া যে মিথ্যা প্রচার করিয়াছিলেন—তাহার ফল কি হইয়াছিল?

কেবল কি তাহাই? বাঙলার দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের বিবরণে প্রকাশ—

(১) যখন সরকারের দোকান খুলিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় একান্ত প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হয়, তখনও এই সচিবরা কিভাবে চাকুরীয়া নিয়োগ করা হইবে—অর্থাৎ কত জন মুসলমান আর মুসলমানাতিরিক্ত কত জন চাকরী পাইবে, তাহার বিবেচনায় যে সময় নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যেই বহু লোক অন্নাভাবে প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু কয়জন লোক চাকরী পাইয়া জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল? বাঙলার মুসলমানদিগের সংখ্যার অনুপাতে চাকরী কয়টি? মুসলমান জনসাধারণ তাহাতে কি উপকার পাইয়াছিল?

(২) যে সময় সকল দলের লোক লইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করাই—লোকের মনে আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য—প্রয়োজন ছিল, তখন মুসলিম লীগের জিদেই তাহা করা সম্ভব হয় নাই। লীগের নির্দেশ ছিল—লীগের আনুগত্য স্বীকার না করিলে কোন মুসলমান সচিবসঙ্ঘে গৃহীত হইতে পারিবেন না।

মুসলমান জনসাধারণ যে মুসলিম লীগের অনুগত সচিবসঙ্ঘ গঠিত হওয়ায় কোনরূপে উপকৃত হয় নাই, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সেইজন্য বাঙলার মুসলমান ভোট দাতারা যেন মুসলিম লীগের নামে বিভ্রান্ত না হইয়া উপযুক্ত লোককেই ভোট দেন।

বাঙলা হইতে কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ৬ জন মুসলমান সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। গত—প্রায় ১০ বৎসর কাল—মুসলিম লীগের অনুগত যে সকল মুসলমান বাঙলার প্রতিনিধিরূপে কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে ছিলেন, তাঁহারা বাঙলার মুসলমানদিগের হিতকর কি কাজ করিয়াছেন, তাহার হিসাব তাঁহারা দিবেন কি? সে হিসাব চাহিবার অধিকার বাঙলার মুসলমানদিগের আছে।

যে সচিবরা বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হইলেও তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা কেহ কেহ যদি এবার কেন্দ্রী পরিষদে নির্বাচনপ্রার্থী হন, তবে কি তাঁহারা ভোট পাইবেন?

বাঙলার স্বার্থ—বাঙলার হিন্দুদিগেরই স্বার্থ নহে—বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ। সে স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে কেন্দ্রী পরিষদে বাঙলার ভারতীয় প্রতিনিধি সকলকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। সে কাজ জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাই করিবেন। লীগের অনুগত মুসলমানগণ লীগের নির্দেশই পালন করিবেন এবং লীগ দুর্ভিক্ষের সময়ে বাঙলা সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ভুলা যায় না।

বাঙলায় কংগ্রেসের সহিত হিন্দু মহাসভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। আমরা শুনিয়াছি, বিরোধ হইতে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে কংগ্রেসীদল হইতে এমন প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, বাঙলা হইতে যে ৮ জন প্রতিনিধি কেন্দ্রী পরিষদে প্রেরিত হইবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ২ জন হিন্দু মহাসভার মনোনীত হইতে পারেন। ৮ জন না বলিয়া ৬ জন বলিলেই সংগত হয়। কারণ, ঐ ৮ জনের মধ্যে ২ জন যথাক্রমে—(১) জমীদারদিগের প্রতিনিধি, (২) ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কিন্তু হিন্দু মহাসভা অন্তত ৩ জন প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবেন বলায় সে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং এখন প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে।

আমরা ইহা দুঃখের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করি। বাঙলায় হিন্দুদিগের অভিযোগের কারণ যে আছে, তাহা আমরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু হিন্দু মহাসভা কর্তৃক মনোনীত নহেন, এমন লোক সদস্য হইলে সে সকল বিষয়ে হিন্দুর সংগত স্বার্থরক্ষার কার্যে অবহিত হইবেন না, এমন মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রীয় পরিষদে বাঙলার স্বার্থরক্ষার্থ হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই একযোগে কাজ করিতে হইবে। বাঙলায় যে ৩ জন ইউরোপীয় নির্বাচিত হইবেন, তাঁহারা যে বাঙলার স্বার্থরক্ষার জন্যও ভারতীয়দিগের সহিত একযোগে কাজ করিবেন, এমন আশা করা যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-নির্বাচন।

এই নির্বাচনের জটিলতা যেমন অধিক, গুরুত্বও তেমনই অসাধারণ। বাঙলায় সম্প্রদায়িকতার নরকাগ্নি নির্বাপণকল্পে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতেছিলেন, তাহার কাজ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। তাহার পরে যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

তিনি সেই সচিব-সঙ্ঘে হিন্দু মহাসভার লোকও গ্রহণ করিয়াছিলেন—কেবল লীগের অনুগত নহেন, এমন কোন সচিবের সহিত লীগের অনুগত মুসলমানরা একযোগে কাজ করিতে অসম্মত হওয়ায় সেই সচিব-সঙ্ঘে মুসলিম লীগের কোন লোক ছিলেন না। কিন্তু সেই সচিব-সঙ্ঘ যে কোনরূপে বাঙলার মুসলমানদিগের স্বার্থে অনবহিত হইয়াছিলেন, সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। কিন্তু সেই সচিব-সঙ্ঘের স্বাধীন মনোভাব তৎকালীন গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। তিনিই সেই সচিব-সঙ্ঘের পতন ঘটান। তাহার পর তিনি মুসলিম লীগের অনুগত মুসলমানদিগকেই সচিব-সঙ্ঘ গঠনের জন্য আহবান করেন এবং খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন কুলত্যাগী কংগ্রেসী বরদাপ্রসন্ন পাইন ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে লইয়া এক সচিব-সঙ্ঘ গঠিত করেন। এই ২ জন শরৎবাবুর 'দোহাই দিতে' দ্বিধানুভব করেন নাই এবং এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, শরৎবাবু তাঁহাদিগের কার্যের সমর্থন করিয়াছেন! তাঁহারা বলিয়াছিলেন—শরৎবাবু তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলিবামাত্র তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু শরৎবাবু যখন তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশ তাঁহারা গভর্নর মিস্টার কেসীর মারফতে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারা পদত্যাগ করেন নাই।

ইঁহারা—অথবা ইঁহাদিগের কেহ যদি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভের চেষ্টা করেন, তবে সে চেষ্টা যে কখনই অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছু পাইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচনে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। কাঁহারা মন্ত্রী হইবেন, সে দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। এবার কংগ্রেসকেই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের সহিত একযোগে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে হইবে। সেই কর্মভার গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিতে হইবে—যদি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়ন লাভের জন্য অগ্রসর না হন, তবে তাঁহাকে অগ্রসর হইবার জন্য প্ররোচিত করিতে হইবে—এমনও বলা যায়। যাঁহারা দেশের সেবার আগ্রহে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, সেইরূপ লোককেই সে দায়িত্ব দিতে হইবে—স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নে বঞ্চিত রাখিতে হইবে।

গত দুর্ভিক্ষের সময় বাঙলায় যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেরূপ সংকটকালে অনাচারের কত সুযোগ উপস্থিত হয় এবং কত লোক সেই সুযোগের প্রলোভন সম্বরণ করে না, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও বলিয়াছেন। কংগ্রেসের ছাড় লইয়া ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশকারী—এমন কি কংগ্রেসের কর্মকর্তাদিগের দলের লোকও যে চাউল, চিনি, সুতা, কয়লা প্রভৃতির ব্যবসায় লাভবান হইয়াছেন, তাহা বলা যায়। তাঁহাদিগের নামের তালিকাও প্রদান করা অসম্ভব বা দুষ্কর নহে। কংগ্রেসী দলের কোন প্রধান সদস্য সম্বন্ধে একদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কোন সচিব বলিয়াছিলেন—তাঁহার উক্তি তিনি (সচিব) ঘৃণাসহকারে অবজ্ঞা করেন; কারণ তিনি (ঐ সদস্য) ব্যবস্থা পরিষদে সচিবদিগকে আক্রমণ করিয়া অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া সচিবদিগের গৃহে গমন করিতে দ্বিধানুভব করেন না। সেই শ্রেণীর লোকরাও যে এবার কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও লক্ষ্য করা যাইতেছে।

সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে অনাচারের বিষয় বিবেচনা করিয়া রোল্যান্ডস কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন—অনাচার এত ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে যে, সরকার যেন মনে করেন, তাহার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হইতে পারে না।

সর্বত্র দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে যাঁহারা আদর্শ ও উপদেশ—এমন কি কঠোরতার দ্বারাও তাহা করিতে পারিবেন, সেইরূপ লোককেই বাছিয়া মন্ত্রী না করিলে কংগ্রেসেরও দুর্নাম ঘটিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধে লোকের আস্থাও শিথিল হইবে।

বাঙলা দুর্ভিক্ষে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে পুনর্গঠনের কার্য একান্ত প্রয়োজন এবং তাহাতে আর একদিনও বিলম্ব করা সঙ্গত হইতে পারে না। সে কাজ লোকের সাগ্রহ সহযোগিতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। লোকের সহিত একযোগে কাজ না করায় গত সচিবসঙ্ঘ ও তাহার পরে গভর্নর-শাসিত সরকার সেদিকে এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য কাজই করিতে পারেন নাই; হয়ত করেনও নাই। বাঙলা সরকার লোকের পরামর্শ পর্যন্তও না লইয়া বহু অর্থসাপেক্ষ যে গঠন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার অনেক অংশে যেমন অজ্ঞতাই সপ্রকাশ, অনেকাংশে তেমনই হাস্যোদ্দীপক। যে সময় ব্যবস্থা পরিষদও নাই সেই সময়ে লোকের কোনরূপ পরামর্শ না লইয়া এইরূপ ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করা কেবল স্বৈরশাসনশীল সরকারের পক্ষেই সম্ভব—সে সরকার দেশের লোকমত অনায়াসে পদদলিত করিতে পারেন এবং তাহা করিলে বোধ হয়, গর্বানুভব করেন।

বাঙলার সমস্যা বাঙালীকেই সমাধান করিতে হইবে—তাহা না হইলে প্রকৃত ও কল্যাণকর সমাধান হইবে না—হইতে পারে না।

সেই জন্যই বাঙলায় ব্যবস্থা পরিষদ গঠনের কার্যের গুরুত্ব অন্যান্য প্রদেশের সে কার্যের গুরুত্ব অপেক্ষাও অধিক।

বাঙলার সমস্যারও বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙলায় যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে, তাহাকে তাহা মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। সেই জন্যই যোগ্যতার, সাধুতার, সেবার আগ্রহের প্রয়োজন।

কিছুদিন বাঙলায় কংগ্রেসী দলেও বিভেদ হইয়াছিল। বাঙলায় "কংগ্রেস জাতীয় দলের" উদ্ভবের তাহাই কারণ। এবার কংগ্রেস পাকিস্থান ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার ফলেই কংগ্রেসের দলে আর বিভেদের কারণ নাই। ইহা বাঙলার পক্ষে সৌভাগ্যদ্যোতক এবং সুযোগের কারণ। সেই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া বাঙালীকে আপনার কল্যাণ ও উন্নতিসাধন করিতে হইবে। বাঙালীকে বাঙলার ত্যাগপূত নেতৃগণের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন—লোককে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যে অবহিত থাকিতে হইবে। আসন্ন নির্বাচন সত্যই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু তাহা যেন বৃহত্তর কার্যের জন্য লোকের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করে।

"শুধু থাক— একবিন্দু নয়নের জল"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

শান্তা বসে আছে খোলা জানালার কাছে। সম্মুখে একফালি সন্ধ্যাকাশে জ্বলছে অসংখ্য রূপোলী তারা, আর ঘরে জ্বলছে শান্তার কানের দুল দুটো।

গায়ে ওর একটা ভয়েলের ব্লাউস; ফিরোজা রঙের শাড়ীটার পেঁচানো আঁচল কাঁধের ওপোর দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে পেছন দিকে। পায়ের নীচে খোলা রয়েছে এক জোড়া চটি......

শান্তা ভাবছে......কি ভাবছে কে জানে! তবু যে ভাবছে, একথাটা সত্যি' এই সময়ে যে মানুষটি দরোজার পর্দা সরিয়ে আস্তে আস্তে পেছনে এসে দাঁড়ালো, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, মুখে একটা সান্ত্বনার নীরব আভাস।...

মাথার বিশৃংখল চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে ও একটু হাসলো, প্রশ্ন করলো ঃ—

"কি ভাবছো শান্তা?"

শান্তা চমকে উঠলো; হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচটা জেলে দিতেই সমস্ত ঘরখানা ফিকে নীল আলোয় ভরে উঠলো।... স্পষ্টও হয়ে উঠলো ঘরের মধ্যে সব জিনিষপত্রগুলো।...দেখা গেল একটা টেবিল, একটা ছোট খাটের বিছানা, একটা বই রাখা আলমারী, খানতিনেক চেয়ার...এই গুলোর মধ্যে বেশ একটা সুশৃংখল সমতা এনে ঘরখানাকে সাজানো হয়েছে আধুনিক রুচিতে। অবশ্য এ রুচি থেকে রবীন্দ্রনাথ আর দেশবন্ধুর ফটো দু'খানাও বাদ পড়েনি; বিবেকানন্দকেও দেখা যায় সেই শ্রেণীতেই, দেওয়ালের গায়ে খাটানো।...সামনের টেবিলে ছোট একটি ফুলদানি তাতে শোভাবর্দ্ধন করছে দুই একটি রজনীগন্ধার গুচ্ছ!... কিন্তু এ হলো ঘরের ভেতরকার দৃশ্য;— যাদের নিয়ে এই দৃশ্যের অবতারণা, তাদের মধ্যেই ফিরে আসা যাক।......এরা সংখ্যায় মাত্র দু'জন,...নারী ও পুরুষ! মেয়েটির নাম শান্তা, ছেলেটির নাম ফাল্গুনী রায়।

ফাল্গুনীর প্রশ্নের উত্তরে শান্তার রঙিন ঠোঁটে আমেজ লাগলো একটু স্মিতহাস্যের। ...মুখ ফিরিয়ে বললে ঃ—

"বোসো—রয়, বোসো!"...কালকে তোমার কথাই ভাবছিলুম!"

"কি সৌভাগ্য আমার! একথা ভাবতেও ভালো লাগে যে মিস্ সরকার,—শান্তা সরকার কোনও দিন আমার কথা ভেবেছিল!

"কেন, অসংগত এবং অসম্ভব কিসে?"

ফাল্গুনী বসেছিল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। পকেট থেকে একটা চুরোট বের করে ধরিয়ে বারকয়েক নিঃশব্দে ধূমপান করলে, তারপর সেটা দুই আঙুল চেপে ধরে জবাব দিলে ঃ—

"উঁহু—কিছুতেই নয়। অসংগতও নয়, অসম্ভবও নয়। যেহেতু—"

শান্তা প্রশ্ন করলো ঃ

"যেহেতু কি?"...

"কিছু মনে কোরনা, সত্যি কথা যদিই বলে ফেলি......

'বলো না, বারণ করছে কে?—আমি?

"আরে রামোঃ—। কি যে বল! দেখো, শুনতে যদি চাও তো বলি...আজকাল সিনেমা দেখেছ? তার মধ্যেই আছে বাড়ি গাড়ি আর শাড়ির একটু ইংগিত। জিনিষটা নেহাৎ অবহেলার বস্তু নয়। বরঞ্চ আদরণীয়ই বলা চলে। কিন্তু সেকথা যাক— এক কাপ গরম গরম চা আনাতে পারো? আজ ফুটবল গ্রাউণ্ডে গিয়ে পর্যন্ত ভিজেছি, বর্ষাতিটাও নিয়ে যাইনি কি না!......

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফাল্গুনী মুখ তুললে ঃ—

"রাগ করলে শান্তা?"

"রাগ? রাগ কার ওপোর করবো?"

"কেন, আমার ওপোর?"

"তোমার ওপোর?"

শান্তা হাসলো। বললে ঃ—

"দেখো ফাল্গুনী, রাগ মানে অভিমান জিনিসটা তখনই করা সম্ভব, যখন সে অভিমানের মান থাকবে বলে আশা করা যায়!"

"কেন, তুমি কি মনে করো আমি তোমার সে অভিমানের মান রক্ষা করার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য? কিসে? প্রতিপন্ন করো, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে মতামত প্রকাশ করলে চলবে না। বলতে হবে!"

শান্তার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল; মুখ থেকে শূন্য চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে সোজা হয়ে বসলো। কাঁধের ওপোরকার শাড়ীর আঁচলটা আর একটু কুঁচিয়ে সংযত করে বললে ঃ—

বলতে হবে বলে দাবী করলেই যে আমায় স্বীকার করতে হবে, তার তো কোনও সংগত কারণ নেই।"

"অসংগতই বা হলো?

"না তা হয় না ফাল্গুনী! তা হয় না।"

শান্তা একটু হাসতে চেষ্টা করলো ঃ—

"হয়তো বলবে কেন হবে না? হওয়া চাই-ই। কিন্তু সে কথা খাটে না সব সময়। ভেবে দেখো। তোমার আমার প্রথম পরিপরিচয়ের সন্ধ্যা মনে পড়ে?"

পড়ে।...তোমার বন্ধু রমার সেদিন আমার বন্ধু ভাস্করের সংগে বিয়ে। উৎসবের আনন্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার সংগে ছড়িয়েছে গান, গল্প আনন্দ আর রূপ। চারিদিকের সে তরংগ এসে প্রাণে লাগলো আমার, লাগলো তোমারও। যার জন্যে আমরা দুজনেই এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম একেবারে সামনা-সামনি! যে সামনে দাঁড়িয়ে দু'জনে দু'জনের মুখ দেখা চলে, কিন্তু মন বোঝা চলে না।"

এ সংশয় আজ মনে জাগবার হেতু?—"

ফাল্গুনীর মুখে হাসি উপছে পড়লো...

সব সময়েই হেতু আবিষ্কার করা চলে না শান্তা ঃ—

শান্তা মুখ ফিরালো; আলোর ঠিক বিপরীত দিকটার অন্ধকার ওর মুখের ওপোর ছায়া ফেললেও মনে হলো শান্তা যেন ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়; যে ভাবনার কথা ওর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে তা যেন আনন্দের নয়, কোনও দিন কোনও উৎসবের আভাসও ভেসে ওঠে না ওতে।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ছুটে এলো বুকের দুটো পাঁজর কাঁপিয়ে। সময় কেটে চলেছে...।

সামনের ঐ বোর্ডিং থেকে বিকৃত ..... গান শুরু হলো ঃ—

গেয়ে যাই, গান গেয়ে যাই!
গানের এ বহ্নিমালা দেব কারে
ভেবে না পাই!

ফাল্গুনী ডাকলে ঃ—

"শান্তা!"

শান্তা মুখ ফিরালো।......

ফাল্গুনী প্রশ্ন করলেঃ—

চিনুকে কেন? চিন্ময় বোস; আমাদের দলের বিপক্ষে যে চিরদিন নিজেকে প্রধান বলে প্রতিপন্ন করে এসেছে! সেই ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, খদ্দর পরা আর দেশের কথায় পঞ্চমুখ হয়ে বক্তৃতা দেওয়া যার অভ্যাস ছিল! চেন তাকে?"

শান্তা তাকিয়ে ছিল ফাল্গুনীর মুখের দিকে, একটু চমকে উঠলো যেন। তখনই সে ভাব সামলে নিয়ে বললেঃ—

"চিনি নয়,—চিনতাম তখন, যখন কলেজের গণ্ডি পার হয়ে বাইরের সংসারের আঘাত খাইনি!"

ফাল্গুনী হাসলোঃ—

সংসারে প্রবেশ না করেই আঘাত পেলে! বাহাদুরী আছে বটে এ আঘাতের! কিন্তু শান্তা সংসারের প্রবেশ করবার যে আশা আমরা দুজনে নিভৃতে বসে দিনের পর দিন ধরে রচনা করে এসেছি এতদিন, আজ তা সফল হবার সময় নিকটবর্তী হলেও আমার কি মনে হয় জানো?—

"মনে হয়—এ পথ যেন তোমার পক্ষে আমার পক্ষেও ঠিক নির্বিঘ্ন হবে না। কারণ আমরা দুজনেই খেয়ালী। যে খেয়াল মাঝে মাঝে মানুষের দুঃসহ হয়ে ওঠে, সেই আনবে যত বিঘ্ন যত অন্তরায়।' তাই মনে হয় বিবাহিত জীবন আজ আমরা সমাদরে বরণ করে নিলেও হয়তো সব সময়ে তা সহ্য করতে পারবো না! যার ফলে দিশেহারা হয়ে পড়বো, কোনও কূলেই পাব না জীবনের সমুদ্রে...কিন্তু তুমি কি ভাবছো শান্তা?

নিস্পৃহ স্বরে শান্তা জবাব দিলঃ—

"আমার কথা জিজ্ঞেস করছো?"

"হ্যাঁ,—তোমার কথা।"

শান্তা হাসলোঃ—"আমি? ফাল্গুনী বলতে পারো, আমার মত মেয়েরা কি ভাবতে পারে? জীবনে যাদের শুধু সমারোহের সঙ্গেই পরিচয়, সম্মান সে দেবে কাকে?"

"ঠিক কথা! কিন্তু শান্তা, দৈন্য তো শুধু বাইরেরই নয়, অন্তরের দৈন্যই যে সবচেয়ে বড় দৈ ! সে দৈন্য ঢাকবার মত পরিপূর্ণতা পৃথিবীতে ধন-ভাণ্ডারে খুঁজে পাবে না,—যাচ্ঞা করলেও মেলে না তা! কিন্তু দুষ্প্রাপ্য নয়—না চাইতেই যেদিন তাকে পাওয়া যায়, সেইদিনই সে করে আমূল পরিবর্তন!"

শান্তা হাসতে চেষ্টা করলেঃ—"ফাল্গুনী, একেই বোধ হয় পরশমণি বলে কেমন?"

"হতেও পারে। আমি কিন্তু তার স্পর্শ পাইনি। পাবো বলেও আশা হয় না কখনও!"

ফাল্গুনী হাসছিল,—

"তাই মনে হয়—সংসারের আশ্রয় না পেলেও যে আমি অচল হয়ে পড়বো, তা নয়। বরঞ্চ প্রাণশক্তিটাই সজাগ থাকবে চারিদিকে।..."

"কিন্তু তোমার ঐশ্বর্য?...তোমার দিকে তাকিয়ে আছে তোমার যেসব আত্মীয়স্বজন, তারা?—তারা কি তোমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করবে না?—"

করবে হয়তো,—"কিন্তু মনুষ্যত্বকে হত্যা ক'রে মানুষ বাঁচতে পারে না শান্তা! তাদের দাবী মেটাতে গেলে, আমি বাঁচবো না! কিন্তু জীবনের মায়া এত তুচ্ছ নয়। আমি আত্মহত্যা করতে চাইনে, আমি চাই বাঁচতে। কিন্তু সে কথা যাক্—আমি ব'ল্‌ছিলাম চিন্ময়ের কথা! তার সঙ্গে কাল দেখা হ'লো হঠাৎ—"

শান্তা তাকিয়েছিল ফাল্গুনীর মুখের দিকে, সে তাকানোর মধ্যে কোনও প্রশ্ন ছিল না, কোনও উত্তর ছিল না, ছিল একটা অনিশ্চিত ঔৎসুক্য। ফাল্গুনী সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে কি খুঁজছিল কে জানে—! একটু অন্যমনস্কভাবে ব'লে চললোঃ—

"কাল হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা! মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলাম এক বন্ধুকে দেখতে। দেখলাম—চিন্ময়কেও আনা হ'য়েছে সেই ওয়াডেই! এ্যাক্সিডেন্ট!—হয়তো বাঁচবে না সে! যাবে শান্তা, তাকে একবার দেখতে যাবে?—"

শান্তা তাকিয়ে আছে ফাল্গুনীর মুখের দিকে।...কোনও উত্তর ওর মুখ থেকে বার হ'লো না, কেবল ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠলো যেন, চোখ দুটো বড় হ'য়ে উঠলো বিস্ময়ে।

ফাল্গুনীর ঠোঁটের ওপর একটু হাসি ভেসে উঠলো।—সে হাসি তীব্র নয়,—পরম সান্ত্বনাময়,—স্নিগ্ধ। ......ডাকলোঃ—

"শান্তা—"

"বল!—"

ফাল্গুনীর চোখ দুটো বেদনায় ভ'রে উঠলোঃ—

"আমি জানি, আমিও বুঝি' শান্তা, কারণ আমি শয়তান নই, দেবতাও নই—আমি মানুষ! মানুষের দুঃখ-সুখ আমাকেও আঘাত করে। সে আঘাত ঐশ্বর্য দিয়ে ঠেকানো যায় না—তাই আমিও তা থেকে রক্ষা পাইনি! আমি জানি' আমার অর্থ, তোমাকে সামাজিক আড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য সমারোহের দিকে আকৃষ্ট ক'রলেও তোমার অন্তরকে আকর্ষণ ক'রতে পারেনি, তাই সমস্ত আশা আজ আমার অবসন্নতায় বেদনাতুর। কিন্তু তবু—তবু যে শান্তি আজ আমি লাভ ক'রেছি,—সেটা তোমায় প্রকাশ ক'রে জানাতে পেরেছি ব'লে! যাক, ওঠো শান্তা, কাপড় বদলে এসো, আমার অসুস্থ বন্ধু চিন্ময়কে দেখার ভার আজ আমি তোমার হাতেই দিতে পারি, আর কারো হাতে নয়,—ওঠো—!"

"ফাল্গুনী!...আমি, আমি যে......"

"না, না। কোনও কথা নয়। যেতে হবে। আমি জানি, শেষ শয্যার পাশে তার চোখের স্তিমিত দৃষ্টি কাকে দেখবার আশায় আকুল হ'য়ে আছে। তোমায় যেতে হবে—। ...চলো..."

শান্তা উঠে দাঁড়ালো।

পা দু'টো যেন ওর কাঁপছে, পৃথিবীর মাটি দুলে দুলে উঠছে চোখের সামনে।...... ওর যেন দাঁড়াবার শক্তি নেই,—তবু যেতে হবে। দূরে, অনেক দূরে কার দু'টো চোখের ওপর চিরদিনের জন্যে অন্ধকার নেমে আসছে, তবু সে খুঁজছে, কেবল খুঁজছে যাকে তার নাম শান্তা,—

তার সহপাঠিনী শান্তা।......

শান্তা ডাকলেঃ

"ফাল্গুনী!—"

ফাল্গুনীর প্রসারিত সবল হাতখানা ওকে ধ'রে ফেললে; ব'ললেঃ "ভয় কি,—চলো। আমার গাড়ি নীচে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিগত স্বপ্নেরা

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

তরল সোনার পাত চাঁদ থেকে নামে
তাই দিয়ে মোড়ানো মনের অবসর;
রোমাণ্টিক ধ্যানলোকে মরচেপড়া বিগত স্বপ্নেরা
ছাড়া পেয়ে ছুটোছুটি করে;
শূন্য স্বর্গে ঢেউ ওঠে—ফুলের গন্ধের উন্মাদনা
প্রেয়সীর স্পর্শ সুকোমল।
বেশ আছি: স্বপ্ন আর আমি।
যুগ হতে যুগান্তরে এই ছায়াপথ দিয়ে চলাচল করা
যদি চিরন্তন জানা যেত,

সোনা দিয়ে মোড়া এই অবসরটুকু
ঝাঁপি বন্দী যদি করা যেত—
তা হ'লে আমাকে নিয়ে রচা হতো নব মেঘদূতঃ
বিরহের দিনগুলো
মন্দাক্রান্তা ছন্দে ডুব দিয়ে
চিরন্তন স্বপনের নির্ঝরিণী হতো।
ক্ষীণায়ু দিনের কথা ভেবে তাই চোখে আসে জল,
মুহূর্তের বিনিময়ে হারানো এ সকল সম্বল
মনে হয় মূঢ় উন্মত্ততা।

কাহিনী খবর ভরপুরে

(৫)

দশ নম্বরের নতুন গৃহিণী

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে পুত্র-পরিবার নিয়ে বসবাস করেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেণ্টস এট্‌লি এখন সেখানে ঘর-সংসার পেতে বসেছেন। প্রধান মন্ত্রীর অনেক খবরই অনেকে রাখেন—কিন্তু তাঁর গৃহিণীর পরিচয়টাও তো জেনে রাখা দরকার। প্রধান মন্ত্রীর গৃহিণীর নাম ভায়োলেট হেলেন—১৯২২ সালের ১০ই জানুয়ারী—মিঃ এট্‌লির সংগে তাঁর বিবাহ হয়। এট্‌লি-গৃহিণী সাদাসিধে চালচলনের খেয়ালী মানুষ। সম্প্রতি মিঃ এটলি প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর এক সাংবাদিক এট্‌লি-গৃহিণীর সংগে সাক্ষাৎ করে বলেন—'আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।' তার জবাবে তিনি হাসতে হাসতে বলেন—"কি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমি কোনওকালেই কেউকেটা ছিলাম না—কোনওকালেই স্মরণীয় কিছু করিও নি। আমি শুধু একটি সাধারণ স্ত্রী ও মা হয়েছি—ঘর-সংসার দেখাশোনা করেছি—ব্যস আর কিছুই নয়।" সত্যিকথা বলতে গেলে তিনি নাকি ঠিকই তাই! ঘর-সংসারের কাজে তাঁর মত গৃহিণী খুব কমই নাকি দেখা যায়। তাঁর স্বামী মন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি সাইকেলে চড়ে দোকান, হাট-বাজার করেছেন—নিজে হাতেই জামা-কাপড় কাচা—ঘর-দুয়ার মাজা-মোছা ইত্যাদি সব করেছেন সমস্ত পরিবারের জামা সেলাই ইত্যাদি সব করেছেন—এবং এখনও ঠিক তাই করেন। এছাড়া তিনি স্বামীর মোটরগাড়ী চালিয়ে স্বামীকে এখানে সেখানে নিয়েও যেতেন। মোটর চালাতে তাঁর খুব ভাল লাগে। সিনেমার চেয়ে থিয়েটার দেখতে তিনি বেশী



এটলি গৃহিণী সেলাই করছেন.........

ভালবাসেন; তবে কালে-ভদ্রে তাঁর থিয়েটার যাওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছে। সংসারের কাজ-কর্মেই সারাটা দিন কাটে তাঁর। বই তিনি নিজে পড়তে তেমন ভালবাসেন না—তবে তিনি যখন বসে বসে সেলাই ফোঁড়াই করেন, তখন তাঁর স্বামী তাঁকে রকমারী বই চেঁচিয়ে পড়ে শোনালে খুব খুশি হন।

তাঁদের তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। 'জ্যানেট' আর 'ফেলিসিটি' বড় মেজো—দুই মেয়ে—সেজটি ছেলে 'মার্টিন' আর সবচেয়ে ছোট মেয়ে 'এলিসন'। এছাড়া আছে তাঁদের একটি কুকুর, টিং তার নাম। 'টিং' অনেক রকম কসরৎ জানে। এট্‌লি-গৃহিণী বক্তৃতা করতে পারেন না বটে, তবে সব জিনিসই গভীরভাবে



এটলি গৃহিণী! পাকা ড্রাইভার?

অনুভব করতে পারেন। প্রধান মন্ত্রীর গৃহিণী বলেন—দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়িতে এসেও তিনি তাঁদের আগের বাড়ি স্ট্যানমোর হাউসের কথা ভুলতে পারেন নি।

বার্নার্ড শ'র বেয়াড়া কথা

বার্নার্ড শ' চিরকালই বেয়াড়া কথা বলেন—এ আপনারা সবাই জানেন। সম্প্রতি আমেরিকার জাপান অধিকারের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ হোল যে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জাপান থেকে বেরিয়ে আসা এবং "অ্যাটম-বোমা-ভীতি"কেই বাকি কাজটুকু করতে দেওয়া। তিনি বলেছেন—"একটা দেশে পিস্তল হাতে নিয়ে বসে থাকা মানেই যুবকদের জীবন নষ্ট করে দেওয়া।" তাঁর এই উপদেশ যে কেউ শুনবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে হাসতে হাসতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেন—"যাই হোক, আর একটা যুদ্ধ বাধবেই।" বার্নার্ড শ'র উক্তি কটু হলেও মনে মনে অনেকেই এর সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবেন।

মলোটভের সন্দেহ

পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মনকষাকষি ও ঠোকাঠুকি শুরু হয়েছে এমন গুজব অনেকই শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মস্কোর 'প্রাভ্‌দা' পত্রিকা যদিও উত্তেজনার সুরে জোর দিয়ে বলেছেন—"পৃথিবীর প্রধান শক্তিদের মধ্যে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়নি, যার সমাধান অসম্ভব।" তবুও অবিশ্বাস এবং উত্তেজনা বাড়লো। লণ্ডনের ল্যাংকাস্টার হাউসে পররাষ্ট্রসচিবদের সম্মেলনে মলোটভ বলেছেন—"আপনারা কি ভাবেন আমি অপরাধী এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি? মলোটভের উত্তেজনা ও সন্দেহ কতখানি বেড়েছিল, সে সম্বন্ধে একটা কাহিনীও জানা গেছে। সেটা হচ্ছে, যখন রুশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব মলোটভ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর 'চেকার্স' বলে গ্রীষ্মাবাসে অতিথি হয়ে ক্লিমেণ্ট এট্‌লির সংগে সাক্ষাৎ করেন, তখন রুশ পররাষ্ট্রসচিব তাঁর তদ্বির করবার জন্য একজন রুশ-দাসী সংগে এনেছিলেন। 'চেকার্স'এর দাসীদের কাছে এ ব্যাপারটা ভালো ঠেকেনি, তাই তারা রুশ-দাসীটির কাজেকর্মে সব সময়ে কড়া নজর রাখতো। রুশ-দাসীটি একদিন যখন মলোটভের বিছানা করছিল, তখন যেই বালিশটি তুলেছে, ইংরেজ দাসীদের চোখ টপ্‌ করে সেদিকে পড়লো—তারা দেখলে, মলোটভের বালিশের তলায় রয়েছে লম্বা মোটাসোটা এক পিস্তল। মলোটভের পিস্তল রাখার যে অর্থই ইংরেজ দাসীরা করুক না কেন, এ যুদ্ধের শান্তি-ব্যবস্থার কর্তারা কেউই মনে মনে ঐ বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা এখনও ভুলতে পারেন নি।

চুলচেরা বিচার

সম্প্রতি জার্মানীতে এক আমেরিকান বিচারক বিচারশক্তির অপূর্ব পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে—হাইডেলবার্গ রেলস্টেশনে এক আমেরিকান সৈনিকের সংগে ১৭ বছরের এক সুন্দরী 'ফ্রলিন' (জার্মান তরুণী) গল্প করছিল—হঠাৎ এক ভূতপূর্ব জার্মান সৈনিক ছুটে এসে পকেট থেকে একটা কাঁচি বার করে কচ্‌ কচ্‌ করে তরুণীটির চুল কাটতে শুরু করে দিলে। মিলিটারী পুলিস দৌড়ে এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করলে এবং জার্মান ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করলে। পরের দিন এই ব্যাপারের বিচার হলো এক আমেরিকান বিচারপতির এজলাসে। তিনি রায় দিলেন—"আমেরিকানরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর তার পছন্দমত অপর নারী বা পুরুষের সংগে মাখামাখি করবার অবাধ অধিকার আছে। তুমি মেয়েটিকে এই-ভাবে ভয় দেখিয়ে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলে। তুমি যদি কৃতকার্য হ'তে, তাহলে মেয়েটিকে সমস্ত চুলগুলি খোয়াতে হোত। আমি কয়েকজন মেয়েকে জিগেস করেছি যে, তাদের মাথা নেড়া করে দিলে লম্বা চুল গজাতে কতদিন সময় লাগতো। তারা অধিকাংশই যা জবাব দিয়েছে, তা থেকে জেনেছি লম্বা চুল গজাতে ৯ মাস সময় লাগে। তোমাকে আমি ৯ মাসের জেল দিলুম।" বিচারপতির রায় এবং আমেরিকানদের প্রেমের উদারতা সবাই উপভোগ করবেন। একেই বলে চুলচেরা বিচার!

পরমাণুর শক্তি

শ্রীমৃগাংকশেখর সিংহ

ইংলণ্ডে যখন প্রথম বাষ্পীয়-শকট আবিষ্কৃত হয় তখন ঘোড়া-বিহীন গাড়ি কিরূপে চলে তাহা দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে রাস্তায় ভীড় জমিয়া গিয়াছিল। জলীয় বাষ্পের চাপকে কাজে লাগাইয়া বড় বড় গাড়ি অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাওয়া পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম বিস্ময়কর আবিষ্কার। ইহার পর ফ্যারাডে কর্তৃক বিদ্যুৎ-শক্তি আবিষ্কারের ফলে, মনুষ্য-সভ্যতার উন্নয়নকল্পে পদার্থ-বিজ্ঞানের বহুবিধ দানের কথা সকলেই অবগত আছেন। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক রেডিও, টকী, টেলিভিসন প্রভৃতিতে কিরূপে বৈদ্যুতিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার ইতিহাসও এখন আর নূতন নহে। পদার্থ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এক এক প্রকার শক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই কিরূপে সেই শক্তিকে ব্যবহার করিয়া মানবের কল্যাণে প্রয়োগ করা যাইবে তাহার চেষ্টা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান গবেষণার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে।

বাষ্পের শক্তির ব্যবহার আজ অত্যন্ত পুরাতন হইয়া গিয়াছে; বৈদ্যুতিক শক্তিও এতটা পুরাতন না হইলেও, ইহার ভূরি ভূরি ব্যবহার আমরা নিয়তই দেখিতেছি। কিন্তু আজ একপ্রকার শক্তির কথা বলিব যাহার আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞানের আর সকল আবিষ্কারকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। এই শক্তির সমকক্ষ কোনও শক্তির অস্তিত্বই একরূপ অসম্ভব। ইহা পরমাণুর শক্তি। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মধ্যেও তিনি বর্তমান। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশই পরমাণু, এবং এই ক্ষুদ্র-অংশের মধ্যে যে কি বিরাট শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহা বুঝিতে পারিলে গীতার উপরোক্ত বাণীর অর্থ কিছুটা বোধগম্য হইবে।

যে কোনও পদার্থের শেষ অবিভাজ্য টুকরাটিকে পরমাণু বলা হয়। এই টুকরাটিকে ভাঙ্গিলে আর ঐ পদার্থের কোনও ধর্মই তাহাতে বর্তমান থাকে না। ইহার আয়তন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। একটি আলপিনের মুণ্ডের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পরমাণু বর্তমান। সমস্ত পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক পরমাণুর অন্তরে একটি পরমাণু-বীজ (atomic nucleus) বর্তমান আছে। এই বীজকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দিকে কতকগুলি বিদ্যুতিন নিয়তই ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে। আমাদের সৌরজগতেও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থার উদাহরণ রহিয়াছে। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দিকে, পৃথিবী, মঙ্গল, শনি ইত্যাদি গ্রহ সর্বদাই ঘুরিতেছে; এবং সূর্যের তুলনায় যেরূপ গ্রহগুলি আয়তনে এবং ভারে একরূপ নগণ্য সেইরূপ পরমাণুর বীজের তুলনায় তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণকারী বিদ্যুতিন-গুলিও ভারে এবং আয়তনে নগণ্য। পরমাণু-বীজ কেবল এক বিষয়ে সূর্য হইতে পৃথক্ যে এই বীজ সকল ক্ষেত্রেই ধন-তড়িৎ সম্পন্ন (Positively charged)। সকল পদার্থেরই (হাইড্রোজেন ব্যতিরেকে) পরমাণু-বীজ দুই প্রকার ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। এক প্রকার কণা ধন-তড়িৎ সম্পন্ন এবং অন্যগুলি সম্পূর্ণ নিস্তড়িত (neutral)। প্রথমগুলিকে ধন-কণা বা প্রোটন (proton) এবং দ্বিতীয়গুলিকে নিস্তড়িত-কণা বা নিউট্রন (Neutron) বলা হয়। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মধ্যস্থিত এই বীজে বিভিন্ন সংখ্যার প্রোটন বর্তমান আছে। এই প্রোটন-সংখ্যা এক হইতে নিরানব্বই পর্যন্ত হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণুর বীজ মাত্র একটি প্রোটন লইয়া গঠিত। এবং সর্বাপেক্ষা ভারী ইউরেনিয়াম পরমাণুর বীজ ৯২টি প্রোটন দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পরমাণুর বীজে যতগুলি প্রোটন অবস্থিত আছে, ঠিক ততগুলি ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন বিদ্যুতিন (electrons) বাহিরে ঘূর্ণায়মান থাকে; এজন্য সম্পূর্ণ একটি পরমাণু একেবারেই নিস্তড়িত, কারণ প্রতিটি প্রোটন এবং প্রতিটি বিদ্যুতিনে তড়িৎমাত্রা সমান থাকায় একই সংখ্যার প্রোটন এবং বিদ্যুতিন মিলিয়া একটি নিস্তড়িৎ পরমাণুর সৃষ্টি করে।

বৈজ্ঞানিকেরা সকল মৌলিক পদার্থেরই পরমাণু-বীজের প্রোটন সংখ্যা নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন কয়লার পরমাণু-বীজে ৬টি প্রোটন, লৌহের ২৬টি, সীসার ৮২টি এইরূপ। ভিন্ন প্রোটন সংখ্যাই বিভিন্ন পরমাণুর প্রধান বিশেষত্ব। কারণ সর্বাপেক্ষা হাল্কা পরমাণু হইতে ক্রমশ ভারী পরমাণুর গুণ পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এই প্রোটন-সংখ্যা এক এক করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। কোনও পদার্থের পরমাণুর প্রোটন-সংখ্যাকে এই পদার্থের পরমাণু-সংখ্যা (Atomic number) বলা হয়। অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পরমাণু-সংখ্যা ৯২, সীসার ৮২, লৌহের ২৬, কয়লার ৬ এবং হাইড্রোজেনের ১। ইহার অর্থ এই যে, হাইড্রোজেন হইতে শুরু করিয়া পর পর সকল মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাইয়া গেলে, হাইড্রোজেন প্রথম স্থান, কয়লা ৬ষ্ঠ স্থান, লৌহ ২৬ তম স্থান, সীসা ৮২ তম স্থান, এবং ইউরেনিয়াম শেষ এবং ৯২ তম স্থান অধিকার করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কোনও পদার্থের পরমাণু-সংখ্যা (অর্থাৎ ঐ পদার্থের বীজের প্রোটন-সংখ্যা) পদার্থের তালিকায় তাহার স্থান নির্দেশ করিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরমাণু বীজ প্রোটন ব্যতীত অপর এক প্রকার নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন লইয়া গঠিত। নিউট্রন এবং প্রোটন প্রায় সম ভার সম্পন্ন। ধরিয়া লওয়া যাউক যে, প্রোটনের এবং নিউট্রনের ভার একমাত্রা; তাহা হইলে কোনও পদার্থের পরমাণুর প্রোটন নিউট্রনের সমষ্টির সংখ্যা পরমাণুর ভার নির্দেশ করিবে, কারণ বীজের বাহিরে যে সমস্ত বিদ্যুতিনগুলি আছে তাহারা বীজের ভারের তুলনায় নগণ্য। যেমন কয়লার পরমাণু-বীজের প্রোটনের সংখ্যা ৬ এবং নিউট্রনের সংখ্যাও ৬; অতএব কয়লার পরমাণু-ভার (Atomic weight) ১২ হইবে। সেইরূপ লৌহের পরমাণু প্রোটনের সংখ্যা ২৬, নিউট্রনের সংখ্যা ৩০; অতএব লোহার পরমাণু-ভার ৫৬ হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কোনও পদার্থের পরমাণু-ভার হইতে পরমাণু-সংখ্যা বিয়োগ করিলে ঐ পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা পাওয়া যাইবে। ১৯১৭ সালে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এ্যাস্টন (Aston) তাঁহার ভার-বিশ্লেষণ যন্ত্রের (Mass-spectrograph) সাহায্যে দেখাইতে পারেন যে, একই মৌলিক-পদার্থ দুই বা ততোধিক ভিন্ন-ভারসম্পন্ন পরমাণুর সমষ্টি হইতে পারে। যেমন কয়লার বহু পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, যদিও প্রায় সমস্ত কয়লার পরমাণুর ভার ১২২, তবুও কতকগুলি

কয়লার পরমাণুর ভার যে ১৩, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সেইরূপ লোহের অধিকাংশ পরমাণু (প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ) ভার ৫৬ হইলেও ৫৭, ৫৮ এবং ৫৪ ভার সমন্বিত লোহ পরমাণুও বর্তমান রহিয়াছে। একই মৌলিক পদার্থের (অর্থাৎ একই পরমাণু-সংখ্যা বিশিষ্ট) বিভিন্ন ভারের পরমাণু-সমষ্টিকে ঐ পদার্থের সমভারাণু (Isotope) বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি কয়লার ১৩ ভার বিশিষ্ট পরমাণুগুলি কয়লার একটি সমভারাণু বা আইসোটোপ। কয়লার পরমাণু সংখ্যা (Atomic number) ৬, অতএব কয়লার এই ১৩ ভারের সমভারাণুটির বীজে নিশ্চয়ই ৭টি নিউট্রন বর্তমান। সেইরূপ লোহের ৫৭, ৫৮, বা ৫৪ ভার-সমন্বিত সমভারাণু-গুলির প্রোটন সংখ্যা বা পরমাণু-সংখ্যা সব সময়েই ২৬, কিন্তু নিউটন সংখ্যা ৩১, ৩২ এবং ২৯। এক্ষণে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে একটি পদার্থের বিভিন্ন সম-ভারাণুগুলিতে কেবল নিউট্রন-সংখ্যারই তারতম্য, প্রোটন-সংখ্যা সব সময়েই সমান। সর্বাপেক্ষা ভারী পদার্থ ইউরেনিয়ামের ২৩৫ এবং ২৩৮ ভার সম্পন্ন দুইটি সমভারাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আলোচনা হইতে এক্ষণে বেশ বুঝা যায় যে কোনও পদার্থের পরমাণুকে যদি কৃত্রিম উপায়ে তাহার প্রোটন-সংখ্যা বাড়াইয়া বা কমাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ পদার্থটি সম্পূর্ণ অন্য পদার্থে পরিবর্তিত হয়।

পরমাণুর শক্তির উৎস কি তাহা বুঝিতে হইলে পরমাণুর বীজ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল তাহা পূর্বেই সম্যক-রূপে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া আমরা জানি যে বিদ্যুৎ-শক্তির সর্বপ্রধান রীতি এই যে সম-তড়িৎ সম্পন্ন দুইটি বস্তু পরস্পর বিকর্ষণ (repel) করে। যদি দুইটি ধন-তড়িৎ সম্পন্ন কিংবা দুইটি ঋণ-তড়িৎ সম্পন্ন বস্তু কাছাকাছি স্থাপিত করা হয় তাহা হইলে পরস্পরকে বিকর্ষণের ফলে তাহারা একটি অন্যটি হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইবে। এই পরস্পর বিকর্ষণ-শক্তি বস্তু দুইটির নিকটত্বের উপর নির্ভর করে। যতই বস্তুগুলি অধিক নিকটস্থ হইবে ততই তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ প্রবল-তর হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যেক পরমাণুর বীজে কতকগুলি ধন-তড়িৎ সম্পন্ন কণা প্রোটন অবস্থিত আছে। এই প্রোটনগুলির নিকটত্ব অত্যন্ত অধিক। ফলে তাহাদের মধ্যে পরস্পরকে বিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াসও অত্যন্ত বেশী। পরমাণু-বীজের প্রোটনগুলির মধ্যে দূরত্ব এক ইঞ্চির এক লক্ষ কোটীর এক ভাগ অপেক্ষাও কম। এখন এই অনুপাতে তাহাদের মধ্যে বিকর্ষণ-শক্তিও কিরূপ ভীষণ তাহা অনুমান করুন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা এই যে পরমাণু-বীজে প্রোটনগুলি এত অধিক নিকটে থাকিয়াও বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই কোনও অদৃশ্য দুর্ধর্ষ শক্তি প্রোটনগুলিকে তাহাদের বিকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তিকেই বীজের বন্ধন-শক্তি (binding energy) বলা হয়। এই শক্তি প্রত্যেক পরমাণু-বীজ কিরূপে সংগ্রহ করে এখন তাহাই বলিতেছি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমাংশে আইনস্টাইন আপেক্ষিকতত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেন যে পদার্থের ভার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হইয়া শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। ভার হইতে রূপান্তরের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন তাহার পরিমাণ ঐ ভারকে আলোকের গতির দ্বিত্বের সহিত গুণ করিলে পাওয়া যাইবে। আলোকের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল; ইহার দ্বিত্ব কত বেশী অনুমান করিলেই বুঝা যায় যে ভার হইতে শক্তিতে রূপান্তর হইলে ঐ শক্তির পরিমাণ কি সাংঘাতিক। যদিও কোনও পদার্থের ভারকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে রূপান্তর করা এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, কিন্তু আংশিক রূপান্তরের ফলেই কি পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহার আভাষ আমরা দিতেছি।

খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষার দ্বারা প্রোটন এবং নিউট্রনের ভার যথাক্রমে ১·০০৮১ এবং ১·০০৮৯ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সকল পরমাণুরই বীজের ভার এ্যাস্টনের ভার-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এইরূপে কয়লার ১২ পরমাণু-ভারসম্পন্ন পরমাণুর নিখুঁত ভার ১২·০০৪ পাওয়া গিয়াছে। আমরা জানি এই ১২ পরমাণু-ভার বিশিষ্ট কয়লার পরমাণু ৬টি প্রোটন এবং ৬টি নিউট্রন লইয়া গঠিত। অতএব প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজ নিজ ভার অনুযায়ী কয়লার পরমাণু-ভার ৬×১·০০৮১+ ৬ × ১·০০৮৯ = ৬·০৪৮৬ + ৬·০৫৩৪= ১২·১০২ হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় ইহার ভার মাত্র ১২·০০৪। তাহা হইলে ১২·১০২−১২·০০৪=·০৯৮ পরিমাণ ভার কোথায় অদৃশ্য হইল? এই ·০৯৮ পরিমাণ ভারই শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কয়লার বীজের প্রোটনগুলিকে উহাদের সম-তড়িৎজনিত বিক্ষেপণের বিরুদ্ধে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ এই ·০৯৮ পরিমাণ ভারই কয়লার বীজের বন্ধন-শক্তি (binding energy)। আইনস্টাইনের নিয়মানুযায়ী ১ মাত্রা ভার অর্থাৎ প্রায় একটি প্রোটনের ভার ১০ কোটী ইলেকট্রন ভোল্টের সমান। অতএব কয়লার বীজের বন্ধন-শক্তি প্রায় এক কোটী ইলেকট্রন-ভোল্ট। এক ইলেকট্রন-ভোল্ট বলিতে ইহাই বুঝায় যে একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা শক্তিসম্পন্ন

করাইলে ঐ ইলেকট্রনের যে শক্তি হয় তাহাই এক ইলেকট্রন-ভোল্ট। বিজ্ঞানে ইলেকট্রন-ভোল্ট দ্বারাই সাধারণত শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়। নিম্নোক্ত উপায়ে এই শক্তির মাত্রা সাধারণের অধিকতর বোধগম্য হইবে।

এক তোলা পরিমাণ কয়লার মধ্যে ১০২৪ অর্থাৎ একের পর ২৪টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় ততগুলি কয়লার পরমাণু আছে। এই পরিমাণ কয়লার প্রতিটি পরমাণুর বীজের বন্ধন-শক্তি একত্র করিলে দেখা যায় যে ঐ পরিমাণ কয়লা দগ্ধ করিলে যতখানি তাপ-শক্তি পাওয়া যায়—উহার বীজগুলির বন্ধন-শক্তি তাহার ১০ কোটী গুণ হইবে। তাহা হইলে এখন চিন্তা করিয়া দেখুন যে যদি কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা একটি একটি করিয়া সমস্ত কয়লার পরমাণুগুলি ভাঙিয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে বীজগুলির বন্ধনশক্তি নির্গত হওয়ার ফলে কি ভয়ানক পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইবে। সম্পূর্ণরূপে পরমাণুটিকে না ভাঙিতে পারিলেও কোনও উপায়ে একটি পরমাণুকে অপেক্ষাকৃত কম বন্ধন-শক্তি বিশিষ্ট ভিন্ন পরমাণুতে রূপান্তরিত করিতে পারিলেও এই ভীষণ শক্তির কিয়দংশ তাপ অথবা অন্য কোনও আকারে প্রকাশিত হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বনামধন্যা ফরাসী মহিলা বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরী আবিষ্কার করেন যে, রেডিয়াম প্রমুখ কয়েকটি ধাতু হইতে স্বতঃই তিন প্রকারের কণা নির্গত হইয়া ঐ ধাতুগুলি নিম্নস্তরের ধাতুতে পরিণত হইতেছে। এই প্রক্রিয়াকে স্বতঃস্ফূরণ (radioactivity) বলা হয়। স্বতঃস্ফূরণের ফলে রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু হইতে যে তিন প্রকার কণা নির্গত হয়—তাহাদিগকে যথাক্রমে আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি বলা হয় (a, b এবং g)। আলফা কণাগুলি দুইটি প্রোটন এবং দুইটি নিউট্রনের সমষ্টি। বিটা কণাগুলি সাধারণ বিদ্যুতিন বা ইলেকট্রন। এবং গামা-রশ্মি অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন সাধারণ আলোকরশ্মি।

এক পরমাণুকে কৃত্রিম উপায়ে অন্য পরমাণুতে রূপান্তর করিতে হইলে পরমাণুর ন্যায়ই সূক্ষ্ম অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন কণা দ্বারা আঘাত করিতে হইবে। মাদাম কুরী আবিষ্কৃত স্বতঃস্ফূরণ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের কার্য বহুদূর অগ্রসর করিয়া দেয়। পরমাণু সম্বন্ধে বহুদিন যাবৎ গবেষণায় রত রাদারফোর্ড সহজেই উপলব্ধি করেন যে স্বতঃস্ফূরণকারী ধাতু হইতে নির্গত আলফা কণাগুলি অন্য পরমাণুকে আঘাত করার কাজে লাগান যাইতে পারে। পরমাণুকে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরের চেষ্টায় রাদারফোর্ডই সর্বপ্রথম সাফল্যলাভ করেন। আলফা কণার দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করার ফলে নাইট্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং এই রূপান্তরের ফলে প্রতি নাইট্রোজেন পরমাণু হইতে একটি প্রোটনও নির্গত হয়। ইহার পর রাদারফোর্ড এবং অন্যান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক অনেকগুলি হাল্কা পদার্থের পরমাণু, আলফা কণা এবং প্রচুর শক্তিসম্পন্ন প্রোটন দ্বারা আঘাত করিয়া অন্য পরমাণুতে পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আলফা কণা বা প্রোটন দ্বারা পরমাণুকে আঘাত করার এক অসুবিধা হইতেছে যে, এই দুইটি কণাই ধন-তড়িৎসম্পন্ন বলিয়া পরমাণু-বীজের ধন-তড়িৎ দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে বিকর্ষিত হয়; এজন্য এই দুইটি কণাই পরমাণু-বীজ প্রবেশ করাইতে হইলে ইহাদের প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন। সম্প্রতি চ্যাডউইক সর্বপ্রথম নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রনের আবিষ্কার করায় পরমাণু রূপান্তরের এক নূতন পথ দেখিতে পাওয়া যায়। নিউট্রন কণার কোনও তড়িৎ-শক্তি না থাকায় সহজেই পরমাণু-বীজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। নব-আবিষ্কৃত এই কণা দ্বারা পরে বহু পরমাণু রূপান্তরিত হইয়াছে। তবে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন দুইজন জার্মান বৈজ্ঞানিক হান এবং মাইটনার। এযাবৎ যে সমস্ত পরমাণু পরিবর্তনের কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ফলে একটি পরমাণু অন্য আর একটি পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং তাহার সহিত ছোট ছোট শক্তিশালী কণা নির্গত হয়; যেমন—নিউট্রন, প্রোটন, অথবা এই দুইয়ের সমষ্টি—"ডয়টরণ" (Deuteron) কিংবা আলফা কণা। কিন্তু উপরিউক্ত দুইজন বৈজ্ঞানিক দেখিতে পান যে, সর্বাপেক্ষা ভারী পরমাণু ইউরেনিয়ামকে যদি নিস্তড়িৎ কণা নিউট্রন দ্বারা আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ইউরেনিয়াম পরমাণু টুকরা টুকরো হইয়া দুই বা ততোধিক ভিন্ন পদার্থের পরমাণুর সৃষ্টি করে। ইহা আর পরমাণুর রূপান্তর নহে। ইহা একটি পরমাণুর সম্পূর্ণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া ছোট ছোট কয়েকটি ভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি। ইহাকে বীজ-ভঙ্গ বা (Nuclear fission) বলা হয়। এইরূপ বীজ-ভঙ্গের ফলে অপেক্ষাকৃত কয়েকটি ছোট পরমাণুর সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও প্রভূত পরিমাণে ইউরেনিয়ামের বীজ হইতে বন্ধন-শক্তি নির্গত হয়। এই বন্ধন-শক্তির পরিমাণ প্রতি পরমাণুতে প্রায় ৭০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট। এই বীজ-ভঙ্গের অন্য একটি মজার বিষয় এই যে, নিউট্রন দ্বারা আঘাতের ফলে এই বীজ-ভঙ্গ সংঘটিত হইয়া আবার ইউরেনিয়াম বীজ হইতে নূতন নিউট্রন বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। দেখা যায় যে, প্রতিটি বীজ ভগ্ন হইয়া গড়ে তিনটি করিয়া নিউট্রন সৃষ্টি করে। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই নব-বহিষ্কৃত নিউট্রনগুলিকে যদি পুনরায় ইউরেনিয়াম বীজ-ভঙ্গের কাজে লাগান যায়, তাহা হইলে বীজ-ভঙ্গের ফলে পুনরায় প্রভূত বন্ধন-শক্তির আবির্ভাব হইবে এবং নূতন নিউট্রনেরও সৃষ্টি হইবে। এইরূপে আপনা হইতেই ইউরেনিয়াম বীজগুলি উত্তরোত্তর ভাঙিয়া চলিতে থাকিবে। একতোলা পরিমাণ কয়লার পরমাণু ভাঙিলে কিরূপ শক্তি নির্গত হয়, তাহার অনুমান আমরা দিয়াছি। এখন চিন্তা করুন, একতোলা পরিমাণ ইউরেনিয়াম (যাহা কয়লা অপেক্ষা প্রায় কুড়ি গুণ ভারী) পরমাণু ধ্বংসের ফলে কিরূপ শক্তি সৃষ্টি করিবে। কুক্ষণেই হান্ এবং মাইটনার এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়া যে মারণাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অভূতপূর্ব শক্তির মূল কোথায়, আশা করি এখন তাহা কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আসামে মহাপুরুষবাদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শ্রীশংকরদেব প্রবর্তিত ধর্ম মহাপুরুষিয়া ধর্ম নামে পরিচিত। শংকর-শিষ্য মাধবদেব কর্তৃক এই মহাপুরুষিয়া মত বিশেষরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশংকরদেবের প্রধান শিষ্য একজন মাধবদেব, অন্যজন দামোদর-দেব। শংকরদেব কায়স্থ ছিলেন, মাধবদেবও কায়স্থ। দামোদরদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরবর্তীকালে অহোমরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় দামোদর-শিষ্য বংশীগোপালদেব অব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলে এই কথা প্রচারিত হয় যে, দামোদরদেব শংকরদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাঙলার শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট হইতে বিশ্বস্ত বাহক-হস্তে শীল-মোহরযুক্ত মন্ত্র ও জপের তুলসীমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে রচিত পুস্তকের অসদ্ভাব নাই। জানি না এই কথায় কোন সত্য আছে কি না!

বংশীগোপাল অহোমরাজের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত ও বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আসামের সুপ্রসিদ্ধ আউনী-আটি সত্র বংশীগোপাল-শিষ্য নিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে, বংশীগোপাল মাধবদেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শংকরদেবের তিরোধানের পর দামোদরদেব একটি পৃথক সত্র স্থাপন করিয়া বংশীগোপালকে অহোম রাজ্যে ধর্ম প্রচারার্থে পাঠাইয়া দেন। দামোদরদেবের আর একজন ব্রাহ্মণ-শিষ্য ভট্টদেব, ইনি পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত হন। দামোদরদেব প্রতিষ্ঠিত সত্রের অধিকার ইহার উপর অর্পিত হয়। কোচ বিহারে দামোদরদেবের অন্য একটি সত্র ছিল। ব্রাহ্মণ শিষ্য বলদেব তাহার ভার গ্রহণ করেন। শংকরদেব ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরে তারক-ব্রহ্ম মন্ত্রের 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' চারি অক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া এই নাম কীর্তনই সাধন বলিয়া প্রচার করেন। আসাম জোড়হাটের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাজমোহন তত্ত্বভূষণের মতে এই ভট্টদেব ও বলদেব মিলিয়াই কীর্তনের স্থলে পূজা-মন্ত্র আদির প্রবর্তন করেন। ইঁহারা মহাপুরুষবাদের পরিবর্তে ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ গোস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায় বামুনিয়া বা দামোদরীয়া নামে বিখ্যাত হয়। মহাপুরুষিয়া মতবাদ হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ইঁহারা নিজেদের ধর্মকে ভাগবতী ধর্ম নামে পরিচিত করিয়াছেন।

মাধবদেব প্রচারিত ধর্মই মহাপুরুষিয়া ধর্ম, ইহাই অনেকের মত। রংপুর জেলার বাস্তুসা গ্রামের রামকণা গিরি নামক একজন ভূঞা (কায়স্থ) কার্যোপলক্ষে নওগাঁ অঞ্চলের বরদোয়ায় কিছুদিন অবস্থিতি করেন। শ্রীরাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—দেশে পুত্রাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি শংকরদেবের এক সম্পর্কীয়া ভগিনীকে বিবাহ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে বর্তমান লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। সেখানে ১৪১১ শকাব্দায় (১৪৮৯ খৃীষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা প্রতিপদে মাধব-দেবের জন্ম হয়। মাধবদেব সম্পর্কে শংকরদেবের ভাগিনেয়। মানসিক দুর্গা-পূজার বলি দিবার উদ্দেশ্যে ছাগ ক্রয় করিবার জন্য মাধবদেবের ভগিনীপতি রামদাস শংকরদেবের বাসগ্রামে উপস্থিত হইলে শংকরদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ছাগবলি বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। রামদাস ফিরিয়া গিয়া মাধবদেবকে সঙ্গে লইয়া আসেন। মাধবদেব শংকরদেবের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। তর্কের সময় শংকরদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবতের—

যথা তরোর্মূল নিসেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ॥
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথাচ সর্বার্চ্চন মচ্যুতে জ্যা॥

শ্লোকটি শুনিয়াই মাধবদেবের মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি শংকরদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং একান্ত অন্তরঙ্গ সর্বপ্রধান শিষ্যের অধিকারপ্রাপ্ত হন। ইঁহার রচিত নাটক আছে, ভক্তিরত্নাবলীর অনুবাদ আছে। ইঁহার রচিত ঘোষা আসামে সর্বজন-পরিচিত। ১৫১৮ শকাব্দায় (১৫৯৬) খৃীষ্টাব্দে) ভাদ্র কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে মাধবদেব কোচবিহারে স্বর্গগত হন।

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলেন, কীর্তনের সঙ্গে ঘোষার পার্থক্য আছে। কীর্তনের ধ্রুব-পদকে ঘোষা বলে। আদিতে ঘোষা গান করিয়া মূল গায়ক কীর্তন গান করেন, দোহারগণ প্রতিপদ কীর্তনের শেষে ঘোষার পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। কীর্তনীয়া কেবল পদের পর পদ গান করিয়া যান।

অপর ঘোষা অর্থে ঘোষণা করা। ঘোষা গীতি একজনই গান করে, অন্য সকলে শোনে। কখনো কখনো ঘোষা দুই তিনজন মিলিয়াও গাহিয়া থাকে। মাধবদেব সকল তত্ত্বের সার সংকলনপূর্বক এক হাজার শ্লোক রচনা করেন; এই শ্লোকগুলিই ঘোষা নামে পরিচিত; বলা বাহুল্য শ্লোক সংস্কৃত নহে, অসমীয়া ভাষায় রচিত। ঘোষার শ্লোকের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ আছে। মাধবদেব বলিয়াছেন—"সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সারতত্ত্ব পাইয়াছি, গুরুর নিকট হইতে যে পরমার্থ তত্ত্ব পাইয়াছি, নিজের বিচার-বুদ্ধি জ্ঞানমতে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই ঘোষাতে নিরূপিত করা হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়ের মতে যিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর হইতে উত্তম, গীতার সেই পুরুষোত্তমকেই মাধবদেব মহাপুরুষরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি ঘোষা হইতে উদাহরণ দিয়াছেন—মাধবদেব বলিতেছেন—

প্রকৃতি পুরুষ দুইতো করি পর
দুয়োরে নিজ কারণ
পরম ঈশ্বর নামক ধরিয়া
আছো তাতে নারায়ণ॥ (১৭৩)
ঈশ্বরের সেবা করন্ত জীবর গুছয় মায়ার ভ্রম।
ব্রহ্মপদে শুদ্ধ জীবক বুলিয় ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম
(১৭৪)
অন্তর্যামীরূপে জীব আদি করি
নিয়ামন্ত সমান্তক।
এহি হেতু সে পরমাত্মা পদে
বুঝি জান ঈশ্বরক॥
(১৭৫)
ব্রহ্ম পরমাত্মা করিয়া যিহেতু
ঐশ্বর্যের নাহি অন্ত।
এহি হেতু মহামহন্ত সকলে বোলে
তাক্তক ভগবন্ত॥
(১৭৬)
পুরুষোত্তমর প্রেম ভকতি সুখক মাত্র
নিশ্চয় করিল যিটো জন।
শরণ কলব পরা সিদ্ধিব কিঙ্কর শুচি
করে সদা শ্রবণ কীর্তন॥

ইহা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অনুসরণে মাধবদেব যে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তের অনুভূতিলব্ধ ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান এই তিন রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং এই তিনের মিলিত রূপই যে পুরুষোত্তম, তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কথাও জানা যায়।

ঋষিগণ একদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং"।

ওগো অমৃতের পুত্রগণ শোন, আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতে এই মহাপুরুষের বন্দনা আছে। একাদশ স্কন্ধে দেবর্ষি নারদ শ্রীবসুদেবের নিকট নবযোগীন্দ্র সংবাদ বর্ণনা করিয়াছেন। কলিযুগের অবতারের বর্ণনা করিয়া যোগীন্দ্রগণ তাঁহার বন্দনা-মন্ত্র বলিয়াছেন—

(১)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং
তীর্থাস্পদং শিব বিরিঞ্চী নুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধি পোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

(২)

তত্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্য বচসা যদ গাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

আমার মনে হয়, মাধবদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই মহাপুরুষ শব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান,—এক কথায় পুরুষোত্তমই হয়তো তাঁহার নিকট মহাপুরুষরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ তত্ত্বভূষণ সঙ্কলিত "মাধবদেবের বরগীত" হইতে মাধবের উপাসনা প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। মাধব দাস্য ভাবের উপাসনাই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী যেমন বলিয়াছেন—"জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস" মাধবদেবও তেমনই বলিয়াছেন—

রাগ আশোয়ারী

মেরো অবনাথ আত্মা নন্দলাল।
বরাহি ঠাকুর হরি দীন দয়াল॥
আপোনাহি মানি হরিক পদে দাসা।
শিব চতুরমুখ করতু উপাসা॥
শরীর আতমা মানি সব লোই চোর।
জ্ঞানী আতমা আপে হারামহি ঘোর॥
সেবক সেবহু মানি আত্মা গোবিন্দে।
রাখত মন হরি পদ অরবিন্দে॥
মাধব দাস কহত তত্ত্ব ওই।
হরি বিনে হামারি আওর নাই কোই॥

যাহারা শরীরকে আত্মা মনে করে, মাধবদেব তাহাদিগকে চোর এবং সোহংবাদী জ্ঞানীকে নিমকহারাম বলিয়াছেন।

মীরাবাঈর মত মাধবদেবও ভগবানের নিকট চাকরী চাহিয়াছেন।

রাগ বরাড়ী

গোবিন্দ দীন দয়াশীল স্বামি।
তুঁহু মেরি সাহেব চাকর হামি॥
কাকু করিয়া তুয়া চরণে লাগোঁ।
অরুণ চরণে চাকরী মাগো॥
তেরি চরণে মেরি পরণাম।
চাকরি মাগোঁ নাহি আন কাম॥
আপন করমে জনম যাঁহা হোই।
তাঁহা তুয়া চরণে চাকর বহু মোই॥
মাধব দাস কহয় মতিহীনা।
গতি মেরি নাহি তুয়া পদ বিনা॥

মাধবদেবের বংশী-তত্ত্ব বা সৃষ্টি-তত্ত্ব এইরূপ—

রাগ বরাড়ী

হরির বংশীর ভাই শুনিয়ো কারণ।
যিহেতু বাঁশীর রবে মোহে ত্রিভুবন॥
নিজে বংশী ভৈলা মূল প্রকৃতি প্রথম।
সাত গুটি রন্ধ্রে সাত প্রকৃতি নিয়ম॥
হরির অধরে ফুঙ্কে পুরুষ চৈতন্য।
জড় বংশী প্রকৃতি করয়ে প্রবর্তন॥
কোমল অঙ্গুলিচয় রন্ধ্র মধ্যে চাপি।
বহু রসে বাঁশীটি বজাওত বনমালী॥
যিতো নিজ মায়া মোহি আছে চরাচরে।
হরির বাঁশীয়ে ত্রিভুবন মোহ করে॥
এহি হেতু বাঁশী নিজ মায়া ভগবন্ত।
ত্রিভুবন মোহি নিরবধি বজায়ন্ত॥
মোহন বাঁশীর নিজ কৈল প্রয়োজন।
কহয় মাধব মেরি গতি নারায়ণ॥

মাধব বংশীকেই মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন। বংশীর সাতটি রন্ধ্রকে সাতটি প্রকৃতি বলিয়াছেন। গীতায় ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই আটটি অপরা-প্রকৃতি এবং জীবকে পরা-প্রকৃতি বলা হইয়াছে। জীব অনু চৈতন্য, কিন্তু মাধবদেবের বংশী মূল-প্রকৃতি হইয়াও জড়। শ্রীরাজমোহন নাথ মহাশয় অনুমান করেন, মাধবদেব হয়তো মন ও বুদ্ধিকে একটি প্রকৃতি ধরিয়াছেন। বংশী জড় প্রকৃতি হইলেও হরির অধরে চৈতন্য-পুরুষ আসিয়া ফুৎকার দিয়া প্রকৃতিকে প্রবর্তন অর্থাৎ ক্রিয়াশীল করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিয়াছেন—"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" হরির এই কামনা—সৃষ্টি কামনাই জড়-প্রকৃতি বংশীতে ফুৎকার—ইহা ধরিয়া লওয়া চলে। এই ফুৎকারে প্রণব উদ্গীত হয়; এ ব্যাখ্যাও মন্দ হয় না। মাধব বলিতেছেন, হরির চরাচর মোহকরী সমস্ত মায়ার মূল মায়া এই বংশী। এইজন্যই ত্রিভুবন-বিমোহিনী বংশী হরির নিজ মায়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যোগমায়া চৈতন্যরূপিণী, তিনি জড়প্রকৃতি নহেন। সুতরাং দুই মতে পার্থক্য থাকিয়া গেল। ব্রহ্ম-সংহিতায় বংশীকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখী বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার্যগণ কেহ কেহ বংশীকেই যোগমায়া বলিয়াছেন। হরির অধরে থাকিয়া যে চৈতন্যপুরুষ বংশীতে ফুঁক দিয়াছেন বা প্রণব উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাকে অক্ষর পুরুষ বলা যাইতে পারে। অক্ষর-পুরুষ চৈতন্যময়। ইনিই কূটস্থব্রহ্ম এইরূপ বলা চলে; ক্ষর-পুরুষ জীব—অনু চৈতন্যময়।

মাধবদেবের কয়েকটি পদ বৈষ্ণব পদাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গোপীগণের কৃষ্ণ-দর্শনে পূর্বরাগ বা রূপানুরাগের পর্যায়ে রাখা যায়, এইরূপ দুই একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

রাগ মায়ূর

শ্যামচান্দ মুখ পেখলো মুই।
কদম্ব কান্ধে রহি ফিরি ফিরি চাই॥
কদম্ব মালা গলে শোভিত ভালি।
এ তিনি ভুবনমোহন বনমালী॥
কুণ্ডল ঝলমল গণ্ডে মোরা।
ঈষত হাসিরসে মুখস চোরা॥
অমল কমল দল লোচন রাতা।
অপরূপ নিরমিল কেমন বিধাতা॥
সকল কলারস শিখ নাগরা।
মাধব কহ গতি গোবিন্দ মোরা॥

রাগ মায়ূর

দেখত নাগর নট বিলসিয়া
বালক সহ কানু সাজ তরি।
ভুবন সুন্দর বর শ্যাম মনোহর
চান্দ কোটি জিনি রাজ তরি॥
রতন ভূষণে চারু অঙ্গ বিভূষিত
চরণে মাঞ্জীর মণি বাজ তরি।
ভ্রূব সুবলিত চারু বঙ্কিম লোচন
পেখি মদন কোটি লাজতরি॥
ঈষত মধুর হাসি বংশী বিনোদিত
মোদিত পঞ্চম গায়তরি।
নন্দকুমার চরণযুগ রাজীব
মাধব মন বহু ডবতরি॥

এই পদটির ছন্দ-ঝঙ্কার অতি চমৎকার।

রাগ বাগেশ্রী

কানাইর কমলমুখ দেখিতে নয়ন সুখ
কোটি ইন্দু জিনি পরকাশে।
শ্যামল সুন্দর বর নব নীল জলধর
তনু ভাল শোহে পীতবাসে॥
আভীর বালক সঙ্গে খেলন খেলয় রঙ্গে
রহিয়া কদম্ব তরু তলে।
হাসি হাসি বাঁশী বায় বঙ্কিম নয়নে চায়
কদম্বের মালা লোলে গলে॥
অরুণ চরণ মাজে মাঞ্জীর ঝমকে বাজে
সাজে কোটি মনমথ জিনি।
যমুনা পুলিন বনে ধাধা ধায়া রঙ্গ মনে
গেণ্ডুয়া খেলয় যদুমণি॥
তেজিয়া বৈকুণ্ঠ সুখ লীলায়ে গোপের রূপ
ধরি হরি গোধন চরায়।
ভকত বৎসল দেব নাহি হরি সম কেব
মাধব দীন গুণ গায়॥

অনুবাদসাহিত্য

তোমাদের আমি

লুই ব্রমফিল্ড

জেনোবাকে আমি দেখেছি কয়েকবারই তাকে নিয়ে গল্পও লিখেছি। প্রথম যখন লিখি, নোতুন লেখক, বেশ জমাটি প্রেমের কাহিনীই লিখে বসলাম; শেষবার যখন লিখলাম, এমনি সাধারণগোছের গল্প, সচরাচর যা ঘটে তাই। কিন্তু মেরে ফেলেছিলাম দুবারই তাকে; যদিও আজ সে বেঁচে আছে সশরীরে।

যাক্ ও কথা।

একটা অদৃশ্য শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি, অনুভব করি; সারাজীবনে বহুজনের সংগে দেখা হয়, পরিচয় হয়; কিন্তু মাত্র কয়েকজনই এমনিভাবে মনে দাগ কেটে যায়— তাদের ভোলা যায় না। সব সময়েই, সব কথায় মনে পড়ে, তারা যেন অতি-পরিচিত আপনার জন!

জেনোবার বেলাতে ঠিক সেই কথাই বলা চলে, মাত্র কয়েকবার তাকে দেখেছিলাম— আজ অবধি সে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তেমনি মূর্তিতে। প্রথম তাকে দেখেছিলাম আমার ছেলেবেলায়।

পাহাড়ী দেশ। বন্ধুর পর্বতমালা, শুঁয়োপোকার মত সর্বাংগে গাছের শিকড় জড়িয়ে নিঝুম হয়ে স্বপ্ন দেখি। চাঁদনী রাতে থমথমে আলোয় আফিমখোরের মত ঝিমোয়। মাঝ দিয়ে গা বয়ে লালপথটা ছোট্ট দুরন্ত মেয়ের মত ছুটে চলে গেছে এঁকেবেঁকে উঠে নেমে। বড় ভাল লাগে আমার। স্বপ্ন দেখা পাহাড়. আকাশ-ছায়া, আলোর দেশের যাত্রী ওরা। মানুষকে কবি করে দেয়—স্বপ্নালু করে তোলে!

বাবার সংগে গাড়ির পিছনে চুপ করে বসে দেখতে দেখতে যেতাম। নীচু পথটার বাঁকে বাঁকে শুরু হয়েছে নোতুন রাজ্যের সীমা! রাস্তার উপর থেকে খেঁকশিয়ালী, নেকড়ের বাচ্চাগুলো ভীরু চোখের চাহনিতে চারদিকে দেখে আবার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়। দূরে ঝরণার শব্দ কানে আসে, বনের মধ্যে যেন নাচের আসর বসেছে। দুটো কুঁদো খরগোস চেয়ে থাকে আমাদের দিকে; কাঠ-বিড়ালীটা বিজ্ঞের মত চেয়ে থাকে আশী বছরের জীর্ণ বুড়োর চাহনিতে!

'বাবা, ওরা পালাচ্ছে না কেন?'

আমার কথায় বাবা হাসেন!—'এখানে কেউ ওদের মারতে আসে না। জেনোবা রয়েছে যে।'

জেনোবা! বনের পশুপাখী যার জন্য ভয় ভুলে যায়, জানি না সে জিন কি পরী, না হয় আর কিছু! একটা বিচিত্র কল্পনা আসে মনে তাকে নিয়ে।

চমৎকার! পাহাড়ের মাথাটায় কোন গাছ-পালা বেশি নাই। নীচে আশেপাশে সারি সারি পর্বতমালা—নীরব নিথর কপিশ পর্বতমালা, সানুদেশে আমাদের ছোট্ট গাঁখানা—অনেক নীচে! স্বপ্নও এত মিষ্টি নয়। সোনালী রোদ দু-হাত দিয়ে মুঠো মুঠো করে নির্জন উপত্যকায় ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে, শিরায় শিরায় কেমন যেন বাঁধন-হারা মুক্তির আনন্দ!

বাবার ডাকে চমক ভাঙে; ওদিকে কয়েকখানা বাড়ি, সামনে বাগানটা গাছে ছেয়ে গেছে; ঘন শ্যামল বাগান; গাড়ির শব্দ পেয়ে দু'তিনটে গোদা কুকুর ছুটে বার হয়ে আসে চীৎকার করতে করতে; তাদের ডাকে বাড়ি থেকে বার হয়ে আসে একটি মূর্তি! প্যাণ্টপরা—দূরে থেকে ঠিক বুঝতে পারি না, আরও কাছে আসতে মাথার লম্বা বেণীটা দেখে ঠাওর করি—স্ত্রীলোকই বটে! বাবাকে দেখে মুখে হাসি টেনে অভ্যর্থনা জানায়—"অনেকদিন আসনি যে! এটি কে—ছেলে?"

—'হ্যাঁ, আমার মেজছেলে—'

ভাল করে দেখি তাকে। চুলগুলো সবই পেকে গেছে। মুখে চোখে বয়সের কালো ছায়া। কালো আঁখিতারা দুটোর তীক্ষ্ম, তীব্র চাহনিতে আমাকে বার বার নিরীক্ষণ করতে থাকে।

"পারবে! হ্যাঁ, ঠিক পারবে তুমি। ওদের কথা তুমি বুঝবে। তুমি যে ওদেরই দলে—!"

অবাক হয়ে যাই তার চাহনি আর অসংলগ্ন কথা শুনে। গলার কাছে কি একটা দলা পাকিয়ে আসে। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নেই সভয়ে। কেঁদেই ফেলতাম, চোখ দুটো ছল ছল করে আসে, নাকের কাছটা আপনা থেকেই ফুলতে থাকে, ঠোঁটটা প্রাণপণে কামড়ে ধরি।

তার কণ্ঠস্বর কানে আসে—"ব্যারি, আজ দুপুরে না খেয়ে যেতে পাবে না। চল, খাবে চল।"

চীৎকার করে উঠি; কালো কুঁদো বুল-ডগটা অজ্ঞাতসারে কখন এসে আমার মুখে কড়কড়ে জিব বুলিয়ে বসেছিল জানি না; তাকে নিরস্ত করে দেয় জেনোবা—"না, না, কোন ভয় নেই! কিছুই করবে না।"

কুকুরটা সত্যিই কিছু করে নি। বাগানে আমার সংগে ঘুরে বেড়ায়। সারা বাগানটা ফুলের রাজত্ব। নাম-না-জানা কত কি ফুল। ভ্রমর-প্রজাপতির মেলা। বাগানের এক-কোণে নানা জাতের গাছ; পাশের গোয়ালে গরুটার নতুন বাছুরটা বিজ্ঞের মত আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। কুকুরটার তিরস্কারে ধীরে ধীরে অতিথির সম্মান করতে এগিয়ে আসে। গায়ে তার হাত বুলোতে থাকি। ওপাশের পুকুরটাই ভাল লাগে সবচেয়ে বেশী। নির্জন উপত্যকা—মানুষের বসতি থেকে অনেক দূরে—সম্পূর্ণ অন্য জগৎ—! সুন্দরের বসতি এখানে।

কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে মাছগুলো খেলা করে বেড়ায়। হাতের কাছে আসে; নরম কাদামাটি দু'হাত দিয়ে খুঁড়তে থাকি, কেন জানি না—ভাল লাগে। হাঁসগুলো আশে-পাশে কি অজানা ভাষায় বলে চলেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে বাছুরটা। আমারই মত নোতুন এসেছে পৃথিবীতে। কালো চোখে পাহাড়-বনানীর আলোছায়া, খুব ভাল লাগে ওকে! আদর করে তার কাছে এগিয়ে যাই। পাখীটা গাছে বসেছিল, উড়ে এসে আশ্রয় নেয় তার পিঠে।

সুন্দর পৃথিবী! পাখীর গানে স্বপ্ন জাগে। সোনালী তলোয় ঝলমল করে রুপালীর চাঁদ! ফুলপরীদের হাল্কা পায়ের আনাগোনা। তাদের গানের সুর—হ্যাঁ, সে সুর আমি চিনি, চিনতে পেরেছি। এখানে বসন্ত কোনদিন বিদায় নেয় না—এ পাখীর গান শুনেছি অনেকদিন আগে—ভাসা মেঘের শীর্ণ ভেলায় করে যেদিন পাড়ি জমিয়েছিলাম.....

পাখী, বাছুরটা, হাঁসগুলো সবারই কথা কেমন যেন আবছা আবছা মনে হয়। বাছুরটা বলে......

হঠাৎ কার হাসির শব্দে চমকে উঠি, সামনে দাঁড়িয়ে জেনোবা হাসছে। অত সুন্দর হাসি আমি দেখি নি। একটা কাঠবিড়ালী তার গাউনের উপর বসে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তাকেই বলে জেনোবা আমাকে দেখিয়ে—'ও নোতুন নয়, তোদেরই দলে!

পাখীটা উড়ে এসে তার কাঁধে বসে। অজানা ভাষায় সায় দেয়। বাছুরটা এগিয়ে আসে।

ঝোপের ওপাশ থেকে বাবাকে আসতে দেখে পাখীটা উড়ে যায়। কাঠবিড়ালীটা বিরক্তিভরা কণ্ঠে বাবার উদ্দেশে কি যেন

বলতে বলতে সামনের গোলার চালে গিয়ে বসে। হাসে জেনোবা।

বেলা গড়িয়ে আসে। জায়গাটা ছেড়ে আসতে আমার মন কিছুতেই চাইছিল না। টেবিলে বসে বার বার বাইরের উদার-উন্মুক্ত আকাশ-বনানীর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারছিলাম না, খাওয়াতে কি আর মন বসে। একেবারে নিরামিষ—কোন মাংসের, ডিমের সংস্পর্শ নাই।

বার হয়ে আসবার সময় জেনোবার কথা মনে পড়ে—'আসবে ত'?'

'নিশ্চয়ই।'

গাড়ি থেকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি তার দিকে; বাঁকের মাথায় মোড় ফিরে যায়, আর দেখা যায় না তাকে! হারিয়ে যায় জেনোব্যর রাজত্ব।

কিন্তু মন থেকে নয়; বার বার থাকতে ইচ্ছা করে। বাবাকে বলতে পারি না, একদিন নিজেই বার হয়ে পড়ি একা। যেতেই হবে সেখানে! এখানকার খরগোস, কাঠবিড়াল কোন জন্তুই যেন তাদের আসল সত্তার কোন পরিচয়ই রাখেনি।

এগিয়ে চলি সেই কল্পলোকের দিকে। বেলা পড়ে আসছে। সন্ধ্যার আগে বাড়ি পেশছতেই হবে। ছুটতে থাকি—সেই পাহাড় বনানী যেন ডাক দেয় আমাকে দু-হাত দিয়ে। হ্যাঁ, মনের তন্ত্রীতে শুনি তার ঘর-ছাড়া বাঁশীর সুর।

বাঁকের মাথায় বাবার গাড়িখানা দেখেই থমকে দাঁড়াই। আমার এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যায়। বাবার বার বার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিই না! কান ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসিয়ে আবার ফিরিয়ে আনলেন বাড়িতে। বাড়ি থেকে বার হওয়া নিষেধ হয়ে গেল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও যাবার জেদ ছাড়ি নি। মা বার বার বাবাকে নিষেধ ক'রত—"ছেলেটাকে ওদিকে যেতে দিও না—তোমার জেনোবা পাগল না ডাইনী, কে জানে!"

অনেকদিন পর বাজারে তাকে দেখেছিলাম, জিনিসপত্র নিতে এসেছিল। বয়স হয়ে গেছে, তবু সাজগোজ না করে সে কোথাও বার হবে না। আজ পর্যন্ত নেকলেস, ইয়ারিং সে পরে। হাতে গোঁজা থাকত একরাশ বুনো ফুল; কিছু না হলেও একথোকা রডোডেনড্রন।

তারপর আর দেখিনি; খোঁজ করেছি অনেক জায়গাতে; তার কথা বড় একটা কেউ জানে না, তবুও যেটুকু শুনতাম তার বিচিত্র জীবনের কাহিনী রূপকথার মত সাগ্রহে মন দিয়ে, সত্যি তা ভাল লাগত! খুব ভাল লাগত।

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। জেনোবার মা ভারতীয় মেয়ে, তাই হয়ত ওর চোখে কোন স্বপ্নপুরীর ডাক। কোন অজানা দেশের লোক ও। ওর বাবা-মা সমাজের বাইরে—জগতের বাইরে, আকাশের কাছাকাছি ওই পাহাড়ের দিকে ঘর বেঁধেছিল। ভগবানের মার তবুও এড়াতে পারে নি। জেনোবা তখন বছর তিনেকের। বাবা সবে বসব্যস শুরু করেছে, সাজান সংসার দুজনের সেবায় গড়ে উঠেছিল, ঠিক সেই দিনে ডাক পড়ল জেনোবার মায়ের। চলে গেল কোন অজানা দেশে।

বাবার বিপদের উপর বিপদ। একা সংসার সামলাবে না দুধের মেয়েকে মানুষ করবে! দিন যায়—বেড়ে ওঠে জেনোবা। বন-মর্মরের গুঞ্জনে প্রাণে আসে ভাষা। নদীর সুর তার মনের তন্ত্রীতে সাড়া দেয়। হাল্কা হাওয়ার স্পর্শে দিনগুলো চলে যায় একটার পর একটা।

নির্জন পুরীতে বাবার কাছেই হয় মানুষ।

মানুষকে মরতে সে দেখে নি। কিছুদিন আগে জেনোবার খরগোসটা মরে গিয়েছিল, নিথর-নিষ্পন্দ হয়ে যায়। চোখের তারা কেমন যেন স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। হয়ে যায় পাণ্ডুর।

চোখের সামনে বাবাকে মরতে দেখে জেনোবার বুক পাথর হয়ে যায়। কলেরা হচ্ছিল ও অঞ্চলে, কোন অদৃশ্য পথে তার করাল স্পর্শ এসে বাবাকে লাগে, জানে না সে। চেয়ে থাকে বাবার প্রাণহীন দেহের দিকে।

বন্দুকের গুলী যখন দেহে প্রবেশ করে, তখন কিছুই জানা যায় না; যন্ত্রণা শুরু হয় শিরায় শিরায়, সারা দেহে কয়েক সেকেন্ড পর; জেনোবাও এত বড় আঘাতটা অনুভব করে ক্রমশ।

আশেপাশের—নীচে পাহাড়ের বস্তি থেকে লোকজন এসে সৎকার করে। তারাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। অনুরোধ জানায় এ জায়গা ছেড়ে নীচে গিয়ে থাকবার; কিন্তু জেনোবা যাবে না কিছুতেই এখান থেকে। কোথায় যাবে। অগত্যা তারাই জেনোবার

জমি জায়গাগুলো চাষ ক'রে দিতে থাকে ভাগে'।

ছোট মাঠে কালো যবশিশুদের হাতছানি। আকাশস্পর্শী পাহাড়ের গায়ে পথটার পানে চেয়ে রোজ জেনোবার আশায় আনন্দে বুকটা উঠ্‌ত ভরে—দূর হতে ভেসে আসত তার কানে একটা সুর। রোজই।

হ্যাঁ, রোজই এ্যারন আসে। দীর্ঘ দেহ যুবক, সারাদেহের প্রতিটি ভাঁজে যৌবনের অপূর্ব শ্রী। মুখের হাসিটা যেন কোন অমূল্য সম্পত্তি।

জেনোবা হেসে ফেলে তার কথায়।

—'দূর!' নাচ্‌তে আমি পারব না; জানি না। লজ্জা লাগে আমার।

'লজ্জা! কাকে!' অবাক হয়ে যায় এ্যারন। নির্জন উপত্যকায় মানুষ বল্‌তে আর কেউ নাই। শুধু ওরা দুজনে। তবুও জেনোবা প্রথম পুরুষের হাতের স্পর্শ পেয়ে কেমন যেন চমকে ওঠে। সারা শরীরে খেলে যায় একটা শিহরণ! দৃঢ় আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে থাকে। পারে না। প্রাণপণে চেষ্টা করে—শেষ অবধি আঁচড়াতে থাকে—থামচাতে থাকে! হাসে এ্যারন। তার চোখের দিকে চেয়ে জেনোবাও হেসে ফেলে—তার চোখের ক্রুদ্ধ ইঙ্গিত ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, ফুটে ওঠে লজ্জার হাসি। এ্যারনের বুকে মুখ লুকোয়।

এ্যারনের বাবা সেদিন রাত্রে জেগেই কাটিয়ে দেয়। ছেলে কোথায় গেছে কে জানে! মা চোখের জল মোছে—"এ্যারন—আমার ছোট ছেলে কোথায় কোন বিপদ—!" বাবা ধমকে থামিয়ে দেন তার প্যানপ্যানানি।

জেনোবা মনে মনে কত আশার জাল বোনে। তাদের নির্জন বাড়িখানা আবার ভরে উঠ্‌বে। দুজন—এ্যারন আর সে। সিঁড়ির নীচেই বাগানের ধারে কালো পাথরটায় দুজনে বসে থাকে পাশাপাশি। রাত কত হয়, কে জানে।

সকলেই জেনে গেছে এ্যারনের ব্যাপারটা। সে নাকি জেনোবাকেই বিয়ে করবে। এ্যারনের বাবা ছেলের কথায় দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে—

—'তা হয় না—হতে পারে না।'

নীরবে সহ্য করে যায় তার বাবার সব কথা। বাড়িতে সে থাকবে না, এত অপমান সহ্য করে সে থাকতে পারবে না। তাকে মানুষ হতে হবে। ঘর বাঁধতে হবে।

জেনোবা অবাক হয়ে শুনে যায় এ্যারনের কথা! সে ফিরে আসবে। মানুষ হয়ে ফিরে আসবে জেনোবাকে নিয়ে যেতে। বাবার আশ্রয়ে সে থাকবে না।

এ্যারন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বাইরে। অনেক দূরে। কোথায় নাকি সোনার খনির সন্ধানে। সে মানুষ হয়ে দেশে ফিরবে। তখনই তারা দুজনে বাঁধবে সংসার, সমাজের বাইরে—দেশের অনেক দূরে। সে ক'টা দিন জেনোবা থাকবে তার পথ চেয়ে। সন্ধ্যার সময়—গোধূলির আলোয় দূরাগত পাখীর কাকলিতে বিদায়ী দিনের শেষে আগত নোতুন দিনের পথ চেয়ে সে রইবে, ধরণীর আলোছায়ায় কামনার জাল বুনে।

চলে গেছে এ্যারন! একা কাটে দিন তার নির্জন পর্বতমালার দিকে চেয়ে। দিন গুণে চিঠি আসে; ব্যাকুল হয়ে পড়ে যায় কি সব লিখেছে সে, নোতুন দেশের কথা! তারা নাকি সেখানে কিসের সন্ধান পেয়েছে, কোথায় কোন্ খনি! ভাগ্য পরিবর্তন হতে দেরী নাই।

এ অঞ্চলের সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দূরে-দূরান্তরে ছড়ানো গোলাবাড়িগুলো। নির্জন বনপথের মধ্য দিয়ে কোন বাড়িকে থাকতে দেখলে ডাকাতের দল মেরে-ধরে কেড়ে নেয় তার সব কিছু। উৎপাত তাদের বেড়েই চলে, নিত্য নূতন উপদ্রব।

রাতের শেষদিকে কাদের চাপা কণ্ঠস্বর পায়ের শব্দে জেগে ওঠে জেনোবা! বন্ধ দরজাটা খুলে যায় তাদের আঘাতে, কয়েক-জন লোক কালো মুখোষ পরে তার দিকে এগিয়ে আসে। জোর করে টাকাকড়ি আদায়ের চেষ্টা করে, কিন্তু জেনোবার মত শক্ত মেয়ের কাছে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। টাকাকড়ি সে পাবে কোথায়। তারাও ছাড়বার পাত্র নয়, হাতে পায়ে বেঁধে পায়ের কাছে আগুনের ছেঁকা লাগাতে থাকে। নীরবে সহ্য করে যায় তাদের অত্যাচার উৎপীড়ন। সকাল হয়ে আসতেই তারাও ব্যর্থমনোরথে ফিরে যায়। শাসিয়ে যেতে ছাড়ে না—'দেখব আর একদিন।

ডাকাতির পরও জেনোবা নির্জন বাড়িটা ছেড়ে যেতে চায় না। কোন ইচ্ছাই নাই তার ছাড়বার। সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও সে আসে না। সহর থেকে একটা পিস্তল—গাদা বন্দুক আর একটা কুকুর কিনে নিয়ে আসে।

সে এ জায়গা ছেড়ে থাকতে পারবে না। বাড়িখানা, ওখানকার সমস্ত প্রাণীগুলো সবই তার প্রিয় আপনার।

দিন যায় সকালের আলোর ঝিলিমিলি দূরে তুষারমণ্ডিত পর্বতশীর্ষে রচনা করে কামনার স্বর্গ। রাইশীষের হলদে ফুল-গুলো ট্যামাটোর রাঙ্গা টুকটুকে ফলের আড়ালে মাথা নাড়ে।

এ্যারন লিখেছে সে নাকি বেশ ভাল চাকরী পেয়েছে, এবার তারা রচনা করবে কামনার স্বর্গ। তারা বিয়ে করবে। বাইরের পৃথিবীর ডাক...জেনোবাকে নিয়ে যাবে তার প্রিয় বাড়িখানা ছেড়ে সে ডাক যদি এ্যারন নিয়ে আসে। হাল্কা গানের সুরে সেদিনটা সে সব জিনিসপত্রগুলো ঘরময় তছনছ করে। বাবার বইগুলো সব জিনিসপত্র সে নিয়ে যাবে...তাদের নোতুন সংসারে!!

ডাকাত দলের উৎপাত দেশের ওপর কেমন যেন কালো চোখের মত অশান্তি বিস্তার করেছে, কেউ কোন বিহিতই করতে পারে না। যথারীতি চলেছে তাদের অত্যাচার। জেনোবা আর ভয় করে না তাদের। তাছাড়া আর সে বেশীদিন ও ত থাকবে না এখানে!!

...রাত্রির অস্পষ্ট অন্ধকার বাইরে যেন কিসের ষড়যন্ত্র পাকায়! কিসের খস খস শব্দ শুনে জেনোবা জেগে ওঠে! অস্পষ্ট অন্ধকারে কে যেন সরে যায় দরজার কাছ থেকে কুকুরটা চীৎকার করতে থাকে! কার অল্প হাসির শব্দ কানে আসে!

জেনোবার দেহে শিহরণ খেলে যায়। আবার আবার তারা এসেছে। ডাকাতের দল। প্রাণপণে জানলার বাইরে...অস্পষ্ট... চলন্ত অন্ধকারটাকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছোড়ে। রাত্রির আঁধারে এক ঝলক আলোর আভা ছিটকে যায়! আর কিছু শোনা যায় না। সব নীরব। সারা রাত কাটে জেনোবার উৎকণ্ঠায়।

সকালে বাইরে আসে। কালো পাথরটা যেখানে বসে তারা দুজনে রচনা করত তাদের কামনার স্বর্গ, সেই পাথরটা কার বুকের জমাট রক্তে লাল হয়ে গেছে। পাশে পড়ে রয়েছে এ্যারনের প্রাণহীন দেহটা। পিস্তলের গুলিটা বুক ভেদ করে গেছে তার।

জেনোবা দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠে !......

চুপি চুপি কখন এসেছিল এ্যারন জানে না,...একেবারে সহসা এসে চমকে দিত বোধ হয়। এ্যারনের বাবা আরও অনেক লোকের সামনে...অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলে চলেছে জেনোবা—"আমি ! আমিই মেরেছি—ওকে......

কিন্তু জানতাম না—!

সকলেই বুঝতে পারে আসল ব্যাপারটা। জেনোবা বলে চলেছে, সে রাতে ঠিকই চিনেছিল জেনোবা, ডাকাতের সর্দার নাকি জেলার শেরিফ নিজেই, কেউ একথাটা বিশ্বাস করে না। মায় শেরিফ অবধি। ভাবে সকলেই এ্যারনের মারা যাবার পর থেকে তার হয়ত মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

যদিও পরে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। দলের একজনই ফাঁস করে দেয় কথাটা। শেরিফ হ'ল পদচ্যুত!! যাক সে কথা—

সেইদিন থেকে জেনোবাকে কেউ আর কোন কিছু মারতে দেখেনি! তার সীমানায় পশুপাখী সব অবাধে যাতায়াত করে, সবই তার আপন জন! কেমন যেন বিচিত্র ভাবে জীবনযাপন করে—যার সঙ্গে মেলে না কারুরও।



যুগোপযোগী পরিকল্পনা



...আর জেনোবার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি অনেকদিন! কত বছর জানি না! ইউরোপের বাইরে এসে গেছি। ভারতবর্ষের দিকে! ভারতবর্ষ! এইখানেই নাকি কোথায় জেনোবার মায়ের দেশ! কোন সুদূর দেশের পবিত্র মাটির স্পর্শ তার মানবজীবনকে দেবতুল্য করে দিয়েছে; তার মধ্য দিয়ে আমার সারা দেশকে প্রণাম জানাতে ইচ্ছা করে। জাভা—সুমাত্রা—! নারিকেল বাত্যান্দোলিত বালুতট ! নীল-সাগরের মায়াঞ্জন লাগান ওর আকাশ। জগতের বিস্তৃত-উদার মনভুলান রূপের মাঝে হারিয়ে ফেলি নিজেকে, ক্ষুদ্রতা আমার মিতালি পাতায় মনের নিঃস্বতার সঙ্গে!...চুপে চুপে চলে তাদের চুরি!!...

...অনেকদিন পর আবার দেশে ফিরছি। সেই পাহাড় ঘেরা দেশ! বাঁকের মালাপরা রাস্তা! সব যেন ছোট! অনেক ছোট হয়ে গেছে রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছে তার পরিসর ! আমি হয়ে গেছি বড়!—কিছুদিন পর আবার যেন আমার আমিকে হারিয়ে ফেলি! ছোট মেয়ে জলির খরগোস-গিনিপিগ—কাঠবিড়ালী পোষার বাতিক!... দিনরাত তাদের নিয়েই ব্যস্ত ! —হঠাৎ একটা হাসির শব্দে ফিরে চাই! জলি দাঁড়িয়ে বাগানে—তার কাঁধে আমার নোতুন আনা ক্যানারীটা!......মনে পড়ে যায় অনেক আগেকার হারান কথা! কোন দুর্বার আকর্ষণে বার হয়ে যাই সেই জেনোবার বাড়ীর দিকে!!

...অবাক হয়ে যাই! জনমানবহীন বাড়ি-খানা নুয়ে পড়েছে, কত বর্ষার জল যে তার উপর দিয়ে গেছে জানি না! সারা-বাড়িটা বুনো গাছে ভরে গেছে ! বাগানটায়ও বাসা বেঁধেছে রাজ্যের পাখী-খরগোস-কাঠবিড়াল!

...জেনোবা মারা গেছে কয়েক বছর আগে ! বয়সের ভারে নুয়ে আসছিল তার দেহ! অভাবও এসেছিল শেষদিকে. তবুও সে কারুর দয়ার প্রত্যাশী হয়নি! ছেড়ে যেতে পারেনি তার বাড়িখানা! আশেপাশের গোলাবাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা তাকে দেখতে আসত! খাবার নিয়ে—কেউ-বা আনত রাই মাখান রুটি! মলিন হাসিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকত জেনোবা! কয়েক-দিন হতে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না জেনোবা!

যন্ত্রণায় পাংশু হয়ে আসে তার জীর্ণ মুখ!

পরদিন সকালে ছেলেমেয়ের দল ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়! বিছানায় পড়ে রয়েছে তার মৃতদেহ! সাজ পোষাক করতে সে ভোলেনি! সেই গাউন—নেকলেস—সবকিছু পরেই সে যেন মরণকে বরণ করেই নিয়েছে!...ঘরের মধ্যে তার আশেপাশে অসংখ্য খরগোস কাঠবিড়াল—পাখীর দল বসেছিল! লোকজন আসতে দেখেই তারা বার হয়ে যায়!

...জেনোবার কবরটা রয়েছে ঠিক এ্যারনের পাশেই!...বুনোঘাসে জায়গাটা ভরে গেছে। সারা বাগানটা—সেই পুকুরের ধারে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি! পড়ন্ত রোদের মাঝে কোথা থেকে কার যেন আহ্বান ভেসে আসে—কোন সুদূরের প্রিয়াসীর!

স্তব্ধ বনানীর মাঝে, পাখীর গানে... আমি যেন খুঁজে পাই কোন অজানা দেশের সন্ধান, বহুদিন আগে আমি যা পেয়েছিলাম সেই জগৎ! তারই পথের নিশানা। জেনোবার হাসিমাখা মুখ—'ও তোমাদেরই দলে!'

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তোমাদের! চিরদিনই তোমাদের! মনটা কেমন হয়ে আসে। পশ্চিমদিগন্তে সূর্য পাহাড়ের কোলে নেমে গেছে! ঝরণার জল আঁজলা আঁজলা খেয়েও আশ মেটে না!

'জলিকে' সব ঘটনাটা বলে বসতেই... কোল থেকে খরগোসটা নামিয়ে আবদার শুরু করে—নিয়ে যেতেই হবে তাকে !

না গিয়ে আমিও থাকতে পারি না! কুকুর দুটোকে নিয়ে বার হতে হয়। জলি না গিয়ে ছাড়বেই না! জলির প্রতিটি পদক্ষেপে আমি যেন বহুদিন আগেকার সেই হারান নিজেকে খুঁজে পাই! জলি বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থাকে বাইরের পৃথিবীর দিকে।

জেনোবার বাড়ি-বাগানের মাঝে 'জলি কি যেন খুঁজে পায়। প্রতিটি গাছ-লতাপাতা পাখীগুলো সে দেখতে থাকে নীরবে! কুকর দুটোকেও ছেড়ে দিয়েছি হঠাৎ জলির চীৎকারে...চেয়ে দেখি...কুকুর দুটো ছুটে গিয়ে একটা কাঠবিড়ালকে শেষ করে দিয়েছে! ধারাল দাঁতের ঘায়ে ছোট দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে! ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে আসে তার দেহ!......ওরা পালাতে শেখেনি!

সারামনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে! আজ আমি সদাই অপরাধী জেনোবার কাছে। তার বিশ্বাস আমি রাখিনি! জলির চোখ দিয়ে জল বার হয়ে আসে। নীরবে ফিরে আসি সেখান থেকে! কথা কইতে পারলাম না! একটা কথাই মনে পড়ে—"জেনোবার পবিত্র স্মৃতি আমি নষ্ট করেছি!"

...আর যেতে সাহস হয়নি সেখানে কদিনই ! নীরবে বসে আছি ! সন্ধ্যা হয়ে গেছে!—জলি কোথায় যেন বেড়াতে গেছে!

রোজই মা নালিশ করে কোনদিনই রাত না হলে সে ফেরে না—! আজ আর সহ্য করতে পারে না। মনটা বিষিয়ে ওঠে! চুপিসারে ঘরে ঢুকতে গিয়েই ধরা পড়ে যায়! কিছুতেই কোন জবাব দেয় না! দাঁড়িয়ে থাকে—তার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু!'

কড়া শাসনের ভয়ে কদিন থেকেই বাইরে যেতে পায়নি জলি! কিছুতেই তাকে বার হতে দেওয়া হবে না! লক্ষ্য করি রোজ বৈকালে কেমন যেন আনমনা হয়ে আমের বাগানের মাঝে চুপ করে বসে থাকে—কাঠবিড়াল-খরগোস-পাখীগুলো আশেপাশে বিরক্ত করলেও সাড়া দেয় না!

সেদিন রাত্রে চুপি চুপি আসে আমার ঘরে! তার কথা শুনে চেয়ে থাকি তার দিকে—'জান বাবা কোথায় আমি যেতাম!' সেই পাহাড়ের গায়ে, পুরানো বাগানে। চল না বেড়িয়ে আসি—'

তার কথায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তার দিকে। এমনি একটা কিছুই সে বলবে জানতাম! কেন যায় জিজ্ঞাসা করলাম না. জানি উত্তর সে দেবে না! আমিও আমার বাবাকে দিই নি. সেই বা দেবে কেন? তার চোখের কোলে চিকচিক করে পড়ন্ত দিনের আলো!

ও আঁখিতারা আমার অনেক দিনের পরিচিত! জেনোবা আজও মরেনি! বাগানের প্রতিটি পাতায় গাছে বাতাসে মিশিয়ে আছে তার বিদেহী আত্মা! সে অমর হয়ে আছে আমার মনে! 'জলির' আঁখিতারায়! সে মরতে পারে না—সে যে চিরন্তন!

অনুবাদক :—শ্রীশান্তিপদ রাজগুরু

হিপ্নোটিজ্‌ম্

যাদুকর পি সি সরকার

'হিপ্নোটিজম্' করিবার যতগুলি প্রক্রিয়া আছে, সবগুলিকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত—প্রভাবমূলক সম্মোহন (Hypnosis by domination). দ্বিতীয়ত সমবায়মূলক সম্মোহন (Hypnosis by Co-operation).

প্রভাবমূলক সম্মোহন বিদ্যায় সম্মোহক তাঁহার পাত্রের উপর নিজের মানসিক বলের ক্রিয়া দেখান। ভয় এবং বিস্ময়ে পাত্রের মন অভিভূত করিয়া দেন এবং পাত্রকে প্রথম হইতেই নিজের বাধ্য করিবার জন্য অনেক প্রক্রিয়া করেন। পুরাকালে কাপালিকগণের সম্মোহন এবং ইতিহাসবর্ণিত যাদুকর রাসপুতিনের সম্মোহন অনেকটা এই শ্রেণীর। কিন্তু সমবায়মূলক সম্মোহনে ঐরূপ জোরের কোন প্রশ্নই নাই। সেখানে হিপ্নোটিজম্ পাত্র ও প্রদর্শকের ইচ্ছাশক্তির পরস্পর বিরোধে উৎপন্ন হয় না—পরস্পর মিলনে হয়। কাজেই পাত্রের ইচ্ছাশক্তি প্রবল বা দুর্বলে কিছুই আসে যায় না। সেখানে সম্মোহক তাঁহার পাত্রকে একটা আরাম কেদারায় শোয়াইয়া যতদূর সম্ভব আরাম দিবেন। তারপর বলিতে হয়—"তুমি তোমার মন হইতে দুঃখ ক্লেশ সব ভুলিয়া সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে কর এবং দেহকে কৌচের উপর এলাইয়া দিয়া উহা ভাবিতে থাক। মনে কর যে, "তোমার ঘুম "আসিতেছে—তুমি ঘুমাইবে।" (ডাক্তার ব্রেইড প্রভৃতি অনেক সম্মোহক এই সময়ে পাত্রকে উঁচুতে কোন একটি বিশিষ্ট চক্‌চকে জিনিসের দিকে তাহার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলেন। তাহাতে চক্ষুর পেশীগুলি শ্রান্ত হয় এবং সমস্ত দেহে ক্লান্তি আসে)। সম্মোহক তখন পুনরায় বলেন—"তুমি ঘুমাও—ঘুমাও।" এই কথা বলিয়া তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই পাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। এই নিদ্রোৎপাদনই—'হিপ্নোটিজম্।' কাজেই দেখা যাইতেছে, পাত্রের প্রথমে যে লক্ষণটি প্রকাশ পায়—উহা অনাসক্তি লক্ষণ। কারণ এই অবস্থায় যদি তাহাকে বলা হয় তুমি চক্ষু খুলিতে পারিবে না, সে কিছুতেই পারিবে না। সে তখন বলিবে, "আমি খুলিতে পারি, কিন্তু মোটেই ইচ্ছা করিতেছে না।' ইহার পর এই নিদ্রা ক্রমেই গাঢ় হইতে আরম্ভ হইবে। তখন পাত্র শত চেষ্টা করিয়াও আর চক্ষু খুলিতে পারিবে না। ইহার পর গাঢ়তম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার নামই 'সংন্যাস।' তখন পাত্র ক্রিয়া প্রদর্শকের ইচ্ছাধীন ভৃত্য মাত্র, তাহার দেহ শক্ত করিয়া তদুপরি গুরুভার জিনিস দিলেও সে বুঝিবে না অথবা দেহে বোধরহিতাবস্থা সৃষ্টি করিয়া অস্ত্রোপচার করিলেও সে তাহা জানিবে না। ইহা সম্মোহনের সর্বোচ্চ স্তর এবং এই অবস্থার নাম "পূর্ণ সম্মোহন" (Complete Hypnosis)।

'মেসমেরিজম্' বিদ্যার আবিষ্কারক ডাক্তার মেসমার সম্মোহন বিদ্যার মূলে শারীরিক কারণ দেখিতে পান। তাঁহার ধারণা ছিল যে, জীবদেহ মাত্রেই এক প্রকার তড়িৎ-পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবাহিত করিলে সেই অপর ব্যক্তি অভিভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার মতে এই 'জীবদেহের তড়িৎশক্তি' (Animal Magnetism) অনেকটা বিদ্যুৎশক্তি বা চুম্বকশক্তির অনুরূপ। উহাকে তিনি জীবদেহে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব বলিয়া উল্লেখ করেন। "De planatrum influxu" or 'the influence of the Planets on the Human Body'—এইটি লিখিয়াই মেসমার সাহেব ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা হইতে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন। ডাক্তার মেসমার চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, জ্যোতিষীবিদ্যা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফলিত (Applied) জ্যোতিষশাস্ত্রে লক্ষ্য করেন যে, গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি আমাদের এই পৃথিবী হইতে বহু শত সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত অথচ এতদূর হইতেও তাহারা পৃথিবীস্থ জনপ্রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পৃথিবীর সহিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তেরই একটা পরস্পর আদানপ্রদানের সুনিয়ন্ত্রিত ধারা বিদ্যমান। সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও তাহারা পরস্পর আকর্ষণবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, হাতে একখণ্ড চুম্বক লইয়া লৌহের নিকট গেলে উহা অনায়াসে লৌহকে আকৃষ্ট করে। এই সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া 'আকর্ষণ' নামক বিষয়ের প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন। চুম্বক লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করে — ইহা হইতে তাঁহার ধারণা হইল যে, চুম্বকের আকর্ষণশক্তি হয়ত মানবদেহেও কিছুটা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। তিনি এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই প্রথম প্রথম রোগীদের দেহের উপর দিয়া শক্তিশালী একখণ্ড চুম্বক নাড়াচাড়া করিতেন। ইহাতে ঐ রোগীসমূহ অল্পকাল মধ্যেই নিদ্রিত হইয়া পড়িত। পরে তিনি ঐ চুম্বকখণ্ড ব্যতিরেকে খালি হাতটি রোগীর দেহের উপর দিয়া চালনা আরম্ভ করেন এবং আশ্চর্যান্বিত হন যে, ঐভাবেও রোগি-



রেডিওযোগে সম্মোহিত করার পর শ্রোতারা হাত টানিয়া খুলিতে অসমর্থ হইয়াছে।

গণ অনুরূপভাবে অত্যল্পকাল মধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার ধারণা হইল যে, প্রত্যেক প্রাণিদেহে চুম্বকশক্তি বিদ্যমান এবং উহা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি হইতেই আসিয়াছে। জীবদেহের উপর দিয়া হস্ত সঞ্চালন করিলে ঐ চুম্বকশক্তি এক দেহ হইতে অপর দেহে সঞ্চালিত হইয়া নিদ্রোৎপাদন করে। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত এই আকর্ষণ শক্তিকেই 'জীবদেহের চুম্বকশক্তি' নাম দেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ঐ আকর্ষণী শক্তি এক দেহ হইতে অপর দেহে চালিত করা সম্ভবপর এবং এইরূপ করিলে পাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িবে এবং রোগ-চিকিৎসা চলিবে। তিনি মনে করেন যে, এই আকর্ষণী শক্তির নিজেরই রোগ-প্রতিবিধায়ক ক্ষমতা আছে। বর্তমানে যে 'আদেশ' (Suggestion) সাহায্যে সম্মোহন করিবার উপায় দৃষ্ট হয়, উহা অনেক পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্বদেশে প্রচলিত সম্মোহন করিবার উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহা সম্পর্কে তিনটি প্রধান মতবাদ আছে। যথা—১। মেসমার স্কুল (The Mesmer School), ২। ন্যান্সি মত (The Nancy School) ও ৩। প্যারিস বা চার্কটের মত (The Paris or Charcot School).

মেসমার স্কুল অনুযায়ী মেসমেরিজম্ উৎপন্ন হয় ক্রিয়াপ্রদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত মানসিক বা মৌখিক আদেশ বা অভিভাবের প্রভাবে। এই মতবাদের মূলেই রহিয়াছে এই সম্মোহন আদেশ, যাহা পাত্রের উপরে প্রয়োগ করিলে সে অতি সহজে অভিভূত হইয়া পড়ে।

প্যারিস স্কুল বা চার্কটের মতানুযায়ী ইহাতে জীবদেহের চুম্বক বা বিদ্যুৎশক্তি কিম্বা অভিভাব বা আদেশের কিছুই নাই। চার্কট সাহেবের মতে 'মেসমেরিজম্' এক প্রকার স্নায়ুগত ব্যাধি। যে সকল লোক ক্ষীণমনা অথবা দুর্বলচিত্ত তাহারাই সহজে এই ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ইহা হিস্টিরিয়ার ন্যায় একটি অসুখ বিশেষ।

মেসমেরিজম্ বা 'এনিম্যাল ম্যাগ্নেটিজম' বর্তমানে হিপ্নোটিজমের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে জনৈক ম্যাঞ্চেস্টারবাসী ডাক্তারের (Dr. James Braid) আবিষ্কার হইতে। ডাক্তার ব্রেইড্ একজন অতিশয় তীক্ষ্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তিনি মেসমার সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত উপায়টি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, পাত্রকে একটি উজ্জ্বল জিনিসের দিকে তাকাইয়া রাখিলে সে সম্মোহিত হইয়া পড়ে। তিনি তাঁহার নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "আমি সাধারণত একটি উজ্জ্বল জিনিস বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলী দ্বারা পাত্রের চক্ষু হইতে পোনের ইঞ্চি দূরে ধরি ও তাহাকে ইহার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে বলি। উজ্জ্বল জিনিসটি তাহার কপালের উপরে এমন স্থানে ধরি যেদিকে তাকাইতে হইলে পাত্রকে খুব জোর করিয়া উপরের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হয়। পাত্রকে বলা হয় যে, ঐ এক জিনিস ব্যতীত অপর কোন দিকে তাকান বা অন্য কোন বিষয় চিন্তা করা নিষিদ্ধ। ঐভাবে থাকিতে থাকিতে চক্ষু ঝাপসা হইয়া আসে ও পাত্র অতি সহজে নিদ্রাভিভূত হয়।" এইভাবে তীব্র দৃষ্টিতে কোন উজ্জ্বল জিনিসের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে পাত্রের দৃষ্টির কি কি রূপ অবস্থা হইতে পারে তাহার একটি সুন্দর বিবরণ ডাক্তার লয়েড টাকী (Dr. Lloyd Tucky) প্রণীত 'সম্মোহন সাহায্যে রোগ চিকিৎসা' পুস্তকে দেওয়া



রেডিওযোগে সম্মোহিত একজন নাবিক কল্পনায় চিঠি টাইপ করিতেছেন।

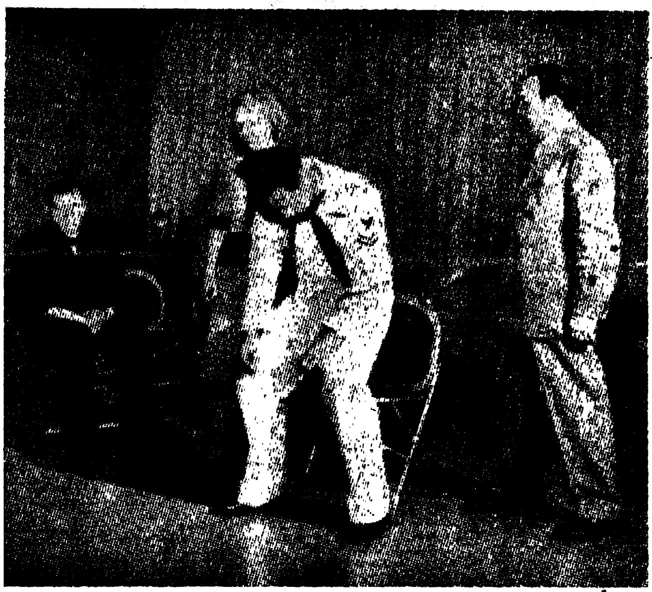
আছে। তিনি বলেন যে, পাত্র এক চিত্তে ও এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চক্ষু পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ক্রমে ক্রমে কম আকৃষ্ট হইয়া শুধু ঐ একই জিনিস দেখিতে আরম্ভ করে। তখন সে ঐ একই জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুই জানিবে না। কারণ তাহার দৃষ্টিকেন্দ্র ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠে এবং উত্তেজিত হয় না। সেইভাবে দর্শন স্নায়ুও আস্তে আস্তে সংবেদনে বিরত হয় এবং সেই পাত্র 'অজ্ঞান অবস্থা' বা মানসিক শূন্যতা প্রাপ্ত হয়। সুস্থ মানুষের মনে পারিপার্শ্বিক বহুবিধ চিন্তা ধারা আসিয়া তাহার মনকে আপ্লুত করে, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টি সাধনা দ্বারা সে কেবল একটি বিশিষ্ট বিষয়ের প্রতি তাঁহার মনকে নিবিষ্ট করিতে থাকে এবং ক্রমে উহা পারিপার্শ্বিক প্রায় সর্ববিধ চিন্তাধারা হইতে মুক্ত হইয়া কেবল ঐ একটি বিষয়েই আবদ্ধ হয়। সহজ ভাষায় ইহাকে এক বিষয়াভিমুখী মন বলা চলে। এই অবস্থায় মনের পরিণতি হয় চিন্তা শূন্যতায়। একটি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে কিছু আলোক রশ্মি পতিত হইলে সেখানে উহা খুব বেশী আলোকিত বলিয়া মনে হয়, কারণ সেখানে ঐ এক রশ্মি ব্যতীত অপর কোন আলোকের চিহ্নই নাই, বরং রহিয়াছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেইরূপ নিদ্রিত (সম্মোহিত) লোকের চিত্তে কোন-রূপ 'আদেশ' প্রদান করিলে খুব বেশী জোরের সহিত কাজ করিবে কারণ সেখানেও উক্ত 'আদেশ' ব্যতীত অপর কোন চিন্তা-ধারার স্থান থাকে না।

সম্মোহিত ব্যক্তিকে কোনরূপ আদেশ দিলে তাঁহার 'অন্তর্মন' উহাকে প্রতিপালিত করে। এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে মানুষের মন দুইটি—অর্থাৎ বিভিন্ন ভাব ও প্রকৃতিবিশিষ্ট দুইটি মানসিক ক্রিয়া বিদ্যমান আছে। উহাদিগের নাম অন্তর্মন (Subjective mind) ও বহির্মন (objective mind) মানুষ প্রতিদিন যত কাজ করে সমস্তই এই মন দুইটির উত্তেজনায় করিয়া থাকে। মানুষ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই মন দুইটির দাস। উহারা যে যেমন আদেশ করিবে মানুষ নির্বিচারে তাহাই প্রতিপালন করিতে বাধ্য, সেখানে কোন প্রকার ওজর আপত্তি খাটে না। এই মন দুইটির একটি 'সেন্সরি নার্ভ' (Sensory Nerve) নামক স্নায়ুর মধ্য দিয়া কার্য করে এবং অপরটি 'মোটর নার্ভ' (Motor Nerve) নামক

স্নায়ুর মধ্য দিয়া। কাজেই এক মন সর্বদাই জাগ্রত কারণ উহা পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে ভালমন্দ গুণাগুণ প্রভৃতি বিচার শক্তিসম্পন্ন ও নিয়ত সতর্ক। অপর মন বিচারশক্তিহীন এবং অর্ধসুপ্ত অবস্থায় থাকে। সম্মোহনকালে 'দৃষ্টি, স্পর্শ, ইচ্ছা' প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের জাগ্রত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিচারশক্তিহীন অন্তর্মনের উপর ক্রিয়া করিতে হয়।

হিপ্নোটিজম্ যে শুধু পাত্রের নিকটে অবস্থান করিয়াই করা যায় তাহা নহে। ক্রিয়া প্রদর্শক তাঁহার পাত্রকে দূরদেশ হইতেও সম্মোহিত করিতে পারেন। ইহার নাম 'দূর সম্মোহন' (Hypnotism from distance) অনেকে হয়ত একথা শুনিয়া হাসিবেন যে, কলিকাতা হইতে 'ইচ্ছা' করিলে উহা শিলংয়ে কার্যকরী হয় কি করিয়া? ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। শব্দের গতি যেমন অবিরাম, সেইরূপ চিন্তার গতিও অনন্ত ও অক্ষয়। চল্লিশ বৎসর পূর্বেও যদি কাহাকেও বলা যাইত যে, এখান হইতে কথা বলিলে ঐ শব্দ জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সেই কথা এমন কি বক্তার চেহারা পৌঁছায়, সে উহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া মনে করিত—কিন্তু রেডিও (Radio), টেলিভিশন (Television) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়া এই অবিশ্বাস দূর করিয়াছে। শব্দ যেমন চলে ঢেউয়ে (Wave), মানবের ইচ্ছাও তেমনি ঢেউতে ভাসিয়া যাইবে ইহাতে বিচিত্রতা কি! এই জন্যই মনোবিদ্গণ ইচ্ছাকে মানব মনের রেডিও (Radio of human mind) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

আজকাল যন্ত্রপাতির সাহায্যেও সম্মোহন নিদ্রা উৎপাদনের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহা 'Hypnotism by machine নামে পরিচিত। ইহাতে একটি চিত্রে বড় বড় দুইটি 'সম্মোহিনী চক্ষু' অঙ্কিত করা থাকে; ঐ চক্ষুর দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে দেওয়া আদেশ 'ঘুম—ঘুম—' ইত্যাদি শুনিতে হয়। ইহা বাস্তবিকই খুবই চমৎকার উপায়। কোন বড় সম্মোহকের চক্ষুর ফটো এবং তাঁহার আদেশের 'রেকর্ড' হইলেই হইল। পাত্র ঐ ফটোর দিকে তাকাইয়া গ্রামোফোনের রেকর্ড শুনিলেই আপনা আপনি সম্মোহিত হইবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান নানাবিধ বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতকে চমকিত করিতেছে। প্রথমে যেদিন গ্রামোফোনের আবিষ্কার হয় পৃথিবীর লোক কত অবাক হইয়াছিলেন। 'রেডিও' আসিয়া গ্রামোফোনকে ম্লান করিয়া দিল—আধুনিকগণ রেডিওকে আপন হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া নিলেন। হিপ্নোটিষ্টগণও বসিয়া নাই—তাঁহারাও জগতের সমস্ত বড় বড় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাজে সেইগুলিকে পোষ মানাইয়া চলিয়াছেন। যাদুকরগণ 'টেলিভিশন'যোগে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতেছেন। আমেরিকায় যাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইবে আর কলিকাতায় আমরা ঘরে ড্রয়িংরুমে বসিয়া সেই যাদুর খেলা দেখিতে পারিব। রেডিও সাহায্যে হিপ্নোটিজম্ করিবার প্রণালীও কম আশ্চর্যের বিষয় নহে। রেডিও ষ্টেশনে বেতার যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাদুকর এমন বক্তৃতা করিবেন যে, শ্রোতারা তাহা শুনিয়া শুধু মুগ্ধই নহে রীতিমত সম্মোহিত হইয়া যাইবেন। অনেকের মতে জার্মানীর রাষ্ট্র-নায়ক হিটলার রেডিও যোগে যে বক্তৃতা করিতেন উহার পশ্চাতে ঐ 'হিপ্নোটিক এফেক্ট' হইত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, রেডিও সাহায্যেও 'হিপ্নোটিজম' করা সম্ভবপর। যন্ত্র যুগের চরম বিস্ময়গুলিও যে প্রতিনিয়ত আমাদের কাজে নানাভাবে আসিতেছে তাহাতে আমরা পরম সার্থকতা লাভ করিতেছি।


মাত্র ১৫ সেকেন্ড মধ্যে 'রেডিও হিপ্নোটিজম্' সম্ভবপর।

হিপ্নোটিজম্ দ্বারা লোকের ইষ্ট এবং অনিষ্ট দুইই করা সম্ভবপর। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ হিপ্নোটিজম্ দ্বারা অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সহজে আরোগ্য করিতে পারেন (হয়ত কেবলমাত্র ঔষধ প্রয়োগে তাহা সম্ভবপর হইত না), তেমনি দুর্বৃত্তগণ নিজেদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এ বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারে। ডাক্তার লয়েড টাকী সাহেব এই বিদ্যাকে 'ডিনা মাইট' আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ারগণের ও কয়লাখনিতে ডিনামাইটের বিশেষ প্রয়োজন। ইহা না হইলে কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করা কষ্ট হইত—এদিক দিয়া এই ভীষণ বিস্ফোরকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আজ যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে এই 'ডিনা-মাইট' সাহায্যেই শত শত নিরপরাধ জীবনকে ধ্বংস করা হইতেছে তখন ইহার প্রশংসা সভ্য সমাজ কিছুতেই করিবেন না। জগতের সমস্ত বিষয়েরই ভালমন্দ দুইটি দিক আছে। বিবেচকগণ ভালগুলিকে ব্যবহার করিয়া অসৎ কার্যে যাহাতে ইহার প্রয়োগ না করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

শোলার মুকুট

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুর বিবাহে বরযাত্রী গিয়াছি। বন্ধুর সহযাত্রী হওয়ার ভাগ্য ঘটে নাই; অফিস ছুটির পর যখন বিবাহভবনে উপস্থিত হইতে পারিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বরের তখন বরণ হইতেছে। আমিও সেখানে নীত হইয়া জনসমাকুল আলোকোজ্জ্বল অঙ্গনের একপাশে রকের উপর অন্যান্য বরযাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম, বিচিত্র-শাটিকাভরণমণ্ডিতা-নারীচক্রব্যূহের কেন্দ্রস্থলে বরবন্ধু সমাসীন। তাহার পরিধানে ভাড়াকরা গরদের ধুতি-চাদরপানজাবি, জামার বুকে ধারকরা সোনার বোতাম, এক হাতের তিন আঙুলের তিনটি আঙটিই চাহিয়া-নেওয়া, অন্য হাতের একটিমাত্র যে অঙ্গুরীয় সেটি বিবাহের আশীর্বাদী, তাহার মণিবন্ধে আমার নিজের বিবাহে-প্রাপ্ত ঘড়ি। পানজাবির গলগহ্বরের প্রান্তরেখা সুদূরে রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া শকুনির গলার মতো যে রক্তগ্রীবা উঠিয়াছে তাহারি অবলম্বনে বন্ধুর পাউডাররুক্ষ চন্দনতিলকচর্চিত বিশীর্ণ কেরাণি-আনন, সে আননের ঊর্ধ্বে তাহার অর্ধললাট আচ্ছন্ন করিয়া বিচিত্র শোলার মুকুট নড়বড় করিতেছে। গলা-সমেত বন্ধুর মুখখানি দর্শকের চিত্তে করুণা সঞ্চার করিতেছে, গুঁড়িকাচন্দনের প্রচেষ্টা তাহার স্বকীয়তা-গোপনে অক্ষম হইয়াছে। নারীগণ বরকে যথাসংস্কার বরণ করিতেছেন; বন্ধুর দুটি কালিমাসীমায়িত কোটরগত চক্ষু সহনশীলতার পরীক্ষায় কাতর হইয়াছে মাত্র, ঝিমাইয়া পড়ে নাই এই আনন্দে যে, এ-কণ্টকের পরেই কমলের আবির্ভাব হইবে।

নিজের বিবাহের কথা মনে পড়িল। নূতনত্ব কিছু ছিল না; —আমিও এমনি ভাড়াটিয়া আর ধারকরা সাজে শোলার মুকুটপরা রাজা সাজিয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম এবং বিবাহ করিয়াছি। ইহাই রীতি; এমনি করিয়া বিবাহ করিতে প্যালা যায়, পঞ্চা যায়, যদু মধু সকলে যায়, আমি গিয়াছি, না গিয়া থাকিলে আপনি যাইবেন, বন্ধুও আসিয়াছে।

কিন্তু ঠকাইতে আসিয়াছে। রাজসিক আভরণের ছদ্মতায় আপন অক্ষমতা গোপন করিয়া, জাহির করিতে আসিয়াছে যে, আজ যে নারীর ভার লইতে সে উদ্যত হইয়াছে তাহাকে বিশেষভাবে বহন করার যোগ্যতা তাহার আছে। বংশপরম্পরাগত সংস্কারের রাজত্বে কন্যাপক্ষও তাহার এই রূপসজ্জায় মোহিত হওয়ার জন্য এমন প্রস্তুত হইয়া আছে যে, নিজের গলদেশ আর মুখ লুকাইবার জন্য একটা মুখোস পরিধানের প্রয়োজনীয়তা বন্ধুর মনেই জাগে নাই। আপন ঊর্ধ্বে চাহিবার দৃষ্টি থাকিলে সে দেখিতে পাইত যে, তাহার সকল সজ্জার শীর্ষে ওই শোলার মুকুটটাই একমাত্র সত্য হইয়া বিরাজ করিতেছে। রাজা সাজিবার অপরিহার্য সজ্জা যে মুকুট, বস্তুমূল্যে সে জিনিসটা এমনি মূল্যবান যে তাহা ভাড়া দিবার দুঃসাহস কোনো কোটিপতি মণিকারেরও নাই, থাকিলেও কোন্ কেরানীর লক্ষ্মীর চুপড়িতে তাহা ভাড়া করিবার সামর্থ্য আছে? সুতরাং মুকুটের প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে হইয়াছে শোলার টোপরে —যুদ্ধের বাজারেও যাহার রাজসংস্করণের মূল্য বারো আনা হইতে পাঁচসিকার উপরে উঠিবার সাহস পায় নাই।

কেন এ ভণ্ডামি? সমাজের আকাশে পুরুষতান্ত্রিক শাস্ত্রশাসনের যে রক্তলাঞ্ছন নারীবিজয়ের প্রতাপে আন্দোলিত হইতেছে, কোন্ কন্যাকুমারীর আর্তনাদ তাহা অবনমিত করিবার শক্তি রাখে? নারীর পিতৃত্বের অপরাধে তাহার পুরুষ পিতার মুষ্টিক্ষেপ পর্যন্ত সেখানে বাধা পাইয়া তাঁহার আপন বক্ষে ফিরিয়া আসিতেছে। বন্ধু যদি এখন নিজের অক্ষমতার সত্যরূপ, চর্মকঙ্কালসার নগ্নরূপ লইয়া তাহার অনুগ্রহনির্বাচিতা কন্যার সমক্ষে দাঁড়ায়, সেই বরেরই শকুন-কণ্ঠে বরণের মালা অর্পণ না করিবার কী সাধ্য সেই কন্যার আছে?

তবু যে এই মনোহরণের মনোবৃত্তি তাহার কারণ হয়তো এই যে, চক্ষুলজ্জার খানিকটা বালাই এখনও নাকি আছে; বিবেক নামক ব্যাপারটার প্রেতাত্মাও মাঝে মাঝে মানুষের যথেচ্ছাচারে বাধা ঘটাইয়া বিব্রতি উৎপাদন করে। ইহারই জন্য পাঁঠা খাওয়ার রাক্ষসতা ঢাকিতে দেবপূজার প্রয়োজন। যে-কারণে পূর্ণপদানত সাম্রাজ্যের প্রজার অর্থ কাড়িয়া না নিয়া সম্রাটপ্রভু তাহা বিবিধপ্রকার করের অছিলায় আত্মসাৎ করিয়া থাকেন, সেই কারণেই যাহা কাড়িয়া লওয়ার অধিকার আছে সমাজপ্রভু তাহা ঠকাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

যথাকালে দুইজন পুরুষের বাহিত চিত্রপীঠিকা-আরোহণে কন্যা যথারীতি সভারূঢ় হইল। এখানে প্রমাণ রহিল যে, পুরুষবাহন ছাড়া নারীর চলিবার উপায় নাই। কন্যা স্বর্ণালংকারে ভূষিতা এবং বেনারসী-মণ্ডিতা। তাহার সেই সজ্জা কিন্তু বরের বা বরপক্ষের মনোহরণের জন্য নয়। পিতার সামর্থ্য শুধু শাখাশাড়িভূষণে কন্যার বিবাহ দেওয়ার; কিন্তু পুরুষ-বরের পুরুষ-পিতা কিছুতেই অন্ততঃ বারো ভরি সোনার গহনা এবং বেনারসী শাড়ীর নীচে নামেন নাই। কন্যাকর্তার আপাদ-মস্তক ঋণবন্ধনে লব্ধ সেই পণের শাড়ি এবং পণের গহনা পরাইয়াই কন্যা সভাস্থ করা হইল। কন্যা-কর্তার নগদও পণ দিতে হইয়াছে কয়েকশত টাকা; বন্ধুর রাজসজ্জায় তজ্জনিত একটা প্রশ্নও বিদ্যমান। বড় অভাবগ্রস্ত বলিয়া যে সেই কয়েকশ টাকা তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া হইতেছে না, তাহার যোগ্যতার সেলামি-রূপেই যে কন্যাজনক সে অর্থ দিতেছেন, তাহা প্রমাণ করার জন্যও বন্ধুর এ যোগ্যতার সজ্জা। ভাবী জামাতা কত মাহিনায় কেরাণিগিরি করেন সে সন্ধান লইবার চেষ্টা কি আর কন্যার পিতা না করিয়াছেন? কিন্তু সেই মাহিনাই যে তাহার আর্থিক অবস্থার প্রমাণ এমন কথার কি অর্থ আছে? মহারাজ খাঞ্জা সিংহের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বংশধর পাঞ্জা সিংহ যদি মধ্যাহ্ন অবকাশটা নিদ্রায় না কাটাইয়া, নিজেদের ছ্যাতলাপড়া টাকার কয়েক হাজার জামিন দিয়া, কোন একটা ব্যাঙ্কের ষাট টাকা মাহিনার একটি কোষ-কেরানিপদকে ধন্য করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা আমার এমন মনে করা চলিতে পারে না যে ওই ষাট টাকাতেই রাজবংশীয়ের সংসারযাত্রা কায়-ক্লেশে নির্বাহ হইতেছে।

শুভদৃষ্টির জন্য কন্যাকে পিঁড়িসমেত উঁচাইয়া ধরা হইল। চতুর্দিক হইতে তাহার প্রতি আলো ভরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার নির্দেশ কোলাহল উঠিতে লাগিল। মনে হইল, কন্যার চোখমেলা দৃষ্টিটা যেন বরের মুখে আঘাত খাইয়া তাহার শোলার মুকুটে গিয়া ঠেকিল, সেখানে আঘাত খাইয়া সেই-যে নামিয়া আসিল, আর উঠিল না।

হাঁড়িকাঠের আসরে দাঁড়াইয়া বলির জীব যখন বুঝিতে পায় যে, সম্মুখের চোখ-ঝলসানো দেবরূপেই তাহার জীবনহন্তারক, সে মুহূর্তে তাহার মনোভাব কি রকম হয় জিজ্ঞাসা করুন ওই কন্যাকে, সেই জীব যদি তখন কোনোক্রমে মুক্তি পাইতে পারে, তাহা হইলে সে কি করে জিজ্ঞাসা করুন ওই কন্যাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? যূপ-আসরের বলির জীবের মতন বিবাহ-আসরের বলির প্রাণীও যে অবোলা। তাহার বাক্‌শক্তি সৃষ্টিকর্তা দেন নাই আর ইহার বাক্‌শক্তি মানুষে হরণ করিয়াছে।

কতজন বরযাত্রী খাওয়াইতে হইবে সে বিষয়েও কন্যাকর্তা পণবদ্ধ। সে-অনুসারে

আমরা খাইলাম, ছড়াইলাম, হৈ হৈ করিয়া আনন্দই নাকি করিলাম। যেমন প্যালা পণ্ডার হয়, যদু মধুর হয়, আমার হইয়াছে, না হইয়া থাকিলে আপনার হইবে, তেমনি করিয়া বন্ধুর বিবাহ হইয়া গেল।

তারপর?

তারপর শোলার মুকুট ভাঙিয়া যাইবে, বন্ধু তাহার রাজসজ্জা দোকানে ফেরত দিবে, পরের আঙটি ঘড়ি বোতাম পরকে ফিরাইয়া দিবে এবং আমার আপনার ও আর সকলের মতো সারা জীবন ধরিয়া কখনো হাসিতে-হাসিতে, কখনো কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিতে থাকিবে, 'ঠকাইয়াছি ঠকাইয়াছি ঠকাইয়াছি'; যাহাকে ঠকাইয়াছে, সে যদি কোনো দিন ভয়ে ভয়ে 'ঠকিয়াছি' বলিবার চেষ্টামাত্র করে, তাহাকে চোখ রাঙাইয়া বলিবে—'চুপ!'

আরো হইবে। প্যালা পণ্ডার যদু মধুর আমার আপনার মতো বন্ধুরও মেয়ে হইবে, মেয়ে বড় হইলে যথাসর্বস্ব পণ রাখিয়া সে পাত্র-নির্বাচন করিবে এবং সেই পাত্রের শোলার মুকুট দেখিয়া ঠকিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। অনন্তকাল ধরিয়া সজ্জার দোকানে বরসজ্জা ভাড়া পাওয়া যাইবে, দশকর্ম ভাণ্ডারে শোলার মুকুট বিক্রি হইবে। শোলার মুকুটের ঠকামির ব্যবসা কোনো কালে রদ হইবে না। শাস্ত্র নামের রক্ত পতাকার নিরাপদ আশ্রয়ে তাহার আইন অক্ষয় অমর হইয়া গিয়াছে; সে আইনের একতিল সংস্কারের জন্য আপনি যদি টুঁশব্দমাত্র করিতে চাহেন, তবে আমরা সভা মিলাইয়া আপনাকে পাগল বলিব, মর্ম-স্পর্শী বাক্যবাণে আপনাকে বিদ্রূপ করিব, আপনাকে অনাচারী ধর্মদ্বেষী বলিব, সকলে এককণ্ঠে গর্জনশব্দে আপনাকে শাসাইয়া বলিব—'চুপ!'

পেখু-গুরু

অ: ঠ: র

* পাদ-পূরক *

মানুষের সমাজকে যদি আমরা একটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা বলিয়া কল্পনা করি তাহা হইলে দেখা যায় আমার মত অনেকেই এই পৃষ্ঠায় পাদপূরক মাত্র। আমাদের কাজ শুধু ফাঁক ভরানো। আমাদের কেহ লক্ষ্য করে না, লক্ষিত হইবার মত গুরুত্ব বা মর্যাদা আমাদের নাই। কিন্তু তবুও সমাজে আমাদের প্রয়োজন আছে—ফাঁক ভরাইবার জন্যই প্রয়োজন আছে।

* * *

রূপক ছাড়িয়া এবার বাস্তবে আসা যাক। সাময়িক পত্র সম্পাদনা ব্যাপারের সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় আছে তাহারাই পাদপূরকের প্রয়োজনীয়তা জানেন। পাদপূরক যে গদ্য হয় না তাহা নহে, কিন্তু প্রধানত তাহা পদ্যই হইয়া থাকে। বর্তমান ক্ষেত্রে পাদপূরক বলিতে আমি পাদপূরক কবিতাই বুঝিব।

আমি সম্প্রতি পাদ-পূরক কবিতা লিখিতেছি, জনৈক সম্পাদক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে। বিশেষ অনুরোধের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলা যাক। বন্ধুটিকে আমি আমার একটি কবিতা তাহার কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলাম—কবিতাটি লম্বায় চব্বিশ লাইন। বন্ধু লিখিলেন এক সংখ্যায় আমার কবিতার জন্য চব্বিশ লাইন জায়গা ছাড়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে কিছুতেই; আমি অনুমতি দিলে তিনি প্রত্যেক কিস্তিতে চার লাইন করিয়া ছয় সংখ্যায় কবিতাটি ছাপিতে পারেন। অনুনয় বিনয় করিয়া কোন ফল হইল না, সম্পাদক বন্ধু অনমনীয়। শেষ পর্যন্ত কবিতাটি ফেরৎ আনাইতে বাধ্য হইলাম। (কবিতাটি আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে।)

ইহারই কিছুদিন পরে সেই সম্পাদক বন্ধুটির একটি পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"ছোট ছোট কবিতা কিছু যদি লিখে পাঠান তো সাদরে ছাপ্‌বো, কিন্তু চার লাইনের বেশী লম্বা যেন না হয়। দু'লাইনেরও পারেন তো কিছু পাঠাবেন। পাদ-পূরণের জন্যে ওদের দিয়ে খুব কাজ হয়। যথাসম্ভব সত্বর কিছু কবিতা পাঠাবেন। বিশেষ অনুরোধ রইল।"

সম্পাদক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পাদপূরক রচনায় হাত দিয়াছি।

পাদপূরক সম্বন্ধে একটা গুজব আছে যে লেখক, কম্পোজিটার এবং প্রুফ-রীডার ছাড়া আর কেহ পড়ে না। গুজবটা পুরা-পুরি সত্য হোক্ বা না হোক্ একেবারে যে গাঁজাখুরী নয়, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহার চেয়ে গভীর ট্রাজেডি আর কি হইতে পারে? তাই আমার মনে হয়, পাদপূরকও যাহাতে পঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করিবার জন্য জোর আন্দোলন চালানো উচিত। শুধু তাহাই যথেষ্ট নহে; পাদপূরক রচয়িতাগণেরও কর্তব্য আছে। পাদপূরক রচনার কাজটা খেলোভাবে করিলে চলিবে না, সাধনার দ্বারা ইহাকে একটা উঁচুদরের আর্টে পরিণত করিতে হইবে।

* * *

পাদপূরক রচনার প্রধান কথা এই যে, অতি অল্প কথায় অনেক কথা প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন ধরা যাক্ আমার সদ্যলিখিত দুই লাইন লম্বা পাদপূরকটি :

ছায়ারে কহিল কায়া "তুই মোর ছায়া"
কায়ারে কহিল ছায়া "তুমি মোর কায়া।"

এ বলে "তুই আমার," ও বলে "তুমি আমার।" ব্যাস্, কবি এই পর্যন্ত খবর দিয়াই খালাস। তারপর ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া পাঠক-পাঠিকারা যত খুশী মাথা ঘামাইতে থাকুন। ছায়া ও কায়ার পারস্পরিক সম্বন্ধটা একটা মহা-সমস্যার ব্যাপার। এত বড় একটা ব্যাপার কবি দুই লাইনে সারিয়া দিলেন।

আরেকটি নমুনা:

অন্ধকারে ডাকি কহে আলো
"রে আঁধার, তুই বড় কালো।"
আঁধার হাসিয়া কহে "দাদা,
আমি কালো তাই তুমি সাদা।"

এই চারিটি লাইনে সৌন্দর্য-তত্ত্বের অনেক কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়া গেল। অসুন্দর এবং অসুন্দরীরা অসুন্দর এবং অসুন্দরী বলিয়াই যে সুন্দরেরা সুন্দর এবং সুন্দরীরা সুন্দরী, এই চারিটি লাইন পড়িলেই পাঠক-পাঠিকার কাছে এই তত্ত্বটি জলের মত সহজ হইয়া যাইবে।

আরো একটি কবিতা:

"চক্র আর চক্রবাকে তফাৎ কি শুধু
ওই বাকে?
কুজ হয় কুজ্‌ঝটিকা ঝটিকা জুড়িয়া
দিলে শেষে?"

একটি উন্মাদ হায় অকস্মাৎ ধরিয়া আমাকে পরম জটিল প্রশ্ন পথমাঝে করেছিল হেসে। প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলাম কি না, তাহা বলার কোনো দরকার নাই। এইখানেই থামিয়া গেলে এখান হইতেই পাঠক-পাঠিকার ভাবনা শুরু হইবে।

নীচে বিভিন্ন ধরণের কয়েকটি পাদপূরক কবিতা দিলাম। যাঁহারা পাদপূরক রচনা অভ্যাস করিতেছেন অথবা অদূর ভবিষ্যতে করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের হয়তো কিছু উপকারে আসিবে। ....

* * *

রাত কহে "দিন, শোনো শোনো মন-চোর!
দেবে নাকি ধরা বাহু-বন্ধনে মোর?"
রাত্রির কাছে দিন দিতে গেল ধরা
সেই ক্ষণে হায় রাত হয়ে গেল ভোর!

* * *

নাপিত পাঠাতে ভবে
(যদি) বিধাতা করিত ভুল
মানুষেরা হায় তবে
কেমনে ছাঁটাত চুল?

* * *

নরম ভক্তেরা কাঁদে "কোথা ভগবান?
খাইয়া শক্তের গুঁতা যায় বুঝি প্রাণ।"
কহিলেন ভগবান হইয়া বিরক্ত
"গুঁতা না খাইতে চাও, হও তবে শক্ত।"

* * *

দিনের দুয়ার খোলা রেখে দিলে
দিন চুরি যায় পাছে
এ ভয়ে অনেকে দিলে তালা দিয়ে
চাবী রেখে দেয় কাছে।

সংসার ও সংগ্রাম

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

রাত বেশী হয়নি, কিন্তু এরি মধ্যে চারিদিক যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বাড়িতে মাত্র দুটি প্রাণী। তারাপদবাবু আর তার স্ত্রী শুভদুর্গা। দুজনেই প্রৌঢ়। শোবার ঘরে খাটের উপর এলিয়ে তারাপদবাবু গুড়গুড়ি টানছিলেন, আর মেঝেতে হ্যারিকেনের সামনে স্তিমিত আলোয় শুভদুর্গা চালের কাঁকর বেছে তুলছিলেন। কারু মুখেই কোনো কথা নেই, যেন নির্বাক চলচ্চিত্র। একটু পরে তারাপদবাবু যখন নলটা ছেড়ে দিলেন তখন গুড়গুড়ির শব্দও বন্ধ হয়ে গেল, শুধু শোনা যেতে লাগল টেবিল ঘড়ীটার একটানা টিক টিক শব্দ। সে শব্দ যেন নীরবতার বুকে ছুঁচের মত বিঁধতে লাগল।

দূরে চাপা গোঙানির মত বাতাসের শব্দ জেগে উঠল,, পরক্ষণেই খোলা জানালা দিয়ে এক দমক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ঢুকল।

তারাপদবাবু বললেন—জানালাটা বন্ধ করে দাও।

শুভদুর্গা নিঃশব্দে উঠলেন, ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে নীরবে সেটি বন্ধ করলেন, তারপর ফিরে এসে আবার হ্যারিকেনের কাছে বসলেন, কোনো কথা বললেন না। তারাপদবাবু একবার পাশ ফিরলেন, একটা হাই তুললেন, তারপর বললেন—সময় যেন আর কাটতেই চায় না, সবে তো আটটা।

এ কথায় কোনো উত্তর দরকার হয় না। শুভদুর্গা স্বামীর কথায় একবার ঘড়ীটার দিকে তাকালেন মাত্র।

একটু পরেই তারাপদবাবু আবার বললেন এ মাসে ছেলেরা কে কত টাকা পাঠিয়েছে গো?

মাথা নীচু করে শুভদুর্গা কাজ করছিলেন, তেমনিভাবে থেকেই জবাব করলেন —এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

—বড়খোকা যেন পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছে, না?

—সে তো পাঠিয়েছে তপন। বড় খোকা পঁয়ষট্টি টাকা পাঠালো না!

—যাই বলো, টাকার অভাব কিন্তু এখন আর আমাদের নেই। ক'বছর আগে কি রকম টানাটানিটাই ছিল। এখনকার মত জিনিষপত্রের দাম হলে আর সংসার চালানোই যেত না।

শুভদুর্গা ছোট একটা 'হুঁ' দিয়ে চুপ করে যান। ক'বছর আগেকার কথা তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে ভাসতে থাকে। তখন গরীব ছিলেন তাঁরা, তবু সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও কী একটা জিনিস যেন তাদের ছিল, যাকে আজ এই প্রাচুর্যের মধ্যেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুভদুর্গা নীরবে বুঝতে চেষ্টা করেন সে জিনিসটার স্বরূপ।

মাঝখানের কটা তো মাত্র বছর। যুদ্ধের আগেও তো পরিবারের অবস্থা ছিল অন্যরকম। মফঃস্বল সহরে সদর রাস্তা থেকে অল্পদূরেই তারাপদবাবুর বাড়িখানা। বেশ বড়সড় বাড়ি। তারাপদবাবু নিজে—স্ত্রী শুভদুর্গা, তিন ছেলে আর এক মেয়ে—এই নিয়ে জমাট সংসার। তারাপদবাবু তখন পুলিস অফিসে কাজ করেন , বড় ছেলে শরৎ সবে বি-এ পাশ করে চল্লিশ টাকা বেতনে কলেক্টরিতে কেরাণীর কাজে ঢুকেছে। মেজ ছেলে তপন আর মেয়ে ছায়া ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ছে। ছোট মনোজ পড়ছে ক্লাস সেভেন-এ। তারাপদবাবু আর শরৎ দুজনে মিলে যা রোজগার করত তাতে সংসার চলত বটে, কিন্তু ফুটো নৌকোর মত জল সেঁচে সেঁচে অতি কষ্টে তাকে চালাতে হত। তারাপদবাবু ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে প্রকৃতির আর শুভদুর্গা বাঙলা দেশের মেয়ে—দুঃখ কষ্ট সহ্য করাটা তো তাদের জন্মগত অভ্যাস। শরৎ মনে মনে সাদাসিধে না হলেও সংসারের অবস্থা বুঝে মানিয়ে চলত। কিন্তু এর পরের কটি ছিল অন্য ধাতের। তারা সর্বদাই তাদের প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে সমস্ত জিনিস দাবী করত এবং তা না পেলেই মুখ ভার করত। তপন এবং ছায়া মাঝে মাঝে এমন মতও প্রকাশ করত যে, ভদ্রসমাজে চলার মত বেশভূষা অবধি তাদের নেই। তারাপদবাবু ও শুভদুর্গা দুঃখ পেতেন, কিন্তু প্রতিকার করা তাঁদের পক্ষে কদাচিৎই সম্ভব হত। ছোট মনোজ অত শত বুঝতো না, বন্ধুদের কাছে কোনো নূতন জিনিস দেখে এলেই সে তা পাবার জন্যে যথানিয়মে বায়না ধরত এবং না পেলে কান্না ধরত। শুভদুর্গা এক এক সময় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন এবং স্বামী পুত্রকে আর নিজের অদৃষ্টকে লক্ষ্য করে কিছু কিছু কটূক্তিও যে না করতেন এমন নয়। ত বাঙলার মেয়েদের গলায় যতটা জোর থা মনেও তার চেয়ে কম জোর থাকে না। ব ছেলে শরৎই দুঃখ পেতো সবচেয়ে বেশ এ সব বিষয়ে সেই যেন অপরাধী—তা ভাবখানা ছিল এমনি ধরণের।

অবস্থা তাদের স্বচ্ছল ছিল না তা সত্যি দুঃখ ছিল—দারিদ্র্য ছিল—অভাব অভিযোগ ছিল অসংখ্য, কিন্তু তবু শূন্যতা কোথাও ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর কথা কাটাকাটি, দুরন্ত ও অবাধ্য ছেলেমেয়েদের প্রতি মায়ের তিরস্কার, ভাইবোনদের ভেতরে ঝগড়া মারামারি—এই সব বিবিধ সংঘটনে সংসারটি সর্বদাই চঞ্চল ও মুখর থাকতো।

দশটার সময় মেজো তপন হয়তো চান করতে যাচ্ছে, ছোটো মনোজ তখনও লাট্টু খেলায় মত্ত। তাকে ডাক দিয়ে তপন বললে—মনু, তুই এখনও খেলা করছিস্ যে, ইস্কুলে যাবার মতলব নেই বুঝি।

—বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। আজ ইস্কুলে যাব না।

—মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। দাঁড়া, আমি এক্ষুনি গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করছি।

—বেশ তো, যাও না। আমি ইস্কুলে যাব না তোমার তাতে কী!

—ও বড়দা, তোমার ভাত দেয়া হয়েছে। খেতে এসো। ছায়ার গলা।

—বাবা, আপনি মনোজকে ইস্কুলে যেতে নিষেধ করেছেন?

—হ্যাঁ। ও বলছিল শরীরটা খুব খারাপ করেছে। মাথা ধরে জ্বর জ্বর করছে।

—ওর চালাকী আপনি বুঝতে পারেন না? দেখুন গে লাট্টু খেলছে।

—ওরে, ও তপন, তোকে না কখানা পোষ্ট কার্ড কিনে আনতে বলেছিলাম। তোদের দ্বারা যদি একটা কাজ হয়। শুভদুর্গা রান্নাঘর থেকে চীৎকার করে বললেন।

—আমার সময় কখন যে এনে দোব। মনুকে বলো না, ও তো লাট্টু খেলছে।

—মা, আমায় একখানা ছাপা শাড়ী কিনে দাও না, আমাদের ক্লাসে সবাই কিনেছে।—ছায়া মায়ের কাছে মিনতি জানায়।

—এখন ও সব ভুলে যাও বাপু। শরৎ ছেঁড়া জামা গায়ে অফিস করছে, তারই একটা জামা হচ্ছে না।

—আর তপনদা যে সেদিন এক জোড়া নূতন স্যাণ্ডেল কিনল সে আর কিছু নয়, না? আমার বেলাই যত।

—ব্যাটা ছেলেদের কথা আলাদা। ওরা রোজগার করে খাওয়াবে। আর তুমি মেয়েছেলে—ঘরের একরাশ নিয়ে নামবে।

—আজকাল মেয়েছেলেরাও রোজগার

করে তা জানো? ও বাড়ির বিজনদি ইস্কুলে চাকরী করে টাকা আনছে না?

শরৎ হাঁক দিলে—এই খুকী, কী কেবল তর্ক করছিস। আমায় আর চারটি ভাত এনে দে।

খেতে বসে মনোজ চেঁচিয়ে উঠল—এ কী মা, আজ মাছ হয়নি বুঝি! কে বাজারে গিয়েছিল?

—মাছ ছাড়া একদিনও ভাত রোচে না বাছা? কোনো রাজ-রাজড়ার ঘরে জন্মালে না কেন। কুমড়োর চচ্চড়ি হয়েছে, আলুর ডালনা হয়েছে—এই দিয়ে তরজ খেয়ে ওঠো।

মনোজের চোখে প্রায় জল এসে গেল,—আমি যে সব জিনিস দুচক্ষে দেখতে পারি নে, বেছে বেছে তাই রোজ রান্না করবে।

—কী রে মনু, তুই যে বড় ভাত খাচ্ছিস? তোর না জ্বর জ্বর করছিল? তারাপদবাবু রান্নাঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন।

তপন এসে মনুকে উত্তর দেবার সংকট থেকে বাঁচিয়ে দিলে, বললে—বাবা, কে এক ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

যেতে যেতে তারাপদবাবু বললেন—আর তোদের যেমন বুদ্ধি! ঘরে এনে বসাতে হয় না ভদ্রলোককে?

মাকে লক্ষ্য করে তপন বললে—তোমাদের ভাব বোঝা ভার মা। সেদিন একজনাকে বসতে দিয়েছিলুম বলে বাবা বললেন—কে না কে, জানা শোনা নেই, আগেই এনে ঘরে বসানো।

শুভদুর্গা ছেলের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন—যাতো ছায়া, আলমারী থেকে একটু চিনি নিয়ে আয়, তরকারীতে দেবো।

ঘরে এসে ছায়া বলল—চিনি তো নেই মা, ফুরিয়ে গেছে। গুড় নিয়ে আসব?

—গুড় তো কবেই শেষ হয়েছে। যাক গে তুই তপনকে ঠাঁই করে দে।

—আমাকেও অমনি দিয়ে দাও মা। একটু বাদেই ইস্কুলের গাড়ী এসে পড়বে।

—উঠোনে ও কে দাঁড়িয়ে আছে? ও কী চায়?

—ও মুচি। আমাদের জুতো সেলাই করেছে, তাই পয়সা চাইতে এসেছে। দেড় টাকা সবশুদ্ধ।

—এখন মাসের শেষে আমি দেড় টাকা বার করব কোত্থেকে? বলে দে কদিন পরে বাবুরা মাইনে পেলে যেন এসে নিয়ে যায়।

—কিছুতেই তুই ভাত খেতে পাবি নে। জ্বর হয়েছে বলে না ইস্কুলে যাস নি! তপন এসে মনোজের হাত ধরে এক টান মারলে।

মনোজ ছিটকে উঠল—ভালো হবে না কিন্তু ছোড়দা, আমার খুসী ভাত খাবো।

—খুসীটা বের করছি। তপন টেনে তুলেই ফেললে মনোজকে।

মনোজ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। তপনের বজ্রমুষ্টি থেকে হাত খুলল না, কিন্তু হাতের ভাতগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পায়ের ধাক্কা লেগে জলের গ্লাসটাও গেল উল্টে। ক্রুদ্ধ হয়ে তপন প্রচণ্ড এক চড় মারল মনোজের পিঠে। সে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুভদুর্গা রাগ করলেন—সামনের ভাত থেকে ছেলেটাকে তুলে দিলি? শাসনটা কি দুদণ্ড পরে হলে চলত না তপন? আমার আর ভাল লাগে না তোদের ব্যাপারে। ইচ্ছে হয়, একদিকে চলে যাই।

বাইরে থেকে তখনও মনোজের কান্না আর গালাগালির স্বর ভেসে আসছিল।

এমনিভাবেই চলছিল সংসার, এমন সময় এলো সংগ্রাম।......

কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না, তাই একটা হ্যারিকেনকে ঘিরে বসে ছেলেমেয়েরা সশব্দে ইস্কুলের পড়া তৈরী করছিল। তপন মুখ ভার করে বসেছিল, এক সংগে বসে তার পড়া হয় না। এ সম্বন্ধে কদিন ধরেই মায়ের কাছে আবেদন ও দাবী জানানো হচ্ছে, কিন্তু প্রতিকার এখনো করা যায়নি।

খাটের উপর বসে তারাপদবাবু গুড়গুড়ি টানছিলেন। তারাপদবাবুর দুটি অভ্যাস ছিল—যাকে বিলাস বা নেশা বলা যেতে পারে। তা হচ্ছে অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ পড়া আর সংগে সংগে গুড়গুড়ি টানা। ইদানীং কেরোসিন বাতির অভাবে তিনি খবরের কাগজ পড়বার বিলাসটুকু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, গুড়গুড়ি চালাতে আলোর দরকার হয় না—এই যা রক্ষা।

শরৎ এসে বাবার কাছে খাটের উপর বসল, বলল—বাবা, শুনছি কলকাতায় সাপ্লাই অফিসে নাকি দেদার লোক নিচ্ছে। আমাদের অফিসের অনেকে চলে গিয়েছে। গ্রাজুয়েটেরা সব একশো দেড়শোতে এপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে। আমি ভাবছি যে, এখানে চল্লিশ টাকায় পড়ে থেকে লাভ কী?

গুড়গুড়ির নলটা মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তারাপদবাবু বললেন—কিন্তু সে তো শুনতে পাই একেবারেই 'টেমপোরারি'। তাছাড়া কোলকাতায় একশো টাকা পাবার চেয়ে এখানে চল্লিশ টাকা পাওয়ায় অনেক লাভ। ওখানে তোমার আলাদা 'এস্টাব্লিশমেণ্ট'-ই তো কত খরচা হয়ে যাবে!

শরৎ বললে—একটা মেসে থাকলে আর কতই বা খরচা হবে? আমাদের সুরেশবাবু তো ছ' সাত মাস ধরে সাপ্লাইতে কাজ করছেন। তিনি প্রতি মাসে ষাট সত্তর টাকা করে বাড়ি পাঠাচ্ছেন। আমি গেলে তাঁর ওখানেই থাকতে পারব।

—কিন্তু ও চাকরীর তো তোমার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

—যুদ্ধ অবধি তো আছে। যুদ্ধের পরের ভাবনা এখন ভেবে লাভ কী! এখন যেখানে বেশী পাওয়া যাচ্ছে, সেখানেই ভালো। তাছাড়া কলকাতায় একবার গেলে কতরকমের 'স্কোপ' পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের বাজারে তো ব্যবসা করেও কতলোক লাল হয়ে গেল। তা ছাড়া মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট ইত্যাদি কত কি আছে। এখানে পড়ে থাকলে তো কিছুই হবে না।

ছেলেমেয়েরা পড়া থামিয়ে হাঁ করে কথা গিলছিল। তাদের একটা ধমক দিয়ে তারাপদবাবু বললেন—তা নিজে ভেবে চিন্তে দেখ। যদি ভাল মনে কর, তাহলে আমার আর আপত্তি করার কি আছে!

শুভদুর্গা শুনে বললেন—সবাই এক জায়গায় আছি এই তো বেশ! তুই আবার একা কোন্ বিদেশে চলে যাবি,—এ আমার ভাল লাগছে না খোকা।

শরৎ বললে—ভাল কি আমারই লাগছে? কিন্তু এত মায়া করলে তো চলবে না মা। জিনিসপত্রের দাম যে রকম চড়তে সুরু করেছে, এর পর যে না খেয়ে মরতে হবে।

শুভদুর্গা আর বিশেষ কিছু বললেন না। শরতের কোলকাতা যাওয়াই শেষ অবধি স্থির হল।

আই এ পরীক্ষায় ফেল করে তপন বললে—পড়াশুনো দিয়ে আর দরকার নেই। আই. এ—বি. এ পাশ করেও সেই তো কেরাণীগিরি করতে হবে। তার চেয়ে আমি কলকাতায় দাদার কাছেই যাচ্ছি, সেখানে চাকরী করব।

শুভদুর্গা বললেন—কোলকাতা গেলেই তোর চাকরী জুটে যাবে?

—আজকাল আবার চাকরীর ভাবনা নাকি! যুদ্ধে একটা কিন্তু খুব সুবিধে হয়েছে যাই বলো, বেকার বোধ হয় আর কেউ রইল না।

তপনকে বিদায় দেবার বেলা শুভদুর্গার চোখ ছলছল করে উঠল, করুণকণ্ঠে তিনি বললেন—একে একে তোরা সবাই ছেড়ে চললি!

কিন্তু এক মাস পরেই যখন শরৎ আর তপন এক সংগে একশো টাকা বাড়ি পাঠালে তখন অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে পুত্র বিচ্ছেদের দুঃখ প্রায় ভুলেই গেলেন শুভদুর্গা।

কৃতিত্বের সংগেই মনোজ ম্যাট্রিক পাশ করলে। শরৎ চিঠি লিখে জানালে যে, মনোজকে আর 'জেনারেল লাইনে' পড়িয়ে কাজ নেই। যুদ্ধের বাজারে আজকাল 'টেক্‌নিক্যাল কাজের চাহিদা অসম্ভব, তাই মনোজকে যাদবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজে পড়াবে বলেই শরৎ স্থির করেছে। তারাপদবাবুর এ বিষয়ে কোনো আপত্তি করার কারণ

ছিল না, কিন্তু শুভদুর্গা এবারে একেবারে বেঁকে বসলেন। স্বামীর সমস্ত যুক্তি-তর্কের বিরুদ্ধে তিনি শুধু বললেন—সব কটিকে কাছ ছাড়া করে আমি থাকবো কী ক'রে বল তো? আমার বুকটা হু হু করবে।

তারাপদবাবু বললেন—ছেলেদের চিরকাল তুমি আগলে রাখবে কি করে? ওরা এখন বড় হয়েছে, নিজেদের পথ ওদের বেছে নিতে দাও।"

মনোজের বিচ্ছেদ শুভদুর্গাকে অনেকখানি আঘাত করল। শরৎ ও তপনের শূন্যতা মনোজই এতদিন পূর্ণ করে রেখেছিল। তাকে চোখের আড়াল করে এবারে সমস্ত শূন্যতাকে তিনি এক সাথে অনুভব করলেন। ঘরদোরের দিকে যেন আর তাকানো যায় না, দড়ির উপর মনোজের দুএকটা ছেঁড়া জামা কাপড় পড়ে রয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে চোখের জল রোধ করা কঠিন হয়ে ওঠে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শুভদুর্গা ভাবেন ছেলেরা এমনি বটে। যখন ছোট ছিল আমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলত না। আজ বড় হয়েছে—ডানা গজিয়েছে, আমাকে এখন আর কী প্রয়োজন!

ছায়া তপনের সঙ্গে এক সাথেই ম্যাট্রিক পাশ করেছিল, তাকে আর পড়ানো তারাপদবাবুর ইচ্ছা ছিল না। মেয়েদের বেশী পড়ালে বিয়ের ব্যাপারে বড্ড ভুগতে হয়।

—বসে বসে আর ভাল লাগে না। দাদাকে লিখে দেব আমার জন্যেও একটা চাকরী ঠিক করতে। ছায়া বলে।

শুভদুর্গা শুনে বলেন—বেশ তো, দে না লিখে।

মায়ের সম্মতিতে কতটুকু যে আন্তরিকতা আর কতটা অভিমান ছায়া বুঝতে পারে না। সে সত্যি সত্যি একদিন শরৎদাকে চিঠি লিখে দেয়। উত্তরে শরৎ জানায় যে, ছায়া এলে তাদের অফিসেই অনায়াসে কাজ পেতে পারে।

তারাপদবাবু আপত্তি করলেন—শরৎকে আমি নিষেধ করে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তোমাকে আর চাকরী না করলেও চলবে।

ছায়া অপ্রসন্ন হয়। সে কোলকাতায় যাবে, ব্যাগ হাতে নিয়ে অফিস করবে, সবাই সসম্ভ্রমে তাকাবে তার পানে—মনে তার কত রঙীন কল্পনা।

শুভদুর্গা বললেন—তা যাক্ না বাপু, তোমারই বা এত আপত্তি কেন? মেয়েরা তো সবাই আজকাল চাকরী করছে, এতে নিন্দের কি আছে?

—নিন্দের জন্যে কি বলছি? আমাদের এমন অভাব কিসের যে মেয়েকে চাকরীতে ঢোকাতে হবে?

ছায়া বললে—বা-রে! আমি কি অভাবের জন্যে যেতে চাইছি? শুধু শুধু বসে থেকে ভাল লাগে কখনো মানুষের।

—সে তো সত্যি। স্বামীকে লক্ষ্য করে শুভদুর্গা বললেন—ওকে আর পড়াশুনোও করতে দিলে না, বিয়েও আজকেই দিচ্ছ না। একটা কাজ নিয়ে তো থাকতে হবে ওকে।

—কিন্তু ছেলেরা সবাই দূরে চলে গেল, মেয়েও চলে যাবে—তুমি একা থাকবে কী করে?

ঠোঁট বাঁকিয়ে শুভদুর্গা বললেন—ওঃ। আমার জন্যে তো তোমার আর ভাবনার অন্ত নেই। ছেলেরা যদি নিজেদের পথ দেখে নিতে পারে, মেয়েই বা কেন পারবে না, শুনি? ছায়া কোলকাতায় চলেই যাক।

কোলকাতা থেকে ছেলেমেয়েদের টাকা নিয়মিত আসতে লাগল; তারাপদবাবু ও শুভদুর্গার প্রয়োজনের চেয়েও সে টাকা অতিরিক্ত। দুহাতে খরচ করেও যেন শেষ হতে চাইত না কোনোমতে। কিন্তু তার বদলে কী গভীর শূন্যতা এই বৃহৎ সংসারের বুকে বাসা বেঁধেছে। তারাপদবাবু যখন তাঁর কাজের দরুণ বাইরে চলে যান, তখন ফাঁকা ঘরগুলো যেন গুমরে গুমরে কাঁদিতে থাকে। দোরের বাইরে উঠোনের উপর দুর্বাঘাস গজাচ্ছে, বাড়ির চারধারে বন-বাদাড়গুলো ঘন হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে। একলা হাতে সংস্কার করবার ফুরসত নেই শুভদুর্গার—উৎসাহও নেই। মাঝে মাঝে হাতের কাজ ফেলে তিনি চুপটি করে বসে থাকেন, মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। দারিদ্র্য নেই, অভাব নেই, শুধু অপরিসীম এক শূন্যতা ভিড় করে আছে অন্তরে বাইরে।

তারাপদবাবু বলেছিলেন—ছেলেদের ধরে রেখো না। ওরা বাইরে যাবে, পথ বেছে নেবে —টাকা রোজগার করবে। তারপর তাদের তুমি বিয়ে দেবে—এক এক করে বৌ আসবে ঘরে—সংসার তোমার গড়ে উঠবে। সে আশা ছিল শুভদুর্গার মনে। কিন্তু আজ কোনো নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্নে—শোভাহীন গৃহের মৌন পরিবেশের মাঝে অবগাহন করে শুভদুর্গার মনে সংশয় জাগে—সংসার কি গড়ে উঠছে, না ভেঙে যাচ্ছে?

দূরে কোথায় রাত্রির পেচক কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠল, সে আর্তনাদে শুভদুর্গার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। নিমেষে সচকিত হয়ে তিনি স্বামীকে বললেন—অনেক রাত হল, চল তোমায় খেতে দিই গে।

তারাপদবাবু তখন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, তাঁর কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না।

—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম

আজ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিকে আবদ্ধ। দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডগুলিতে, প্যালেস্টাইন হইতে ইন্দোনেশিয়া—পরাধীনতার গ্লানি দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে! এই সব ভূখণ্ড সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব আর মানিয়া লইতে চাহিতেছে না।



যবদ্বীপের জনৈক আদিম অধিবাসীর হস্তে সুবৃহৎ ধনুক ও কোমরে বিষ-মাখানো তীর। ইন্দোনেশিয় নরনারী বর্তমান যুদ্ধে তীর-ধনুকও ব্যবহার করিয়াছে।

মহাসমরের বজ্রনির্ঘোষ আর উত্তেজনাময় কোলাহল থামিয়া যাওয়ার পর প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে চলিতেছিল স্বার্থগৃধ্নু ভাগ-বাঁটোয়ারা দ্বন্দ্ব। সশস্ত্র যুদ্ধের পরিবর্তে আরম্ভ হইয়াছিল, কূটনৈতিক চাতুরীর সংগ্রাম।

মহাযুদ্ধের ফলে ফরাসী ও ওলন্দাজ পাশ্চাত্যের এই দুইটি এবং আরও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইয়াছিল নিবীর্য, হৃতসর্বস্ব। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী দম্ভ ধূলিসাৎ ও নখদন্তহীন হইয়া পরাজয়ের গ্লানিতে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ছিল। যুদ্ধাবসানে তাহাদের সাম্রাজ্যক্ষুধা আবার জাগ্রত হইয়াছে, চূর্ণিত ফণা আবার উদ্যত ও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। হৃত সাম্রাজ্যে আবার তাহাদের নিরঙ্কুশ ঔপনিবেশিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তাই প্রাচ্যখণ্ডে মহাযুদ্ধের বিরতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আবার আরম্ভ হইয়াছে।

একদিন যাঁহারা ফ্যাসিস্তদের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা ও তাহাদের পরপীড়ন ও পররাজ্য-লোভের কথা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন আজ তাঁহারাই ফ্যাসিস্ত সাজিয়া বসিয়াছেন এবং সুচিরকাল পরাধীন থাকার পর, পরাজিত প্রভু-শক্তিগুলির পতনের ফলে যে সমস্ত ভূখণ্ডের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিগয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহাদের স্বাধীনতা-রক্ষার সংগ্রাম-দলনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিংবা তাহাতে মৌন সম্মতি প্রদান করিতেছেন।

গত মহাযুদ্ধে শোণিতস্নাত এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে, বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়ায় আজ যে স্বাধীনতারক্ষার্থ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই নির্বাপিত হইতেছে না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে অংশে আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা প্রাচীন বৃহত্তর ভারতেরই অংশ ছিল। এই সমস্ত ভূখণ্ড প্রাচীন ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পুষ্ট হইয়াছিল। সুপ্রাচীন যুগ হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গ হইতে অভিযাত্রিদল সমুদ্রপথে সিংহল, শ্যাম, ইন্দোচীন বা হিন্দুচীন, ইন্দোনেশিয়ায় বা দ্বীপময় ভারতে এবং এমন কি চীনের উপকূলভাগে গমন করিয়া তথায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। জাপানী লেখক কাকাসু ওকাকুরা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"Down to the days of Mahamudan conquest went by the ancient high-days of the sea the intrepid mariners of the Bengal Coast finding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra binding Cathay (China) and India in mutual intercourse."

—"Ideals of the East."
By Kakasu Okakura.

এই সমস্ত অভিযাত্রিদল প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই সমস্ত প্রদেশের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত অভিযাত্রিদলের উপনিবেশ-স্থাপনে শোষণপটু সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতের শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এই সমস্ত ভূখণ্ডকে



যবদ্বীপের জনৈকা কৃষক-বধূ।

উন্নত ও মহীয়ান্ করিয়া তোলাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ইন্দোচীনের আংকরভাট বা আংকর মঠে, যশোধরপুরে যবদ্বীপের বোরোবুদুরে ও অন্যান্য নানা বুদ্ধমন্দিরে, চম্পার অনিন্দিত শিল্পচাতুর্যে বাঙালী কলাকুশলী শিল্পগণের হস্তের স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।



যবদ্বীপের একটি বুদ্ধ-মন্দিরের সম্মুখস্থ তোরণের দৃশ্য।



নৃত্যভঙ্গিমায় বলী দ্বীপের নর্তকী।

বোরোবুদুরের মত এমন সুবৃহৎ বুদ্ধ-মন্দির আর কোথাও নাই।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণ ইন্দোচীন ও দক্ষিণ এশিয়ার নানা প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া বা কম্বোজে হিন্দু-নৃপতিগণের শাসন চলে। প্রাচীন মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত ইন্দোচীনের আনাম প্রদেশে চীনের শাসন-কর্তৃত্ব চলে। ইহার পর হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আনাম এক আনামী নৃপতির শাসনাধীনে থাকে। মাঝখানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনামের উপর অল্প কিছুদিনের জন্য চীনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে ভারতে ফরাসীরা পরাজিত হইলে, সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ ইংরাজগণের বাণিজ্য বিস্তার খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে ফরাসীরা কোচিন-চীনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কালে সমগ্র ইন্দোচীনে ফরাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরাসীদের প্রতিশোধ গ্রহণের এই উদ্দেশ্যের কথা ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকালে জেসুইট বিশপ লিখিত এক স্মারকলিপি হইতে জানা যায়।

ইন্দোচীনে ফরাসীদের কতকটা ডিক্টেটরী শাসন প্রবর্তিত ছিল। অহমিকাদৃপ্ত এই সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের ফলে ইন্দোচীনে গণ জাগরণের সূত্রপাত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইন্দোচীনের দেশীয় নৃপতিরা ফরাসীর কাছে আত্মবিক্রয় করিলেও জন-গণের মনে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা নির্বাপিত হয় নাই, বরং তাহা ক্রমাগত ফরাসীদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অত্যাচার ও অবিচারের ফলে বাড়িয়াই চলিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইন্দোচীনের অধিবাসিগণের হৃদয় স্বাধীনতা-লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এমনকি স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশীয় নৃপতিগণ পর্যন্ত যোগদান করিলেন, ১৯১৬ সালের ষড়যন্ত্র রাজা দুইথানের নেতৃত্বে পরিচালিত হইল। আরও অন্যান্য ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ফরাসী গভর্নমেণ্ট কঠোর নির্যাতনের নীতি অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে লাগিল। ইহাতে সাময়িক শান্তি ফিরিয়া আসিলেই ইন্দোচীনের জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে শ্রমিক আন্দোলন মাথা তুলিয়া ওঠায় জাতীয় আন্দোলন আরও উগ্রতর হইয়া উঠিল।

ফরাসী গভর্নমেণ্ট শ্রমিকদিগের সামান্য বেতন বৃদ্ধি, সপ্তাহে সাত দিনই কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে, কাজের সময়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস ও বৎসরে বেতনসহ ৫ হইতে ১০ দিনের বিদায় ইত্যাদি মঞ্জুর করিলেন। শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতি-শ্রুতি ও আশা-ভরসা দেওয়া হইল। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দান ও তৎসহ নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণকে কারারুদ্ধ করিয়া ফরাসী কর্তৃপক্ষ আন্দোলন প্রশমিত করিতে প্রয়াসী হইলেন।

জার্মানীর হস্তে ফরাসীর পতন হইলে জাপান ইন্দোচীনের উপর আধিপত্য দাবী করিয়া বসিল। এদিকে শ্যাম তাহার রাজ্যের যে অংশ ইন্দোচীনকে দান করিয়া তাহার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় দাবী করিল। ইতিমধ্যে জাপান শ্যাম আক্রমণ করিয়া বসিলে শ্যাম একরূপ বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করায় ইন্দোচীন জাপান কর্তৃক কবলিত হইল।

অতঃপর জাপানের আক্রমণ মালয় ও যবদ্বীপের পথে দক্ষিণাভিমুখে পরিচালিত



যবদ্বীপের সুরকর্তা-রাজ্যের নৃপতি সপ্তম মংকুনাগরের কন্যাগণ "সেরিম্পি" নৃত্য করিতেছেন।

হইল। শ্যাম আত্মসমর্পণ করায় সিংগাপুরের পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং ১৯৪১ সালের ৩১শে জানুয়ারী সমগ্র মালয় জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইল।

ইন্দোচীন জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইলেও তাহারা জাপানের কাছে মাথা বিকাইয়া দেয় নাই। বরং এই আকস্মিক ও ঐতিহাসিক রাজনীতিক পরিবর্তনে তাহাদের মনে স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতম হইয়া উঠিল এবং এতদুদ্দেশ্যে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংঘ (League of Independence of Indo-China) সংগঠিত হইল।

মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পতন ঘটিলে ইন্দোচীনের জনগণ অতঃপর আর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভুত্ব মানিয়া লইবে না বলিয়া কৃতসংকল্প হইল। টংকিং-এর রাজনীতিক দল ও আনামীদের জাতীয় দল ভিয়েৎ মিন্হের মধ্যে যে মতবৈষম্য ছিল, তাহা উভয় দলের নেতা হো চাই মিন্হ্ (অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী) ও ঙ্গুয়েন হাই থান্ (Nguen Hai Than, —ভিয়েৎ মিন্হ্ দলের নেতা)-এর মধ্যে চুক্তির ফলে তাহার অবসান হইল এবং তাহার ফলে ইন্দোচীনের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইন্দোচীনে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানী সৈন্য নিয়োগ করা হইল। অথচ ইন্দোচীনের এই বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের মূলে জাপানীদের উস্কানি রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইতে লাগিল। অবরুদ্ধ সাইগনে আনামী জাতীয় সৈন্য ও মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাইবার জন্য কুড়ি হাজার আনামী সমবেত হইল। ২রা অক্টোবর তারিখে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় এক মাস যুদ্ধ চলিবার পর যুদ্ধ-বিরতি হইল।

ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতি হইলেও ইন্দোনেশিয়ায় এখনও স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিশিখা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া বা ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, বা যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলী বা বালি, বোর্নিও ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ লইয়া গঠিত। প্রাকৃতিক সম্পদে এই সমস্ত দ্বীপের ঐশ্বর্য অপরিমিত। এইজন্যই যবদ্বীপকে "Cream of the East" বলা হয়।

দ্বীপগুলির মধ্যে যবদ্বীপই অধিক জনসমাকীর্ণ, ঐশ্বর্যশালী এবং স্বাধীনতার সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলও যবদ্বীপ।

সুপ্রাচীন কাল হইতেই যবদ্বীপ ভারতীয় সংস্কৃতি, শিল্প ও সভ্যতার পুষ্ট



জনৈকা যব দ্বীপবাসিনী।

হইয়াছে। সুপ্রাচীন যুগে রাজা জয়বাহু যবদ্বীপে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যবদ্বীপীয় ভাষায় ইঁহার নাম অজি জয় বায়া (Aji Joya Baya)। ইনি এখানে মহাভারত ও রামায়ণ প্রচার করেন। বর্তমানে যবদ্বীপ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইলেও মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনীর প্রভাব খুবই পরিদৃষ্ট হয়। যবদ্বীপীয় লোকদের বিশ্বাস মহাভারতের ঘটনা যবদ্বীপেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই সব পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই দ্বীপে নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে। বালি ও যবদ্বীপের নৃত্যকলা মনোরম।

হিন্দু সংস্কৃতির পর যবদ্বীপে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধশিল্পে এই দ্বীপ ও অন্যান্য নানা দ্বীপ ভরিয়া যায়। বহু বৌদ্ধ শ্রমণ ও ধর্ম-প্রচারক এই দ্বীপে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাশ্মীরের যুবরাজ, পরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক গুণ বর্মনের নাম উল্লেখযোগ্য।

যে যবদ্বীপ শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কোন সুসভ্য দেশ হইতেই পশ্চাৎপদ ছিল না, ওলন্দাজদিগের সুদীর্ঘ শোষণের ফলে আজ সেই দ্বীপবাসিগণ দরিদ্র, অজ্ঞ। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র অবারিত রাখিতে হইলে জনগণকে কিরূপ নির্বীর্য ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে দীন করিয়া রাখিতে হয়, যবদ্বীপই তাহার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হল্যাণ্ডে উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে ওলন্দাজগণ



বাটাভিয়ার রাজপথের একটি দৃশ্য। দক্ষিণ পার্শ্বে বাষ্পচালিত ট্রামগাড়ি দেখা যাইতেছে।

তাহাদের এই দ্বীপময় সাম্রাজ্যে স্বার্থগৃধ্নু বণিকবুদ্ধির কঠোরতা হ্রাস করিয়া শিক্ষাবিস্তারে অনিচ্ছার সংগে প্রবৃত্ত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজকুমারী কার্তিনা অভিজাতগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপর যবদ্বীপে দ্রুতগতিতে শিক্ষার প্রসার হইতে লাগিল।

যবদ্বীপের জাতীয় জীবনের জাগরণের যাঁহারা পুরোহিত তাঁহাদের মধ্যে ডেকেরের (Dekker) নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি জাতিতে ইন্দো-ইউরোপীয়। ইঁহার আন্দোলনের ফলে যে সমস্ত ইউরেশিয়ান নিজদিগকে ইউরোপীয়দের হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করিত, তাহারাও জাতীয় মন্ত্রে দীক্ষিত হইল। ডেকের এবং তাঁর ভারতীয় দল (Indian Party)-এর প্রচেষ্টায় ইন্দোনেশিয়ার হৃদয় স্বাধীনতা লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত হইতে লাগিল।

১৯২৬-২৭ সালে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিক অসন্তোষ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। সরিকৎ ইস্লামের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

১৯৪০ সালে জার্মানি হল্যান্ড অধিকার করিয়া লইলে এই ওলন্দাজ শাসিত দ্বীপময় সাম্রাজ্য মূলশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসহায় হইয়া পড়িল। তখন জাতীয় দলের হাতে কিছু ক্ষমতা দান করিয়া নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল।

১৯৪১ সালে জাপানী আক্রমণের ফলে শ্যাম, সিংগাপুর ইত্যাদির একে একে পতন হইলে ওলন্দাজদের নৌঘাঁটি সুরাবায়ার পতন হইল। ক্রমে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জাপ কবলিত এবং ১৯৪২ সালের ৯ই মার্চ তারিখে যবদ্বীপে মিত্রবাহিনীর প্রতিরোধের অবসান হইল।

যুদ্ধের গতির পরিবর্তনের সংগে সংগে মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পতন হইল এবং বর্তমান বৎসরের গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে জাপানের পতন এবং ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ পর্ব সম্পন্ন হইল।

২৪শে সেপ্টেম্বর হইতেই ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতার আন্দোলনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

স্বাধীনতা রক্ষার্থ যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইল, তাহাতে ইন্দোনেশীয় জনগণ বীরত্বের সংগে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

জাপানীর অনুরক্ত বলিয়া ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ণের সংগে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ কোনরূপ আলোচনা চালাইতে অসম্মত হওয়ায় এই বিরোধ ক্রমশঃই তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ২০শে অক্টোবর মাউণ্ট ব্যাটেন তাঁহার হেডকোয়ার্টার্স হইতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন,—ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ছাড়া সমগ্র জাভা এখন ইন্দোনেশিয়ানদের দখলে। তাঁহার ইস্তাহারে আরও প্রকাশ, এই দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজদের কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব।

ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার এই সংগ্রাম দলনে ব্রিটিশ কেবল অংশ গ্রহণ করেন নাই ভারতীয় ও জাপানী সৈন্য এই দলনকার্যে নিয়োগ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ নেতৃগণ ইহার নিন্দাবাদ ও প্রতিবাদ করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় ও জাপানী সৈন্য নিয়োগও এক কূটনীতিক খেলা। এই নিয়োগের ফলে ভারতীয় ও জাপানীগণ ইন্দোনেশীয়দের অপ্রীতিভাজন হইবে।

হল্যান্ড জার্মাণ কবলিত হইলে রাজ্ঞী উইলহেলমিনা তাঁহার দ্বীপময় সাম্রাজ্যের প্রজাগণের উদ্দেশ্যে "Complete Partnership" এর প্রতিশ্রুতি দান করিয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ মহাযুদ্ধের অবসানে চূর্ণিত-দম্ভ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংস্র রূপ ক্রমশ প্রকট হইতেছে। প্রতিশ্রুতি, আশাভরসা, আটলান্টিক চার্টার সমস্তই—যাঁহারা একদিন পরাধীন জাতির ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 'মুক্তি-দাতা সাজিয়াছিলেন—তাঁহাদের এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল!

আজ দক্ষিণ এশিয়ায় যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ আজ হইবে কিনা তাহা অজ্ঞাত, কিন্তু এশিয়ার এই জাগরণই পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনা করিবে, সেদিন সুদূর নহে।

সাহিত্য-সংবাদ

জিয়াগঞ্জ কৃষ্টিচক্রের মুখপত্র "রক্তরাগ" পত্রিকার ৮ম বাৎসরিক সাহিত্য প্রতিযোগিতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্মৃতি প্রতিযোগিতারূপে অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলা ভাষায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে যে কোন রচনা আগামী ৩০শে আশ্বিন পর্যন্ত সর্বসাধারণের নিকট হইতে সাদরে গৃহীত হইবে। **প্রবন্ধ**—(১) বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এক দল, এক নেতা ও এক নীতি কি জাতীয় সংহতির পরিপোষক হইবে? (ফুলস্কেপ সাত পৃষ্ঠার মধ্যে)। (২) রবীন্দ্র সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম (ফুলস্কেপ পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে)। **গল্প**—(৩) বাঙলা দেশের বর্তমান বস্ত্র সংকটকে ভিত্তি করিয়া যে কোন গল্প (ফুলস্কেপ ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে)। (৪) যে কোন হাস্য রসাত্মক গল্প (ফুলস্কেপ ৫ পৃষ্ঠার মধ্যে)। **কবিতা**—(৫) 'রক্তরাগ' শীর্ষক ও 'রক্তরাগ' ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া ৩০ লাইনের মধ্যে একটি কবিতা। **চিত্র**—(৬) যে কোন রংগীন ছবি (৬"×৯" মধ্যে)। (৭) ভারতের বর্তমান রাজনীতিকে অবলম্বন করিয়া যে কোন কার্টুন চিত্র (৬"×৯" মধ্যে)। (৮) এমেচার ফটো। প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। অবস্থা বিশেষে উপযুক্ত হইলে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। যে কোন প্রতিযোগী একাধিক বিষয়ে যোগদান করিতে পারেন। প্রতিযোগিতার বিচার উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা হইবে। **পেয়ারে বাছারৎ**, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ট্রামে-বাসে

শুনিলাম, মা এবারে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন। দেখিলাম, মায়ের বুদ্ধি আছে। অশ্বের সঙ্গে শুধু যে ভারতীয় ঐতিহ্যই জড়িত তা নয়। যজ্ঞক্ষেত্র হইতে ডার্বি এবং সেখান হইতে টালিগঞ্জ জিমখানা পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের কাছে পরমতীর্থ হইয়া আছে শুধু এই অশ্বের সঙ্গে সংযুক্তির জন্যই। সুতরাং মা যে বাছিয়া বাছিয়া বেশ যুগোপযোগী যানই নির্বাচন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

* * *

সে যাহা হউক, পঞ্জিকাকার কিন্তু বলিতেছেন যে, মায়ের ঘোটকে আগমন ও প্রস্থানের ফল ছত্রভঙ্গ। আমরা কথাটা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশুখুড়ো সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন যে, মহামান্য আগা খাঁ পর্যন্ত নাকি হিন্দু দেবীর এই যান-নির্বাচনের তারিফ না করিয়া পারেন নাই। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের এই অশ্বপ্রীতিতেই নাকি একদিন মিলনের ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে। কথাটি যদি সত্য হয়, তবে দেবীর অশ্বযান যে নবযুগেরই সূচনা করিতেছে, সে সম্বন্ধে বিতর্কের কোন অবকাশ নাই।

* * *

নবযুগের সূচনা সম্বন্ধে বিশুখুড়ো আরও কয়েকটি সংবাদ দিলেন। পূজার ছুটিতে তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন। তাঁহারই একটি পরম আত্মীয়ের ওয়াকিবহাল মহলে একটু যাতায়াত আছে। রয়টারও যেখানে মাথা গলাতে পারেন না, সেখানেও তিনি মাথায় করিয়া এত সব খবর বহন করিয়া নিয়া আসেন যে, সে-সব ছাপাইতে গেলে সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেন্সারের জন্য অবশ্য সব খবর প্রকাশেরও বাধা আছে। যাহা হউক, দিল্লীর সংবাদ বিশুখুড়ো যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, ট্রামে-বাসের পাঠকের গোচরার্থ তাহা নিবেদন করিলাম।

(১) রাজনীতিক্ষেত্রে শীঘ্রই ভয়ানক ওলট-পালট হইয়া যাইবে। কায়েদে-আজম নাকি শীঘ্রই আবার কংগ্রেসে যোগদান করিবেন। কংগ্রেসের প্রায় সব ক'টি নীতিই তিনি মানিয়া নিয়াছেন। শুধু জেলখাটা সম্বন্ধে আপত্তিটা এখনও আছে। তিনি বলেন, এটা ভদ্রনীতিতে বাধে।



(২) মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দিবার জন্য শীঘ্রই নাকি কোন কোম্পানীর সঙ্গে



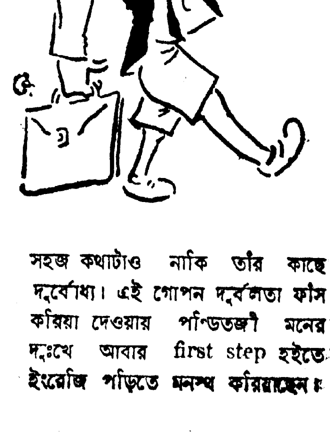
চুক্তিবদ্ধ হইবেন। জনপ্রিয়তাটাকে আরও কায়েমী করার জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা।

(৩) শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পাকপ্রণালী সম্বন্ধে একখানা কবিতার বই রচনা



করিতেছেন। বইখানা বাজারে কাটিলে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ আর তাঁর না-ও থাকিতে পারে।

(৪) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নাকি ইংরেজ সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য আবার বিলাত যাইতেছেন। দিল্লীর 'Dawn' পত্রিকাখানার মত নাকি এই যে, পণ্ডিতজী ভাল ইংরেজি জানেন না, এমনকি "Brickbat"-এর মত



সহজ কথাটাও নাকি তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। এই গোপন দুর্বলতা ফাঁস করিয়া দেওয়ায় পণ্ডিতজী মনের দুঃখে আবার first step হইতে ইংরেজি পড়িতে মনস্থ করিয়াছেন।

(৫) শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী কংগ্রেসের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বাঙলা



এবং পাঞ্জাবে মাদ্রাজী খাদ্য লোকপ্রিয় করিবার জন্য শীঘ্রই দুইটি হোটেল স্থাপন করিবেন।

(৬) শ্রমিক গভর্নমেণ্ট আপাতত ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে পারিবেন না বটে, আগামী পূজার সময় হইতে



ভাঙ্ চাষের বিধিনিষেধ উঠাইয়া দিয়া—এই ব্যাপারে আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিবেন।

বলিলাম,—"তা চাষের না হোক্ সিদ্ধি-পানের স্বাধীনতা তো দেখছি এ বছর থেকেই দিয়েছেন"—খুড়ো একটু হাসিলেন মাত্র। চোখে তখনও বিজয়া-উৎসবের ঘোর লাগিয়া আছে।

* * *

শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, **বৃটিশরা যদি স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষ ত্যাগ** করিয়া না যান, তবে **তাঁহাদিগকে ভারত** ত্যাগ করিতে বাধ্য করানো **হইবে।** বিবৃতিটিতে আমরা খুব উৎসাহ বোধ করিতেছি না। "প্রহারেন ধনঞ্জয়" নীতি কংগ্রেসের নয় বলিয়া পন্থজী এই পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তারপর ঘৃত-হীন খাদ্য বা কদন্ন পরিবেশনে যে বৃটিশ জামাতা ভারতের মত শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, সেকথা যে-কেহ বুঝিতে পারে। সুতরাং জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব সংগ্রহে মন দেওয়া ছাড়া আর কি যে করিতে পারি, তা আমাদের মত ট্রাম-বাসের যাত্রীদের বুদ্ধির অগম্য।

* * *

সম্প্রতি ভারতে অনুসৃত বৃটিশনীতি সম্বন্ধে রুশ পত্রিকায় সমালোচনা করা হইয়াছে। মঁসিয়ে গ্রিগরি বলিয়াছেন যে, "ভারতকে স্বাধীনতাদানে বৃটিশ সরকারের কোন আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।" সংবাদটি বিশুখুড়োকে পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি শুধু বলিলেন,—"বহু পুরাতন ভাব নব-আবিষ্কার!"

* * *

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও উহার নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া জিন্না সাহেব কোয়েটায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে লণ্ডনস্থ মুসলিম নেতারা মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা "বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ মাত্র"। লণ্ডনের মুসলিম নেতারা দেখিতেছি শুধু সত্য কথাই বলিতে শিখিয়াছেন, অপ্রিয় সত্য গোপন করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করেন নাই।

* * *

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হলে খাকসার নেতা আল্লামা মাসরিকী যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন একদল মুসলমান নাকি "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি করিতে থাকে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষ পর্যন্ত ইট-পাটকেল ছুড়িতে থাকে। ইঁহারা যদি লীগের লোক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জিন্না সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তিনি আসন্ন নির্বাচনের জন্য "চাঁদির বুলেট্" চাহিয়াছিলেন মাত্র। ইষ্টকের বুলেটটির কিন্তু কোন কথা ছিল না।

* * *

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভার অচিরেই ভারতীয়দের হাতে দেওয়া হইবে বলিয়া ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার অকিন্‌লেক সাংবাদিকদের বৈঠকে একটি বিবৃতি-প্রদান করিয়াছেন। বিশুখুড়ো তাঁর স্বকীয় বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, "অতঃপর ভারতীয়দের পক্ষে 'নিধিরাম সর্দারের' পদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।"

জাপ সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিত্রপক্ষের নীতি অনুযায়ী জাপানের বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "জৈবাৎসু"কে ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে। অতঃপর "জুজুৎসু" সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের কি নীতি, তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক হইয়া রহিলাম।

* * *

প্রসংগত আরও একটি সংবাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। জাপানে নাকি সম্প্রতি "জীজী" নামক একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এ ব্যাপারে মিত্রপক্ষের নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে; কেননা, "হাঁ, জী, হাঁ, জী" করার নীতিকে চিরকালই তাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা "জীজী"র দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

* * *

কেন্দ্রীয় ও বাঙলা সরকারের মধ্যে ঘড়ি নিয়া খেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে, পোস্ট অফিস প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনের অফিসে যখন দশটা বাজে, তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঘড়িতে বাজে এগারটা (ভাগ্য ভাল যে বারোটা নয়)—জনসাধারণের ইহাতে অসুবিধা হইলেও, বাঙলা সরকারের এই অগ্রগমনের বৈশিষ্ট্যকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি!

* * *

সম্প্রতি দিল্লীতে একটি "তরকারী সম্মেলন" হইয়া গিয়াছে। নিদারুণ খাদ্য-সংকটেও আমরা পুঁই প্রভৃতি শাক-পাতার উপর চিরকালই ভরসা রাখিয়া আসিতেছিলাম। সম্মেলনে তরকারীকে দিল্লীর লাড্ডুর পর্যায়ে উন্নীত করায়, সে সম্বন্ধেও শেষ পর্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িতেছি।

* * *

আগামী এপ্রিল মাস হইতে ব্রিটেনে আয়কর হ্রাস করা হইবে বলিয়া অর্থসচিব মহোদয় একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে আয়কর কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তাহার গবেষণা ইতিমধ্যেই চলিতেছে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। কামধেনু সম্বন্ধে আয়কর হ্রাসের প্রশ্নই উঠে না!

* * *

অফিসের বেলায় অযথা ভিড় না করিবার অনুরোধ জানাইয়া ট্রাম কোম্পানী বিজ্ঞাপন ছাড়িয়াছেন। জনসাধারণ এই অনুরোধ পালন না করিলে অতঃপর অফিসের বেলায় অযথা বেশি গাড়ি সরবরাহ করিয়া রাস্তার ভিড় না বাড়াইলেই সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়! কোম্পানী নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

পরিচালক সুশীল মজুমদার 'বেগম' তোলা শেষ করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন এবং বম্বেতে আর কোন ছবি তোলার চুক্তি না থাকায় এবারে বোধহয় এখানেই কোন ছবি তুলবেন। পরিচালক নীতিন বসুও ফিল্মিস্তানে 'মজদুর' তোলা শেষ করে কলকাতায় বিশ্রাম করতে এসেছেন। তবে তিনি ফিরে যাবেন বম্বে টকীজের হয়ে 'নৌকাডুবি' তোলার জন্যে।

*　　　*　　　*

বম্বের অভিনয় শিল্পীসংঘ পৃথ্বীরাজের অধিনায়কত্বে সুভাষচন্দ্র গঠিত ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর পরিবারবর্গের সাহায্য-কল্পে একটি ফান্ড খুলেছে। সাবাস।

*　　　*　　　*

হিন্দী সাহিত্যিক এবং বর্তমানে চিত্র-প্রযোজক ভগবতীচরণ বর্মা সম্প্রতি কলকাতায় এসে বিড়লাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন এবং শোনা গেল তাঁর চেষ্টা ফলবতীও হয়েছে, অর্থাৎ বিড়লা তাঁর বিপুল অর্থবল নিয়ে চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও আধিপত্য বিস্তারে এগিয়ে আসছেন।

*　　　*　　　*

বম্বের অভিনেত্রী বীণা চিত্রপ্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করেছেন। তার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা থাকবেন তার ভাই ইফতিকারউদ্দিন। প্রথম ছবি হবে পাঞ্জাবের প্রণয় কাহিনী 'হীররাঁজা'।

*　　　*　　　*

গত মহাষষ্ঠীর রাতে অরোরা ফিল্মসের ষ্টুডিওতে এক বিরাট আগুন লেগে পাশা-পাশি কতকগুলি ফিল্ম গুদাম ধ্বংস হয়ে যায়। কোন লোকের প্রাণ না গেলেও চিত্র-জগতে এতবড় অগ্নিকাণ্ড তরে হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছে অরোরা ফিল্মস, মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ডোসানী ফিল্ম কর্পোরেশন, ডিলাক্স ফিল্মস এবং বাঙলা সরকার। সঠিক হিসাব না হলেও ক্ষতির পরিমাণ ছ'লক্ষ টাকার বেশী বলে অনুমিত হয়। বম্বে ও লাহোরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরই কলকাতায় এই ব্যাপার —এর পিছনে কোন দল নেই তো?

*　　　*　　　*

বিখ্যাত কবি হারীণ চট্টোপাধ্যায় এন আর দেশাই প্রডাকসন্সের আগামী সামাজিক চিত্রে অভিনয় করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর প্রতিপক্ষে নায়িকা হবেন লীলা দেশাই।

*　　　*　　　*

হলিউডের অধিকাংশ কর্মী গত ২৯ সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট করেছে। কাজ এক রকম বন্ধই আছে।

*　　　*　　　*

বম্বের জি বি প্রডাকসন্সের 'রেহানা নামক একখানি ছবিতে শাড়ীর খরচই লাগছে পঞ্চাশ হাজার টাকা।



এই সপ্তাহে নিউ সিনেমায় নবযুগ চিত্রের 'পান্না'র রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অন্যান্য চিত্রগৃহে চলার হিসেব এই সঙ্গে যোগ করলে কলকাতায় 'পান্না'র একাদিক্রমে চলার এটা হয় ২৯ সপ্তাহ। 'পান্না'র গানগুলি শহরকে যেভাবে মুখরিত করে রেখেছে তাতে এর এত দীর্ঘ চলায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

*　　　*　　　*

কাপুরচাঁদ লিমিটেড ন' লাখ টাকায় ফিল্মিস্তানের 'মজদুর' ছবিখানির সর্ব-ভারতীয় স্বত্ব ক্রয় করেছে।

*　　　*　　　*

মজহর আর্ট প্রডাকসন্সের 'পহলীনজর'-এর সর্বভারতীয় স্বত্ব এগারো লাখ টাকায় বিক্রী হয়ে গিয়েছে।

*　　　*　　　*　　　*

সিনেমার টিকিট বিক্রীর ব্যবসা যে কি পরিমাণ বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল ক্রাউন সিনেমার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। ওখানকার ব্যবসা কোন দলের হাতে থাকবে এই নিয়ে দু'দল দুর্বৃত্তের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়। প্রথম ব্যাপারটা বচসার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু টিকিট ঘর খুলতেই একেবারে সম্মুখ-সমর। দু'দলই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ময়দানে হাজির, সংঘর্ষের ফলে একজন ছুরিকাঘাতে এবং সোডার বোতল ও লাঠির আঘাতে আরও জনকয়েক আহত হয়। তারপরই থানা পুলিশ এবং হাসপাতাল। দখল নেওয়ার বিষয় এখনও অমীমাংসিতই রয়েছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সংখ্যা হইতে 'দেশ' ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে।

উক্ত সংখ্যা হইতে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের উপন্যাস "উটলের খেয়াল" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

*　　　*　　　*　　　*

কলিকাতায় সংগীত শিল্পী সম্মেলন

আগামী ৯ই হইতে ১২ই নবেম্বর শ্রী সিনেমা গৃহে নৃত্য, গীত ও যন্ত্রসংগীতের আয়োজন হয়েছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণী শিল্পীবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর নাম উল্লেখ করা হলো:—গোলাম আলী খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, ডি ভি পুলস্কের রামদাস (বড় ও ছোটো), বিলায়েৎ খাঁ, মোস্তাক আলী, কণ্ঠে মহারাজ, আচ্ছান মহারাজ, হাবিবুদ্দিন খাঁ, অলকনন্দা প্রভৃতি। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা সর্বপ্রথম বাঙলাদেশে আসছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলতাফ খাঁ, মিস কৃষ্ণা উদয়ভারকার (বি এ) শিরোমণি (১১ বৎসর) সাখাওয়াৎ আলি, ইলিয়াজ খাঁ, বন্ধু খাঁ, পণ্ডিত সখারাম, জামাল খাঁ প্রভৃতি।

পুস্তক-পরিচয়

স্ফুলিঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশ ১৩৫২। মূল্যঃ সাধারণ সংস্করণ, দুই টাকা; শোভন-সংস্করণ। চার টাকা।

রবীন্দ্রনাথ জীবিতকালে প্রায় প্রতি বৎসরেই নানা শুভতিথিতে একাধিক গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন তার স্বদেশবাসীদের। সংবাদ পাবা-মাত্র সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থ কিনতে দৌড়নো এবং পরে সে বই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়া-কাড়ি করার আনন্দ—বাংলার নবীন পাঠকদের সে এক মন-কেমন-করা পরম সুখের স্মৃতি। রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর চোখের জলে যেদিন "শেষ লেখা" পড়া সাঙ্গ হল, গভীরতম বেদনায় সকলে সেদিন অনুভব করেছিলাম যে, এ জীবনের মতো সে সুখোৎসবের উদ্‌যাপন হল।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ কিন্তু নিরুৎসাহ হতে দিলেন না রবীন্দ্র-সাহিত্যামোদীদের। কি ভাষায় তাদের কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না! বিশেষ করে সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্র কাব্য স্ফুলিঙ্গটির জন্যে। "স্ফুলিঙ্গ" রবীন্দ্র-নাথের সম্পূর্ণ নূতন কবিতা সংগ্রহ। প্রকাশক দেশবাসীকে অতি নম্রভাবে নিবেদন করেছেন গ্রন্থটির প্রকাশ-সংবাদ, কিন্তু সাহিত্যের পূজারীগণ এ বৎসর আনন্দ-উৎসবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে অভাবনীয় এই সংবাদে। নূতন রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রকাশ বাঙালীর জীবনে যে চির-অবিস্মরণীয় এক পরম ঘটনা!

"স্ফুলিঙ্গ" তার বাইরের রূপ-সৌষ্ঠবে এবং অন্তরের কাব্যরসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গই বটে। ঝক্‌-ঝকে রেশমের মলাটে কবির আঁকা দীপ্ত-বর্ণের প্রচ্ছদ-ছবিটি শুধু রুচিসম্মত নয়, অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। প্রবেশক কবিতায় কবির হস্তাক্ষরে বলা হয়েছেঃ

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেলো
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেলো
সেই তারি আনন্দ॥

পাঠক কিন্তু "স্ফুলিঙ্গের" পাতায় সংগৃহীত ক্ষণকালের এই ছন্দগুলিতে চিরকাল আনন্দে গুঞ্জন করবার অজস্র খোরাক পাবেন। "স্ফুলিঙ্গ" লেখনেরই সগোত্র, ফলে "ক্ষণকালের ছন্দ" যে এর কবিতাগুলি তা এক অর্থে সত্য। কিন্তু প্রধানত স্নেহভাজন আশীর্বাদ প্রার্থীদের খাতায় কবিতাগুলির জন্ম হলেও নির্বাচনের গুণে সংগ্রহ-গ্রন্থটির কাব্য-মহিমা কোথাও ক্ষুন্ন হয়নি। বাক্যের বোঝাকে লঘু করে রসের দ্যোতনায় টলোমলো শোভায় ফুটে উঠেছে এক একটি কবিতা-কণা, যেন নানা বর্ণের আলো-ঠিকরানো এক-একটি মহামূল্য মণি-কণা। মাঝে মাঝে ঈষৎ বড়ো কয়েকটি কবিতা গেঁথে এই অপূর্ব কাব্য-মালিকার অতি পরিপাটি ভাবে বৈচিত্র-সাধন করা হয়েছে।

প্রায় দুশো কবিতা সংগ্রহ করা হয়েছে "স্ফুলিঙ্গে"। ভাবের, চিত্রের, সুরের ও ছন্দের বৈচিত্র্য আশ্চর্য রকম ধরা পড়েছে গ্রন্থটিতে; পথে-ঘাটে, সময়ে-অসময়ে পাতা উল্টে আনন্দ পাবার এবং আনন্দ দেবার এমন অপূর্ব খনি রবীন্দ্রনাথের "লেখন" দুষ্প্রাপ্য হবার পরে আর ইতিপূর্বে হাতে পাইনি। দু-একটি মাত্র ছন্দ-স্ফুলিঙ্গ বইটি থেকে উদ্ধৃত করা গেল এখানে, পড়তে পড়তে ভালো লাগল বলে, পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথকে পরিচিত করার প্রয়োজনে মোটেই নয় তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

"এসো মোর কাছে"
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা
নিবে চলে গেল,
মানিল সে আহ্বান। (৩৩নং)

প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ।
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন। (১১০নং)

মিলন-সুলগনে,
কেন বল্,
নয়ন করে তোর
ছলছল্।
বিদায়দিনে যবে
ফাটে বুক
সেদিনও দেখেছি তো
হাসি মুখ। (১৫০নং)

তোমারে হেরিয়া চোখে,
মনে পড়ে শুধু, এই মুখখানি
দেখেছি স্বপনলোকে। (৮০নং)

ক্লান্ত মোর লেখনীর
এই শেষ আশা—
নীরবের ধ্যানে তার
ডুবে যাবে ভাষা। (৪৭নং)

হে তরু, এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে,
"ভালোবেসেছিল কবি
বেঁচেছিল যবে।" (১৯৬নং)

পথ নিদেশ—সনায়মৎ প্রণীত। বাণী নিকেতন; ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানাতে আধুনিক সমাজ জীবনের পটভূমিকায় তরুণ-তরুণীদের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং সে মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত বিপ্লবের আদর্শের উদার স্বরূপটিকে গ্রন্থকার তরুণ-তরুণীর অন্তরের রসধারায় উজ্জ্বল-রূপে উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধনতান্ত্রিকতা এবং আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তরুণ চিত্ত বিদ্রোহোন্মুখী হইয়া উঠিতেছে। লেখক ধনতন্ত্রের এবং আভিজাত্য শ্রেণী-কৌলিন্যের মূলীভূত স্বার্থগৃধ্নুতা এবং নীতির নিষ্ঠুর স্বরূপ অনাবৃতভাবে উন্মুক্ত করিয়া মানবতার জয়গান করিয়াছেন। এমন উপন্যাসের আদর হইবে।

কাজ্জা ফাসাদ—শ্রীসুনির্মল বসু প্রণীত। কুলজা সাহিত্যমন্দির সি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা।

শিশুসাহিত্যের নামকরা লেখক সুনির্মলবাবু এই বইখানাতেও শিশুদের উপযোগী সহজ ভাষায় কয়েকটি হাসির গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়া শিশুদিগকে নির্মল আনন্দ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পড়িয়া শিশুরা যে যথেষ্ট আমোদ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নান্দীমুখী—ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথম এবং শারদীয়া সংখ্যা। দাম এক টাকা। নাট্য, সংগীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কীয় কতকগুলি প্রবন্ধে সংখ্যাখানা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

গায়ত্রী—পূজাসংখ্যা। **দাম আট আনা।** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বহু নবীন লেখকের রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

প্রগতি—শারদীয় সংকলন। দাম এক টাকা। বিভিন্ন লেখকের কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সংকলন।

প্রাণ-বসন্ত—শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত। দাম এক টাকা। ৩২ পৃষ্ঠায় গোটা কুড়ি কবিতা। পড়ে বসন্তের কোন হদিস পাওয়া গেল না।

আগ্নকাল—পূজাসংখ্যা। দাম দুই টাকা। নামকরা লেখকগণের বহুসংখ্যক গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতায় সংখ্যাটি সমুজ্জ্বল।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২২

অশোকের পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিয়া প্রণবকে চা ও খাবার দিবার জন্য শক্তি বিনোদকে আদেশ করিল।

বিনোদ বলিল, "আপনার জন্যেও একটা পেয়ালা নিয়ে যাব না-কি দিদিমণি?"

শক্তি বলিল, "না বিনোদ, আমি আর খাব না। তুমি শুধু প্রণববাবুর জন্যে পেয়ালা তিনেকের মত চা নিয়ে যেয়ো।" বলিয়া দ্বিতলে মাঝের ঘরে প্রণবের নিকট ফিরিয়া গিয়া পূর্বের আসন অধিকার করিয়া বসিল।

সহাস্যমুখে প্রণব বলিল, "ভোট নেওয়ায় বাধা পড়ল মিস্ মুখার্জি,—সুযোগ পেয়ে অশোক পালিয়ে বাঁচল।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "ভালই হয়েছে। ভোট নেওয়া হলে আপনার পক্ষে সুবিধে হোত না।"

সকৌতূহলে প্রণব বলিল, "কেন বলুন ত?"

"আপনি হারতেন।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আপনার বন্ধু জিততেন।"

শক্তির কথা শুনিয়া হাসিমুখে প্রণব বলিল, "সে ত' একই কথা হল—আমি হারলে আমার বন্ধু নিশ্চয়ই জিততেন। কিন্ত কেমন করে জিততেন, সেই কথাটাই জানতে চাই।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল "আপনার বন্ধুর স্বপক্ষে আমি ভোট দিতাম।"

"অর্থাৎ বাজিতপুরের ব্যবস্থার চেয়ে পার্ক সার্কাসের ব্যবস্থা আপনার পক্ষে উন্নততর ব্যবস্থা, অশোকের সেই মত আপনি সমর্থন করতেন?"

"করতাম।"

প্রণবের মুখে তরল কৌতুকের ক্ষীণ হাসা ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তাহলে মনে করতাম, সত্যি কথা বললে পাছে অতিথির পক্ষে সত্যটা অপ্রিয় হয় সেই ভয়ে আপনিও বিনয় প্রকাশের ছলেই সত্যি কথাটাকে এড়িয়ে গেলেন।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কিন্তু আমিও ত' সেই একই রকমে বলতে পারি প্রণববাবু, কথাটা যে সত্যি, তা আপনি মনে মনে জেনেও বিনয় প্রকাশের ছলেই বিপরীত কথা বলছেন।"

শক্তির কথা শুনিয়া হাসিমুখে প্রণব বলিল, "তর্কের খাতিরে নিশ্চয় তা বলতে পারেন। কিন্তু আসলে কথাটা যে কত বড় মিথ্যে কথা, অন্তত আপনার দিক থেকে, তা আপনার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।" তাহার পর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু কথাটা যদি আসলে সত্যিই হত অর্থাৎ, সত্যি সত্যিই আপনার বিবেচনায় পার্ক সার্কাসের ব্যবস্থাই যদি উন্নততর হোত, তা হলে সে কথার উত্তরে আমিও নিঃশব্দ থাকতাম না।"

মন্দ হাসিয়া শক্তি বলিল, "কি বলতেন আপনি?"

প্রণব বলিল, "যদিও তর্কেরই ছলে এসব কথা হচ্ছে। তবু সে কথা শুনে হয়ত আপনি আমার ওপর বিরক্ত হবেন।" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ঈষৎ ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তি বলিল, "কি আশ্চর্য! আমি বলব কথা,—আর সে কথার উত্তরে যে কথা আপনি বলবেন, তা শুনে আমি বিরক্ত হব, এতটা অবুঝ আমাকে মনে করবেন না প্রণববাবু! আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, যা আপনি বলতেন।"

এক মুহূর্ত মনে মনে একটু ভাবিয়া লইয়া প্রণব বলিল "আমি তা হলে বলতাম,—আর, আপনি জানেন মিস্ মুখার্জি, অজানা ভবিষ্যৎ এমনই একটা অনিশ্চিত ব্যাপার যে তার বিষয়ে কোন কথাই যেমন বলা চলে না তেমনি সব কথাই বলা চলে। কেমন, ঠিক কি-না?"

কৌতূহলোদ্দীপ্ত চিত্তে ঈষৎ অধীর কণ্ঠে শক্তি বলিল, "তা হয় ত' ঠিক; কিন্তু কি আপনি বলতেন, তা বলুন?"

প্রণব বলিল, "আমি বলতাম, তা হ'লে রইল আমাদের পার্ক সার্কাসের পথ, যতদিন দরকার, আপনার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে; আর রইলাম আমি, একান্ত প্রয়োজন হলে সেই পথ দিয়ে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে।"

প্রণবের এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত গভীর ব্যঞ্জনাত্মক বাক্য শুনিয়া শক্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু একথা আপনি কেন বলতেন প্রণববাবু?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রণব বলিল, "আপনার প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। হঠাৎ শুনতে আমার কথাটা যে কটু লাগে তাতে আর সন্দেহ নেই। শুধু অনধিকার চর্চাই ত নয়; মনে হয়, বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসটুকু সব অবস্থাতেই বজায় রেখে চলা উচিত, বন্ধুর অনুপস্থিতির পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝি তার ওপর একটা গর্হিত আঘাতই করা হল। সুতরাং, একথা শুনে আপনি আমার ওপর বিরক্ত হয়ে থাকলে আপনাকে দোষ দিতে পারিনে মিস্ মুখার্জি। কিন্তু—"

প্রণবের কথা শেষ হইয়াছে মনে করিয়া শক্তি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এখনও তাহার বক্তব্যের কিছু বাকি আছে বুঝিয়া কহিল, "কিন্তু কি প্রণববাবু?"

প্রণব বলিল, "কিন্তু আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বিশ্বাসের বাঁধন এতই খাঁটি আর এতই জোরালো যে, যে কথা আপনাকে এখন বললাম তা অশোকের সাক্ষাতেই বলি আর অসাক্ষাতেই বলি, তাতে কিছুই এসে যায় না, দুই-ই সম্পূর্ণ সমান। একথা আমি যেমন জানি, অশোকও তেমনি জানে। কিন্তু আপনি ত' তা জানেন না, তাই পার্ক সার্কাসের কথা বলে আপনাকে যদি অসন্তুষ্ট করে থাকি তা হলে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্ মুখার্জি।"

গভীর ব্যগ্র কণ্ঠে শক্তি বলিল, "না, না প্রণববাবু, অসন্তুষ্ট ত' দূরের কথা, ও কথা শুনে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে না, এমন মেয়ে বাঙলাদেশে আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আপনার মনে যে করুণা দেখা দিয়েছে তার জন্যে আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমার ভবিষ্যৎ কি আপনি এতই অনিশ্চিত মনে করেন যার জন্যে আপনার আমাকে এই আশ্বাস দেওয়ার বিশেষ দরকার আছে?"

এই কঠিন প্রশ্নের তাড়নায় প্রণব যৎপরোনাস্তি বিব্রত বোধ করিল। ইহার যথার্থ এবং সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হইলে যে কথা বলিতে হয় তাহা শক্তির নিকট অবচনীয় কথা, তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। তাই আসল কথাটা এড়াইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "একথা বলে কিন্তু আপনি আমার প্রতি অন্যায় করছেন মিস মুখার্জি!"

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কোন কথা?"

"আমার মনে করুণা দেখা দেওয়ার কথা। আপনার মধ্যে এমন কিছু মহিমার ঘাটতি হয়নি যার জন্যে আমার মনে আপনার প্রতি করুণা দেখা দিতে পারে।"

স্মিত মুখে শক্তি বলিল, "তা হলে দয়া দেখা দিয়েছে।"

(ক্রমশঃ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৩শে অক্টোবর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহর বেওয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, কম্যুনিজম এবং রাশিয়ার নাম ভারতের কম্যুনিস্টদের হাতে সর্বাপেক্ষা বেশী কলঙ্কিত হইয়াছে।

২৪শে অক্টোবর—আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর মাতা শ্রীযুক্তা অম্মু স্বামীনাথন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে মাদ্রাজ শহর কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন।

হাওড়ার সালখিয়া অঞ্চলে হরগঞ্জ নামক স্থানে একটি ইলেকট্রিকের দোকানে এক শোচনীয় বিস্ফোরণের ফলে ঘটনাস্থলে তিনজন মারা যায়। পরে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে হাসপাতালে আরও দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে।

গতকল্য জয়পুরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, "দিল্লীর লালকেল্লার উপরও ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইবে।"

২৫শে অক্টোবর—ভারত গভর্নমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থনকারী কমিটিকে জানাইয়াছেন যে, সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইতে পারে না বা স্থগিত রাখা যায় না।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী আজ বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে ভারতীয় ভূতপূর্ব যুদ্ধবন্দীদের যে বন্দিশিবির রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট চেম্বার নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত মনু সুবেদার বিনা বাধায় কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে অদ্য কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে তিনিই সর্বপ্রথম নির্বাচিত হইলেন।

২৬শে অক্টোবর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লীতে সাংবাদিকদিগকে বলেন যে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, বর্তমান দিল্লীর জেলে শত্রুর গুপ্তচর সংক্রান্ত অর্ডিনান্স অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বহু ভারতীয় রহিয়াছেন। তিনি আরও জানিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত অর্ডিনান্স অনুসারে কাহারও কাহারও ফাঁসিও হইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অদ্য তাঁহাদের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অদ্য দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় আগমন করেন।

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-সমূহের নিকট এই মর্মে এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন যে কংগ্রেসের বর্তমান কার্যকলাপ কেবলমাত্র আগামী নির্বাচনের জন্য সীমাবদ্ধ না রাখিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আরও সভা সংগ্রহ করিতে এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক তৎপরতার প্রসার-কল্পে শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

শ্রীযুত মহেন্দ্র গোপের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল প্রিভি-কাউন্সিল কর্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। আগস্ট আন্দোলনের প্রারম্ভে পুলিস কর্তৃক সংগঠিত গ্রামরক্ষী দলের নেতা সহদেও সিংহকে হত্যা করিবার অভিযোগে শ্রীযুত মহেন্দ্র গোপের প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়।

২৮শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্দেশক্রমে অদ্য কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াবাসী জনসাধারণের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া এবং তাহাদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৯শে অক্টোবর—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বর্ধমান বিভাগের অ-মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে বাঙলার বিভিন্ন নির্বাচক-মণ্ডলী হইতে আর যাঁহারা কংগ্রেসের মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম—(১) শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—কলিকাতা শহর ও শহরতলী অ-মুসলমান (২) শ্রীযুত কে সি নিয়োগী, ঢাকা বিভাগ—অ-মুসলমান, (৩) শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্যাল—প্রেসিডেন্সী বিভাগ—অ-মুসলমান; (৪) শ্রীযুত সর্বপ্রিয় ব্যানার্জি—রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, অ-মুসলমান। কেন্দ্রীয় আইনসভায় আসামের দুইটি অ-মুসলমান আসনই কংগ্রেস দখল করিয়াছে। সোমবার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে কংগ্রেসের দুইজন প্রার্থী মন্ত্রী শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী এবং কংগ্রেসদলের ডেপুটি লীডার শ্রীযুত অরুণকুমার চন্দ যথাক্রমে আসাম উপত্যকা এবং সুরমা উপত্যকা ও শিলং হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

পুনার সংবাদে প্রকাশ যিসাপুর জেলের অনুমান আড়াইশত রাজনৈতিক বন্দী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থার প্রতিবাদে গত ১৮শে অক্টোবর হইতে অনশন ধর্মঘট করিয়া আছেন।

সম্প্রতি আগ্রা সেণ্ট্রাল জেলে আটক কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার পিতা শ্রীযুত হীরালাল লোহিয়া বড়লাটের নিকট এক খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। উহাতে লাহোর ফোর্টে থাকাকালে তাঁহার পুত্রের উপর অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাঁহাকে (ডাঃ লোহিয়া) কলিকাতায় পাঠাইয়া চিকিৎসার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে অক্টোবর—নয়াদিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নেতৃবৃন্দের যে বিচার হইবে, তাহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ জাপানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব শিগেমিৎসুকে নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিগেমিৎসু জানাইয়াছেন যে, অসুস্থতার জন্য তিনি এই বিচারে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। জাপ গভর্নমেণ্ট সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য অন্য তিনজনের নাম [illegible] করিয়াছেন।

জাভার ইন্দোনেসিয়ান গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, মেঃ জেনারেল স্যার ফিলিপ ক্রিস্টিসনকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইন্দোনেসিয়ায় যদিও আরও ওলন্দাজ সৈন্য আমদানী করা হয়, তাহা হইলে রক্তের বন্যা হইয়া যাইবে।

২৪শে অক্টোবর—সাইগনের সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীনে আনামীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিবার জন্য মিত্রপক্ষের তৎপরতা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যগণ আনামীদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

গত ২১শে অক্টোবর রেঙ্গুনে অস্থায়ী ভারতীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের স্মৃতি স্মরণকল্পে ভারতীয়দের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

২৪শে অক্টোবর—নরওয়ের কুখ্যাত দেশদ্রোহী কুইসলিংকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর—স্বাধীন ইন্দোনেসিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্ন জাভা হইতে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "আমেরিকা যদি আমাদের বিরোধে মধ্যস্থতা করিতে রাজী হয়, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পক্ষে সাহায্য হইতে পারে; ইন্দোনেসিয়ার সমস্যা সমাধানে রাশিয়া ও চীন যদি অংশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।"

২৬শে অক্টোবর—বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ উইলিয়ম কোভ ভারতীয় নির্বাচন সম্পর্কে ভারতবাসীদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন যে, পাকিস্থানের পক্ষে ভোটের অর্থ ভারতের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভোট।

২৭শে অক্টোবর—মার্কিন নৌ-দিবস উপলক্ষে এক বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ১২ দফা বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করেন।

২৮শে অক্টোবর—জাভায় ইন্দোনেসিয়ান জাতীয়তা এবং বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে অদ্য সর্বপ্রথম সংঘর্ষ বাধে। সুরাবায়ায় এই সংঘর্ষ সুরু হয়। তথায় ইন্দোনেসিয়ানগণ মিত্রপক্ষের অস্ত্রত্যাগের আদেশ উপেক্ষা করিয়া গুলীবর্ষণ করে। ইতিপূর্বে মিত্রপক্ষ প্রচার-পত্রের সাহায্যে এই আদেশ দেন যে, মিত্র-সৈন্য এবং নিয়মিত পুলিসগণ ব্যতীত অপর কেহ অস্ত্র রাখিলে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। ইহাতে সুরাবায়াতে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

২৯শে অক্টোবর—ইন্দোনেসিয়ান গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুকর্নের আবেদনে সুরাবায়ায় সংঘর্ষের অবসান হইয়াছে।

উত্তর চীনে কেন্দ্রীয় চীনা গভর্নমেণ্টের সৈন্য ও কম্যুনিস্ট ফৌজের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা অদ্যকার ইয়েনান বিজ্ঞপ্তিতে সোজাসুজি গৃহযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

দ্বাদশ বর্ষ

(৪০শ সংখ্যা হইতে ৫১শ সংখ্যা পর্যন্ত)

—('কিসমৎ' ক্রোড়পত্র)—

কিস্মৎ-বিজয়ের ইতিকথা

চলচ্চিত্র ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল এক অধ্যায়

১৯৪৩ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর তাণ্ডবলীলা চলেছে তখন। আকাশে বা বাতাসে শুধু ক্ষুধার্ত আর পীড়িতদের আর্তনাদ, তার ওপরে জাপানী বোমার আতঙ্ক। বম্বে টকীজের 'বসন্ত' একাদিক্রমে রক্সীতে ৫০ সপ্তাহ চলা শেষ ক'রে ক্ষান্ত হ'য়েছে। সাফল্য সম্পর্কে আশা ও নিরাশার মধ্যে মুক্তিলাভ ক'রলো 'কিসমৎ'। ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রে তার বিজয় অভিযান বিপুলভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়েছে, বম্বের রক্সীতে ৫০ সপ্তায় পেঁছে এল প্রায়, কিন্তু বাঙলাদেশে, কলকাতায় সেই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে তা কি সম্ভব হ'তে পারে! যে কাপুরচাঁদ লিমিটেড বিগত ১০ বছর ধ'রে একটার পর একটা রেকর্ড ক'রে বাঙলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান হ'য়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন ক'রে নিয়েছে, তাদের সে গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল তখন। কিন্তু লোকে জানতো যে কাপুরচাঁদের পরিবেশনে শ্রেষ্ঠ প্রমোদচিত্রগুলিই থাকে শুধু আর সমব্যবসায়ীদেরও দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যে কোন ছবির যথাপ্রাপ্য গৌরব এনে দিতে কাপুরচাঁদের দক্ষতার আর তুলনা নেই। দুর্যোগের দিনে মুক্তিলাভ ক'রেও তাই 'কিসমৎ' প্রথম পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই এক লক্ষ টাকার ওপর টিকিট বিক্রী ক'রে (১০১৯৬৭:/০) একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি ক'রলে, পর পর প্রায় বিশ সপ্তা ধ'রে প্রতিদিনের প্রতিটি প্রদর্শনীই প্রায় 'হাউস ফুল' গেল—লোকের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। দুঃখ-দুর্দশাজর্জরিত তখনকার জনগণের মনে এতটুকু প্রমোদ ক'রতে পারায় কাপুরচাঁদ নিজেদের কৃতার্থ মনে ক'রলে। 'কিসমৎ' একভাবেই জনাকর্ষণ ক'রে এগিয়ে চললো। যে প্রতিষ্ঠান প্রমোদচিত্র নির্মাণে ভারতে একটা যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সেই বম্বে টকীজের সুনাম, আর যে প্রতিষ্ঠান প্রদর্শন ও পরিবেশনের ব্যবসায়িক প্রয়োগনৈপুণ্যে নিত্য নূতন কীর্তি স্থাপন ক'রে চলচ্চিত্রজগতে সাড়া এনে দিয়েছে তাদের সেই দক্ষতা, এই দুয়ের মিল 'কিসমৎ'-এর অভিযান অপ্রতিহত ক'রে তুললো। ২৫ সপ্তাহ......৫০ সপ্তাহ......দেখতে দেখতে ১০০ সপ্তাহ পার হ'য়ে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘচলার রেকর্ড স্থাপন ক'রলে, কিন্তু জনপ্রিয়তা সেই প্রারম্ভকালের মতই। সমগ্র পৃথিবীতে এর আগে আর কোন ছবি এত দীর্ঘকাল চলার সৌভাগ্য লাভই করেনি নয়, একই চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হ'য়ে, ১১০ সপ্তাহে ১২ লক্ষ টাকার বেশী আহরণ ক'রতে বা ১৮ লক্ষ অর্থাৎ ক'লকাতার প্রায় অর্ধেক-সংখ্যক লোককে আকর্ষিত করার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। মুক্তিলাভ করার দু'দিন পরই বাঙলার দুর্ভিক্ষে দুর্গতদের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত একটি মাত্র প্রদর্শনী থেকে ২,০১,৭১৭৲ টাকা তোলাও পৃথিবীর একটা রেকর্ড। শুধু ভারতবাসীই নয়, 'কিসমৎ'-ই ভারতীয় ছবির মধ্যে সব চেয়ে বেশী-সংখ্যক বিদেশী দর্শক আকর্ষিত করার দাবী ক'রতে পারে এবং তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভেও সমর্থ হয়। রক্সী সিনেমা ২য়, ৩য় পার হ'য়ে আজ ৪র্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে উপনীত হ'লো, প্রায় ২০০ খানি বাঙলা ও হিন্দী এবং ৬০০ খানি বিদেশী এলো এবং গেলো, কিন্তু 'কিসমৎ' ঠিক চলেছে জনগণের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনধন্য হ'য়ে। পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে এর চেয়ে স্মরণীয় কীর্তি আর নেই।

রক্সী সিনেমার চতুর্থ বার্ষিক উদ্বোধন দিবস

ইতিহাস যারা গড়ে তোলে

বিশ্বের চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে ভারতকে যারা সম্মানিত আসন এনে দিল

ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রের উল্লেখে প্রথমেই যে ক'টি প্রতিষ্ঠানের নাম মনে পড়ে, কাপুরচাঁদ লিঃ তাদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র এক যুগের ব্যাপার হ'লেও এই প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব ও দক্ষতা ভারতের চিত্র-ব্যবসাকে যে ধাপে পৌঁছে দিতে সমর্থ হ'য়েছে তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হ'য়ে থাকবেই। নগণ্য অবস্থা থেকে আজ চিত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে কাপুরচাঁদ লিঃ কি ক'রে একেবারে সামনের আসনে নিজেদের অধিষ্ঠিত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে সে কাহিনী ফোর্ড, রকফেলার বা গোল্ডুইনের মতই চমকপ্রদ।

গুজরাটের অন্তবর্তী কাঠিয়াওয়াড় জেলার জেটপুর গ্রাম থেকে এক শীর্ণকায় তরুণ এলো বাঙ্গালোরে এক মারোয়াড়ীর দোকানে ১০ টাকা মাসিক বেতনে চাকরী ক'রতে। নাম তার কাপুরচাঁদ নেমচাঁদ মেটা! কর্মঠ, অধ্যবসায়ী একাগ্রচেতা ও বিশ্বস্ত কাপুরচাঁদ অল্পকালের মধ্যেই খাজাঞ্চীর পদে, তার কিছুদিন পরই বড় মুনীমের পদে উন্নীত হ'লো। কাপুরচাঁদ নিজেও তখন টুক্‌টাক্ ব্যবসা করে, তার মধ্যে প্রধান টুপি তৈরী। হাতে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হ'তেই কাপুরচাঁদ সেটা কাজে লাগাবার উপায় ভাবছেন, এমন সময় বম্বের কোন একটি বড় চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে বন্ধ হবার উপক্রম হ'য়েছে ব'লে খবর পেলেন। কাপুরচাঁদ তাকে সাহায্য করলেন। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সে-ই প্রথম যোগ স্থাপিত হ'লো. সেটা ১৯৩৩ সাল। সেই থেকে কাপুরচাঁদ তাঁর অপর দু'ভাই, জাভেরচাঁদ ও কেবলচাঁদের সহায়তায় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে পূর্ণোদ্যম নিয়োগ করেন এবং রঞ্জিৎ, প্রকাশ, সাগর, সরস্বতী, ইম্পিরিয়াল প্রভৃতি বড় ছোট ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে দুর্দিনে অর্থ-সাহায্য ক'রে বাঁচিয়ে তোলেন। এই সময়ে কাপুরচাঁদ 'লাল-ইমলি'র রেশমী ও পশমী জিনিষের এজেন্সী গ্রহণ



শ্রীকাপুরচাঁদ মেটা

করেন এবং সে ব্যবসাও ফাঁপিয়ে তোলেন। এর পর বম্বের 'রক্সী' সিনেমা কেনা হয়, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হ'য়েও ছবি পাওয়া দুষ্কর হ'লো। কেবলচাঁদ সে সমস্যার সমাধান ক'রলেন বম্বে টকীজের 'অছ্যুৎ কন্যা'র সর্বস্বত্ব কিনে নিয়ে। এদের দক্ষতায় ছবিখানি 'রক্সী'তে রেকর্ড স্থাপন ক'রে বম্বের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে একটা সাড়া এনে দিলে। ভারতের অন্যান্য সহরেও ছবিখানি মুক্তি দেবার চেষ্টা হ'তে লাগলো, কিন্তু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কে আর আমল দেবে! তাতে হতাশ না হ'য়ে কাপুরচাঁদরা এলো ক'লকাতায় নিজেদের অফিস খুলতে এবং সেই সঙ্গে প্রদর্শনের অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে 'প্যারাডাইস' সিনেমার পরিচালন ভারও হাতে তুলে নেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এবং তাঁর আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে 'অছ্যুৎ কন্যা'র যাত্রা সুরু হ'লো এবং একাদিক্রমে ৩৮ সপ্তাহ চলে কাপুরচাঁদ লিমিটেডকেই শুধু প্রতিষ্ঠা এনে দিলে না—ভারতের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে যুগান্তরও নিয়ে এলো। প্রথম দিনের সে গৌরব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং এর জন্যে মেটা ভায়েদের সঙ্গে ক'লকাতা অফিসের কর্ণধার ছটুভাই ভিখাভাই দেশাইও সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছেন। এই ছটুভাইয়ের কর্তৃত্বাধীনে এবং বিচক্ষণতায় এবং তাঁর সহকারী শ্রীরতিলাল মেটার কর্ম-কুশলতা কি দীর্ঘ প্রদর্শন বিষয়ে



শ্রীজাভেরচাঁদ মেটা

আর কি অর্থাগমে এবং কি প্রদর্শন-ক্ষেত্র প্রসারে কাপুরচাঁদের পরিবেশনায় অধিকাংশ ছবিই নতুন নতুন রেকর্ড স্বারা অচিন্ত্যপূর্ব কীর্তিস্থাপন ক'রে সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের এমন এক প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে, যা ছবির বিরাট আর্থিক সম্ভাবনা বিষয়ে লোককে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছে। কিছুকালের জন্য 'জ্যোতি সিনেমা'র পরিচালনভারও কাপুরচাঁদ গ্রহণ করে। তারপর ১৯৪১ সালে চৌরঙ্গীর বিলাতি ছবিঘর 'এম্পায়ার থিয়েটার' কিনে নিয়ে প্রভূত অর্থব্যয়ে তাকে 'রক্সী' নাম দিয়ে সহরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগৃহ ক'রে তোলে। আরও বৃহত্তর কীর্তির পথে অভিযান আরম্ভ হ'লো এবং আজ এই 'রক্সী'ই 'কিসমৎ'কে বিশ্বজয়ের কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা ক'রলো।

এইভাবে কাপুরচাঁদ লিমিটেড কেবলমাত্র ক'লকাতা বা বাঙলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতের মধ্যেই প্রমোদ-ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান ব'লে খ্যাতি অর্জন করে। ভারতের বড় বড় প্রায় সব চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানই কাপুরচাঁদের হাতে ছবির পরিবেশন-ভার সঁপে দিতে উৎসাহ বোধ করে। আজ কাপুরচাঁদদের হাতে ৩০০-রও বেশী ছবি, যার প্রত্যেকখানিই দর্শক ও প্রদর্শক উভয় পক্ষেরই সমাদরলাভে সক্ষম হ'য়েছে। সম্প্রতি ১৮২৫০০০, টাকায় 'চল্ চল্ রে নওজোয়ান'-এর ভারতীয় স্বত্ব কিনে কাপুরচাঁদ ভারতীয় ছবির বিক্রয়মূল্য বাড়িয়ে দিতে সহায়তা ক'রেছে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও পরিবেশন ব্যবসা ছাড়া কাপুরচাঁদ কাঁচা ফিল্মেরও



শ্রীছটুভাই দেশাই

ব্যবসা করে এবং ভারতে ডুপে ফিল্মের তারাই একমাত্র এজেণ্ট চলচ্চিত্রের বাইরেও কাপুরচাঁদের কর্মক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত র'য়েছে—লগ্নী কারবার। কাপড় ও সুতার কল, জমি বেচাকেনা, রাসায়নিক ও রং প্রভৃতি বহু ব্যবসা এরা পরিচালনা করেন যুদ্ধোত্তরকালের সমস্ত বিভাগের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে কার্যকরী ক'রে তোলা হ'য়েছে।

বম্বের মেরীন ড্রাইভের ওপর দিয়ে যেতে তিনটি একই ধাঁচের মনোরম প্রাসাদ অধ্যবসায়, ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধির জয়গান ক'রতে অনুপম রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়—কাপুরমহল, জাভের-মহল আর কেবলমহল। কাপুরচাঁদদের



শ্রীকেবলচাঁদ মেটা

দানের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ ক'রতে হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখে বাসের জন্য বম্বের প্যারেলে 'নেমচাঁদ কচরাভাই চ্যারিটি ট্রাণ্ট বিল্ডিং' একটা বড় দৃষ্টান্ত। এছাড়া গত দুর্ভিক্ষের সময় মাস কয়েক ধরে 'প্যারাডাইস' ও 'রক্সী' থেকে সপ্তাহে একটি দিনের সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থদের সাহায্যার্থে দানও স্মরণযোগ্য। সম্প্রতি ক'লকাতায় গুজরাট বালমন্দির নির্মাণ-কল্পে চিত্রগৃহ দু'টি থেকে ১০,০০০, টাকারও বেশী তুলে দিতে সাহায্য করেছেন। দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে 'কিসমৎ'-এর মাত্র একটি প্রদর্শনী থেকে ২,০৭,২১৭, টাকা তুলে দেওয়ার উদ্যোগী হিসেবেও সর্বজনের ধন্যবাদের পাত্র।

ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্যে নিজেদের কুশলতার চেয়ে কাপুরচাঁদরা পৃষ্ঠ-পোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং সাংবাদিক-দের সহায়তাকেই কৃতিত্ব দেন এবং তার মর্যাদা যাতে বজায় থাকে, কোন ত্রুটি যাতে না থাকে, সে বিষয়ে তারা বদ্ধপরিকর। প্রমোদ বিষয়ে লোকে কাপুরচাঁদের ওপরে যেমন আস্থা রেখে চলেছে কোনদিনই তাঁরা তা চলে যেতে দেবেন না!

দেওয়ালীর এই শুভ লগ্নে, বিশেষ করে কলকাতায় কাপুরচাঁদ লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস ও রক্সী সিনেমার ৪র্থ বার্ষিক উদ্বোধন দিবসে আমাদের সমস্ত পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী—প্রদর্শক, সাংবাদিক ও জনসাধারণকে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানাই এবং কামনা করি নববর্ষে তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবন মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠুক।

—কাপুরচাঁদ লিমিটেড

কলিকাতা, কাপুরচাঁদ লিমিটেডের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশপত্রিকা

সম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক: শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 17th November, 1945. [২য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ৫৭তম জন্মদিবস-উৎসব উপলক্ষে ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসীর সহিত আমরাও তাঁহার দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিতেছি। তাঁহার জন্মদিবস উপলক্ষে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান ও তাঁহার জীবন-কথার আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজনই যথেষ্ট নহে, যে মহত্তম ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি ও অন্যান্য দেশ-নায়কগণ ব্রতী হইয়াছেন, ভারতের মুক্তি-সাধনার সেই চরম ও পরম আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ হইয়া সক্রিয়ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করাতেই তাঁহার জন্ম-দিবসের এই উৎসব-পালনের প্রকৃত সার্থকতা। এই তেজস্বী ত্যাগবীর ভারতের মুক্তিসাধনার অপরাধে পুনঃ পুনঃ যে কারা-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার ললাটে নয়, সমগ্র জাতির ললাটে বিজয়-টিকা পরাইয়া দিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার অগ্নিময় অভীঃমন্ত্রে জাতি দীক্ষিত হইয়াছে। কারামুক্ত হওয়ার পর প্রথমে তাঁহারই অকুণ্ঠ নিঃশঙ্ক কণ্ঠে আগস্ট-বিপ্লবের শহীদগণের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, যাহার ফলে আগস্ট-বিপ্লবের গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পটভূমি জগতের সমক্ষে গৌরবের দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীর সৈনিক ও সেনানীবৃন্দের প্রতি তাঁহার প্রশস্তি উদ্গীত হইয়া জাতির হৃদয়ে অভূতপূর্ব চেতনার ও প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার বীর যোদ্ধৃগণ তাঁহাদের জাতীয় জীবনের দুর্যোগময় দিনে তাঁহাকেই আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কেবল ভারতের নহে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি এক মহিমোজ্জ্বল আসনে সমাসীন। তাঁহার হৃদয়ে পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে অনির্বাণ শিখার মত জ্বলিতেছে তাহার উত্তাপে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। লণ্ডনের ১২ই অক্টোবর তারিখের এক সংবাদ হইতে জানা যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে গ্রেপ্তার করা হইতে পারে, ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত এইরূপ একটি সংবাদ তথায় প্রকাশিত



হইয়াছে। বলা বাহুল্য পণ্ডিত জওহরলালের গ্রেপ্তারের সম্ভাবনার এই সংবাদে ভারতবাসী বিচলিত হইবে না, পরাধীন দেশে মুক্তিসাধকের এই যোগ্য পুরস্কার সর্বদাই এ দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের উদ্ধত হস্তে উদ্যত হইয়া আছে সেকথা কাহারও অজ্ঞাত নহে। পণ্ডিত জওহরলালের মত স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর তেজস্বী, নির্ভীক সেনানীগণের হৃদয়ে স্বাধীনতালাভ করিবার যে দুর্নিবার অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে, তাহাতে সমগ্র দেশ সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই পবিত্র হোমানলে ভারতের পরাধীনতার কলঙ্ক ভস্মসাৎ হইবে। সেদিন সুদূর নহে।

পণ্ডিত নেহরুর গ্রেপ্তারের কথা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নির্ভীকতা পূর্ণ বাণী আমলাতন্ত্রকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় ভারতের আমলাতন্ত্র যে নির্মম অত্যাচার এবং যে পীড়ন চালাইয়াছিল, ইঁহারা তাহা প্রকাশ করাতে সিভিলিয়ানী দল শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ দলের বিচারে দেশময় যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছে তাহাতে সরকারী মহলের স্নায়ুমণ্ডল বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ধ্বনি উঠিয়াছে যে, নেতাদের মুখ বন্ধ কর, জওহরলালকে গ্রেপ্তার কর। বিলাতের সংরক্ষণশীল দলের সমর্থক সংবাদপত্রগুলি ইহাতে সায় যোগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জানি, স্বাধীনতার অগ্নিময় প্রেরণা আজ দেশের সর্বত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; এবং আমলাতন্ত্রের আচরণ সম্বন্ধে সত্যই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু সেজন্য দোষী কে? দোষী কি জওহরলাল, না শরৎচন্দ্র? ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে আজ যে মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছে এজন্য অন্য কেহ দায়ী নহে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নিজেই দায়ী। তাঁহারা পঁচিশ বৎসরের অধিক হইতে চলিল ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু দেশের লোক দেখিতেছে তাঁহাদের সেই সবই প্রবঞ্চনা মাত্র। এতবড় একটা মহাযুদ্ধ হইয়া গেল; ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখে আগাগোড়া আমরা এই কথাই শুনিয়াছি যে, বিশ্বমানবের স্বাধীনতার জন্যই তাঁহারা লড়াই করিতেছেন; কিন্তু যুদ্ধ শেষ

হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অতি ঘোর সাম্রাজ্যবাদীর মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা এখনও তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন না। ভারতের অধিবাসীরা মানুষের অধিকার চায়, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে জাগ্রত জাতির মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিবে, ইহা স্বাভাবিক। জওহরলালকে বন্দী করিলে মনুষ্যত্ব নির্জিত হইবে না। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজদের ব্যাপার। জার্মানদিগকে বাধা দিবার জন্য ফ্রান্সের ম্যাকিরা যদি প্রশংসাভাজন হইতে পারে, তবে আজাদ হিন্দ ফৌজদেরই বা অপরাধ কি? ম্যাকিদের স্বদেশ প্রেম যদি অপরাধজনক না হয়, তবে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকেও নিন্দা করা চলে না। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বদেশের স্বাধীনতার বেদনা সব চেয়ে বড় বেদনা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যাহারা আত্মোৎসর্গ করিবে, তাঁহাদের আদর্শ তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবেই; কোন যুক্তিই সে ক্ষেত্রে খাটে না। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে না চাহেন, তবে সমগ্র দেশের বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার গতি তাঁহারা কামান বন্দুকের দ্বারা রুদ্ধ করিতে পারিবেন না, জওহরলালকে কারারুদ্ধ করিলেও ভারতের প্রবল প্রাণশক্তি পশুবলের কাছে পিষ্ট হইবে না। ইহা তাঁহারা জানিয়া রাখুন।

মানব ও দানব

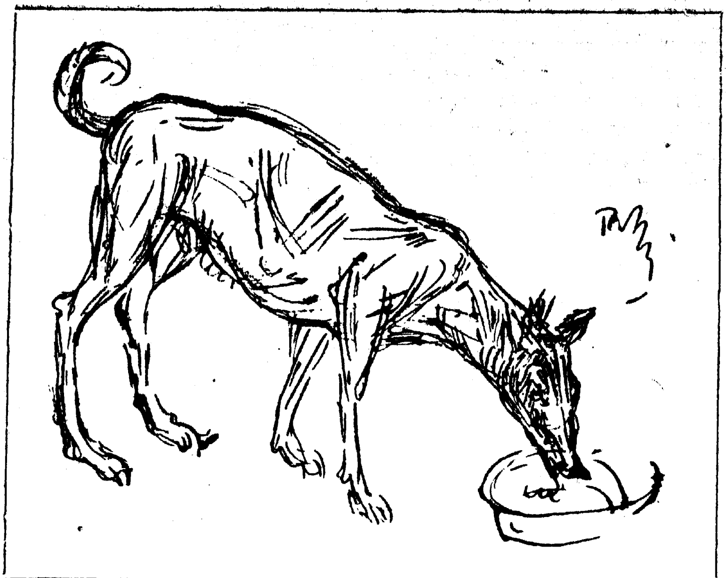
মানবে ও দানবে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। দানবের যে আসুরী ও রাক্ষসী পিপাসা এতদিন সমধর্মী হিংস্র-বৃত্তির সঙ্গে শোণিতোৎসবে মত্ত ছিল, আজ তাহার সেই অন্ধ এবং পৈশাচিক বীভৎস আবেগ মানবের রক্ত চুষিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুচীন এবং ইন্দোনেশিয়াতে আমরা দানবে ও মানবে এই দুরন্ত সংগ্রাম দেখিতে পাইতেছি। একদিকে হৃদয়ের বল, অন্যদিকে পশুবল। হিন্দুচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বীর সন্তানগণ মানবতার পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন. অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দানব শক্তি তাহাদিগকে আসুরিক বলে পিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল ম্যানসার্গ জল স্থল ও অন্তরীক্ষে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দলের ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরাধীন ভারত, দুর্বল ভারত, আজ ব্রিটিশের ইঙ্গিতে সেই ভারতের সেনাদল ইন্দোনেশিয়ার স্বদেশ সেবকদিগকে উৎখাত করিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। একথা ভাবিলেই জীবনে ধিক্কার আসে। এ লজ্জা রাখিবার স্থান আমাদের নাই। অথচ ইন্দোনেশিয়ার এইসব বীর সন্তানের অপরাধ কি? অপরাধ এই যে, ইহারা উগ্রপন্থী, অর্থাৎ ইহারা জীবন দিয়া মানুষের অধিকার রক্ষা করিতে চায়; অন্য কথায় ইহারা নিজেদের দেশ ও জাতির স্বাধীনতা কামনা করে; সুতরাং ইহারা দস্যু তস্কর, গুণ্ডা, অভদ্র, সাম্রাজ্যবাদীদের অভিধানে যতরকম নিন্দনীয় ভাষা আছে, ইহারা সেইসব ভাষায় দুষ্কৃতকারী। বিশ্বপ্রেমিক ব্রিটিশ জাতি; জগতে বিশেষভাবে প্রেম বিতরণ করাই তাহাদের ব্রত। বিশ্বকল্যাণ নীতি ব্রিটিশের পররাষ্ট্র নীতি। সেদিন ওয়াশিংটন শহরে গিয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী সেই মহাবাক্য আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশের এই বিশ্বপ্রেমই বজ্রবর্ষী বোমা এবং কামানের আগুনের মুখে সেখানকার উগ্রপন্থী স্বাধীনতাকামীদিগকে ভস্ম করিবার জন্য হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিতেছে। সুরাবায়া শহর ধ্বংস হইয়াছে; ইন্দোনেশিয়ানেরা প্রাণ দিয়াছে, নিরস্ত্র, নিরীহ শিশু ও নরনারীরা মরিয়াছে এবং এখনও মরিতেছে; কিন্তু বিশ্বের কল্যাণ ব্রতে ব্রতী ব্রিটিশ বীর্য নিরস্ত হইবার নয়—হয় আত্মসমর্পণ কর নতুবা ধ্বংস হও। কিন্তু এশিয়া এখন বিশ্বপ্রেমে ভুলিতেছে না, ইন্দোনেশিয়াও দমিতেছে না। হিন্দুচীন ও ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র একই কথা; বিদেশীরা অধীনতা কোন রকমেই মাথা পাতিয়া লইব না। সোনার দেশ ভস্মীভূত হইয়া যায়, সহস্র সহস্র নরনারী শ্মশানশয্যা গ্রহণ করে তাহাও স্বীকার। বলা বাহুল্য, এমন যাহারা আত্মঘাতী ব্রিটিশের বিশ্বপ্রেম তাহাদিগকে রেহাই দিতে পারে না; কোন দিনই কোথাও দেয় নাই। আমেরিকায় দেয় নাই, আয়র্লণ্ডে দেয় নাই, ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানগণ ১৮৫৭ সাল হইতে এ পর্যন্ত এই অপরাধে ইহাদের কাছে 'দস্যু' পর্যায়ভুক্ত ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁতিয়া টোপী হইতে আধুনিক ১৯৪২ সালের আত্মদাতাগণ পর্যন্ত সেই একই কথা। ব্রিটিশ যাহারা তাহাদের মত বিশ্বপ্রেমিকদের পদানত হয়, তাহাদিগকেই ব্রিটিশ কিছু বলিবে না; কিন্তু উগ্রপন্থী যাহারা. তাহাদিগকে বধ এবং তাহাদিগকে বন্ধন ও নিপীড়ন করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে বিশ্বসেবা। অতীতে বহু ব্রিটিশ রাজনীতি-ধুরন্ধর বিশ্বধর্মের যে ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন, শ্রমিক দলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী আজ তাহাই প্রতিপালন করিয়া চলিতেছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশের নিজের স্বার্থ নাই—সেখানে গণতান্ত্রিকতার স্বার্থ। গণতন্ত্র ব্রিটিশের প্রাণ। মিঃ এটলী আমেরিকার হোয়াইট হাউসে পেট ভরিয়া খানা খাইয়া এই গণতন্ত্রেরই গুণগান করিয়াছেন; আর ইন্দোনেশিয়ায় কামানের মুখে ব্রিটিশের সেই গণতন্ত্রের দানই ছড়াইয়া পড়িতেছে। অজ্ঞলোক বলিবে, ইন্দোনেশিয়ার বীর সন্তানেরা গণতন্ত্রের জন্যই যুদ্ধ করিতেছে; কিন্তু মিঃ এটলী বহু পূর্বেই বলিয়া দিয়াছেন, সে ধারণা ভুল। ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রের গুরু হইল ওলন্দাজেরা। ব্রিটিশ তাহাদের জন্যই নিষ্কামভাবে লড়িতেছে। জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করাই অবশ্য সেখানে তাহাদের প্রধান ব্রত ছিল; কিন্তু এখনকার ব্রত দাঁড়াইয়াছে ওলন্দাজদের গণতান্ত্রিকতার ধ্বজা ধরিয়া দাঁড়ান। লোকে বলিবে কেন, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী সন্তানদের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও তো ব্রিটিশ জাপদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিত; কিন্তু তাহা হইলে তো গণতন্ত্রের মহিমা রক্ষা করা হয় না! গণতন্ত্র শ্বেতাঙ্গ প্রভুদেরই একচেটিয়া সুতরাং ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়া শোষণ করিয়া যদি পুষ্ট না হয়, তবে পূর্ব এসিয়ায় গণতন্ত্র যে মারা যায়; কারণ, গণতান্ত্রিক ব্রিটিশের এসিয়ার শোষণ সম্পর্কিত স্বার্থের হানি ঘটে; সুতরাং ব্রিটিশ আর ওলন্দাজে মাসতুতো ভাইয়ের সম্পর্ক আজ বিশ্বপ্রেমের প্যাঁচে প্যাঁচে পাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকাও অবশ্য দূরে থাকিবে না। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সত্বরই নূতন বেদ বাণী দিবেন এবং ইন্দোনেশিয়া ও হিন্দু চীনের অধিবাসীদিগকে বিশ্বপ্রেমের পথ নির্দেশ করিবেন। যদি ইহাতেও উগ্রপন্থীরা নিরস্ত না হয়, এবং পূর্ব এসিয়ায় সর্বত্র যেভাবে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতেছে যদি তাহাই চলিতে থাকে তবে আণবিক বোমা আছে। বিশ্বরক্ষার মহাব্রত হইতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা নিবৃত্ত হইতে পারে না। সে ক্ষেত্রে দানবী-শক্তি তাহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। পৃথিবী ধ্বংস হইবে। আমরা বলি, তাহাই হোক্। সেই ধ্বংসের ভিতর দিয়া নূতন মানুষ জাগিবে। মহামেধ ভূমি এই ভারতবর্ষ; দানবী-শক্তির সেই শেষ সংঘর্ষে নিজের সন্তানদিগকে বলি দিয়া সে বিশ্বে মানব জাতির উদ্বোধন করিবে। সেই ব্রতেরই তপস্যা সে করিতেছে। আসিবে সে দিন আসিবে। দানব তাহার শস্ত্র বলের সম্ভ্রম হারাইয়াছে, দানবী শক্তির বোমা ও বজ্র—আজ আর মানবের মনে ভয় জাগায় না, পক্ষান্তরে দুরন্ত ঘৃণারই সৃষ্টি করে; এই ঘৃণাকে ভিত্তি করিয়াই মানব আপন গরিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। অসুরের মোহিনী মায়ার আবরণ খুলিয়া গিয়াছে। আজ তাহার মরণ কামড় উপেক্ষা করিয়া মানবকে দেব-বীর্যে দাঁড়াইতে হইবে। ভারতের ভাগ্য বিধাতা মানব-গুরুগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

নির্লজ্জতার চূড়ান্ত

চার্চিলকে আমরা বরদাস্ত করিতে পারি; কিন্তু মিঃ এটলীকে পারি না। চার্চিল স্পষ্টবাদী; তিনি প্রতারক নহেন; কিন্তু এটলীর মুখে মধু অন্তরে গরল। সেদিন বিলাতে লর্ড মেয়রের ভোজ উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, এই ভণ্ডামীর জন্যই তাহা আমাদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ এটলীর মতে ১৯৪২ সাল হইতেই ভারতবাসীদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবাসীরা দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেই হয়; কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বেই ব্যস্ত। তাহারা ব্রিটিশের এই উদার দানকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। বলা বাহুল্য এই ধরণের কথার ধড়িবাজীতে আমাদের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবে? পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠিলেও একথা আমরা বিশ্বাস করি না। ভারতের সাম্প্রদায়িকতার এক দোহাই এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা মুখস্থ করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী কাহারা? একমাত্র ব্রিটিশই দায়ী। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরাই নিতান্ত ঘৃণিত স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কৃত্রিম ভাবে এই বিংশ শতাব্দীতেও এখানে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতাকে জীয়াইয়া রাখিতেছেন। তাঁহারা ভারত ছাড়িয়া গেলে সেই মুহূর্তে এই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার বুদ্বুদ দেশপ্রেমের সিন্ধুতে বিলীন হইয়া যাইবে। আর ভারতেই না হয়, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন দেখা দিয়াছে; ব্রহ্মদেশে কিম্বা সিংহলে তো সে প্রশ্ন নাই; কিন্তু অকৈতব প্রেমদাতা মিঃ এটলীর দল এ ক্ষেত্রে কি করিতেছেন? সিংহলের স্বাধীনতাকে তাঁহারা সঙ্কুচিত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের ঘাঁটি আরও পাকা করিয়া লইয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নীতির পরম সত্য হইল শোষণ এবং সেই শুভ উদ্দেশ্যে শাসন। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতা ব্রিটিশের মুখে এসব কথা সাজে না। মিঃ এটলীর মুখে তো নহেই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের অন্য দলের চেয়ে শ্রমিক দলের দৃষ্টি শোষণ স্বার্থ সম্পর্কে অধিকতর সঙ্কীর্ণ। আমরা ম্যাকডোনাল্ডী শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলীতে তাহা বুঝিয়া লইয়াছি। সে মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট হইতে ভারতবর্ষ নির্যাতন ও নিপীড়নই সমধিকভাবে লাভ করিয়াছে এবং আজও তাহাই দেখিতেছি। শ্রমিক দলের ভারত সম্পর্কিত সব বড় কথা শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী সন্তানদিগকে এখনও নিপীড়ন করা হইতেছে। ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী যদি ভারতে গণতান্ত্রিকতার কিছু মূল্যও স্বীকার করিতেন তবে এদেশের সর্বদলের জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ভারতীয় জাতীয় সেনা দলের বিচারে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং ভারতের বাহিরে মালয় ও সিঙ্গাপুরে সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে আজ কারারুদ্ধ করা হইত না; শুধু তাহাই নহে, ঐসব স্থানে ইতিমধ্যেই কোন কোন ভারতবাসীকে বিচারের বালাই না রাখিয়া ফাঁসী দেওয়া হইত না। জানি না, ইহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ। খুব সম্ভব স্বদেশের স্বাধীনতা কামনাই ইহাদেরও প্রধান অপরাধ। ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী যদি সত্যই উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইতেন, তবে যুদ্ধের পর আর এই সব প্রশ্ন উস্কাইয়া তুলিতেন না এবং তাহার কোন হেতুও নাই; কারণ স্বদেশের স্বাধীনতা কামনা করা প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ অপরাধ নয়। পথের প্রশ্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি ভারতকে স্বাধীনতাই দান করেন, তবে সে অবস্থায় সম্যকভাবে এবং সন্তোষজনক রকমেই অপ্রীতিকর আবহাওয়া সৃষ্টি না করিয়া সব প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, ব্রিটিশ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারে না, এবং দিবেও না। মিঃ এটলী স্পষ্ট ভাষাতেই সেদিন বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য হইল বিদেশে ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করা। ব্রিটিশ নীতির মুখ্য লক্ষ্য হইল ইহাই—এই শোষণ এবং শোষণস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য শাসন; সুতরাং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মুখে স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক সব ভণ্ডামী ও প্রতারণা। তাহারা পরাধীন ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, সিংহলকে স্বাধীনতা দিবেন না এবং পরস্পরের স্বার্থ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ওলন্দাজ এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই তলোয়ার ধরিয়া দাঁড়াইবেন; আর দরকার হইলে তাহাদের স্বার্থের দায়ে ভারতীয় সেনাদিগকে নিয়োগ করিবেন। এসিয়া জুড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই কূটচক্র চলিতেছে। সমগ্র এসিয়াকে আজ এই কূটচক্র কাটিয়া বাহির হইতে হইবে; সেজন্য আত্মদানের আহ্বান একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বজ্রানল-ধূম্রায়িত পূর্বাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছি।

কংগ্রেসকে জয়ী কর

নির্বাচন সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা এই সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমরা যতদূর বুঝি, নিজেদের মান প্রতিষ্ঠা এবং স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তাঁহারা স্বদেশসেবক নহেন, জনগণের জন্য বেদনাও তাঁহাদের নাই; কারণ যদি তেমন শুভবুদ্ধি তাঁহাদের থাকিত, তবে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেন না। পরাধীনতাই ভারতের বর্তমান সর্ববিধ দুর্গতির মূলে; কংগ্রেস এই প্রশ্নেই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বদেশের যাঁহারা স্বাধীনতাকামী, দেশের জনগণের স্বার্থের সম্বন্ধে যাঁহারা সচেতন, তাঁহারা দেশের এই সঙ্কটকালে কংগ্রেসের শক্তিকেই নিজেদের উপদলীয় সকল রকম বিচার ভুলিয়া সর্বতোভাবে সমর্থন করিবেন, ইহাই সুস্পষ্ট সত্য। সাম্প্রদায়িকতার কথা আজ কোন দিক হইতেই উঠে না; সে প্রশ্ন খোঁচাইয়া তুলিয়া দেশের বৃহত্তর আদর্শকে পরিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। সকলেই ইহা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, ব্রিটিশ প্রভুত্ব ভারতে যতদিন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইবে না; পক্ষান্তরে ভারত হইতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব যদি অপসারিত হয়, তবে সাম্প্রদায়িকতার শেষ সমাধান হইয়া যাইবে; সুতরাং কংগ্রেসের লক্ষ্যই সমগ্র ভারতের একমাত্র লক্ষ্য এবং কংগ্রেসের সেই আদর্শকে কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া কর্তব্য নয় কিংবা কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য কোন দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুবিধা দিয়া কূটনীতিক ব্রিটিশকে এখানে তাহাদের প্রভুত্ব কায়েম করিবার পক্ষে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া উচিত নহে। আজ জাতির সমগ্র জনমতকে একমাত্র কংগ্রেসের ভিতর দিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে; এক্ষেত্রে খুঁটিনাটি—নীতিগত, কোন বিচার যেন আমাদিগকে বিভ্রান্ত না করে। এক দিকে কংগ্রেস, অপর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই দুইয়ের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ সমুত্থিত হইতে চলিয়াছে। অবশ্য এই সঙ্ঘর্ষের রুদ্র রূপ এখনও দেখা দেয় নাই; কিন্তু সে দিনের অধিক বিলম্বও নাই। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অপর কোন দলের নামে দাঁড়াইবেন, সে দল হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, তাঁহারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধতাই করিবেন . এবং সেইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকেই সমর্থন করা হইবে। জাতি এই শ্রেণীর দেশদ্রোহীদিগকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যতই ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হউন না কেন জনমত তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে কোন দ্বিধা করিবে না।



শ্রীবিনোদবিহারী

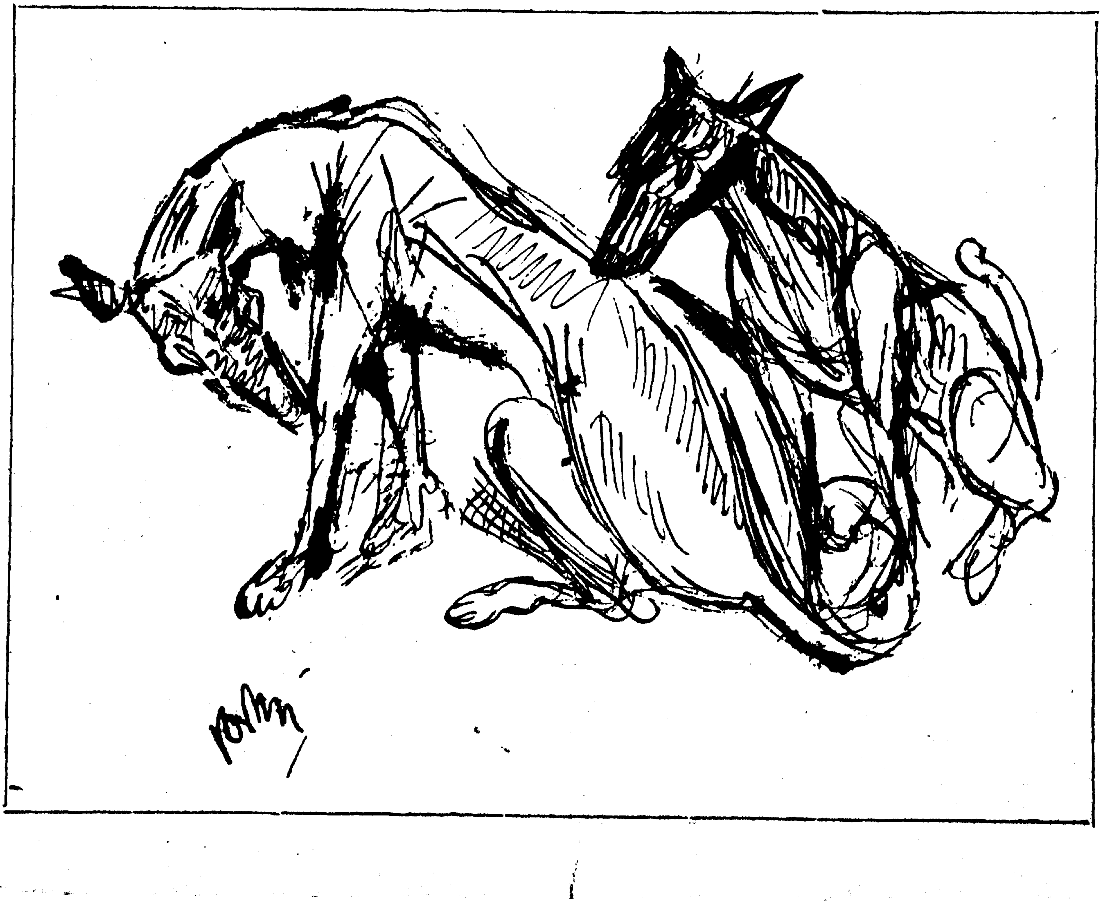
মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক

অঙ্কিত

—

৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য



"দিল্লী চলো"

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সেনাদল, আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব করিবার দিন। আজ ভগবান আমাকে সমগ্র জগতের কাছে এই ঘোষণা করিবার অপূর্ব সুযোগ এবং সম্মান দান করিয়াছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য সেনাদল গঠিত হইয়াছে। সিংগাপুর একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাকার স্বরূপ ছিল; সেই সিংগাপুরে এই বাহিনী এখন ব্যূহবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই বাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবে ইহাই নয়, অতঃপর এই সেনাদলকে ভিত্তি করিয়া স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় বাহিনী গঠিত হইবে। প্রত্যেক ভারতবাসী এই বাহিনীর জন্য গর্ববোধ করিবে। এ বাহিনী তাহাদের নিজেদের বাহিনী, সমগ্রভাবে ভারতবাসীদের নেতৃত্বে ইহা গঠিত হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত হইলে ভারতীয়দেরই নেতৃত্বে ইহারা যুদ্ধ-ক্ষেত্র অবতীর্ণ হইবে।

লোকে একদিন, এই বিশ্বাস করিত যে, যে সাম্রাজ্যের মধ্যা সূর্য অস্তমিত হয় না, তাহা বুঝি চিরস্থায়ী হইবে। এইরূপ চিন্তায় কোন দিনই আমি মাথা ঘামাই নাই। ইতিহাসে আমি এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতির অধোগতি এবং পতন অনিবার্য। ইহা ছাড়া একদিন যে সব নগর এবং দুর্গ সুরক্ষিত ছিল সেগুলি কিরূপ-ভবে সাম্রাজ্যের সমাধিভূমিতে পরিণত হইয়াছে, আমি স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধিভূমির উপর দাঁড়াইয়া যে কোন শিশুও এই সত্য উপলব্ধি করিবে যে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই অতীতের বিষয়বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ফ্রান্স যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সমরসজ্জা আরম্ভ হয়, তখন জার্মান সেনাদের কণ্ঠে কণ্ঠে শুধু এই এক ধ্বনি উচ্চারিত হইত—প্যারিস চলো, প্যারিস চলো। নিপ্পনের বীর সৈনিকদল ১৯৪১ সালে তাহাদের বিজয় অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার সময় তাহাদের মুখে এই এক কথাই ছিল—'সিংগাপুর চলো, সিংগাপুর চলো'!

সতীর্থগণ, সৈনিকগণ, 'দিল্লী চলো' 'দিল্লী চলো' ইহাই তোমাদের রণধ্বনি হউক। আমাদের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের পর আমাদের মধ্যে আমরা কতদিন জীবিত থাকিব, আমি জানি না; কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চরমে জয়লাভ আমরাই করিব এবং যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে সব বীর জীবিত থাকিবে তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপর একটি শ্মশানভূমি—প্রাচীন দিল্লীর লাল কিল্লায় তাহাদের বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করিবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য উদ্‌যাপিত হইবে না।

দেশসেবার কর্মক্ষেত্রে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া সব সময়ই আমার ইহাই মনে হইয়াছে যে, অন্য সব বিষয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পক্ষে উপযোগী, কিন্তু একটি বিষয়ে তাহার অভাব রহিয়াছে অর্থাৎ তাহার স্বাধীনতা-প্রয়াসী সেনাদল নাই। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন এই জন্য যে, তাঁহার সেনাদল ছিল। গ্যারিবল্ডী ইটালীকে স্বাধীন করিত সমর্থ হইয়াছিলেন কারণ তাঁহার পিছনে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠনে অগ্রগামী হইবার সুযোগ এবং সম্মান লাভে তোমরা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছ। এতদ্দ্বারা তোমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথে শেষ অন্তরায়কে দূর করিয়াছ। এমন মহৎ ব্রতের তোমরাই অগ্রদূত হইয়াছ, পুরো-ভাগে থাকিয়া তোমরাই চলিয়াছ, এজন্য সুখী হও, গর্ববোধ কর।

আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্তব্য স্মরণ করইয়া দিতেছি, সে কর্তব্য ত্রিবিধ। অস্ত্রবলের সাহায্যে এবং তোমাদের শোণিতোৎসর্গের দ্বারা তোমাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। তারপর ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখন স্বাধীন ভারতের জন্য স্থায়ী বাহিনী তোমাদিগকেই গঠন করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতা সর্বদা রক্ষা করা তাহাদের কর্তব্য হইবে। তোমাদিগকে আমাদের দেশরক্ষার শক্তি এমন অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে, আমরা যেন আর কোনদিনও আমাদের স্বাধীনতা না হারাই।

সেনা হিসাবে তোমাদিগকে তিনটি আদর্শ সর্বদা অন্তরে উদ্দীপ্ত রাখিতে হইবে এবং জীবনকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিতে হইবে। বিশ্বস্ততা, কর্তব্য পালন এবং ত্যাগ এই তিনটি হইবে তোমাদের আদর্শ। যে সব



নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি শিরে ধারণ করিয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারতে প্রবেশ

সৈনিক তাহাদের জাতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, যাহারা সর্বাবস্থার মধ্যে থাকিয়া তাহাদের কর্তব্য পরিপালনে কখনও পরাঙ্মুখ না হয় এবং যাহারা জীবন-দানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত, সেই সব সেনা অপরাজেয় হইয়া থাকে। তোমরাও যদি সেইরূপ অপরাজেয় হইতে চাও তোমাদের অন্তরের অন্তরতমদেশে উক্ত আদর্শত্রয় দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখ। প্রকৃত যে যোদ্ধা, তাহার সামরিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তোমরা—তোমাদের সকলেই, তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের সতীর্থগণকে এরূপভাবে শিক্ষিত করিয়া তোল যে, প্রত্যেক সৈনিক যেন অপরিসীম আত্মবিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে। তাহাদের যেন প্রত্যেকের মনে শত্রুদের চেয়ে সে যে অশেষ রকমে শক্তিশালী এই বিশ্বাস জাগরূক থাকে। সে যেন মৃত্যুর সম্বন্ধে নির্ভীক হয় এবং সংকটকালে প্রয়োজন হইলে নিজই নিজের লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার মত যথেষ্ট উদ্যমসম্পন্ন হইতে পারে। বর্তমানের এই যুদ্ধের সময় সাহস, নির্ভীকতা এবং উদ্যমের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-ভাবে পরিচালিত সেনাদল কি অঘটন ঘটাইতে পারে, তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে তোমরা যাহা শিক্ষা করিতে পার শিখিয়া লইবে এবং আমাদের মাতৃভূমির জন্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বাহিনী গঠন করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের সেনানী, তাহাদিগকে আমি এইকথা বলিব যে, তোমাদের কর্তব্য অতি গুরুতর। জগতে প্রত্যেক বাহিনীর সেনানীদের দায়িত্বই গুরুতর; কিন্তু তোমাদের ক্ষেত্রে সে গুরুত্ব আরও অনেক বেশী। রাজনীতিকভাবে আমরা পরাধীন, এজন্য অনুপ্রেরণা লাভ করিবার মত আমাদের ইতিহাসে মুকদেন, পোর্ট আর্থার অথবা সিডানের মত কিছু নাই। ব্রিটিশ আমাদিগকে যে সব শিক্ষা দিয়াছে, তাহার কতকগুলি বিষয় আমাদিগকে ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং যাহা শিক্ষা দেয় নাই, এমন কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। সে যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমরা অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া চলিতে পারিবে এবং তোমাদের দেশবাসী তোমাদের সুদৃঢ় স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তাহা পালন করিবে। সেনাদল গড়িয়া তোল। একথাও স্মরণ রাখ যে, ব্রিটিশেরা যে এত জায়গায় পরাজিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে তাহাদের সেনানীরা অযোগ্য। ইহাও স্মরণ রাখ যে, তোমাদের দল হইতেই স্বাধীন ভারতের ভাবী সেনানায়ক দল গঠিত হইবে। তোমাদের সকলকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, এই সংগ্রামকালে তোমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে এবং যে সাফল্য অর্জন করিবে, তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সেনাদলের গৌরববৃদ্ধি জাগ্রত হইবে। যে সেনাদলের পক্ষে বীরত্ব, নির্ভীকতা ও অপরাজেয়তার সম্বন্ধে নিজেদের গর্ব করিবার মত অতীত স্মৃতি নাই, কোন পরাক্রান্ত শক্তির সহিত সংগ্রামে তাহারা টিকিতে পারে না।

সতীর্থগণ, তোমরা স্বেচ্ছায় এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছ। মানব জীবনে এই ব্রত মহত্তম। এইসব ব্রত উদযাপন করিবার পক্ষে কোন ত্যাগ স্বীকারই খুব বেশী নয়, নিজের জীবন পর্যন্তও তুচ্ছ। তোমরাই আজ ভারতের জাতীয় মর্যাদার রক্ষক এবং ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। এমনভাবে চল যে, তোমাদের দেশবাসী তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতে পারে এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তোমাদের জন্য গর্ববোধ করে।

আজ আমার জীবনে সর্বাপেক্ষা গর্বের দিন, একথা আমি বলিয়াছি। পরাধীন জাতির পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সেনা হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান এবং গৌরবের বিষয় অন্য কিছু নাই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে এতদুপযোগী দায়িত্বও রহিয়াছে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে সচেতন। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি, আলোক এবং অন্ধকারে, দুঃখে এবং সুখে, পরাজয়ে এবং বিজয়ের ক্ষেত্রে আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গে থাকিব। বর্তমানে তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ-কষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ব্যতীত আমার দিবার কিছু নাই। কিন্তু যদি তোমরা জীবনে ও মৃত্যুতে আমার অনুসরণ কর আমি জানি, তোমরা তাহাই করিবে, আমি তোমাদিগকে বিজয় এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে লইয়া যাইব। আমাদের মধ্যে কে জীবিত থাকিয়া ভারতকে স্বাধীন দেখিবে, ইহা বিবেচ্য নয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট এবং ভারতের সেই স্বাধীনতার জন্য আমাদের সর্বস্ব সমর্পণ করিব। ভগবান আমাদের সেনাদলকে আশীর্বাদ করুন এবং আসন্ন সংগ্রামে আমাদিগকে বিজয়ী করুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ।

১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের কুচ্‌কাওয়াজে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সমর-সঙ্গীত

কদম কদম মোরা হই আগুয়ান
গান গেয়ে চলি সবে হর্ষের গান
শুধু স্বদেশের লাগি ধরি এই প্রাণ
দেশের মাটিতে প্রাণ লুটাইতে চায়।

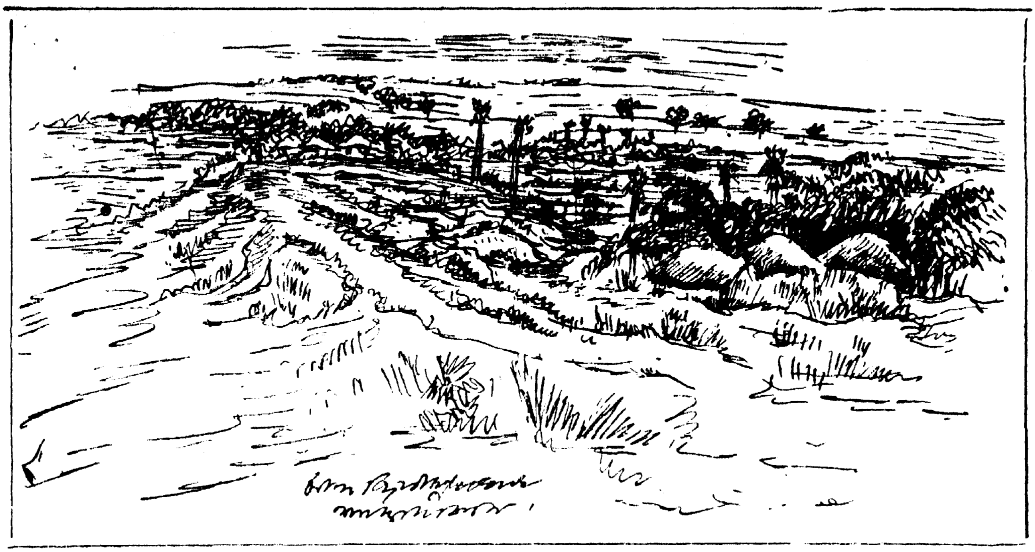
হিন্দের শের সবে হও আগুসর
মরণে তোদের বল্ কিসের বা ডর
আসমানে উঁচা শির ধর্ তুলে ধর
লক্ষ্য তোদের ঠিক মিলবেই ঠায়।

হিম্মৎ তোদের তো বাড়িয়াছে ঢের
খোদা শুনেছেন নিজে ডাক যে তোদের
যাহারা হইবে আজ বাধা এ পথের
ছাই হয়ে তারা দেখ্ বাতাসে মিলায়।

নে "দিল্লী চলো" গান ওষ্ঠোপরি
জাতির নিশানখানি সামলে ধরি
লাল কেল্লায় তারে স্থাপন করি—
লহরে লহরে তোরা আগাইয়া আয়।

অনুবাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

"কদম কদম বঢ়ায়ে জা"—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এই উর্দু সমর-সঙ্গীতটির অনুবাদ।



শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু তাঁর সদ্য-প্রকাশিত "মণ্ডন শিল্প" প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫২, কার্তিক-পৌষ দ্রষ্টব্য) একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন—

ভিন্ন ভিন্ন দেশের রুচিগঠনের নিমিত্ত হয়ে দাঁড়ায় দেশের বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী, দেশবাসী লোকের বিশেষ মেজাজ আর তাদের ধর্ম। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, পারসীক শিল্পে দাড়িমের ফুল ও ফল, চৈনিক শিল্পে ড্রাগন ও বোটান, জাপানী শিল্পে চেরি ও চন্দ্রমল্লিকা, মিশরীয় শিল্পে কুমুদ ও পেপিরাস্, গ্রীক শিল্পে অলিভ ও তালজাতীয় গাছ এবং রোমক শিল্পে আঙুরের পল্লব ও ফল—এই সবের বহু ও বিচিত্র প্রয়োগ। ভারতের আলংকারিক পরিকল্পনায় পদ্মের স্থান সর্বাগ্রে।"

এত অবিসংবাদিত এই সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি অনায়াসেই আমরা এ সম্পর্কে অসাড় হয়ে থাকি। জাতীয় রুচির উদার ক্ষেত্রে এই সত্যটি পণ্ডিতদের যদিও বা মনে থাকে, শিল্পীবিশেষের ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে রসিক সাধারণ এ তত্ত্বটুকুর মূল্য প্রায়ই দেন না—ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় জলের মাছকে ডাঙায় তুলে ব্যবচ্ছেদ করার মতো। বিচারক অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো রায় দিয়ে বসেন, এ-জীবটি নিশ্চয় প্রকৃতির 'ফ্রীক্' বা খামখেয়ালের সৃষ্টি, নইলে ডাঙায় জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি এর নেই কেন? পরম পরিহাসনীয় এই মন্তব্যের, বলা বাহুল্য, কোনই সার্থকতা থাকতে পারে না।

শিল্পীর সমগ্র সত্তার রসে সঞ্জীবিত যে শিল্প, তারও বিচার করতে হবে রসের সেই সমগ্র ক্ষেত্রে, যেখানে শিল্পীর দু চোখ প্রকৃতির বিশেষ রূপটিকে দুবেলা দেখেছে, তার চিন্তা এবং কল্পনা বিশেষ যে একটি আবেষ্টনে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। শিল্পীর কাজের শেষ মূল্য-যাচাই দেশ-কাল-পাত্রের অতীত ক্ষেত্রে হলেও তার এই ব্যক্তিগত দিকটি কোনোমতেই ভুললে চলে না। শিল্পীর সকল সৃষ্টিই সেভাবে বিচার করলে বলতে হয়, একাধারে ব্যক্তিগত এবং সর্বজনগত।





শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন কলাভবনের অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে অধ্যাপক। প্রথম পত্তনের সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন তাঁর যোগ বিশ্বভারতীর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। কেবলমাত্র নন্দলাল-শিষ্য বললে তাঁর সঙ্গে শিল্পাচার্যের সম্বন্ধটি যথেষ্ট সম্পূর্ণ করে বলা হয় না। গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের যে প্রগাঢ়তায় নন্দলাল তাঁর নিজেরই ভাষায় আচার্য অবনীন্দ্রনাথের 'পুত্রস্থানীয়', স্নেহের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় বিনোদবিহারীও নন্দলালের ঠিক ততখানিই নিকট সম্বন্ধীয়। কিন্তু গুরু-শিষ্যের অতি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ সত্ত্বেও নন্দলালের ব্যক্তিসত্তা যেমন শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বকীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে বিনোদবিহারীর শিল্প-প্রতিভাও তেমনি নিজস্ব বলিষ্ঠতায় নিজের বিশিষ্ট পথটি অন্বেষণ করে চলেছে। গুরুর শিক্ষা এবং প্রেরণা শিষ্যের শক্তি বা প্রতিভাকে কোনো ক্ষেত্রেই কণ্ঠরোধ করে মারে নি। অবনীন্দ্র-নন্দলাল রীতিটি শান্তিনিকেতন কলাভবনের সংকীর্ণ সীমা' অতিক্রম করে দেশময় ছড়িয়ে পড়া আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত নব্য ভারতীয় শিল্পের মূল প্রেরণায় প্রাণের এক নতুন প্রকাশ দেখা দিয়েছে কিছুকাল থেকে। কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার বাল্য ও কৈশোর পার হয়ে যৌবনের সূচনায় আজ সে-শিল্প বাস্তব





জীবনের মুখোমুখি হয়েছে। পুরাণ ও রূপকথার মায়ালোক মধুর হলেও আজ দূরস্মৃতির মতো তার মানসদিগন্তে বিলীয়মান। দুচোখ ভ'রে আজ সে বস্তুর জগৎকে তথা মানব জগৎকে তার প্রতি মুহূর্তের আলোছায়ায়, চলাফেরায় নিরীক্ষণ করছে, অনুভব করছে। গাছ-পালা, ফুল-ফল, পশু-পাখি, লোক-জনে পরিপূর্ণ প্রতিদিনের পথেঘাটে যে প্রতিবেশ, তার কোন কিছুই আজ তুচ্ছ নয় শিল্পীর নিরভিমান স্বচ্ছদৃষ্টিতে। চিত্রী তার মৌলিক সৃষ্টির উপযোগী নতুন রূপ ও রেখা, ছন্দ ও বিন্যাস আজ আবিষ্কার ক'রে চলেছে তার চারিপাশের চোখে-দেখার জগৎকে একাগ্র অভিনিবেশের সঙ্গে নিজের চোখে যাচাই ক'রে এবং বাছাই করে। বিনোদবিহারী এই সচল সবল নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধানদের একজন। রূপপতি নন্দলালের শিল্পজীবনে তাঁর এই শিষ্যদের প্রভাব শিষ্যদের ওপর গুরুর প্রভাবের চেয়ে হয়তো নিতান্ত কম নয়। কোনো শিষ্যের প্রতিভার এর চেয়ে বড়ো পরিচয় আর কি হতে পারে।

শিল্পী বিনোদবিহারীর কয়েকটিমাত্র স্কেচ্ এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত হল। তাঁর সৃষ্টির একটি প্রদেশের অতি যৎসামান্য এই ফসল। বীরভূমের প্রকৃতির শুষ্করুক্ষ শস্যবিরল খোয়াইডাঙার শোভা কালির কয়েকটিমাত্র আঁচড়ে কী অব্যর্থ সন্ধানেই না ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! শাল-তাল-মহুয়ার পত্রহীন শীতকাতরতা, তার রসহীন কাঙাল বুভুক্ষা চোখের সামনে কোথাও বা আঁকুবাঁকু করতে থাকে নিষ্ঠুর প্রেতনৃত্যে।



কোথাও বা কুক্কুর-কুক্কুরীর ধূলিধূসর, ক্ষুধার্ত জীবনের আকস্মিক ছন্দসুষমার প্রতি শিল্পীর ক্ষণ-ইঙ্গিত রসিক দৃষ্টিকে সহসা চমকিত করে দেয়। শিল্পীর বিশিষ্ট জগৎটি, তাঁর বহুচিত্রিত মুহূর্তের বিশেষ মেজাজ-গুলি অতি সহজ ছন্দে এবং স্বচ্ছ প্রেরণায় অসংখ্য আকারে রূপলাভ করেছে এক সজীব নিজস্বতায়। যে চোখ দেখার জিনিসকে আজো দেখতে ভোলেনি, মগজের দুর্ভর বিবেক ও বিচারের চাপে সে চোখ শিল্পীর এই বিপুল রূপ-লোকে আপনার যথেচ্ছ মুক্তভ্রমণের পথ অনায়াসেই দেখে নেবে। বাক্-বিস্তার করে সমালোচককে সে পথ চিনিয়ে দিতে হবে না।









আভিজাত্য

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ঘটনাটি এমন কিছুই নয় এবং তাহার মধ্যে কাহিনীর চমৎকারিত্বও বিশেষ কিছুই নাই—তবুও বর্ষণমুখর শ্রাবণ মধ্যাহ্নে লাহোর এক্সপ্রেসের চলন্ত ট্রেনে একজন লেডি ক্যানভাসারকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম।

—মালবাবুর স্ত্রী, অর্থাৎ আমার বৌদি! নিজের চোখ দুটিকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না! কিন্তু অবিশ্বাস করিবারও উপায় নাই।

ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর কলকোলাহলকে থামাইয়া দিয়া মালবাবুর স্ত্রী তখন অনর্গল বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন—ঈশ্বর সাক্ষী করে যদি বলতে পারেন আমার এ খাবারে কোন রকম ভেজাল আছে—কিংবা আমার এ খাবার অস্বাস্থ্যকর—তা হলে এই মুহূর্তেই এ সমস্ত খাবার আমি ফেলে দেবো আর উপযুক্ত ক্ষতি স্বীকারেও বাধ্য থাকবো।

ট্রেনে চলিতে চলিতে বহু রকমের পেশাদার ক্যানভাসার দেখিয়াছি—বক্তৃতার নিত্য নতুন পদ্ধতিও কতই না শুনিয়াছি—কিন্তু এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অভিনব। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইনিই সেই মালবাবুর স্ত্রী—বিহারের একটি পল্লীতে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম—গৃহস্থ ঘরের লজ্জাবতী বধূরূপে, কয়েকটি ঘণ্টার স্মৃতি যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া আমার মনের আনাচে কানাচে এখনও উঁকি ঝুঁকি মারিয়া থাকে। ট্রেণের সহযাত্রীরা নানারূপ বিদ্রূপ প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। যুদ্ধের বাজারে অনেক নতুনত্বর মাঝে ইহাও একরূপ অভিনব বিস্ময়

হু হু করিয়া ট্রেন চলিয়াছে আর লেডী ক্যানভাসারের বক্তৃতার সাথে সাথে যাত্রীদের ক্ষুধা প্রসারলাভ করিতেছে—দেখিতে দেখিতে প্রায় আট দশ টাকার খাবার বিক্রয় হইয়া গেল।

আমার পাশের টাকওয়ালা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি মালপোয়ার রসে রসনাকে রসাইয়া লইয়া টিপ্পনি কাটিলেন—ব্যবসাটা ফেঁদেছে মন্দ নয়। এর ভেতর বেশ একটা মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মশায় কিছু খেয়ে দেখুন না—পেট এবং মন একসঙ্গে দুই ভরবে।

ভদ্রলোকের কদর্য ইঙ্গিতের প্রতিবাদের ভাষা আমার নাই। আমি ভাবিতেছিলাম সেদিনের ঘটনা—শীর্ণ অজয়ের বালুচরে লজ্জাবতী বিশীর্ণা সেই বধূটি—অর্বাচীন স্বামীর কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় শীতের সন্ধ্যায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম আলাপের সূত্রটি ঠিক মনে নাই—তবুও মনে পড়ে মাত্র কয়েকদিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিলাম মুঙ্গেরের এক অখ্যাত পল্লীতে।

আকর্ষণ সেখানে কিছুই ছিল না। ছিল শুধু অজয়ের শীর্ণ দেহকঙ্কাল—প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণে বালির পাহাড়ে যখন স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া পড়িত, আর সন্ধ্যার বিষণ্ণতায় অজয়ের জলরেখায় কারুণ্য জাগিয়া উঠিত। সেখানে বাঁচিয়া আছে আমার কয়েকটি মুহূর্ত।

দেখিয়াছিলাম মালবাবুকে—তোবড়ানো গালে বাটারফ্লাই গোঁফ—বিশীর্ণ চেহারায় ছড়ি ঘুরাইয়া চলিতে চলিতে সারা দুনিয়াকে যিনি তাচ্ছিল্যের চোখে দেখিতেন, সঙ্গের সঙ্গিনী কঙ্কালসার সহধর্মিণী তাঁহার নিত্যই পিছনে পড়িয়া থাকিতেন—অবগুণ্ঠনের মাঝে শঙ্কা এবং ভীরুতা—অজয়ের শীর্ণ জলরেখার সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াছে। আলাপ হইবামাত্রই মালবাবু আমাকে আহ্বান জানাইলেন—বিদেশে নিজেকে ভারী একা একা ঠেকে মশাই—যে কদিন থাকেন দয়া করে আসবেন আমার বাড়ি।

প্রতিশ্রুতি দিলাম।

করগেটের দেওয়ালের মাঝে অজস্র ঠাকুর দেবতার ছবি—আঁশের সাজি আরও বিচিত্র আসবাবপত্র—উপরে লালটালির সেড—ভিতরের অপরিসর জীবনকে যেন পরিবেষ্টনীতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ঘরে ঢুকিতেই মালবাবু ছুটিয়া আসিলেন—আসুন, আসুন, আপনারা কলকাতার লোক হলেও বাঙালী তো—আমার স্বজাত। মৃদু হাসিয়া তাঁহার কথা সমর্থন করিলাম।

কলিকাতার সমস্ত অলি-গলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সম্পর্কের জের টানা হইল—বাগবাজারের গোঁসাই, শাঁখারীটোলার বাড়ুয্যে, পটলডাঙ্গার মুখুয্যে ঘুরিয়া বাজে শিবপুরের চাটুয্যে পরিবার একাধারে সবাই আত্মীয়। সংসারে কেবল তিনিই অভাগা—তাই ছাতুর দেশে এমন শুকাইয়া মরিতেছেন।

অবগুণ্ঠনবতী বিশীর্ণা বধূ আসিলেন—ভাঙা কাঁচের গেলাসে রক্তবর্ণ চা এবং খানকয়েক মালপোয়া হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে—অত্যন্ত লজ্জা এবং কুণ্ঠায় অবনমিতা হইয়া।

মালবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—বড়বাজারের গাঙ্গুলীদের নিশ্চয়ই চেনেন।

সবিনয়ে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

গাঙ্গুলীদের নাতনী ইনি—অর্থাৎ দৌহিত্রী।

সম্ভ্রমে মাথা নত করিলাম।

অবগুণ্ঠনবতী চা আর খাবারের রেকাবী রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিলেন—মালবাবু তাঁহার গতিপথ রোধ করিলেন—ওকি, ভদ্রলোক আমাদের অতিথি এবং স্বজাত—উনি খাবেন আর তুমি চলে যাবে?

অবগুণ্ঠনবতী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করিতেছিলাম—বংশমর্যাদায় ইঁহাদের অপেক্ষা আমি অনেক ছোট—আর রুচিজ্ঞানেও আমি বিব্রত হইয়া পড়িতেছিলাম—কিন্তু যে সকল অকপটতা এবং সারল্যের স্নিগ্ধতার পরিচয় পাইতেছিলাম, মন আমার তাহাতে ক্রমশই বিমুগ্ধ হইতেছিল।

মালবাবু স্ত্রীর জড়সড় ভাব দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—ওকি, তুমি ওরকম সং সেজে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কত বড় বংশের মেয়ে তুমি—আমার ঘরণী হলেও উনি জানেন তোমার কত বড় পরিচয়। বিদেশে উনি এসেছেন—উনি তোমার ভাই—ওঁর কাছে আবার তোমার লজ্জা কিসের? ঘোমটা দিলে তোমাকে একেবারে গেঁয়ো লাগে।

মালবাবু শুধু ইহাতেই নিরস্ত্র হইলেন না। উঠিয়া সহধর্মিণীকে তিনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং অবশেষে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইল।

মালবাবু বলিলেন,—তাহলে সম্পর্কটা কিসে শেষ অবধি দাঁড়ালো অবিনাশবাবু? দিদি তো?

আমি প্রতিবাদ জানাইয়া কহিলাম—না, বৌদি!

বৌদির সঙ্কোচ এবার কমিয়া গেল—ওটুকু খেয়ে ফেলুন ঠাকুরপো। গাঙ্গুলী বাড়ির দৌহিত্রী আমি—এ পরিচয় আমার সত্যিকারের পরিচয় নয়। আপনার দাদার সব তাইতেই বাড়াবাড়ি।

মালবাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন—বাড়াবাড়িটা কিসে তুমি দেখলে? গাঙ্গুলীদের দৌহিত্রী তুমি নও?

বৌদি প্রতিবাদ জানাইলেন—না। জাহাজ কোম্পানীর কোন গাঙ্গুলীরা আমার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে না কি হতেন তা নিয়ে আমি এখন তোমার মতন বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বেড়াইনে। আমার পরিচয় যা—আমি হচ্ছি তাই। ই আই আর রেল কোম্পানীর মালবাবুর স্ত্রী আমি—এতে আমার কোন লজ্জা নেই।

বৌদির কথায় অপ্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম—তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটিকে চাপা দিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাই। মালবাবু কিন্তু দমিবার পাত্র নন। সগর্বে বাইশ ইঞ্চি বুক ফুলাইয়া তিনি কহিলেন—তাহলে আমি মিথ্যেবাদী—তুমি গাঙ্গুলী বাড়ির দৌহিত্রী নও—আমিও রঘু লেঠেলের নাতি নই?

নতুন আর একটি পরিচয়ের সূত্র পাইয়া উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলাম। মালপোয়ার রসে মালবাবুর বংশ পরিচয়ের অলৌকিক কাহিনী জমিতেছিল মন্দ নয়।

রঘুনাথ বাড়ুয্যে মস্তবড় লাঠিয়াল। ক্ষুদ্র কোন গণ্ডগ্রামে তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার স্বাদেশিকতা—লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া গেলেও তাঁহার বংশধরের কাছে আজিও তাহা পরম গর্বের বস্তু হইয়া আছে। একটি লাঠির আঘাতে তিনি পঞ্চাশটি মাথাকে একদিন ধরাতলশায়ী করিয়াছিলেন—তাহার পর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিয়া রাজার শাসনের বাহিরে চলিয়া গেছেন। মুঙ্গের জেলার ছোট গ্রামটির মাঝে তাঁহার বংশধর সে কীর্তিকে আজ শুধু প্রমাণ দিবার দাবী রাখে।

সে কথা বলিতে বলিতে মালবাবুর বিশীর্ণ চোখ দুটি শুধু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে একবার মাত্র—তাহার পর উত্তেজনায় কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া যায়—সখেদে তিনি ভাঙিয়া নুইয়া পড়েন।

- সেই বংশেরই ছেলে মশাই, অভাবের তাড়নায় আজ এই অবস্থা। এই ছাতুর দেশে মরে পড়ে আছি—পঁয়ত্রিশ টাকার গো-ডাউন ক্লার্ক।

ভাগ্যের দোহাই দিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া সেদিনের মতন উঠিয়া পড়িলাম।

আর একদিনের কথা।

মালবাবুর গৃহে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। স্বদেশী এবং স্বজাতি ভাই আমি—আমাকে উপযুক্ত আত্মীয়তায় তিনি পরিতুষ্ট করিবেন।

আমি কিন্তু ভীষণ লজ্জিত হইয়া উঠিতেছিলাম। পঁয়ত্রিশ টাকার জীবনযাত্রায় নিজেকে যেন তাঁহাদের কাছে দুষ্টগ্রহ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

মালবাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—খবরদার—আপনি এমন কথাও মুখে আনবেন না। পয়সায় কি করে মশাই—দিল্, দিল্‌ই হচ্ছে আসল! বলিয়া তিনি বাইশ ইঞ্চির ছাতি ফুলাইলেন।

লজ্জিত হইয়া আমি নিজের ত্রুটিটুকু ঢাকিয়া লইলাম—না, না, সে কথা বলছিনে দাদা। দাদার বাড়ি ছোট ভাই খাবে, তাতে আবার কিন্তু করবার আছে কি? আমি বলছিলাম—বৌদি তো অমনি ছাড়বেন না—রাজসিক যজ্ঞের আয়োজন করবেন এক্ষুণি!

গর্বের হাসি হাসিয়া মালবাবু কহিলেন,—তা যা বলেছেন আপনি—সে তো যে সে ঘরের মেয়ে নয়—গাঙ্গুলীদের দৌহিত্রী সে!

আমি রসিকতা প্রকাশ করিলাম—আর তার আহ্বান উপেক্ষা করলে ছাতুর দেশে রঘুবীরের নাতির লাঠির ঘায়ে আমাকে ছাতু

হয়ে যেতে হবে—সে ভয়ও আমার বড় কম নয়।

মালবাবু হাসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন আর বাড়ি ফিরিয়া গৃহিণীকে সে কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া উঠিলেন।

পঁয়ত্রিশ টাকার রেলওয়ে গো-ডাউন ক্লার্ক বিহারে বাঙালীর আতিথিপরায়ণতার যে দম্ভ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। সেদিনের সেই রাজসিক আহার আর পরিচর্যা কখনও ভুলিবার নয়। আর বিহার পল্লী হইতে ফিরিবার দিনটির কথা আমার স্মরণের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

বৌদির চোখে জল দেখিয়াছিলাম—তুমি আমার সত্যিকারের ঠাকুরপো! বিদেশে এই জঙ্গলে পড়ে আছি—আত্মীয়স্বজন আমাদের কেউই নেই—মাঝে মাঝে খবর নিও ভাই।

মালবাবু আসিয়া ট্রেণে উঠাইয়া দিয়াছিলেন—আর পাথেয়স্বরূপ প্রচুর মিষ্টিমুখের জোগাড় করিয়াছিলেন—ট্রেণের সারা পথেও যাহা আমি খাইয়া শেষ করিতে পারি নাই।

সেই মালবাবুর স্ত্রী এবং বৌদিকে চলন্ত ট্রেণে আজ দেখিলাম—মালপোয়া বিক্রয় করিতেছেন—চমৎকার বক্তৃতার ঠাস্ বুকনি বুনিয়া।

মালপোয়া শেষ হইয়া গেল—খুচরা, রেজকি, টাকা এবং নোটে ব্যাগটি তাঁহার ভরিয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ চোখাচোখি হইতে তিনি সবিস্ময়ে আমার দিকে খানিক তাকাইয়া রহিলেন। তারপর আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া ভর্ৎসনার সুরে কহিলেন—বেশ লোক যা হোক তুমি! সেই যা গেলে একটি দিনের তরেও কি আর বৌদির খোঁজ নিতে নেই।

আমি কহিলাম—একি বৌদি!

ইঙ্গিতে বৌদি আমাকে থামাইয়া দিলেন —এখানে নয়, পরের ষ্টেশনে নেমে যাবো। আমার সঙ্গে যেতে হবে—তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

আমার তো নামবার উপায় নেই—আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।

—তা হোক! তোমার দাদার সঙ্গে একবার দেখা না করে তোমার যাওয়া হবে না।

—দাদা সেখানে নেই?

—না, এখন আমরা ঝাঁঝায় থাকি।

—দাদা কেমন আছেন?

—নিজের চোখেই দেখে আসবে।

ট্রেণ আসিয়া ঝাঁঝায় থামিল। বৌদির আহ্বানে আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম, সমস্ত যাত্রীর রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিকে তাচ্ছিল্য করিয়া।

আসন্ন সন্ধ্যায় অজয়ের তীরে মাটির একখানি ঘরে ঢুকিয়া মর্মবেদনায় মন আমার ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৌদির তিলার্ধ সময় নাই—পরের ট্রেণে আমাকে রওনা হইতে হইবে। বৌদি রান্না ঘরে ঢুকিয়াছেন—শুধু মুখে বৌদির বাড়ি হইতে ঠাকুরপোকে ফিরিতে নাই—সংসারে তাহাতে অমঙ্গল ঘটিবে।

দাদার চোখ-মুখ হইতে জীবনীশক্তির সকল চিহ্নই বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার জ্বর আসে। কিন্তু তাঁহার অঙ্গহানি হইল কেমন করিয়া? ডান হাতখানির আর কোন চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। আর তাঁহার পঁয়ত্রিশ টাকার সেই মালবাবুর জীবন?

দাদা কিন্তু এতটুকু দমিলেন না। আমাকে দেখিয়া উত্তেজনার আধিক্যে তিনি উঠিয়া বসিলেন।

কোথায় ছিলে এতদিন? তোমার আর চুলের টিকিটি দেখবার উপায় নেই। শোন, তখন বোধহয় হেসেছিলে রঘুবীরের নাতির কথা শুনে! এখন বোঝ সে রক্ত আজও আমার শরীরে বইছে কিনা? ডানহাতখানা কিসে গেছে জানো? সবিস্ময়ে আমি তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া রহিলাম।

রঘুবীরের নাতি কহিলেন—পুলিশের গুলীতে। আগষ্ট হাঙ্গামায় পূর্বপুরুষের রক্ত হঠাৎ শিরায় প্রতিশিরায় বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিলে। রেল কোম্পানীর লোক হয়েও দল বেঁধে একদিন রাত্রে গিয়ে রেলের লাইন উপড়ে ফেলতে গিয়ে হাতখানি খোওয়ালাম।

বিস্ময়ে আমি হতবাক হইয়া গেলাম।

—সেদিন থেকেই মালবাবুর পঁয়ত্রিশ টাকার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ! প্রমাণাভাবে জেল হয়নি—কিম্বা ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়নি—রেল কোম্পানীর লোক কিনা। বরঞ্চ খেসারৎ পাচ্ছিলাম—মনে কিন্তু ধিক্কার এলো। পারলুম না তাই সে দান গ্রহণ করতে। হাজার হোক—রঘুবীরের রক্ত তো গায়ে আছে হে—বলিয়া মাটির ঘরখানি প্রকম্পিত করিয়া রঘুবীরের নাতি তেমনি ভাবেই হাসিয়া উঠিলেন দশ বছর পূর্বে মুঙ্গেরের একটি গ্রামে মালবাবুকে যেমন করিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম—নিজের বংশ-আভিজাত্যের গৌরবে।

বৌদি একরাশ খাবার লইয়া ঘরে ঢুকিলেন—নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও ঠাকুরপো! তোমার ট্রেণের কিন্তু আর দেরী নেই।

আমি নীরবে বৌদির আদেশ প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলাম।

দাদা রসিকতা করিলেন—তোমার দাদার সংসারে এত স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না হে—পেট ভরে খাও। তোমার বৌদিই এখন সংসার চালাচ্ছেন—ট্রেণে ট্রেণে খাবার বেচেন। গাঙ্গুলী বাড়ির দৌহিত্রী—ভিক্ষে তো করতে পারেন না। স্বাধীন ব্যবসা—এ তো পরের দাসত্ব নয়! দাদার প্রাণখোলা হাসি এবারে কাশির আবেগে মাঝপথেই থামিয়া গেল। বৌদি ছুটিয়া গেলেন—বুকের ভেতর সাঁই সাঁই শব্দ হইতেছে—শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি বা রুদ্ধ হইয়া যায়!

বৌদি দাদার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু ভর্ৎসনা প্রকাশ করিলেন—পাঁচশবার তোমাকে না বলেছি, বাজে উত্তেজনায় মেতে উঠো না।

দাদা কাশির বেগ সামলাইয়া লইলেন—স্বদেশী আর স্বজাতি লোক কিনা—তাই একটু প্রাণের কথা বলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আর কিছুই তো আর এ জাতের বেঁচে নেই—শুধু আছে এই বংশমর্যাদার আভিজাত্যটুকু।

রাত্রের ঘন-অন্ধকারে রওনা হইলাম। রাত্রের ট্রেণ আমাকে ধরিতেই হইবে।

অন্ধকারে অদূরে যেন জলপ্রপাতের শব্দ শুনিলাম—শ্রাবণ আকাশে দুর্যোগের ঘন মেঘ।

বৌদি আশ্বাস দিয়া কহিলেন—ও কিছুই নয়। বর্ষায় অজয় মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে গর্জন করে; বর্ষাশেষে ওর সকল তেজ মরে যায়।



উইলের খেয়াল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত • এম-এ, বি-এল •

তিন

রঘুনাথ সামন্তের সংগে সাক্ষাৎ করে রায় পরিবার নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হল না। সম্পত্তির একাংশ থেকে ঋণ শোধ হয় না। আজকাল পল্লী গ্রামের জমিজমার কোনো দাম নাই। তার উপর জ্ঞাতিদের সংগে যৌথ সম্পত্তি। দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর হবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় অসম্ভব।

অগত্যা বুকে পাথর বেঁধে ভাই-বোন দিন চালাবার সমস্যার সম্মুখীন হ'ল। প্রফুল্ল ব্যাপারটা বুঝলে, মহিলাদের বোঝালে। অনুরূপ চৌধুরীর নিকট বারো বৎসর পূর্বে তার পিতা ষোলো হাজার টাকা কর্জ নিয়েছিলেন। সর্ত ছিল ১৯৪৩ সালের পহেলা জানুয়ারী টাকা দিতে না পারলে উত্তমর্ণ অনুরূপ চৌধুরী কিম্বা তার স্থলাভিষিক্ত, প্রফুল্ল রায়ের পিতা অনিল রায়ের সমস্ত সম্পত্তি দখল নিতে পারবে। উত্তমর্ণকে সম্পত্তির কতক অংশ তাদের দিয়ে অবশিষ্ট অংশ রক্ষার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ বাজারে সম্পত্তির অংশ মাত্র, ভদ্রাসন বাদ দিয়ে, ঋণের পরিমিত অর্থে বিক্রয় অসম্ভব।

অন্তরালে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—অনুরূপ চৌধুরী কে? কোথায় তার বসতি?

সামন্ত বললে—অনুরূপ চৌধুরী অম্ল-মধু গ্রামের ব্যবসাদার ছিল। ধান চাল, মুগ কলাইয়ের ব্যবসায় অনেক অর্থ উপার্জন ক'রেছিল। সেই টাকায় মহাজনী ক'রে অনেক বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়েছিল।

—মানুষটি কেমন? দয়া ধর্ম আছে?

সামন্ত বললে—বাবু তিনি তো নাই। তাঁর পুত্র আছে কলিকাতায় কোথায়। শুনেছি লোহার কল-কারখানা করে। দেশের সম্পত্তি অনুরূপের জ্ঞাতি শ্রীনিবাস চৌধুরীর হাতে।

প্রফুল্ল বললে—আর শ্রীনিবাস কেমন লোক?

মাত্র দুইটি কথায় প্রকাণ্ড শ্রীনিবাসকে বর্ণনা করলে রঘুনাথ সামন্ত—ওরে বাবা!

আহারান্তে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করলে শ্রীচিত্রা রায়। তার কাছে রঘুনাথ বাক-সংযম আয়ত্ত ক'রে শ্রীনিবাসকে মাত্র এক কথায় বর্ণনা করলে—ভয়ংকর।

তার অগ্রজ শ্রীনিবাস তত্ত্বর পর আর অগ্রসর হয়নি। শ্রীমতী শ্রীনিবাসকে দুষ্ট ভেবে দূরে রেখে স্বর্গীয় অনুরূপ চৌধুরীর বিবরণ সংগ্রহ করলে।

—অনুরূপবাবুর পুত্রের কি নাম, নায়েব মশায়?

নায়েব মশায় মাথা চুলকে বললে—নাম, নাম। নামটা দিদিমনি মনে পড়ছে না।

কোথায় থাকে?

তার ঠিকানাও সে জানে না। এই মাত্র জানে যে সে কলিকাতার উপকণ্ঠে কোথায় কলকারখানা চালায়।

চিত্রা পিতার আমলের নায়েবকে শ্রদ্ধা করতো. তাই মনের কথাটা ব্যক্ত করলে না। মানুষের তথা জানোয়ারের কণ্ঠ থাকে মাত্র একটি। তাকে টিপে ধরা যেতে পারে। কিন্তু কলিকাতার মত সহরের উপকণ্ঠ বহু। আর প্রত্যেকটি স্থূল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অনুরূপ পুত্র অরূপই থেকে যাবে।

মাত্র নয় মাসের মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হবে অসম্ভব। সুতরাং অন্ন চেষ্টায় কর্মসাগরে তাদের ভাই-বোনকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সে নিজের কথা ভাবলে না। তার সহানুভূতি অগ্রজকে ঘিরে নানা চিত্র আঁকলে। চিত্রা সত্যানুরাগিণী। ভণ্ডামি তার কাছে অতি হেয়। মনকে আঁখি ঠারবার মত সাংসারিক বুদ্ধি তার ছিল না। কিন্তু মমতা তারুণ্যের দুর্বলতা। স্নেহ তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করেছিল। সে দাদার গুণগুলোকে বাড়িয়ে দেখতো। এমন গুণী লোক স্বাধীন বৃত্তি ওকালতী ছেড়ে কোনো সরকারী অথবা বে-সরকারী অফিসে কেরাণীগিরি করবে, এ চিন্তার অন্তরে ছিল বিভীষিকা। ভ্রাতৃ-স্নেহ তার চোখ টিপে ধরেছিল তাই সে দেখলে না অগ্রজের প্রকৃত কর্ম খোঁজা নিরাশার রূপ।

চার

তারা রায়নিবাসে বাস করতে গেল। এর পর সে দেশ হবে পরের।

বিধবা চিত্রা-জননী রায়নিবাসের ভদ্রাসনের প্রত্যেক অঙ্গের সংগে আপনার জীবনের এক একটা ঘটনা জড়িয়ে রেখেছিলেন। বালিকা নববধূরূপে সদর দরজা অতিক্রম করবার সময় সীমন্তিনীদের শঙ্খ-ধ্বনি ও হুলুধ্বনি কেমন বেগে তাঁর হৃদকম্প জন্মিয়েছিল, অঙ্গনের কোন্ ভাগে সে দুধ-আলতা-ভরা পাত্রে চরণ রেখেছিল, কোন্ দালানে দুধের বাটি উল্টে ফেলে সে শ্বাশুড়ীর কাছে ধমক খেয়েছিল, সে সব কথা সোনার জলে লেখা ছিল স্থানগুলির গায়ে। সে ধমকও আজ আশীর্বাদরূপে বিজলীর আলোর মত বিধবার মনকে সমুজ্জ্বল করে আবার আঁধারে ঘিরলে। আর তাঁর নিজের কক্ষ, যার প্রতি বালুকণার সংগে তাঁর সুখ-স্মৃতির শিহরণ বিজড়িত, সেই স্বর্গ কে জানে কোন্ অসুরের দানবলীলার ক্ষেত্র হবে। তাঁর বিবাহ-জীবনের বহু ঘটনা মনের মধ্যে খেলে গেল—মান-অভিমান, হাসি-অশ্রু, আশা-নিরাশা—যাদের স্মরণীয় করেছিল, তাদের গোপন গুহা থেকে ভাবনার মাঝে ভাসিয়ে নিয়ে এলো, গৃহ-ত্যাগের দুর্ভাবনা।

জননী অম্বিকা রায় ছেলেমেয়েদের বন্ধু ভাবতেন। তাদের উপর তার বিশ্বাস ছিল অগাধ। যেসব কথা সাধারণত মায়েরা পুত্র-কন্যার সংগে আলোচনা করে না, শ্রীযুক্তা অম্বিকা রায় সেসব প্রসঙ্গে আনন্দ পেতেন। যাক কিন্তু তাঁর অপার স্নেহ তাঁকে ভাব-গোপন ভঙ্গী শিক্ষা দিল।

এ দেশ পাড়াগাঁ মোটে ভালো না। যারা কলকাতায় বাস করেছে, তারা বাপু এক তিল এখানে থাকতে পারে না—একদিন বল্লেন তিনি শ্রীমতী ও শ্রীমানকে।

আসলের চেয়ে ছায়া বড় হয়। মিথ্যা, সত্যের ছায়া তাই তার বিস্তৃতির প্রাচুর্য। কিন্তু ছায়া প্রাণবন্ত হয় না, তাই তার সৌন্দর্য অলীক। মোট কথা রায়নিবাস খুব ভালো লেগেছিল চিত্রার। কলিকাতায় সে শুনতো বন্দী কোকিলের ডাক। দেশে গাছে কোকিল ডাকছে। ফলওয়ালার ঝুড়িতে নয়, জল-জীয়ন্ত গাছের ডালে আম ঝুলছে, ইত্যাদি ইত্যাদি কাণ্ডগুলো তার তরুণ চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল। কি দারুণ মজা। সাঁঝের বাতাস, আমতলা, জামতলা, ছেঁচ-তলায় কত আনন্দে লুকোচুরি খেলে। আর পাখীর কি গুনতি আছে। একটা লেজ নাড়ে, একটা কালো চেহারা সরু তারের উপর বসে, আবার একটার চমৎকার সবুজ লেজের মাঝের একটা পালক বড়। কিন্তু জননীকে এ সব সমাচার তো শোনানো যায় না, যেহেতু—

হেতু ভাবতে তার চোখে জল আসত। তারও শিশুকাল কেটেছে এদেশে। বাড়ি-ঘর ঘাট-মাঠের সংগে তার পিতার পুণ্য-স্মৃতি জড়ানো। কে একটা বাহিরের লোক এসে এখানে বাস করবে। কিন্তু মাকে তো বাঁচাতে হবে। যাক সত্য মাথার পরে।

জননীকে একদিন চিত্রা বল্লে—মা, চলো পালাই। এখানে আমাদের বাস করা অসম্ভব। হয়তো আমরা উচ্ছন্ন গেছি সহরে চিরদিন বাস করে। কিন্তু কলকাতার কলরবই ভালো।

জননী বল্লেন—কেন চিতলু, দেশে সেবার

এসে তো তোর বেশ লেগেছিল। হরিণ-ছানার মত লাফিয়ে বেড়াতিস। বনের পাখী ধরতে ছুটতিস।

চিত্রা বল্লে—সে আজ পাঁচ বছরের কথা। কত আম পেড়ে খেতাম। নিজে বাগানে বাগানে ঘুরে কালো জাম, লিচু, জামরুল, গোলাপ জাম সব কুড়াতাম।

জননী বল্লেন—এখনও তা করলে পারিস।

—এখন যে মা বড় হ'য়েছি। তার ওপর পাশ করেছি। এখন গাছ-কোমর বেঁধে ঘুরলে নিন্দা হবে স্ত্রী শিক্ষার। আর জান মা, মাগো কী কাণ্ড! সেদিন পুকুর ধারে কিলবিল করছে জোঁক।

এ রকম কথাবার্তায় কিন্তু জননীর ঘা শুকোত না। বরং তিনি বিষণ্ণ হ'তেন। ভাবতেন যদি টাকা থাকতো বাড়ি ঘর পুকুর বাগান সাফ করে দেখাতাম এদের দেশ কত মধুর।

প্রকৃত পক্ষে প্রফুল্লর প্রাণ চাহিত বস্তু-তন্ত্রতা। অত কবিতা, আহা, উহু, চোখ গেল, বা কুহু কুহু তার কাছে অতিরঞ্জিত হয়ে সর্বগ্রাসী অভাব অভিযোগ অবলুপ্ত করতে পারতো না। সকাল সন্ধ্যায় বাতাস বয়। কিন্তু দুপুরে যখন রৌদ্রে রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম করে সারা বিশ্ব আর তেঁতুল গাছের ছায়া মাটির পরে চঞ্চল হয় নানা ভঙ্গিতে কিলবিল ক'রে এদিক ওদিক করে, তার নিজের মন ঝিম্ ঝিম্ করে, চঞ্চল হয়। মান্ধাতার আমলের হাতপাখা এক বিপদ। অঙ্গ নাড়ার কষ্ট। তার উপর একটু তন্দ্রা এলে নাকের ডগা টিপ ক'রে ঠক্ ক'রে মারে হাতপাখার গোল ধার। না, যারা কবিতা লেখে তাদের পক্ষে পল্লীবীথি ভালো। এক টান মেরে কেটে সাতদিন থাকা যায়। যাক মহাজনের হাতে—

কিন্তু শেষ প্রসঙ্গে মুখ বলে যাক্, জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার বলে—ওরে বাবা! বাস্তু ভিটা! পৈতৃক সম্পত্তি! রায়-নিবাসের রায়েদের বাড়ি! অনিল রায়ের পুণ্য স্মৃতি জননীর উপভোগ্য। এক একদিন সে ভাবে, সেই শ্লোকটার কোথায় কোথায় বিসর্গ পড়বে ঠিক জানি না। কিন্তু স্বর্গ হ'তে জননী ও জন্মভূমি বড় একথা দারুণ সত্য। জন্মভূমি অবশ্য বঙ্গ আমার, জননী আমার ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণ মাতাবার শ্লোকের আসল নির্দেশ—যে বাড়িতে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে, অর্থাৎ পৈত্রিক ভিটা। প'র তার চিন্তাধারা তার মনের জমাটি কুয়াসা সরিয়ে দেয়। যৌবন সুলভ রসবোধ তাকে ত্রাণ করে। সে ভাবে তার ব্যাখ্যা অসঙ্গত। জন্মভূমি মানে অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, জাহ্নবী-যম না-বিগলিত-করুণা ইত্যাদি ভারতভূমি। কারণ আজকাল কলিকাতায় ছেলেমেয়ে জন্মে হাসপাতালে। ইংরাজের বহু লোকের জন্মভূমি হাসপাতাল। রুশিয়ার প্রত্যেকেরই এখন জন্ম হয় সাধারণ জনমশালায়। অথচ এদের দেশভক্তি, বৈষ্ণবের কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কম নয়।

তার চিন্তাধারাকে প্রতিহত করলে এক আগন্তুকের আগমনবার্তা। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল প্রফুল্ল। হঠাৎ নিজের মনে বললে—কে রে বাবা। ঠিক ছাল-ছাড়ানো আলু সিদ্ধর মত মুখখানা।

সে দেখেনি তার জননীকে। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন—ওকি কথা পফু? গ্রামের ভদ্র লোকদের কোনোদিন অসম্মান ক'রো না। কলকাতার বাবুদের মত ওদের পালিস নেই। কিন্তু—

প্রফুল্ল মাথা চুলকে বাহিরে গেল। শহরবাসী অপেক্ষা কোন্ গুণে এরা গুণী সে কথা শুনলে না। শুনলেও প্রথম ধারণা পরিবর্তিত হ'ত না।

ভদ্রলোক গোবিন্দ সরকার। প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত। ধানের কলের মালিক। আখের চাষ করেছে এ বৎসর।

তাকে যথাযোগ্য অভিবাদন ক'রে প্রফুল্ল বৈঠকখানায় বসালে। তক্তপোষের উপর ফরাসপাতা।

প্রফুল্লর স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে গোবিন্দ সরকারের পরিচয় ছিল। এক গ্রামের মানুষ তবে ভিন্ন পাড়ার—

—আপনার মা বাপের আশীর্বাদে আমি এবার অনাহারী ম্যাজিস্টর হয়েছি, রায় মশায়—বললে গোবিন্দ।

প্রফুল্ল বললে—সেটা আর এমন বেশী কথা কি মিঃ সরকার। আপনার যে রকম গেরমবারি চেহারা আপনাকে মানায় জজ হ'লে—দায়রা জজ।

মিঃ সরকার অভিভূত হল। সে বললে—তেমন তো আমাদের বিদ্যা নাই।

বিদ্যা কি বুদ্ধির কাছে মাথা তুলতে পারে সরকার মশায়? আপনার ঐ মুখ হতে পাঁচ টাকা দশ টাকা জরিমানা, দু মাস চার মাস জেলের রায় শোভা পায় না। আহা! ঐ মুখে, ঐ গলায় ফাঁসীর হুকুম দিলে তবে কাছারী গম্‌গম্ করে।

অতি সরলভাবে কথা বলছিল প্রফুল্ল রায়। গোবিন্দ সরকার সন্তুষ্ট হল। প্রফুল্ল বোঝবার চেষ্টা করছিল তার শুভাগমনের উদ্দেশ্য। অবশ্য এ তিন সপ্তাহ বহু লোক তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। প্রফুল্লর সন্দেহ ছিল যে, দেশের লোক তাকে প্রাণখুলে সমাজে স্থান দেবে না। কিন্তু তার ধারণা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হল, কারণ তার অজ্ঞাতসারে সমাজ পরিবর্তিত হয়েছিল। একজন প্রবীণের প্রতি প্রচ্ছন্ন পরিহাস তার মনে কাঁচা আত্ম-গ্লানির ছায়া-সম্পাত করলে। না এবার আলাপের ভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন।

গোবিন্দ সরকারের কণ্ঠস্বর গভীর অথচ দ্রুত। ও রকম আকৃতির লোকের দর্শন মাত্রেই মনে সন্দেহ হয় যে, মুখ টিপে, গলা খাঁকাড়ি দিয়ে, চিবিয়ে কথা বলাই এর প্রকৃতিগত। কিন্তু গোবিন্দর বাক্ বিকাশের ভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কারণ যখন সে অধিক কথা বলা অভ্যাস করেছিল, তখন সে ছিল কৃশ। তার বাক্য পরে অর্থ উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাগম অগ্রদূত হয়েছিল মাংস এবং তৎপরে মেদের প্রাচুর্যের। তাই তার কণ্ঠস্বর মৌলিক গতি বর্জন করেনি। দেহের স্থূলতা তাকে গভীর করেছিল মাত্র।

সামাজিক সমস্যার মানসিক আলোচনার সময় অমন শব্দ অকস্মাৎ কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে ভাব তো স্তব্ধ হয় এমন কি শান্ত প্রকৃতি না হ'লে ভাবুক চমকে ওঠে। প্রফুল্লর আলোচনা বন্ধ হ'ল, কিন্তু সে থমকে উঠলো না যখন গোবিন্দ সরকার বললে—রায় মশায় বলছেন ভাল কথা। ধর্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। মানুষকে লটকানো অধর্ম। কিন্তু একবার জজ হয়ে যদি বসতে পারি তা হলে টক মিষ্টির চিনিবাসকে ঝুলিয়ে দিই।

প্রফুল্লর মনে ছিল যে গোবিন্দ চিনির চাষ করেছে। কিন্তু এতখানি পরিভাষা সে বুঝতে পারলে না। বিশেষ ঐ দ্রুত লয়ে উচ্চারিত বিবৃতি। সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা কলকাতার লোক কিনা, অতটা টেক্‌নিক বিশেষ ঐ টেম্পো, কায়দা করতে পারিনি। কি বললেন—টক্, মিষ্টি, চিনি? চিনি তো মিষ্টিই হয়, টক চিনি, বন্ধ্যা জননীর মত। কী ব্যাপার। আমরা শহরে থাকি, অত শত বুঝি না।

গোবিন্দ সরকারও তার ভাষা বুঝলে না। কিন্তু তার ভাবধারাকে প্লাবিত করছিল শ্রীনিবাস-বিদ্বেষ।

—কেমন ক'রে বুঝবেন রায় মশায়? ও যে শয়তান। নামে চিনি কিন্তু হাড়ে টক্।

বিজলীর আলোর মত জ্ঞানের জ্যোতি খেলে গেল প্রফুল্লর মস্তিষ্কে। ওঃ! চিনিবাস—শ্রীনিবাস। নামটা জানা। বুঝেছি। সে বললে—আপনি কোন চিনিবাসের কথা বলছেন হাকিম মশায়?

—ছিনিবাস একটাই হয়, উকীলবাবু। টক মিষ্টির চিনিবাস চৌধুরী—অনুরূপ চৌধুরীর আছে।

এবার বুঝলে প্রফুল্ল—তার উত্তমর্ণের কথা হচ্ছে। গোবিন্দ তার শত্রু। কেন? টক মিষ্টি অম্ল মধুরের চলতি রূপ।

প্রফুল্ল বললে—চিনিবাস কি অনুরূপ হ'তে বেশী ওর নাম কি?

সে বললে—বলেন কি? চিনিবাস হ'ল শয়তান। বুঝুন তো আপনার পিতা

ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিয়ে ষোলো হাজার লিখিয়ে নিয়েছিল কে? তারপর কট কোবালা। পৈত্রিক ভিটে আপনার না তার। শয়তানের বাচ্ছা!

প্রফুল্ল জানতো শয়তান অবিবাহিত। যাক। সে বোঝাবার চেষ্টা করলে অনুরূপে শ্রীনিবাস, গোবিন্দ সরকারের কোন্ ক্ষেতে পাকা ধানে মই দিয়েছে। কিন্তু গোবিন্দ পরার্থপরতার মোটা মুখোস পরে' তার বৈঠকে সমাসীন। সে এদের কথাই কহিল, নিজের কথা বললে না।

অনেক কথার পর গোবিন্দ বললে—এবার বাছাধন ফাঁদে পড়েছে। রায় নিবাসের রায়েদের বাড়ি নেবে? আরে মোর যাদু।

প্রফুল্ল বললে—যদি কট কোবালা থাকে, কেন নেবে না?

গোবিন্দ বললে—আপনি তো উকীল। আইনকানুন সরবত করে খেয়ে তবে উকীল হয়েছেন। বলুন তো রামের জিনিস কি রামের বাবা দশরথ বেচতে পারে?

প্রফুল্লর মনে পড়লো তার বাবার বন্ধু ননী চাটুয্যের উপমা—গুণচটের থলিতে খসা যান। গোবিন্দর ঘটোৎকচ থলিতে আইন পুরাণ সমস্ত থরে থরে সাজানো। অদ্ভুত সৃষ্টি। তাকে স্বীকার করতে হ'ল যে দশরথ রামের জিনিস দায়যুক্ত করতে পারে না।

—জীতা রহ! বলে একটা বিকট চীৎকার করলে গোবিন্দ। বললে—তবে বলুন তো প্রফুল্ল রায়ের বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক দেয় কেমন করে অনিল রায়, আপনার পিতা?

প্রফুল্ল বিস্মিত হল। লোকটা বলে কি? তার পিতা নিজের বিষয় বন্ধক দিতে পারেন না?

গোবিন্দ বললে—ব্যাপারটা হয়েছে তাই। আপনার পিতামহ স্বর্গীয় নবদ্বীপ রায় যদি তাঁর সম্পত্তি উইল ক'রে তাঁর নাতিকে দিয়ে যান, তা' হলে সম্পত্তি স্বর্গীয় অনিল রায়ের হয় কেমন করে? ধরুন দাখিলা কোবালা, রেভিনিউ সব তাঁর নামে। কিন্তু আপনার নাবালকী অবস্থায় যদি তিনি নিজেকে মালিক ভাবেন, তা হলে কি মশায়ের বিষয়টা তাঁর হয়? যৌথ সম্পত্তিতে বে-দখল হলেও তো তামাদি হয় না।

ঠিক সেই সময় একটা তার এলো গৌরী সেনের নিকট হতে। চিত্রা বি এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে। ভগ্নী গ্র্যাজুয়েট!

আনন্দে সে সুসংবাদ বহন ক'রে অন্দরে গেল। কাজেই গোবিন্দ সরকারের সঙ্গে আলাপ বন্ধ রাখতে হল।

যাবার সময় গোবিন্দ সরকার বলে গেল—যা বললাম মনে রেখো বাবু। বড় কর্তার উইল। আমায় ডেকে পাঠালে সমস্ত ঠিক ক'রে দেব।

প্রফুল্ল প্রাণ খুলে আনন্দ করলে ভগ্নীর সাফল্যে। কিন্তু নিরালায় বসে সে আর একবার প্রার্থনা করলে। এত বড় সমস্যা সে একেলা সমাধান করবার মত শক্তি আয়ত্ত করতে পারলে না। এক অব্যক্ত বেদনা তাকে ম্রিয়মান করলে। সংশয় তাকে উৎপীড়িত করলে। কিন্তু সে সংশয়ের কারণটাকে সামনে ধরে বিচার করতে পারলে না। কি সর্বনাশ! কি পাপ! জাহান্নামে যাক তার পৈত্রিক ভিটা তার মাটি, কাঠ, লোহা, অট্টালিকা। তারা তুচ্ছ। তার পবিত্র পিতার বর্তমান ধর্ম। তার কি শক্তি একেলা সে এ বিপদে ত্রাণ পায়। সে শক্তিমানকে ডাকলে। বললে—সত্য কি ভগবান। না না হ'তে পারে না। আমার পিতা—যাঁকে আট বৎসর পূর্বেও দেখেছি—সজ্জন. আপনভোলা—না প্রভু—মিথ্যা প্রমাণ কর।

প্রার্থনায় সে বল পায়। আবার যখন মনের প্রহরী ঘুমিয়ে পড়ে, সে ভাবে সত্যই কি সে বিষয়ে তাঁর অধিকার ছিল না. সে বিষয় বন্ধকের ভাণ ক'রে পিতা অন্যকে ঠকিয়েছেন? নিজের পিতার উইল লুকিয়ে রাখা এক অপরাধ। তার উপর ঠকানো অন্য অপরাধ। অসম্ভব। মিথ্যা! হতে পারে না।

সে ভাবলে গোবিন্দকে গুলী মেরে ফাঁসী যাবে। সে মিথ্যা সমাচার নিয়ে এসেছিল। কোথা তার পিতামহর উইল? মাথা নাই মাথা ব্যথা। সে মূর্খ, ভাব-প্রবণ অনভিজ্ঞ।

পাঁচ

প্রফুল্ল নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করলে। তার চিত্ত হ'ল মহাসমরের লীলা ক্ষেত্র। তার পিতৃভক্তি সকল বৈরীকে পরাস্ত করলে। প্রধান অরি লোভ মিত্রতার মুখোস পরে তার স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করলে। বাড়ি, ঘর, বাগান. জমিদারী। লোভ বহু মনোমুগ্ধকর প্রস্তাব নিয়ে এলো তার সমর্থনের জন্য। ওকালতী ব্যবসায় কতিত্ব অর্জন করলেও সে মাত্র আপনার উপকার সাধতে পারে। দু' পক্ষের বিবাদে এক পক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডা হয়ে লাঠি বাজি, যশ মান, অর্থ আনতে পারে. কিন্তু জগতের. সমাজের. বিশেষ বাঙলা দেশের কি উপকার প্রত্যক্ষভাবে সে কার্য হতে সম্ভব। একটা জমিদারী হাতে থাকলে কৃতবিদ্য ভ্রাতা-ভগ্নীর পক্ষে দেশের বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবপর। সেটা যে মহাকাজ! চারিদিকে অজ্ঞতা বিরাজিত. চাষা নিজে জানে না কৃষি কৌশল। শিল্পী জানে না শিল্প। হাটে মাঠে কেহ ভারতের প্রাচীন কৃষ্টির কোনো সন্ধান রাখে? তারপর দেশের দলাদলি, মারামারি, গোবিন্দ সরকার—

শেষ নামে লোভের সম্মোহন রূপ তিরোহিত হল, জমিদারী করতে গেলে প্রথম প্রমাণ করতে হয় পিতামহের উইল। সে উইল গোপন ক'রে—

প্রথমটা সে ভাবতে চাহিল না। তারপর তার শুদ্ধ অন্তরাত্মা বললে—ভয় করে ভূতুড়ে ঝোপ হ'তে পালিয়ে গেলেই তো ভূত ঘাড়ে চাপে। তাকে তেড়ে গেলে প্রমাণ হয়, তার অস্তিত্ব অলীক। ইংরাজী প্রবচন মনে পড়লো। বলীবর্দর শৃঙ্গ ধরলে তার পরাজয় সম্ভব।

সে বললে—আচ্ছা উইল আছে বা নাই। যদি থাকে পিতা প্রবঞ্চনা ক'রে আমার বিষয় বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন। আমি তাঁর পুত্র। আমাকে তিনি স্নেহে পালন করেছেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, মাকে শেষ অনুরোধ করে গেছেন, যেন তাঁর পুত্র-কন্যা শিক্ষিত হয়। আমি সেই পিতাকে জুয়াচোর প্রমাণ ক'রে যদি জমিদারী, ঘর বাড় বালাখানা বজায় রাখি, তারা কি কোটি কোটি কাঁকড়া বিছার রূপ ধারণ ক'রে চিরদিন আমাকে দংশন করবে না। ছিঃ! ছিঃ!

কিন্তু তবু তার বুকের মাঝে দগ্‌দগে ক্ষত তাকে উৎপীড়ন করলে। এবার সে আরও আলোচনা করলে। পিতার পবিত্র স্মৃতি যে এক পাপ কলঙ্কের রেখা লেপবে, ছিঃ! ছিঃ! কার অভিযোগে! একটা ঘটোৎকচ পাপিষ্ঠ গোবিন্দ সরকারের মিথ্যা কথায়! কোথায় উইল! কোথায় প্রমাণ! মূর্খ. প্রফুল্ল। সে শয্যা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। নিজের কান ধরে টানলে। তারপর নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলে। এবার অপরিচিত বিশ্ব-নিয়ন্তার কাছে নয়, তার পৃথিবীর দেবতা. বিশ্ব-দেবতা, স্বর্গের দেবতা, পিতৃ-স্মৃতির বেদীপ্রান্তে। প্রার্থনার ভাষা সরল. সহজ, দুর্বোধ সংস্কৃত নয়, ঋষির সৃষ্ট নয়।

বাবা. মাপ কর বাবা। তুমি যা চেয়েছ তা হব হব হব। আর অলস, উদাসীন থাকবো না। তুমি বিক্রী করেছ এ বাড়িঘর। যাক এরা। আমি তোমার নামে স্কুল করব, হাসপাতাল করব, মেয়েদের সম্মান রাখবো। আশীর্বাদ কর বাবা! তার চোখ ভরে জল পড়লো। নবীন বলে প্রফুল্ল বলী হ'ল।

তার যখন ঘুম ভাঙলো ঘরে সূর্যের তপ্ত আলো প্রবেশ করেছে। আম্রবাগানের পাখীর গান হয়েছে এলোমেলো। তাদের সঙ্গে মিশে গেছে মানুষের কণ্ঠস্বর। বাহিরের বারান্দায় তার জননী ও ভগ্নী গল্প করছিল।

সে দ্রুত উঠলো শয্যা ছেড়ে। টেবিলের উপর একখানা ভিজিটিং কার্ডে লেখা—কুমারী চিত্রা রায় বি-এ।

সে হেসে বল্লে—কাম ইন প্লীজ, মিস্ রায়।

সুস্মিতা সহোদরা এসে বল্লে—মিঃ রায় আপনি অধুনা নিদ্রা সুখটা একটু অতি-মাত্রায় ভোগ করছেন।

—সম্ভব। সে আচরণ প্রমাণ করছে যে আমার বিবেক নির্মল।

তার্কিক ভগ্নী বল্লে—কিন্তু দেহ অলস।

প্রফুল্ল বল্লে—যাক প্রভাতে কলহ করব না। দেখ চিতল্, চিত্রা রায়ের পাশে বি-এ বেশ মানিয়েছে। আমি যেদিন প্রথম গ্র্যাজুয়েট হলাম লুকিয়ে লুকিয়ে কতবার যে প্রফুল্ল রায় বি-এ লিখেছি, তার ইয়ত্তা নাই।

ভগ্নী তার বক্তব্য ব্যক্ত করলে। ও বাড়ির রাজন কাকাকে সে সম্মত করেছে, সমস্ত পরিবারবর্গ মিলে দেউটির বাগানে বন-ভোজনে যাবার জন্য। এক ঘণ্টার মধ্যে যেতে হবে, তার মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে। তিন-খানা ভাড়াটে গাড়ি আসছে। অজয় নদীতে স্নান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত উৎসাহ পাবকের উপর এক বালতী জল ঢাললে ভ্রাতা, যখন সে বল্লে—দুত্তোর।

চিত্রা—ডিপ্লোম্যাট। সে একটু মৃদুস্বরে বল্লে—মার বড় আনন্দ। ওখানে ও'রা আগে খুব যেতেন।

ওঃ! নিশ্চয়, বোলে প্রফুল্ল বাহিরে এলো।

তারপর প্রাতরাশের হজমীগুলি হল তাদের পল্লীসমাজ আলোচনা।

প্রফুল্ল বল্লে—দেশ একেবারে বদলে গেছে মা। চিত্রা বি-এ পাশ করেছে, আমি ভেবে-ছিলাম পল্লীসমাজ তাকে ভাববে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ। কিন্তু এখন দেখছি সবারই সেটা গর্বের কারণ হয়েছে।

মা বল্লেন—পল্লীগ্রাম বদলায়নি বাবা; বদলেছে বি-এ পাশ। আগে কলকাতা থেকে লেখাপড়া শেখা মেয়ে দেশে এসে চটি পায়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকে যেতো। মুড়িকে বলতো—ভাজা চাল, কাঁচকলাকে বলতো কাঁচা কলা, আর কথায় কথায় আমাদের লেকচার দেবার চেষ্টা করতো। কাজেই আমরাও তাদের ভাবতাম পাগল, থিয়েটারের অভিনেত্রী। এখন শিক্ষিত জানে শিক্ষিতার নিজস্ব ব্যাপার, আর মানুষ সব সমান। চিত্রা সেই গানটা বল না।

চিত্রা হেসে বল্লে—সত্যি মা এত সাদা কথায় কেউ সমাজতত্ত্ব এমন ভাবে বোঝাতে পারে না। তারপর সুর করে গাহিল—শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

কিন্তু জননী কোনো কাজেই স্বচ্ছন্দতা অনুভব করতে পারলেন না, রাক্ষসীর রূপ ধার চিন্তা, যখন শ্রীমতী অম্বিকা রায় তাকে শান্তিময়ী দেবীর মূর্তিতে আরাধনা করেন। স্মৃতির দাহিকা শক্তি এত প্রবল, এ বার্তা তিনি পূর্বে কোনোদিন উপলব্ধি করেন নি। জগতের নশ্বরতাকে বেঁধে রাখে স্মৃতির ডোর, তাই তো চির-নবীনের মাঝে পুরাতন চিরন্তন। (ক্রমশ)

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতের আধুনিক লৌহ-শিল্প

কালীচরণ ঘোষ

ভারতের পুরাতন লৌহ শিল্পের কথা পূর্বে এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাহা ভারতের অতীত গৌরবের কথা; তাহার পর প্রচণ্ড বিদেশী আমদানীর যুগ, তখন ভারতের শিল্প অভিভূত হইয়া পড়ে। অতি সাধারণ ব্যবহারের জন্যও বিদেশী লৌহের আমদানী প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে থাকে এবং দেশীয় শিল্প লোপ পাইবার উপক্রম হয়।

কেবল আমদানীর কথা বলিলেই লৌহ-শিল্পহানির সকল কথা বলা হইল না। ইহাই বা কেন সম্ভব হইল সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ইহারই অপরাপর সংস্করণ ভারতীয় অন্যান্য শিল্প-নাশের কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সূত্রপাতে ইংলণ্ডের শিল্প বিষয়ে অবস্থা ভারত অপেক্ষা হীন ছিল. তখন ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যাদি ইংরেজ বণিকের পণ্য ছিল। ভারতের অর্থ ইংলণ্ডে নীত হইবার পর সেখানে লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পোন্নতি সম্পর্কে নানা গবেষণা চলিতে থাকে। বয়ন ও লৌহ শিল্প বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; তাহার বিভিন্ন স্তরগুলি যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ভারতবর্ষ নানা উপদ্রবের মধ্যে এই সুযোগ হারাইয়া ফেলে। উপরন্তু যাহার যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা উত্তরাধিকারী বা যথোপযুক্ত শিষ্য না পাইলে কাহাকেও দান করে নাই, তাহার মৃত্যুর সহিত সমস্ত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

লৌহ শিল্পের ইহা ব্যতিরেকে অন্য অসুবিধাও ছিল। তখন কাঠ কয়লার সাহায্যে লৌহ-মল বিদূরিত করা হইত বলিয়া সাধারণত জঙ্গলের নিকট খনি অবস্থিত হইলে লৌহ নিষ্কাসনের সুবিধা হইত। বলা বাহুল্য, খনি থাকিলেই হয় না; খনিতে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লৌহ-প্রস্তর অবস্থিত না হইলে, লৌহ উদ্ধার করা সম্ভব হইত না। খনি বা চুল্লী হইতে কাঠ দূরে পড়িয়া গেলে, ধীরে ধীরে সেই স্থানের কাজ বন্ধ হইয়া যাইত। সাধারণত পথহীন প্রদেশে দূরে জঙ্গল হইতে কাঠ আনিতে খরচ বেশী পড়িবার কথা। কেবল এই কারণে কত যায়গার শিল্প, উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ-প্রস্তর থাকা সত্ত্বেও বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সঙ্গে বিদেশী মালের আমদানী হইয়াছে। হয়ত বন্দর বা নগরী হইতে দূরে অবস্থিত শিল্প কোনও রকমে বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু সে ভরসা শীঘ্রই লোপ পায়। অতি দ্রুত ভারতের অর্থের অপব্যয় করিয়াও শীঘ্রই রেল বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং অতি দূরের শিল্পকেন্দ্রের সন্নিকটে বিদেশী মাল উপস্থিত হয়। সকল দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া দেশীয় শিল্প মুমূর্ষু হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি শিল্পনাশের প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা না হইলে সে যুগেও ভারতীয় লৌহ ইস্পাতের গুণ ক্ষয় পায় নাই। তখন পর্যন্ত ভারতীয় লৌহের খ্যাতি বেশ বিদেশের লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। ইংলণ্ডের প্রয়োজনে ভারতীয় লৌহ লইয়া গিয়া আপনাদের কার্যোপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। ওয়েলসে মেনাই প্রণালীর উপর পুল নির্মাণ করিবার সময় ভারতীয় লৌহ এখান হইতে আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া বহু প্রমাণ আছে।

"Its (Indian iron's) superiority is so marked that at the time when the Britannia Tubular Bridge across Menai Straits was under construction preference was given to the iron produced in India . . . ."

T. H. D. La Touche—**An Annotated Index of Minerals of Economic Value,** p. 233.

কিন্তু একটা বিরাট জাতির পক্ষে ইহা কিছুই নয়। তাহা ছাড়া লোক সংখ্যা

বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লৌহের নানা ব্যবহারও প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় কোনও জাতির শিল্প অচল হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং ধীরে ধীরে আধুনিক ধরণে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে থাকে।

অনেকেই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই চেষ্টার মূলে বাঙালী বিদ্যমান ছিল। সাধারণত ১৮৩০ সালে মিঃ হীথ (I. M. Heath) মাদ্রাজে যে চেষ্টা করেন, তাহা সর্বপ্রথম বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহার প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার অধিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ শর্মা তৎকালীন উন্নত প্রথায় লৌহ নিষ্কাসন-মানসে বীরভূমের খনি ইজারা লইবার জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল বলিয়া জানা আছে, কিন্তু নানা অসুবিধার মধ্যে তাঁহার আর কার্যারম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং বাঙলার প্রচেষ্টার প্রথম অধ্যায় এইভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাহার অল্পদিন পরে মেসার্স মট ও ফার্কুহার (Messrs Mott and Farquohar)) বর্ধমানের পশ্চিমে জমির ইজারা লন। তখন তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল ঝরিয়ায় চুল্লী স্থাপন করেন। সঠিক কারণ জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু এই সঙ্গে তাঁহারা বীরভূমের লোহা মহলের একাধিপত্য প্রার্থনা করেন এবং ১৭৭৮ সালে মিঃ ফার্কুহার ঐ ইজারার দখল গ্রহণ করেন। প্রায় পনেরো বৎসর ধরিয়া নানা চেষ্টা চলিতে থাকে এবং এক সময় মনে হইয়াছিল যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই; ১৭৯৫ সালে কোম্পানী বন্ধ হইয়া গেলে সমস্ত সম্পত্তি জমিদারগণের অধিকারে চলিয়া যায়।

এই সকলের পর মাদ্রাজে মিঃ হীথের প্রচেষ্টা সকলের গোচরীভূত হয়। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী ছিলেন। ভারতের লৌহশিল্পের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়া তিনি সরকারী সংস্রব ছাড়িয়া দেন এবং কার্যে সফলতা অর্জনের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ১৮৩০ সালে দক্ষিণ আর্কটে পোর্টো নোভোতে পরীক্ষা-মূলকভাবে "ইণ্ডিয়ান ষ্টীল আয়রণ এ্যাণ্ড ক্রোম কোম্পানী" নামে কার্যারম্ভ করেন এবং এই কার্যে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হন। কিছুদিন কাজ চালাইবার পর এই স্থানে নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ১৮৩৩ সালে মালাবার উপকূলে বেপুর-এ নূতন কারখানা স্থাপন করেন এবং পোর্টো নোভো ষ্টীল এ্যাণ্ড আয়রণ কোম্পানীর নাম দেন। তখন পর্যন্ত পোর্টো নোভোতে অবস্থিত কারখানা বন্ধ হয় নাই; দুইটিতেই কাজ চলিতে থাকে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার কার্যের উপর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য রাখিতেছিল; কিন্তু ফলাফল দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। পোর্টো নোভো ও বেপুর কারখানায় লৌহ উৎপাদনের পড়তা সম্বন্ধে হিসাব গ্রহণ করিয়া দেখা গেল খরচের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী পড়িতেছে। তখন দক্ষিণ আর্কটে ও কইম্বাটুরে ইস্ট ইণ্ডিয়া আয়রণ কোম্পানী নাম দিয়া আবার দুইটি স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপন করা হয় এবং "ব্লাস্ট ফার্ণেসে"র সাহায্যে কাজ চলিতে থাকে; কিন্তু ১৮৫৮ সালে ইহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। তখনও পর্যন্ত বেপুর ও পোর্টো নোভোতে কাজ চলিতেছিল, কিন্তু তাহাও মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য। ১৮৬৬ সালে পোর্টো নোভো এবং ১৮৬৭ সালে বেপুরের কার্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেলে মাদ্রাজের চেষ্টার উপর যবনিকা পড়িয়া যায়।

বাঙলার চেষ্টা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ১৭৯৫ সালে এখানকার সকল প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। তাহার পর অর্ধশতাব্দীর উপর আর কোনও চেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে ১৮৫৫ সালে ম্যাকে কোম্পানী (Messrs. Mackay & Co) বীরভূম মহম্মদ বাজারে "বীরভূম আয়রণ ওয়ার্কস" নামে কারখানা সুরু করে। বীরভূম কোম্পানী সম্পূর্ণ ইংরেজ দ্বারা গঠিত। ইহারা ইজারা লইবার সময় এখানে কেবল যে জমির একাধিপত্য গ্রহণ করে তাহা নহে। ঐ অঞ্চলে যাহাতে কেহ লৌহ নিষ্কাসন প্রভৃতি কার্য করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া লয়। ফলে স্থানীয় লৌহ-শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বীরভূম কোম্পানী ১৮৫৬ সালে যে লৌহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা লৌহ বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু এখানেও সফলতা সম্বন্ধে কেহ সুনিশ্চিত আশা পোষণ করিতে পারে নাই; কার্য পরিচালনে কেবলই ক্ষতির আভাষ পাওয়া যাইতে লাগিল। পরে বার্ণ কোম্পানী (Messrs Burn & Co) ইহার ভার লইয়া ইহাকে রাখিতে চেষ্টা করিলেও ১৮৭৫ সালে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

ইতোমধ্যে কুমাউন প্রদেশে কালাঢুঙ্গি অঞ্চলে এবং নৈনিতালের ডেচাউরিতে দুইটি স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৬২ সাল নাগাদ উভয়ে সম্মিলিতভাবে কার্য পরিচালন করে। ঐ সময় ইন্দোর রাজ্যে বারওয়াই অঞ্চলে অপর এক প্রচেষ্টা হয়; দুঃখের বিষয়, কোনটিই সফল হয় নাই।

এতকাল সময় ও বহু অর্থ নষ্টের পর কাঠ কয়লার দ্বারা লৌহ নিষ্কাসন কার্য সম্ভব কি না,—এই লইয়া একটি প্রশ্ন ওঠে। বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডে এতদিনে পাথুরে কয়লার সাহায্যে লৌহশিল্প প্রভূত অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার কোনও পরীক্ষা হয় নাই। বিদেশীদের বরাবরই ধারণা ছিল এবং স্বতন্ত্র কোনও মতামত পোষণ করিবার আমাদের কোনও সুযোগ ছিল না,—ভারতবর্ষের কয়লা গুণে অত্যন্ত হীন সুতরাং বাষ্পীয় যান এবং ধাতবশিল্পে তাহা ব্যবহার করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।

১৭৭৪ সালে ভারতবর্ষে কয়লার ভাণ্ডারের পরিমাণ, খনির অবস্থান এবং কয়লার গুণানুসন্ধানের যে চেষ্টা হয়, তাহার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। তাহার পর একশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় কয়লার সঠিক তথ্য সংগ্রহের বিশেষ কোনও চেষ্টাই হয় নাই। ১৮৭৫ সালে পুনরায় চেষ্টা হইলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায়। এই সময় পাথুরে কয়লার সাহায্য লৌহ-প্রস্তর গলাইবার উদ্দেশ্যে এক কোম্পানী বরাকরের নিকট কুলটিতে দুইটি চুল্লী স্থাপন করে। ১৮৭৯ সালে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৮২ সালে গভর্নমেণ্ট হঠাৎ এই কার্যে উৎসাহিত হইয়া উঠেন এবং ঐ কোম্পানীর পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। যাঁহারা "দেশ" পত্রিকায় ধাতব শিল্প সম্পর্কে সরকারী নীতির বিষয় পূর্বে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভারতবর্ষে যাহাতে কোনওরূপে ধাতবশিল্প, বিশেষত লৌহ শিল্প গড়িয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য ১৭৭০ সালে ২১শে নভেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়মে এক গোপন বৈঠকে এতৎসংক্রান্ত এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁহাদের এই নীতির মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে বলা হয় ঃ

"The real change comes in any country when the iron and steel industries begin to be successful.... The development of the metallurgical industries means the real revolution."

অতএব বাঙলা দেশে, তথা ভারতবর্ষে, ধাতব শিল্পের প্রসার সর্বপ্রকারে প্রতিহত করা হইয়াছে।

গভর্নমেণ্ট কার্যভার হাতে করিয়া ১৮৮৪ সালে একটি চুল্লীতে কাজ আরম্ভ করে এবং ১৮৮৯ সালে "বেঙ্গল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী" নাম দিয়া মার্কিন কোম্পানীকে কাজ চালাইবার সুযোগ দেয়।

ভারতের নানা প্রচেষ্টার মধ্যে এই কারখানা আজও জীবিত আছে। ১৯১৯ সালে ইহাকে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানী বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লৌহশিল্প পর্ব নানা

আশা নিরাশার মধ্য দিয়া শেষ হইয়া গেল। এই সময় হঠাৎ ভারতে বিশেষত বাঙলা দেশে শিল্প প্রচেষ্টার বিরাট লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৯০৫ সালে লাট কার্জন বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। সেই কার্যের প্রতিবাদ স্বরূপ বিদেশী বর্জনের মন্ত্র গৃহীত হয়। ইহার সহিত ভারতের সর্বপ্রধান লৌহ কারখানার গভীর যোগাযোগ রহিয়াছে বলিয়া এখানে উল্লেখ করিতে হইল।

কেবল বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে বলিলেই চলে না। লোকে যাহাতে পরিবর্তে দেশীয় দ্রব্যাদি পায় তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সুতরাং দেশীয় শিল্পের প্রবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। এই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব হইতেই এদিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। পুণ্যশ্লোক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সতীশচন্দ্র সিংহ এবং চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয়ের চেষ্টায় যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাহা পুষ্ট করিয়া তুলিলে বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস সর্বসমক্ষে আপন জ্যোতি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। সেই আলোক দিকে দিকে বাঙালীর নয়ন আকৃষ্ট করিল। প্রাতঃস্মরণীয় রাসবিহারী ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি দেশমাতৃকার সুসন্তানগণ দেশীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অকাতরে অর্থ ব্যয় দ্বারা স্বদেশী ভাব জাগ্রত রাখিবার সহায়তা করেন এবং দেশীয় শিল্পের সংস্থানের চেষ্টা করেন। এই ভাবাবেশের উপর নির্ভর করিয়া টাটা কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলে আজ অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না।

ভারতবর্ষে বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠার সহিত টাটা পরিবারের নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। জামসেদজী লক্ষ্য করেন, এখানে উল্লেখযোগ্য একটিও লৌহ কারখানা নাই। মার্টিন কোম্পানীর পরিচালনে একটি যাহা আছে, তাহা দেশের অভাবের তুলনায় একেবারে নগণ্য। সুতরাং তিনি দেশে বিরাট লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠিলেন। প্রথমে ভারতবর্ষে এই জাতীয় শিল্প চালু রাখিবার উপযুক্ত লৌহপ্রস্তর ও অপরাপর মাল মশলা আছে কি না সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। মধ্য প্রদেশের চন্দা জেলায় এবং ভারতীয় অপরাপর স্থানে "প্রস্তরের" পরিমাণ জানিতে পারিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। পরে মূলধনের জন্য তিনি ইংলণ্ডের ধনিকদের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কথাবার্তা "পাকা" হইবার পর হঠাৎ একদিন কারখানার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ছোট্ট একটি প্রশ্ন উঠিয়া পড়ে। ভারতের কারখানা, ভারতীয়দের হাতে সম্পূর্ণ পরিচালন-ভার থাকিবে শুনিয়া ব্রিটিশ ধনিকদের মুখোস খুলিয়া পড়িল। তখন আর তাঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না। জেমসদজী সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিতে চাহিলে কর্তাদের এমন কাজ পড়িয়া যাইতে লাগিল যে, দেখা করিবার সময়টি পর্যন্ত সঠিক বলা তাহাদের অসম্ভব হইয়া পড়িল। জেমসেদজী প্রমাদ গণিলেন; মূলধন চাই, "মাত্র" ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা! তখনকার দিনে দেশীয় কারবারে মূলধন দিয়া অপচয় (!) করিবার মত টাকা বাহির করিবার লোক পাওয়া যাইত না। (আজ সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে)। সুতরাং বোঝা গেল, এত দূর আসিয়াও সফলতা ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে। তিনি টেলিগ্রাম করিয়া সমস্ত অবস্থা বোম্বাই অফিসে জানাইলেন। তখন মিঃ বিলিমোরিয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতীয়দের স্বদেশ-প্রীতির উপর জোর দিয়া মূলধন আহ্বান করা হইল। আবেদন জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে টাটার অফিসে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিল। কে আগে টাকা জমা দিবে এই লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া গেল। টাটারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য নিতান্ত অনিশ্চিয়তার মধ্যে লোকে টাকা দিয়াছে। টাটা কোম্পানীসংগঠনের কল্পনার সময় হইতেই ভারত সরকার নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা লিখিয়াছে ঃ

"Earlier attempts to introduce European processes for the manufacture of pig iron and steel in India have been such conspicuous failure that there is naturally some hesitation in reposing confidence in the project now launched by Messrs. Tata, Son & Company."

Records of the Geological Survey of India, Vol. XXXIX (1904-08), p. 101.

পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন ভূতত্ত্ববিদ্যার পত্রিকার পক্ষে কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে এইভাবে মতামত প্রকাশ করা একেবারে অবান্তর। তাহা হইলেও তাহারা ইহাতে লজ্জা বোধ করে নাই। এই বিষয়ে যাঁহাদের বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করা হয়, তাঁহাদের প্রকাশিত মত জানিতে পারিয়াও যে তিন সপ্তাহকালের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের সমস্ত টাকা জমা হইয়া গেল, ইহাতে বিদেশী ধনিক সম্প্রদায় প্রমাদ গণিলেন; ব্রিটিশ রাজ সরকারের যে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহারা ত ১৭৭০ সাল হইতে মনে করিয়া আছে যে, লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিলে দেশের মধ্যে সত্য সত্যই বিপ্লব ঘনাইয়া উঠিবে। আমি সেই গোপন বৈঠকের সভ্যদের দূরদৃষ্টির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি।

এই মূলধনই শেষ নয়। কারখানার সর্বাঙ্গীন গঠন সমাপ্ত করিয়া কাজ চালু করিবার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন মহারাজা সিন্ধিয়া একাই চার লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রয়োজনের সমস্ত টাকা সরবরাহ করেন। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কারখানার কাজ চালু হয়।

ইহার পর ১৯১৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী তিন কোটি টাকা মূলধন লইয়া স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, এ সময় টাকা পাইতে কোনও কষ্ট হয় নাই।

১৯১৮ সালে আরও একটি ঘটনা ঘটে। মহীশূরে নূতন একটি কারখানা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইহাতে মহীশূর সরকারের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। ইহা ১৯১৮ সালে জন্মলাভ করিলেও সমস্ত যন্ত্রপাতি আনিয়া কাজ সুরু করিতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানী স্থাপিত হইবার পর বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর সহিত একযোগে কাজ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯২৫ সালে লভ্যাংশের বণ্টন (Profit Sharing) নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া কাজ চলিতে থাকে। পরে ১৯৩৬ সালে উভয়ে মিলিত হইয়া যায়। ইহা এক মস্ত শুভ লক্ষণ। সাধারণত কলহ বিবাদ মনান্তরের মধ্যে অনেক কারবারের জীবনান্ত ঘটিয়া থাকে। সেদিক দিয়া ইহা নূতন ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আধুনিক লৌহ শিল্পে বহু অর্থের প্রয়োজন সুতরাং সম্মিলিতভাবে কাজ করিলে সুবিধা অনেক।

ভদ্রাবতী (মহীশূর) আয়রণ ওয়ার্কস এক হিসাবে-ভারতের পুরাতন ধারা আজও বজায় রাখিয়াছে। ইহারা এখনও বহু পরিমাণে কাঠ-কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। বায়ুবদ্ধ স্থানে কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া উপোৎপাদ্য বস্তু উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ চুল্লী ইহাদের আছে এবং ইহা হইতে প্রাপ্ত কাঠকয়লা লৌহ নিষ্কাসন কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্তমানে লৌহ নিষ্কাসনের জন্য যে কয়টি কারখানা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। দেশের বিরাট প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। ৪০ কোটি লোকের এই বিরাট দেশে কি পরিমাণ লৌহ লাগিতে পারে তাহার ধারণা করা কঠিন। তবে একবার যখন দেশে "বিপ্লব" দেখা দিয়াছে, তখন আশা আছে আমরা অন্তত কতক পরিমাণে দ্রুত এদিকে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারিব।

অনুবাদ সাহিত্য

তরুণ এ্যাক্সেলব্রড্

— সিনক্লেয়ার লুই —

কটনউড্ গাছ ডালপালা বিস্তার করে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটা বনের সৃষ্টি সকল সময় করে। তার শাদা শাদা লোমের মতো রোঁয়াগুলো শাখার বিস্তারে প্রান্তর আর পথ আবৃত করে যায়। আমাদের প্রতিবেশীরা এই জঙ্গল বিস্তারের দায়িত্ব অপরের কর্তব্য পালন না করার জন্যে বলে বিবাদের সূচনা করে। তবু সত্য কথা স্বীকার করতে হোলে বলতে হয় যে, কটনউড্ গাছ প্রকৃতপক্ষে তার ছায়ায় শুধু আশ্রয় দান করে না, স্বাচ্ছন্দ্যও প্রদান করে। যারা গমের ক্ষেতে অথবা সাগুগাছের বীথিকায় রৌদ্রদগ্ধ হোয়ে কাজ করে তারা গায়ের ঘামে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাতে কটনউডের ছায়ায় এসে বসে।

জোরেলমনের লোকেরা নুট এ্যাক্সেলব্রডকে বলতো 'বৃদ্ধ কটনউড'। কটনউডের প্রকৃতি তার মধ্যে বিরাজমান বলে কেউ এ নাম দেয়নি। তার অদ্ভুত সাদাবাড়ী আর লাল রংয়ের গোলাবাড়ীর চার পাশে যে বাগান সে তৈয়ার করেছিল, সেই বাগানকে কেন্দ্র করে তার এই আখ্যা জন্মলাভ করে। গৃহ-প্রবেশের পথের দুধারে সে গাছের সারি লাগিয়েছিল। যখন সে কাঠের গাড়ীতে ঘোড়া জুতে সেই গাছের তলা দিয়ে যেতো, তাকে নিঃসংশয়ে ঐশ্বর্যবান বলে মনে হোত।

পয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ নুটকে সত্যি কটনউডের মতোন মনে হোত। কটনউডের ন্যায় মাটিতে গভীরভাবে শিকড় সঞ্চারিত করে, দেহে আগস্ট মধ্যাহ্নের ঝড় বৃষ্টি আর রোদের দাপট সহ্য করে দিনের উদয়ে এবং আমেরিকার বিশাল তৃণ প্রান্তরের রাত্রিময়ী আকাশে সে প্রায় অভ্রংলিহ শীর্ষ উন্নীত করে দাঁড়িয়েছিল। জন্মভূমি যদিও তার আমেরিকা নয় তবুও কথার উচ্চারণে তাকে মার্কিণ ছাড়া অন্য দেশীয় বলে বোঝবার উপায় ছিল না একমাত্র 'জে' আর 'ডবলিউ'-র উচ্চারণ ব্যতিরেকে। স্ক্যানডানেভিয়ায় জন্মালেও তার ধারণা ছিল আমেরিকা হচ্ছে একমাত্র দেশ যে ন্যায়ধর্ম, অপ্রতিকাল চিন্তাশীলতা এবং জ্ঞানদীপ্ত নগরীসমূহের পাল্যয়িত্রী ধাত্রী হোয়েছে। দুঃখ এবং কষ্ট তার জীবনে যাই আসুক না কেন, সে সকল সময় স্বপ্ন দেখছে সে চিরতরুণ, সুন্দরের উপাসক।

ছেলেবয়সে নুট এ্যাক্সেলব্রডের ইচ্ছা ছিল সে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হবে। নানাদেশের ভাষা সে শিখবে, ইতিহাসের সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা তার কণ্ঠস্থ থাকবে, জ্ঞানী হবে সে অমূল্য পুঁথির ভাষা আহরণ করে। যখন সে প্রথম আমেরিকায় এলো, তখন সে দিনের বেলা একটা কাঠকাটা কলে কাজ করতো আর সমস্ত সন্ধ্যা পড়াশোনা করতো। লেখাপড়া সে কিছু শিখেছিল। কেন না, জেলার প্রাথমিক স্কুলে সে প্রায় ছ'মাস শিক্ষকতা করেছিল। তারপর তার বয়স যখন মাত্র আঠারো বছর, সেই সময় অকস্মাৎ তার তন্বী বিবর্ণ লেনা ওয়েমিলিয়াস্-এর ওপর এতো বেশী সহানুভূতি এলো যে তাকে সে বিয়ে করে ফেললো। তাদের তৃণ-প্রান্তরের ওপর নব-প্রতিষ্ঠিত ক্ষেতে আর বাগানে যথেষ্ট আনন্দ থাকলেও নুট কিন্তু শীঘ্র দারিদ্র্য আর সংসারের জালে বিজড়িত হোয়ে পড়েছিল। আঠারো বছর হোতে সেই যে আরম্ভ হোল, আটান্ন বছর পর্যন্ত অহরহ হয় সে কোনো সন্তানকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছে, না হয় কোনো ক্ষেতকে বন্দকী কবালা থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

এ সব ব্যাপার সত্ত্বেও সে শান্তিতে ছিল এবং তার অবসর সময় সে বিরাট বিরাট ইতিহাস অথবা অর্থনীতির বই পড়ে কাটিয়ে দিতো। কিন্তু কখনো তার মন হোতে সেই স্বপ্নসুন্দর নগরীসমূহ আর অত্যুচ্চ প্রাসাদভবনের ছবি মুছে যায় নি। ক্ষেত আর বাগান নিয়ে দিন যাপন করে সমস্ত দারিদ্র্য আর দেনা থেকে বাঁচিয়ে অবশেষে সে একটা বায়ুতাড়িত কল স্থাপন করল। এরপর সে প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল। যখন তার বয়স ক্রমে তেষট্টি বছর হোল, তখন তার মনে হোয়েছিলঃ এবার তার কাজ শেষ হয়েছে। মরণ তার সুখের হবে, শান্তি সে পাবে, সংসারের আর কোনো প্রয়োজন তার নেই।

লেনা আগেই মারা গেছে। ছেলেরাও কেউ তার কাছে নেই। একজন 'ফারগো'তে দাঁতের ডাক্তার, আর একজন গোল্ডেন উপত্যকায় নিজের ক্ষেত আর বাগান তৈয়ার করে চাষী হোয়ে গেছে। নুট নিজের ক্ষেত-বাগান মেয়ে-জামাইকে দিয়ে দিলো। তারা বললো, বাবা যেন অবশিষ্ট জীবন তাদের কাছে থাকেন।

নুট সে অনুরোধ রাখলো না। বললো, না, সে হয় না। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। আমি ক্ষেত আর বাগান তোমাদের দান করবো না। আমার মরণ পর্যন্ত তোমরা ক্ষেত আর বাগান বাবদ আমাকে বার্ষিক চারশো ডলার করে দেবে। আমি সামনের পাহাড়ে আমার যে জমি আছে, সেখানে ঘর বানিয়ে বাস করবো।

পাহাড়ের কোলে একটা টিলার ওপর যে একমাত্র কটনউড্ গাছটা ছিল, নুট সেই গাছটাকে বড়ো ভালোবাসতো। অবসর পেলে সে ওরি নীচে গিয়ে বসতো। এখন তার অবসর জীবন যাপনের কুটীর সে ওরি ছায়ায় স্থাপন করলো। যে নতুন দৈনন্দিন জীবন তার আরম্ভ হোল, তাতে সে সকালে উঠে আগে তার খাবার তৈয়ার করে নিতো, তারপর বিছানা পরিষ্কার করতো। অবশেষে বাইরে এসে রোদে পিঠ দিয়ে বসতো। তখন তার চলতো জোরেলমনের পাঠাগার হোতে আনা বই পড়া। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তার মনে হোত ছুটি মিলেছে—সে ছুটি পেয়েছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে একটা চেয়ারে তার ঘরের সামনে বসে থাকতো। সময় কেটে যেতো, সে কিন্তু তার বিরাট বপু আর কাশশুভ্র দাড়ি নিয়ে নিশ্চল হোয়ে বিরাজিত। তার পরণের ঢিলে পায়জামা, কলারবিহীন সার্ট অশোভন হোলেও মনে হোত সে যেন সত্যই জ্ঞানবৃদ্ধ। বসে বসে সে অনবরত ভাবতো তার এই বর্তমান জীবনের কথা। প্রথম প্রথম যখন সে এই নতুন ঘর বাঁধলো, তখন সে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে তার অভ্যাসানুযায়ী চলতো। তারপর এক সময় দেখা গেল, অভ্যাসের নিগড় হোতে সে মুক্ত হোয়েছে। কঠোর পরিশ্রমকে সে ব্যঙ্গ করতে আরম্ভ করলো। এই ব্যঙ্গোক্তি অবশ্য শুনতো তার 'রাজকুমারী' নামে একটা বিড়াল। নুটের কোলের ওপর বসে টেবিল থেকে দুধ খেতে খেতে 'রাজকুমারী' এই সব শুনতো। নুটের শাদা দাড়িসমাচ্ছন্ন মুখের ওপর চোখ দুটি শাদা ভ্রূর নিম্নে সকল সময় উজ্জ্বল হোয়ে থাকতো, আর স্বপ্ন দেখতো তারুণ্যের, বিলুপ্ত সেই সব দিনের সৌন্দর্যের যা প্রাণময় করে রেখেছিল গ্রীসকে, গরীয়ান করেছিল রোমকদের।

অভ্যাসের বন্ধন ছিন্ন করে নুট যে নতুন মানুষ হোয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল একদিন। দেখা গেল রাত্রিকালে নুট

বেড়াতে আরম্ভ করেছে। চিরকাল রাত্রি যার নিদ্রার কোলে আত্ম-সমর্পণ করে অতিবাহিত হোয়েছে, আজ সহসা তার এই জাগরণ সত্যি রোমাঞ্চকর। অন্ধকারের অপরিমেয় গভীরতা, তৃণ-প্রস্তরের অসীম বিশালত্ব, চন্দ্রালোকের মোহ, পায়ে ঘাসের শিশির-সিক্ত স্পর্শ, কটনউডের বিরাট রহস্যময় অস্তিত্ব আর নিশাচর পাখীর সচেতনতা নিয়ে রাত্রি যে কতো অদ্ভূত এবং মায়াময়ী সেই গোপন কথা আবিষ্কার করে নুট মাইলের পর মাইল পথিক হোয়ে পথ অতিক্রম করে চলে যেতো। জুতো শিশিরে ভিজে যেতো, তবু সে চলার বিরাম ছিল না। কখনো কখনো সে টিলার ওপর উঠে দু-বাহু প্রার্থনার ভংগীতে প্রসারিত করতো, যেন এই নিদ্রিত প্রকৃতিকে অর্ঘ্যদান করছে।

নুটের এই নৈশ অভিযান একদিন লোক-গোচর হোল। তার প্রতিবেশীরা যারা শহর থেকে আমোদ করে বেসামাল হোয়ে রাত্রিতে বাড়ী ফিরতো তারা লোককে জানালো যে নুট আজকাল খামখেয়ালী হোয়ে উঠেছে। চাষবাস ছেড়ে দিয়ে তার রাত্রির ঘুম গেছে, দুপুর রাত্রিতে সে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। তারা দুঃখও করলো নুটের মতো অবকাশ যদি তাদের থাকতো, তাহোলে ঘুম কাকে বলে তা তারা দেখিয়ে দিতো। তাকে নিয়ে যে আলোচনা শুরু হোয়েছে সেকথা বুঝতে পারলেও নুট তার এই অপূর্ব ভ্রমণ বন্ধ করলো না। বরং সে আরো চঞ্চল হোয়ে উঠলো এই নতুন জীবন যাত্রার গতিবেগকে বৃদ্ধি করতে।

সুপরিচালিত জীবনকে নুট ভরিয়ে দিলো অবহেলায়। তার সেই পাণ্ডিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পর্যন্ত অপসারিত হোয়ে গেল। মেক্সিকো বিজয়ের ইতিহাস পড়া স্থগিত রেখে সে রোম্যান্সের ভিতর ডুবলো। অবশেষে একদিন দেখা গেল প্রতিটি সন্ধ্যা সে 'রাজকুমারী'কে কোলে নিয়ে 'ঝিন্দের-বন্দী' পড়ছে না হয় ট্রিলবির সংগে ভালোবাসায় আত্মহারা হোয়ে যাচ্ছে।

সব চাইতে তার ভালো লাগলো 'এল' প্রদেশের একটি গল্প। একজন যুবক কি ভাবে অদম্য চেষ্টায় কলেজে এসে ঢুকেছিল তারপর ধীরে ধীরে জীবনে সে কি সুন্দর সফলতা লাভ করলো। গল্পটা এতো বেশী অনুপ্রেরণা আনলো যে, একদিন রাত্রি তিনটার সময় বিছানার ওপর উঠে বসলো নুট এবং স্থির করলো সে কলেজে পড়তে যাবে। তখন তার বয়স হোয়েছে চৌষট্টি।

রাত শেষ হোলে দিনের আলোয় নুটের সংকল্প টলতে আরম্ভ করলো। কটনউড গাছটার দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ মনে হোল বয়স হোয়েছে। কলেজে যৌবনদীপ্ত তরুণদের মাঝখানে বার্ধক্যের এই লোলচর্ম যে অত্যন্ত অশোভন হবে একথা অনস্বীকার্য। তবে? মাসের পর মাস অতিবাহিত হোল। কিছুতে নুট স্থির করতে পারলো না সে কি করবে। এমনি ভাবে দিনের পর দিন যেতে লাগলো। অবশেষে নুট আর থাকতে পারলো না। অহরহ তার মনে হোতে লাগলো কলেজে তাকে যেতে হবে। বাগ্‌দেবীর মন্দির বিরাজমান রয়েছে ওই হার্ভার্ড, এল আর প্রিনসটনে। সেখানে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ অলিন্দে গ্রীস দেশীয় তরুণের দল দীপ্ত মুখশ্রী আর উজ্জ্বলকান্তি দেহে জ্যোতির্বিদগণ, নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রণয়নের আলোচনা করছে। তাদের ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ওরা যেন অপার্থিব। অলৌকিক সৌন্দর্যের ওরা একনিষ্ঠ উপাসক। নুটের কানে দিনরাত্রি ওই বাগ্‌দেবীর মন্দির হোতে আকুল করা আহ্বান এসে পৌঁছাতে লাগলো, ওরে যাত্রা কর তুই যে চিরকালীন জ্ঞানপিপাসু যাত্রী!

নুট একদিন সত্যি চিঠি লিখে আনালো কলেজের নিয়মাবলী আর পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পরীক্ষার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো। একদিন যেমন সে মাঠে আঠারো ঘণ্টা করে লাঙল টেনেছিল, সেই ভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করে প্রত্যহ বারো ঘণ্টা ধরে পড়াশুনা করে সে আয়ত্তে আনলো লাতিন ভাষার অদ্ভূত ক্রিয়াপ্রকরণকে, বীজগণিতের জটিল সংখ্যামীমাংসাকে। এমন কি যতোটা সম্ভব জার্মান ভাষা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শিখে নিলো সে। পয়তাল্লিশ বছর আগে শিক্ষকতা করে যে অভিজ্ঞতা তার সঞ্চয় হোয়েছিল সেই অভিজ্ঞতা আজ কাজে লাগিয়ে সে নিজেকে আগিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করলো। তার আরো মনে হোল কলেজে অধ্যাপকদের কাছ হোতে যে সহানুভূতি সে পাবে, তাতে অনায়াসে কলেজের পাঠ শেষ করে সে ফিরে আসতে পারবে।

এক বছর এই ভাবে গেল। দ্বিতীয় বছরে শরৎকালে একদিন আকাশের দিকে চেয়ে তার এই প্রত্যহের পড়াশোনা আর ভালো লাগলো না। মনে হোল, কলেজে গিয়ে কি হবে?

একটা দ্বিধা এমন করে ধীরে ধীরে মাথা তুলছিল। সে দ্বিধার কিন্তু অবসান ঘটলো। জোরেলমনে যাবার পথে সেদিন সে বেড়াচ্ছে এমন সময়ে ছোকরা মুদী এসে হঠাৎ জিগ্যেস করলো, কবে কলেজ যাচ্ছেন?

এই প্রশ্নে নুটের সমস্ত দেহ যেন ক্রোধ-বহ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হোয়ে উঠলো। তার ক্ষেতের কাজে ফাঁকি দিলে সে থাবার মতো প্রকাণ্ড দু-হাত দিয়ে যেমন মজুরের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনী দিতো, তার মনে হোল ওই ছোকরা মুদীর ঘাড় ধরে আজ তেমনি নেড়ে দেয়, ভেংগে দেয় কণ্ঠার হাড়। খোস-গল্পের তথ্য সংগ্রহের জায়গা সে আর পায় নি? রাগে ফুলতে ফুলতে সাত মাইল পথ হনহনিয়ে হেঁটে সে তার ঘরে ফিরে এলো। তারপর রাজকুমারীকে কাঁধে নিয়ে আবার সে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যার আকাশে তখন অস্তমিত সূর্যের রক্তাভ আলোর প্লাবন এসেছে। স্তব্ধ হোয়ে নুট সেই উদ্ভাসিত আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সামনের শরবন বাতাসে দুলছিল। যেন তার তরঙ্গিত সবুজ মাথা এক সময় ঐ আকাশ স্পর্শ করে হবে একটা অপূর্ব রাজ্য। অকস্মাৎ সেই শরবনের দিকে এগিয়ে এলো নুট। তারপর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো, আমি কলেজে ভর্তি হবো। আগামী সপ্তাহে কলেজ খুলছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মনে হোচ্ছে উত্তীর্ণ হোতে পারবো।.........

দুদিন পরে সমস্ত জিনিসপত্রের সংগে 'রাজকুমারী'কে মেয়ে জামায়ের বাড়ীতে রেখে সে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করলো। পরনে তার কালো রংয়ের সার্ট একটা নতুন টুপি আর সেলুলয়েডের কলার। কম্পিত, সংশয়বিজড়িত হৃদয়ে সে সমস্ত পথ অতিক্রম করে একদিন নিউইর্য়ককে পৌঁছালো। 'এল' বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরীক্ষা দিলো এবং কোনোরূপে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণও হোল। হোস্টেলে থাকবার ঘর সে পেলো, আর পেলো একজন সংগী, নাম তার রে গ্রিফিল। রে গ্রিফিলকে নুট আত্মীয় বলে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করলে কি হবে, রে তার বিরুদ্ধে গেল, যখন সে অবগত হোল যে জীবনে কোনো উন্নতি করবার জন্যে নুট কলেজে আসে নি, এসেছে সাহিত্যচর্চার জন্য। কলেজে ভর্তি হওয়ার পূর্বে রে ছিল শিক্ষক। শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য এবং হৃদয়-হীনতা সহকারে রে নুটকে প্রথম পরিচয়ের পর বললো, আপনার বয়স তো হোয়েছে প্রচুর। কাব্য চর্চা করে তো কোনো লাভ হবে না। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে আপনার বাইবেল, লাতিন ভাষা আর গণিত নিয়ে আলোচনা করাই সুষ্ঠু আর সদ্বিবেচনার কাজ হবে।

প্রচণ্ড আঘাত পেলো নুট রে'র কথায়। তবুও আশাবাদী মন ভাণ করলো কোনোরূপে বিচলিত সে একথায় হয় নি। এখানকার জীবনযাত্রার প্রণালীর সংগে সে নিজেকে পরিচিত করতে উৎসুক হোয়ে উঠলো। কিন্তু তার এই আগ্রহ প্রতিপদে অশোভন বলে প্রতিভাত হোয়ে গেল। ক্লাসে লাবণ্য-দীপ্ত তরুণ মুখমণ্ডলের মধ্যে তার সাদা দাড়ি আর রেখাসংকুল মুখ হাস্যকর বলে যেন সর্বাপেক্ষা চোখে পড়তে লাগলো। মনে হোল নুট যেন তার ছেলেদের মধ্যে পিতার

আসনে বসে আছে। সহপাঠী সে কোনোক্রমে নয়।

কলেজ সম্বন্ধে তার যে ধারণা ছিল তা যে ভুল, সে কথার প্রমাণ নটে ধীরে ধীরে পেলো। সে দেখলো যারা ভালো ফুটবল খেলে, টাকা খরচ করে স্ফূর্তি করে বেড়ায়, লোকে তাদের বেশী পছন্দ করে। যারা শ্রমশীল, জ্ঞানপিপাসু তাদের সম্বন্ধে আগ্রহ লোকের নেই বললেই হয়। শুধু তাই নয় যা এরা আন্তরিকতার সংগে গ্রহণ করতে অক্ষম, অম্লানমুখে তাই এরা স্বীকার করে প্রিয় বলে এবং এজন্য কোনো লজ্জা তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। এদের দেখে নটের মনে পড়লো পুরোনো দিনের কথা, অতীতের ছায়াস্পন্দন একটা ছবি : তার ক্ষেতে যখন ফসল কাটার সময় আসতো তখন মজুরেরা ঠিক এমনভবে থাকতো, কথা বলতো আর এদের মতোন দিনযাপন করে চলে যেতো!

তারা একটা দিকের আলেখ্য উন্মোচিত হোল নটের কাছে। এই ছাত্রদল ভয়ানক ঘৃণা করে [illegible] এবং চিন্তানুরাগীদের। ধনীর ছেলে ছিল গিলবার্ট ওয়াসবার্ণ। সে ছিল এই দলছাড়া, নিজের খেয়ালে আত্মহারা তরুণ। তার ওপর এদের যে কি প্রচণ্ড বিদ্বেষ তার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হোয়ে গেল নটে। সংসারে নাকি উন্নতি করবার কোনো ইচ্ছা নেই গিলবার্টের। সুতরাং কলেজ পড়তে আসার এই সৌখিনতার জন্যে তাকে কি ক্ষমা করা যায়? এদের এই আলোচনা শুনতে শুনতে নটে নিজের সম্বন্ধে শঙ্কিত হোয়ে উঠলো। ভাবতে ভাবতে তার মনে হোল সে আদর্শহীন সৎপথচ্যুত লোক। কেন সে কলেজ এলো?

দিনগুলো এইভাবে গেল। সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হোল। কোনো সাথী পেলো না নটে। তার ক্লাসের সংগীরা তার থেকে দূরে রইলো। কেউ তার সংগে মিশলো না, পাছে লোকে বলে তারা বুড়োটে হোয়ে যাচ্ছে।

দেহে তার শক্তি এখনও অপরিমিত। সে স্থির করলো ব্যায়াম-বীরদের সংগে সে বন্ধুত্ব করবে। 'এলে'-এর খেলার মাঠে গিয়ে সে ফুটবল খেলোয়াড়দের সংগে আলাপের চেষ্টা দেখলো. তাদের নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলো। তারা সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বিরক্তি প্রকাশ করে কেউ কেউ প্রশ্নের উত্তর দিলো। শেষকালে সরল ভাষায় তারা জানালো নটের মস্তিষ্কে গোলমাল আছে।

যে উজ্জ্বল মহিমার অতুলন সৌন্দর্য নিয়ে প্রথম দিন তার মন রেখায়িত হোয়েছিল, সেই উজ্জ্বলতা ক্রমে ম্লানায়মান হোয়ে আসছিল। তার মনে সেই ধ্বংসোন্মুখ মহিমার স্থানে জাগরিত হোতে লাগলো যে হার্ভার্ডের সংগে এলের প্রাঙ্গণের এবং এলের প্রাঙ্গণের সংগে জোরেলমনের প্রান্তরের কোনো পার্থক্য অস্তিত্বহীন। বাগদেবীর সেই শুভ্র শ্বেত প্রস্তর বিনির্মিত মন্দির অতীত দিনের ন্যায় বিলীন হোয়ে গেছে, সেখানে উদ্ভূত হোয়েছে ইট আর পাথরের কতোকগুলো স্থাপত্য। আর সেই স্থাপত্যের স্তরে স্তরে আত্ম-অবিশ্বাসী, মর্যাদাশূন্য যুবকের দল জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হোতে নটের পলায়নের প্রচেষ্টাকে পরম কৌতুক বলে উপভোগ করছে।

আর একটা আঘাত এসে লাগলো। পারগানটুয়ানের কমনস্ হলে নটে তার খাওয়া শেষ করতো। সেই কমনস্ হল তাকে পরিত্যাগ করতে হোল। প্রতিদিন খাবার সময় তার দাড়ি নিয়ে দুজন যুবক সকল সময় আলোচনা করতো। প্রথম জন অ্যাটকিনসন লোককে জানালো মজা করতে, বুড়ো বয়সে কলেজে এসেছে নটে। লোকে পাছে মনে করে বয়স হয় নি, তাই সযত্নে দাড়ি রেখেছে নটে। দ্বিতীয় জনের কথা না বলাই ভালো। প্রতি কথায় খাওয়ার টেবিল হাসির কলরবে উচ্চকিত হোয়ে উঠতে লাগলো। দুটি ভদ্র যুবকের সম্মিলিত আক্রমণের আঘাত সহ্য করতে পারলো না

নুট। সে 'ব্ল্যাক ক্যাট'এ খাওয়ার বন্দোবস্ত করলো।

জীবন দুর্বহ হোয়ে উঠলো। কোনো বন্ধু নেই। কোথাও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। রাত্রির স্বপ্ন যেন নিশ্চিহ্ন হোয়ে গেছে দিনের আলোকের আঘাতে। যে আকর্ষণ তাকে এখানে এনেছিল, সেই আকর্ষণ কোথায় যেন অন্তর্হিত হোয়ে গেছে। নিজের সেই কুটীরের সম্মুখে আসন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়বার সময় যে আনন্দ তাকে উদ্বেলিত করে রাখতো, কোথায় সেই আনন্দলোক! এখানে পড়ার সময় মনে হয় সে যেন রোজ বেতনের মজুর সমস্ত দিন ধরে একটার পর একটা বই পড়ছে অমানুষিক পরিশ্রম করে। তার এই পরিশ্রম কোনোরূপ কঠোর বলে মনে হোত না যদি বিন্দুমাত্র উৎসাহ অথবা সহানুভূতি সে কোনো ব্যক্তির থেকে পেতো। কার কাছে সে আজ আর প্রত্যাশা রাখবে? তাকে পরিবেষ্টনকারী তরুণ দল ভাবছে কি করে বড়ো ব্যবসায়ী হবে লুটবে টাকা। কি করে হবে বড়ো ক্রীড়াবিদ—জগতে নাম ছড়িয়ে যাবে। আর ছাত্র ছাড়া আছেন শিক্ষকরা। তাঁরা কোনোরূপে অধ্যাপনা শেষ করে নম্বর দিয়ে কর্তব্য শেষ করে ফেলছেন।

বলাৎকারের সীমান্তে আহত, ক্লান্ত এবং আনন্দহীন সৈনিকের ন্যায় দিনগুলো যখন তার মন্থর গতিতে প্রবহমান সেই সময় অকস্মাৎ নুট খোঁজ পেলো এমন একজন তরুণের, তারুণ্যের দীপ্তিতে গরীয়ান।

নুট শুনলো কলেজের সবচাইতে জনপ্রিয় অধ্যাপক ব্রাউনিং পড়াবার ক্লাসে ছাত্রদের বলেছেন তারা যেন 'এ্যালিস-ইন-ওয়ানডারল্যাণ্ড' পড়ে। কথাটা নুটের মনে লাগলো। একটা পুরাতন পুস্তকের দোকান হোতে সেদিন দুপুরে একখানা 'এ্যালিস-ইন ওয়ানডারল্যাণ্ড' এনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ছে এমন সময় রে এসে ঘরে ঢুকলো।

নুটের হাতে বইখানার নাম দেখে সে ভ্রূ কোঁচকালো তারপর কাঁচের মতো সবুজ চোখ নুটের মুখের ওপর রেখে বললো, কি যে আজগুবি পড়ে আপনি সময় নষ্ট করেন? পড়ে যদি আনন্দ পেতে চান, বেশ তো পড়ুন না সেকস্‌পিয়ার পড়ুন না প্যারাডাইজ লস্ট্!

রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিশ্চল হোয়ে পড়ে রইলো নুট। তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল 'এ্যালিস-ইন-ওয়ানডারল্যাণ্ড'।

তারপর এক সময় সে বিছানা থেকে উঠলো। ইতিহাসের ক্লাসে গেল। ইতিহাসের অধ্যাপক হোচ্ছেন বেলভিনস্। ডিগ্রী তাঁর পি, এইচ, ডি।

বেলভিনস্ পড়ান ভালো। তারিখ আর সন নিয়ে সঠিক ঘটনার সময় খুঁজে বের করতে তার প্রয়াস অদম্য এবং আদর্শ-স্থানীয়। নুটের বড়ো ভালো লাগে এই তরুণ অধ্যাপকের অধ্যবসায়।

তন্ময় হোয়ে সে বেলভিনস্‌এর বক্তৃতা শুনতে শুনতে সহসা চমকিত হোল। তার পেছনে বসে কারা 'পোকার' খেলছে। চঞ্চল হোয়ে উঠলো নুট। একবার সে পেছন ফিরে চাইলো। তাকে চাইতে দেখে খেলোয়াড়রা হাসলো, কিন্তু অপ্রস্তুত হোল না, বা খেলা বন্ধ করলো না। বেলভিনসেরও নজর এপাশে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন একটা কিছু অনিয়ম ওখানে ঘটেছে। একটা ভ্রূকুটি করে তিনি পড়িয়ে চললেন, কোনো কথা জিগ্যেস করলেন না, বা কিছু বললেন না।

দুঃখে অকস্মাৎ নুটের সমস্ত বুক আলোড়িত হোয়ে উঠলো। তার মনে হোল বেলভিনস্ একটি ছোট ছেলে—অসহায় সে, অত্যাচারিত হোলেও তার পক্ষে অত্যাচারের প্রতীকার করা সম্ভবপর নয়।

বেলভিনসের ক্লাস শেষ হোল—ছেলেরা সব বেরিয়ে গেল। নুট বেলভিনসের সামনে এসে বললো, অধ্যাপক মশাই আজ যে কারণে আপনি বিরক্ত হোয়েছিলেন, যদি বলেন আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, আগামী দিন হোতে আর ওরকম কিছু ঘটবে না।

অধ্যাপক বেলভিনস্ নুটের মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন। তারপর শালীনভাবে অথচ কণ্ঠস্বরে সম্পূর্ণ উপেক্ষা পরিস্ফুট করে বললেন 'এ্যাকসেল রড, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আর দেখো, একটা কথা ছিল তোমাকে বলবার। আমার মনে হয় ক্লাসে যে কোনো প্রশ্নের তুমি বড়ো লম্বা লম্বা উত্তর দাও। আর সেই সময় তুমি হাসতে থাকো। যেন আমাকে উপহাস করবার জন্যে তোমার এই হাসি ঝকমক করে ওঠে। আমি জানি আমার চেহারা হাসবার মতো, কিন্তু সেজন্যে ক্লাসে তুমি হাসবে তাই কি উচিত?

—না, না, অধ্যাপক কি যে বলেন আপনি! —আর্তনাদ করে উঠলো নুট, আমি কি আপনাকে কখনো উপহাস করতে পারি? যদি আমি কখনো হেসে থাকি জানবেন বুড়ো বয়সে আমি কিছু শিখতে পারছি বলেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে হেসেছি।

—বেশ বেশ। তবে দেখো, হাসিটা বন্ধ রাখলেও শিক্ষা তোমার হবে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও করতে পারবে।—বেলভিনস্ চলে গেলেন।

নুট বসে রইলো সেই জনহীন ক্লাসে নিস্তব্ধ, পরিত্যক্ত অথবা নির্বাসিত হোয়ে, আবার মনে হোল, বয়েস তার হোয়েছে, বৃদ্ধ মুখের হাসির উচ্ছ্বাস পর্যন্ত চারিপাশে বিরাজিত পৃথিবীর কাছে অসহ্য। নুট বসে রইলো। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে গ্রীষ্মের শেষ আলো সেই ঘরকে প্রাণবন্ত করে অপরূপ রূপ দিলো। খেলার মাঠ হোতে ছেলেদের সতেজ গলার আনন্দ কোলাহল ভেসে এলো। এই অপরূপ আলো, ঐ আনন্দোচ্ছ্বাস আজ আর এই বৃদ্ধ শরৎসৌন্দর্যের পূজারীকে ভাবমুখর করাতে পারলো না। সে স্থির হোয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলো—সমস্ত দৃষ্টি যেন তার আবদ্ধ হোয়ে গেছে ঐ কালো বোর্ডে। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হোল। তারপর এক সময় সে জামার হাতা ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। তার মনের পটভূমিকায় তখন প্রস্ফুট হোয়েছে আর একখানি চিত্র। কুটীরের সামনে স্থাপিত রয়েছে তার চেয়ার, কোলে বসে আছে 'রাজকুমারী' এবং সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর প্রসারিত। এরা সকলে এই কুটীর, এই চেয়ার, রাজকুমারী আর প্রান্তর তাকে পরম আত্মীয় বলে জানে, নীরবে ভাবের বিনিময় করে দিনের পর দিন, রাত্রির অবসানে আগত পরবর্তী রাত্রিতে। এই কলেজের ওপর ওই অকারণ আনন্দোচ্ছ্বাসের ওপর, এদের গ্রহণ করার রীতির ওপর নিদারুণ বিতৃষ্ণায় সমস্ত অন্তর শুষ্ক, রুক্ষ, মরুভূমির মতো ক্ষমাহীন হোয়ে উঠলো। সে ভুলে গেল মাত্র একমাস আগে শত শত মাইল অতিক্রম করে সে এসেছে এইখানে।

এক সময় নুট উঠে দাঁড়ালো। ধীর-গতিতে সে অধ্যাপকের টেবিলের পাশে এসে থামলো, তারপর সেই নির্জন ক্লাসের দিকে চেয়ে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে বললো যদি যথা-সময়ে আসতে পারতাম তবে আমার আসন নির্ধারিত হোত এইখানে।

পথে বেরিয়ে এলো নুট। চারপাশ তখন স্বর্ণ-আলোকের তরঙ্গে কল্লোলিত হয়ে উঠেছিল। সেই আলোকের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তার সমস্ত বিরূপতা এক সময় অন্তর হোতে অপসারিত হোয়ে গেল। সে পূর্ব পাহাড়ের দিকে চলতে লাগলো। সেখানে পৌঁছে বুকভরে প্রশ্বাস নিলো। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হোল নিউ ইংল্যাণ্ডের কতো প্রিয় অন্তরঙ্গ কাহিনী এই বাতাস প্রশ্বাস হোয়ে বলে গেল। সামনে তার মনে হোল ওই অপূর্ব আলোকের অংগরাখায় আপনাকে আবৃত করে পাষাণও বুঝি সুন্দর হোয়ে উঠেছে। গাছের পাতার সরসরানিতে ঝঙ্কৃত হোচ্ছে সেই অশ্রুত গান যা সে চিরদিন শোনার আগ্রহে উন্মুখ হোয়ে আছে। আপনমনে সে সহসা বলে উঠলো, আঃ, আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম!

পাহাড়ের আর একটু ওপরে উঠে সে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লো। তারপর বিরক্তিতে সমস্ত অন্তর ভরে গেল। সামনে বসে রয়েছে গিলবার্ট ওয়াস্‌বার্ন!

সেই উজ্জ্বল আলোয় গিলবার্টকে ভারি সুন্দর বলে প্রতীয়মান হোল। ওকে দেখতে দেখতে নুটের মনের সমস্ত বিতর্ক নির্বাক হয়ে গেল। গিলবার্টের মুখখানি বড়ো করুণ আর বিষন্ন।

হঠাৎ তার চোখের সঙ্গে চোখ মিললো গিলবার্টের। গিলবার্ট উঠে দাঁড়ালো নুটের সেই দাড়িসমাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাইলো—পরমুহূর্তে এসে বসলো নুটের পাশে। স্মিত হাসিতে পাতলা দুটি ঠোঁট কাঁপিয়ে সে মৃদু কণ্ঠে বললো, বড়ো সুন্দর!

সেই হাসিতে অনুভূতিরা যেন ঊর্মি-মালার মতো দুলতে দুলতে এসে নুটের অন্তর সমুদ্রের সৈকতে শুভ্রফেনরাজি লিপ্ত করে গেল। এক মুহূর্তে সে উপলব্ধি করলো যার অনুসন্ধানে সে জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আজ এই কলেজে এসে উপনীত হোয়েছে তাকে বুঝি সে এবার লাভ করলো। স্পন্দিত হৃদয়ে সে বললো, হ্যাঁ, মনে হয় আর্কোপোলিশ বুঝি এমনি সুন্দর।

—শুনুন এ্যাকসেলরড, আমি আপনার কথা ভাবছিলাম।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। ক্লাসের সবচাইতে অবাঞ্ছনীয় লোক আমরা—আমাদেরই তো বন্ধুত্ব হওয়া উচিত। এ্যাট্‌কিনসন আর রে যখন জীবনে উন্নতি করার কথা ভাবে আপনি আর আমি তখন কাজ ফেলে পালাই এমন দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে। আমার তো মনে হোয়েছে আপনি আর আমি সমধর্মী।

—তুমি কি করে জানলে যে প্রকৃতির আহ্বানে আমি পলাতক হই?

—কেন, কমনস্‌এ বসে এ্যাটকিনসন যখন আপনার কলেজে আসা সম্বন্ধে আলোচনা করতো, আমি তখনি বুঝেছি আপনি কি? এখন দেখুন তো মুসাতের এই কাব্য আপনার কেমন লাগে?

গিলবার্ট পকেট থেকে যে পাতলা বই-খানি বের করলো, নুট দেখলো তার ভাষা তার অপরিচিত। তার থাবার মতো প্রকাণ্ড হাতে বইটা নিয়ে আঙ্গুলে বুলিয়ে গেল নুট। তারপর মৃদুকণ্ঠে আক্ষেপ জানালো, আমি তো এ ভাষা জানি না!

তার সেই নৈরাশ্যআকুল মুখের দিকে তাকিয়ে গিলবার্ট সহসা বললো, হার্টফোর্ডে আজ বাঁশী বেহালা বাজাবে, চলুন শুনে আসি। আমি সঙ্গী পাইনি, তা হোলে এতোক্ষণ চলে যেতাম!

বাঁশী যে কে সেকথা নুট জানতো না। তবুও সে উৎসাহিত হোয়ে উঠলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ হবে। চলো যাই।

হার্টফোর্ডে বাঁশীর বেহালা শোনার পর যে পয়সা বাঁচলো, তাতে বিকালের টিফিন

আর মেরিডান পার্ক পর্যন্ত বাসে আসায় খরচ কুলালো। মেরিডানে এসে গিলবার্ট বললো, চলুন নিউ-হেভেন পর্যন্ত আমরা হেঁটে যাই।

তার হোস্টেল হোতে নিউ-হেভেন কতো দূরে চার মাইল কি চল্লিশ মাইল সেকথা নুটের অজ্ঞাত। তার শরীরের পক্ষে এই অনিয়ম ক্ষতিকর। কিন্তু আজ উৎসাহের সীমা নেই। নুট বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ চলো, তাই যাবো।

পথ বেয়ে তারা চললো। অক্টোবরের চাঁদ নীল আকাশকে সোনালী করে এনেছে। অজস্র কথা বলে চলেছিল গিলবার্ট। তার পাশে পাশে নীরব শ্রোতা হোয়ে পথ হাঁটছিল নুট। বাঁশীর বেহালার মূর্চ্ছনা তখনও তার কান ভরে রয়েছে—কল্পনার পাশে লাগিয়েছে দূর ইতিহাসের হাওয়া। খুলে গেছে সেই স্বপ্ন রাজ্যের সিংহদ্বার যেখানে পৌরাণিক যুগের যোদ্ধৃদল দীর্ঘ উন্মুক্ত তরবারি হাতে বিচরণ করছে সুন্দরীদের কৃষ্ণপক্ষ্মভারাতুর নয়ন হোতে অশ্রুধারা মোচন করতে, আশ্রয় দিতে দুর্গতকে, বিনাশ করতে অধর্মের অত্যাচার।

পাশের মাঠ হোতে পাকা গমের গন্ধ উঠছিল আর নুটের মনে উদয় হোচ্ছিল সেদিনের কথা, যেদিন এই প্রান্তরে প্রথম চাষের লাঙল টানা হোয়েছিল।

হোস্টেলে তারা পৌঁছলো সন্ধ্যা পাঁচটায়। গিলবার্টের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেল নুট, বললো, শুতে চললাম। আজ স্বপ্ন দিয়ে আমার ঘুমকে সুন্দর করে নেবো।

—না, না কোথায় যাবেন আপনি? আমাদের যাত্রা কি এরি মধ্যে শেষ হোতে পারে। এখন তো সবে সন্ধ্যা। অপেক্ষা করুন আমি কিছু পয়সা নিয়ে আসি, খাবার কিনতে হবে।

কিছুক্ষণ কেন, সারারাত্রি অপেক্ষা করতে রাজি ছিল নুট। প্রায় সত্তর বছর সে বেঁচেছে, পনের শত মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছে, রে গ্রিবলিকে সহ্য করেছে গিলবার্টের দেখা পাবে বলেই না?

গিলবার্টের ঘরে এসে একটা পরম তৃপ্তিতে নুটের বুক ভরে গেল। পারস্য দেশীয় গালচে, রূপার চায়ের বাসন, নানা রকমের ছবি আর বইতে ঘরখানি মনোরম এবং শোভনীয়। একটা ইজিচেয়ারে বসতে বসতে মনে পড়লো তার সেই টিলার ওপরের কুটিরের কথা।

খাওয়া শেষ হোয়ে গেল। গিলবার্ট স্টিভিনসন আর আনাতোল ফ্রাঁস থেকে অনেকখানি আবৃত্তি শোনালো নাটকের অবশেষে সে পড়তে আরম্ভ করলো স্বরচিত কাব্য। ভালো কি মন্দ একথার কোনো তর্ক উঠলো না নুটের মনে। সে শুধু হৃদয়ঙ্গম করলো সফল হোয়েছে তার স্বপ্ন, সে একজন সত্যকার কবির দেখা পেয়েছে।

রাত্রি গভীর হোতে গভীরতম হোল। ঘুমে জড়িয়ে এলো চোখের পাতা। ওরা ঘুমোতে গেল। শয্যায় দেহ এলায়িত করার সময় নুটের মনে হোল বেশি না, সামান্যক্ষণ পরেই সে প্রত্যাবর্তন করবে গিলবার্টের ঘরে—তারপর আবার শুরু হবে তাদের সেই অনিবচনীয় সুন্দর রাত্রি মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরে উপভোগ করা।

দিনের আলো এসে পড়েছে শয্যার ওপর এমন সময় নুটের ঘুম ভাঙলো। ব্যস্ত হোয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হাতে নিয়ে মুসাতের সেই বইখানা। আর কোনো ব্যবধান নেই, নুট মনে মনে বললো, এখন আমরা বন্ধু, ওর ঘরে আমার অবাধগতি!

সিঁড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে সহসা সচকিত হোয়ে উঠলো নুট। মনে হোল তার বড়ো ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত সে। থমকে সে দাঁড়ালো তারপর রাত্রির বিগত ইতিহাস মনে উদয় হওয়াতে সে বুঝলো কেন এতো অবসন্ন তার দেহ।

ধীর শ্লথগতিতে ঘরে সে ফিরে এলো। মনে হোল গত রাত্রিটা বাস্তবে নামে নি, ওটা তার নিদ্রিতাবস্থার একটা স্বপ্নদর্শনের ভগ্নাংশ মাত্র।

পড়ার টেবিলে বসে কলম তুলে নিল নুট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্যাডের আলগা পাতাখানা কাঁপলো, মন বললো, না, তা হয় না। বার্ধক্য আর তারুণ্য কি পাশাপাশি অবিচ্ছেদ্য এবং শালীন হোয়ে চলতে পারে? না, গিলবার্টের কাছে আর যাবো না। এবার সে হয়তো আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। আর তা ছাড়া আমার তো আর বলার কিছু নেই। গত রাত্রিতে সব কিছু উজাড় করে দিয়েছি। কলেজে এসেছিলাম এই একটা রাত্রির জন্যে। আমার কল্পনা বাস্তবের মাটিতে প্রাণময়ী এবং রূপায়িতা হোয়েছে। আর কেন? এই রাত্রি আমার জীবনে স্মৃতির স্বর্ণসৌধ হোয়ে উজ্জ্বল আর অক্ষয় হোয়ে থাক।

সুপ্ত রে গ্রিবলিকে সে জাগালো না। গিলবার্টের জন্যে একটা লিপি লিখে রাখলো, তারপর গুছিয়ে নিলো তার সমস্ত জিনিসপত্র।

অক্টোবরের সন্ধ্যা আকাশে সোনার চাঁদ আর মাঠে পাকা সোনালী গমের গন্ধ ছড়িয়ে ধরিত্রীর বুকে নামছিল। সন্ধ্যার সেই শান্ত পটভূমিকায় পশ্চিমের একখানা ট্রেন অতি দ্রুতগতিতে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে ধাবমান। একজন বৃদ্ধ সেই ট্রেনের কামরায় বসে বাইরের দিকে চেয়েছিল। মুখ তার স্মিতহাস্যে প্রসন্ন, চোখে তার পরম তৃপ্তির উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত, হাতে তার ফরাসী ভাষায় রচিত একখানি ছোট বই।

কলেজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে নুট এ্যাকসেলব্রড।

অনুবাদক—**সমীর ঘোষ।**

স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

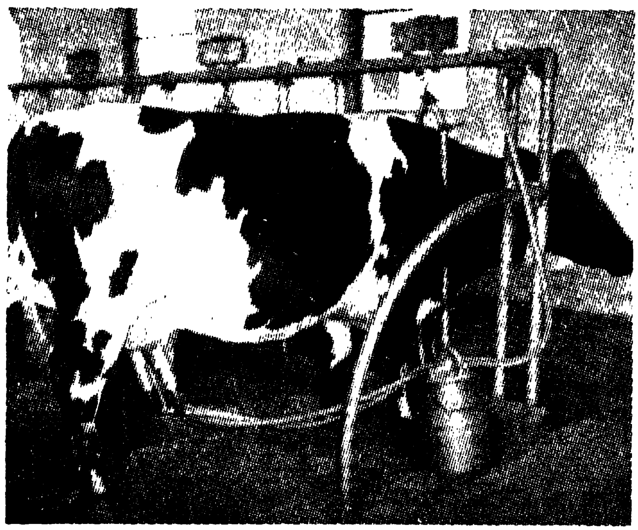
পাস্তুরাইজেসন্

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

জনস্বাস্থ্যের অনুকূলে কার্যকরী যে কয়েকটি বিশিষ্ট জিনিস বিজ্ঞানের দান হিসাবে আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে 'পাস্তুরাইজেসন্' একটি বিশেষ দান। এই 'পাস্তুরাইজেসন্' জিনিসটি যে কি তা বোঝাতে গেলে এর এই নামকরণের পেছনে যে ইতিহাস আছে আগেই তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ মহামতি লুই পাস্তুরের নাম জানে না এমন লোক আজকাল নেই বললেও চলে। বহুবিধ আবিষ্কার,—বিশেষ ক'রে জলাতঙ্ক (hydrophobia) রোগের প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কারের জন্য তাঁর নাম আজ বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে ও থাকবে। তাঁর বহুবিধ গবেষণার বিষয় ছিল—দুধ টকে যায় কেন? এই নিয়ে গবেষণাকালে তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে টকে যাওয়া দুধ পরীক্ষা করতে করতে দেখতে পান যে টকে-যাওয়া দুধের প্রত্যেকটি নমুনাতেই এক রকম অতি সূক্ষ্ম কীটাণুসদৃশ জীব (জীবাণু) আছে,—যা টাটকা দুধে,—অর্থাৎ টকে না-যাওয়া দুধে হয় পাওয়াই যায় না, আর নয় তো যা পাওয়া যায় তা সংখ্যায় এতো কম যার জন্য দুধের কোন বিকৃতিই হয় না। সেই দুধ অনেকক্ষণ রাখলেই তবে তার বিকৃতি হয় এবং তখনই তাতে অসংখ্য পরিমাণে জীবাণু দেখা যায়। এতে তিনি প্রমাণ করলেন যে, দুধ টকে-যাওয়ার মূলে আছে এই সব জীবাণু। এই আবিষ্কারের পরেই তাঁর মাথায় চিন্তা ঢুকলো যে কি উপায়ে দুধ টকে-যাওয়া নিবারণ করা যায়। সেই চিন্তারই ফলস্বরূপ তিনি আবিষ্কার করলেন যে এই সব জীবাণু বেশী উত্তাপ সহ্য করতে পারে না এবং দুধকে যদি কিছুক্ষণ সময়ের জন্য বিশেষ মাত্রার উত্তাপে উত্তপ্ত করা যায়, তবে তা জীবাণু শূন্য হয়ে যায়। তার এই শেষোক্ত আবিষ্কারের জন্য তাঁকে সম্মানিত করবার জন্য এবং এর সঙ্গে তাঁর নাম অচ্ছেদ্য করে রাখবার উদ্দেশ্যেই 'পাস্তুর' নামের সঙ্গে জড়িয়ে 'পাস্তুরাইজেসন্' কথাটির প্রচলন হয়।

তাঁর এই শেষোক্ত আবিষ্কারের জনস্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর গুণাবলীর কথা উপলব্ধি করে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই পাস্তুরাইজ করা দুধের প্রচলন হয়েছে, ফলে সাধারণ দুধের মারফত জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার পক্ষে যা কিছু বিপদের সম্ভাবনা ছিল তা সেই সব দেশ থেকে দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু এই ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আজও এই দুধের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হওয়া দূরে থাকুক, এ দেশের জনসাধারণের অধিকাংশেরই এই দুধ সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান বা ধারণাও নেই। এ দেশে যে সামান্য ক'জনের এ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আছে, তার কিছু এই 'পাস্তুরাইজ' করা দুধের নামটুকুর মধ্যে, আর বাকি কিছু এই দুধ খাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাও কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্যান্য অনুরূপ নগরীর অধিবাসীদের মধ্যেই। দুধ 'পাস্তুরাইজ' করার আবশ্যকতা কি, কি ভাবেই বা তা করা হয়, অথবা জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কতটুকু,—এ সম্বন্ধে কারোরই কোন ধারণা নেই, একমাত্র বিজ্ঞান জগতের অধিবাসী ও দুধ 'পাস্তুরাইজ' করা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ছাড়া।

দুধ 'পাস্তুরাইজ' করার সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের সম্বন্ধ কি লুই পাস্তুরের গবেষণা সম্পর্কে তার কিছুটা আভাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয় বলে এখানে বিশদ ভাবে তা বোঝানো হলো।



কল দিয়ে দুধ দোওয়ার পদ্ধতি।

দুধে যত বেশী সংখ্যায় এবং যত বেশী বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা এমন আর অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যেই নয়,—এমন কি টাটকা দোওয়া খাঁটি দুধও এই ব্যাপারে নিরাপদ নয়। দুধের এই সব জীবাণুর মধ্যে পচনকারী জীবাণু থেকে শুরু করে বহুপ্রকার রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণু পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জীবাণু দ্বারা দুধ পচে যায়—সাদা কথায় যাকে বলে টকে যায় বা কেটে যায়,—আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবাণু দ্বারা নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগ-সৃষ্টিকারী যেসব জীবাণু দুধে পাওয়া যায়, তার কতকগুলি গবাদি পশুর নিজস্ব কয়েকটি রোগের, যেগুলি মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়ে অনুরূপ রোগের সৃষ্টি করে,—আর কতকগুলি হলো মানুষের নিজের রোগের যেগুলি দুধের মারফতই মানুষের মধ্যে পুনঃ বিস্তারিত হয়।

গবাদি পশুর যে কয়েকটি রোগ মানুষে সংক্রামিত হয়ে অনুরূপ রোগের সৃষ্টি করতে পারে তার মধ্যে যক্ষ্মা (Tuberculosis), খুরাই বা এঁসো (Foot and mouth disease), দড়কা (Anthrax), গোবসন্ত (Cowpox) প্রভৃতি রোগগুলি

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কয়েকটি ছাড়াও গবাদি পশুর আরো কয়েকটি রোগের জীবাণু দুধে পাওয়া যায় যেগুলি মানুষে সংক্রামিত হয়ে অনুরূপ রোগের সৃষ্টি না করলেও অন্য রূপ রোগের সৃষ্টি করে।

মানুষের নিজস্ব যেসব রোগের জীবাণু সচরাচর ক্ষেত্রে দুধে পাওয়া যায় তার মধ্যে টাইফয়েড, প্যারা টাইফয়েড, কলেরা বা ওলাউঠা, আমাশয়, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগ গুলিই প্রধান। এই সব রোগের জীবাণু ছাড়াও আরো কতকগুলি রোগের জীবাণু দুধে পাওয়া যায় যার কতকগুলি মানুষের আরো কয়েকটি নিজস্ব রোগের, আর কতক-গলি মানুষ ও গবাদি পশু, এই উভয়বিধ জীবের মধ্যে কয়েক প্রকারের রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

দুধ কি উপায়ে জীবাণুদুষ্ট হতে পারে তা বলতে গেলে একটা আলাদা প্রবন্ধই লিখতে হয়,—তাই এখানে সংক্ষেপে তার মোটামুটি আলোচনা করা হলো। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে—এক কথায় সর্বত্র এবং সব জিনিসেই জীবাণু আছে। বাতাসের সঙ্গে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমানভাবে নিয়তই ধুলো উড়ে বেড়াচ্ছে এবং ঐ বাতাসের দ্বারা বাহিত হয়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ধুলাই অধিকাংশ জীবাণুরই বাহকের কাজ করে এবং এই ধুলার সঙ্গেই জীবাণুও সবত্র ছড়িয়ে পড়ে। যদি গরুর দেহ অপরিষ্কার থাকে, যদি গোয়ালঘর ধুলা ও আবর্জনাপূর্ণ হয়, যদি দুধ দুইবার বা রাখবার পাত্র অপরিষ্কার হয়, যদি দোহকের বা অন্য যারা দুধ ঘাঁটে তাদের হাত অপরিষ্কার হয় বা তারা নোংরা কাপড় প'রে থাকে, তবে এই সব থেকে ধুলার সঙ্গে জীবাণু পড়ে দুধ দূষিত করে তুলতে পারে।

গবাদি পশুর যেসব পীড়া মানুষে সংক্রামিত হয়, সেই সব রোগে আক্রান্ত গরুর দুধ সরাসরি ভাবে জীবাণুদুষ্ট হতে পারে, অথবা এই জীবাণুদুষ্ট সুস্থ গরুর দুধের সঙ্গে মিশে তাও দূষিত করতে পারে। গোয়ালাদের নিজেদের অসাবধানতা বা অজ্ঞতার জন্য, অথবা দুধ কেনবার আগে পরীক্ষা করার নামে ক্রেতাদের অপরিষ্কার হাত দিয়ে অনাবশ্যক ভাবে দুধ ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য মানুষের নিজস্ব রোগগুলির জীবাণু দুধে মিশে তা বিষাক্ত করতে পারে।

মাছি বহুবিধ রোগোৎপাদক জীবাণুর বাহক। মুখখোলা পাত্রে করে দুধ রেখে দিলে ধুলার সঙ্গে তাতে জীবাণু তো পড়েই, তার ওপরে তাতে মাছি বসে তা পুনরায় জীবাণুদূষিত করে। তেমনি দুধ দুইবার বা রাখবার পাত্র ব্যবহারান্তে ধুয়ে মেজে না রাখলে দুধের অবশিষ্টাংশে খাবার লোভে তাতে মাছি বসে,—পরে সেই পাত্র ধুয়ে বা মেজে না নিয়ে তাতে টাটকা দুধ রাখলে তাও জীবাণুদুষ্ট হতে পারে।



পাশ্চাত্য দেশসমূহে কল দিয়ে দুধ দোওয়া হয়, কিন্তু তার আগে গাভীর পাছান ও তার আশ-পাশ পরিষ্কার ভিজে ঝাড়ন দিয়ে মুছে দেওয়া হয়। সামনে দুধ দোওয়া কল দেখা যাচ্ছে।

বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য বিশেষ শ্রেণীর আশ্রয় বা আধারের প্রয়োজন। মানুষের কয়েকটি রোগের জীবাণু অপরিষ্কার অর্থাৎ ময়লা জলের আশ্রয়ে বৃদ্ধি লাভ করে এবং তারই মারফত মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। দুধের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে যদি তাতে এই জল মেশানো হয়, তবে দুধ আরো কয়েক প্রকারের জীবাণু দ্বারা দূষিত হতে পারে।

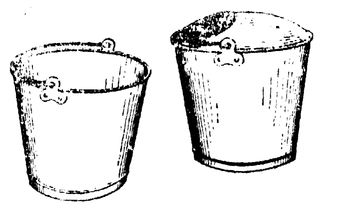
মফঃস্বলের গোয়ালাদের মধ্যে দুধে ভেজাল মেশানোর দুষ্প্রবৃত্তি বড় একটা হতে দেখা যায় না। যত গোলমাল সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বড় বড় সহর ও নগরীতে। সেই সব স্থানে দুধ সরবরাহ ব্যাপার নিয়ে বর্তমানে যা কাণ্ড চলছে, তার উল্লেখও ন্যক্কারজনক। একটা উদাহরণ হিসাবে কলিকাতার কথাই বলা হলো। যুদ্ধ পরি-স্থিতির জন্যই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক বর্তমানে কলিকাতার লোক সংখ্যা যুদ্ধপূর্বকালের দ্বিগুণ বা তারও বেশী হয়েছে, অথচ সেখানে যুদ্ধপূর্বকালের লোক সংখ্যা অনুপাতে দুধের যে পরিমাণ ছিল, বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্যই নানা কারণে এখন তা নেই,—অর্থাৎ বর্তমান লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি না হয়ে বরঞ্চ যুদ্ধপূর্ব-কালের পরিমাণ থেকেও তা কমে গেছে; ফলে সেখানে দুধের দুর্ভিক্ষ হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুধের অত্যধিক চাহিদার এই সুযোগ নিয়ে সেখানকার গোয়ালারা এই অল্প পরিমাণ দুধটুকুকেই অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে আজ বাড়ী বাড়ী দুধের যোগান দিচ্ছে। দুধের পরিমাণ বাড়াতে তারা দুধে যা মেশাচ্ছে তা শুনলে অনেকে হয়তো দুধ খাওয়াই ছেড়ে দেবেন, —তবু জনস্বাস্থ্যের কল্যাণে তা বলার দরকার এবং তা না বললে এই প্রবন্ধ লেখার কোন মানেই থাকে না। যাঁরা নিয়মিত ভাবে দৈনিক সংবাদপত্র পড়ে থাকেন, তাঁরা এই ব্যাপারের কিছুটা হয়তো জানতে পেরেছেন। যাঁরা তা পারেননি তাঁদের অবগতির জন্য কিছুদিন আগে (১৯শে মে, ১৯৪৫) 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তে প্রকাশিত একটি বিশেষ সংবাদের ভাবার্থ এখানে উল্লিখিত হলোঃ—

বঙ্গদেশীয় সরকার বাহাদুর কিছুদিন আগে কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বারা সহরের বিভিন্ন স্থান হতে

সংগৃহীত ২২৪টি বিভিন্ন দুধের নমুনা পরীক্ষা করিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে ১৫১টি দুধ ভেজাল বলে পরীক্ষাতে ধরা পড়েছিল। এই ভেজাল দুধগুলির মধ্যে আবার কতকগুলিতে ভেজালের পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৬ ভাগেরও বেশী—অর্থাৎ সেই গুলিতে দুধের পরিমাণ ছিল ১৪ ভাগেরও কম। তারপর এই ১৫১টি ভেজাল দুধের সব ক'টিতে ময়লা জল মেশানো হয়েছিল, যার জন্য সবগুলিতেই কয়েক প্রকারের রোগোৎপাদক জীবাণু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যারা জলের দ্বারা বাহিত হয়েই রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মাছির দ্বারা বা ধূলার সঙ্গে মিশে বাতাসের দ্বারা বাহিত হয়ে জীবাণু যদি সবপ্রকারের খাদ্য দ্রব্যেই পড়ে তা দূষিত করতে পারে তবে বিশেষ ভাবে দুধেই এই সব জীবাণুর অস্তিত্বের জন্য এত চিন্তাই বা কেন? জীবাণু হলো—অণুসদৃশ, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র জীববিশেষ, তাই প্রাণধারণের জন্য এবং বিশেষ করে বংশ বৃদ্ধির জন্য এদেরও খাদ্য চাই। যে জিনিসে যত বেশী পরিমাণে তাদের পক্ষে উপযোগী খাদ্য থাকে, সেই জিনিসে তত বেশী সংখ্যায় এবং সেই অনুপাতে তত তাড়াতাড়ি তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। যে জিনিসে তাদের পক্ষে উপযোগী কোন খাদ্য থাকে না সেই জিনিসে তারা বংশ বিস্তার করতে তো পারেই না, উপরন্তু নিজেরাই তাতে জীবন্মৃত হয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে অথবা শেষ পর্যন্ত হয়তো মরেই যায়। তারপর খাদ্য থাকলেও যে কোন জিনিসে তাদের বংশ বৃদ্ধি ততক্ষণই চলতে থাকে যতক্ষণ না সেই খাদ্যের অভাব ঘটে। খাদ্যের অভাব ঘটলেই তাদের ক্রমবংশবৃদ্ধির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কোন জীবের দেহে রোগসৃষ্টি করার মূলে এদের ক্ষিপ্র বংশ বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন, কেননা প্রত্যেক জীবদেহে জীবাণু বা অনুরূপ শত্রু ধ্বংসকারী প্রকৃতিগত যেসব কলা-কৌশল আছে, জীবাণুর সংখ্যা খুব বেশী না হলে তারা জীবদেহের এই সব কলা-কৌশলকে সহজে বিকল করতে পারে না—অর্থাৎ জীবাণুর সংখ্যাল্পতা হলে দেহরক্ষী এই সব কলা-কৌশল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবাণুদের ধ্বংস করে ফেলে, ফলে জীবদেহে সেই সব জীবাণুজনিত রোগ হতে পারে না। বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও জীবাণু জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই যে ব্যতিক্রম এটা হতে দেখা যায় সেই সব জীবদেহেই যা পূর্ব হতে নানা কারণে দুর্বল, অর্থাৎ যাদের এই দেহরক্ষী কলা-কৌশল আগে থেকেই নিস্তেজ। জীবাণুর পক্ষে অনুকূল যেসব খাদ্য বা পানীয় মানুষে সাধারণত গ্রহণ করে তার মধ্যে দুধই প্রধান, কারণ জীবাণুর বংশ বিস্তারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে বিশেষ খাদ্য তাদের দরকার তা এই দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং সেই জন্যই এই দুধে তাদের বংশ বৃদ্ধি খুব ক্ষিপ্রভাবেই ঘটে। অপরিণত বয়সের জন্য শিশুর এবং রোগের জন্য রোগীর দেহরক্ষী কলা-কৌশল স্বতঃই নিস্তেজ থাকে অথচ তাদের পক্ষে বলতে গেলে এই দুধই একমাত্র খাদ্য ও পথ্য। এই সব বিবেচনা করে দেখলে বিশেষ করে দুধেই জীবাণুর অস্তিত্বের জন্য এত চিন্তা কেন তা বোঝা যাবে।

পর্যাপ্ত খাদ্য ছাড়াও জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির পক্ষে উষ্ণতাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

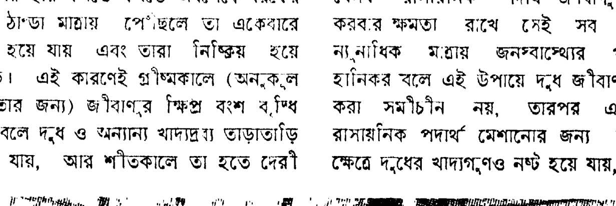


হাত দিয়ে দুধ দোওয়ার জন্য দু'রকম বালতি। ডান দিকের অল্প মুখ খোলা বালতিটিই প্রশস্ত, কারণ এতে ধূলো বা অন্য কিছু পড়বার সম্ভাবনা কম।

জীবাণুর শ্রেণীভেদে এই উষ্ণতার মাত্রার তারতম্য হয়। যে শ্রেণীর জীবাণুর যে মাত্রায় উষ্ণতার প্রয়োজন তার ব্যতিক্রম হলে খাদ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাদের বংশ বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়,—অর্থাৎ কোন এক শ্রেণীর জীবাণুর পক্ষে অনুকূল যে মাত্রায় উষ্ণতার প্রয়োজন তা পেলে যে হারে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, তার মাত্রাল্পতা অনুপাতে তাদের বৃদ্ধির হার কমতে কমতে অবশেষে বরফের মত ঠাণ্ডা মাত্রায় পৌঁছলে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই কারণেই গ্রীষ্মকালে (অনুকূল উষ্ণতার জন্য) জীবাণুর ক্ষিপ্র বংশ বৃদ্ধি হয় বলে দুধ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি পচে যায়, আর শীতকালে তা হতে দেরী হয়। ঠাণ্ডার এই পচন নিরোধক বিশেষ গুণের সুযোগ নিয়ে আজ বিজ্ঞান জগৎ 'রেফ্রিজারেটার', 'কোল্ড স্টোরেজ' প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আবিষ্কার করেছে যাতে খাদ্যদ্রব্য বা পচনশীল অন্যান্য দ্রব্য রাখলে তা বহুদিন ধরে অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং আজ এই আবিষ্কার দৌলতেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে বহু প্রকারের খাদ্যদ্রব্য জাহাজযোগে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে, সেটা কয়েক বছর আগেও সম্ভবপর ছিলনা।

দুধ ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখলে তাতে যেসব জীবাণু থাকে তারা বংশ বিস্তার করতে পারে না, বরঞ্চ ঠাণ্ডার চোটে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সেই দুধ খেলে রোগ সহজে না হলেও পূর্বে উল্লিখিত বিশেষ ক্ষেত্রে তা হবার সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ যাদের দেহরক্ষী কলা-কৌশল নিস্তেজ তাদের দেহে দুধের এই সব জীবাণু, সংখ্যাল্পতা ও নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এখন কার দেহে দেহরক্ষী এই সব কলা-কৌশল নিস্তেজ বা দুর্বল, আর কার দেহে তা সবল বা প্রবল তা আমরা যখন কেউই বলতে পারি না, তখন এই সব জীবাণু দ্বারাও রোগ হবার এই সম্ভাবনাটুকুও দূর করাই উচিত। তা করতে গেলে দুধকে সম্পূর্ণ ভাবে জীবাণুশূন্য করতে হবে।

দুটি সহজ উপায়ে দুধকে জীবাণুশূন্য করা যেতে পারে,—প্রথমটি হলো দুধে জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ অষুধ মিশিয়ে, আর দ্বিতীয়টি হলো খুব বেশী মাত্রার উত্তাপে দুধ জ্বাল দিয়ে। কিন্তু নানা দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে এ দুটি ব্যবস্থার একটিও গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু ধ্বংস করবার ক্ষমতা রাখে সেই সব পদার্থ ন্যূনাধিক মাত্রায় জনস্বাস্থ্যের পক্ষেও হানিকর বলে এই উপায়ে দুধ জীবাণুশূন্য করা সমীচীন নয়, তারপর এই সব রাসায়নিক পদার্থ মেশানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দুধের খাদ্যগুণও নষ্ট হয়ে যায়, তখন



আধুনিকতম সাজসরঞ্জামে সজ্জিত দুধ ও ননী পাস্তুরাইজ করবার ঘর।

সেই দুধ খাওয়া আর না খাওয়া একই কথা দাঁড়ায়। তারপর দুধ জ্বাল দেবার কথা। আমরা বাড়ীতে সাধারণত যে উত্তাপে ও যেটুকু সময়ের জন্য দুধ জ্বাল দিই তাতেই অধিকাংশ জীবাণু, বিশেষ করে রোগোৎপাদক জীবাণু নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে হয় না এবং সেই কারণেই জ্বাল দেওয়া দুধ বেশীক্ষণ সময়ের জন্য রেখে দিলে টকে যায় বা পচে যায়। জ্বাল দিয়ে দুধকে সম্পূর্ণ ভাবে জীবাণুশূন্য করতে গেলে যে মাত্রার উত্তাপ প্রয়োজন তাতে দুধের খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেই দুধের কোন স্বাদ থাকে না, এমন কি তাতে পোড়া-দুধের গন্ধ বেরোয়। এই দুধ রুচিকর তো নয়ই, এতে পুষ্টিকর গুণেরও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুধকে মানুষের ব্যবহারের পক্ষে নিরাপদ করতে গেলে এমন কিছু করতে হবে যাতে দুধের খাদ্যগুণ একেবারে নষ্ট হয়ে না যায় এবং তাতে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী কোন রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়েও তা জীবাণু-শূন্য করা যায়। এটি একমাত্র 'পাস্তুরাইজেসন' দ্বারাই করা সম্ভব। দুধ 'পাস্তুরাইজ' করার প্রক্রিয়াটি আর কিছুই নয়, কেবল বিশেষ প্রথায় দুধকে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপে গরম করা। বর্তমান প্রথাটি লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত প্রথারই রকমফের, —তফাতের মধ্যে এই যে, বর্তমানে দুধ নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপে নির্দিষ্ট সময় উত্তপ্ত করার পরই খুবই তাড়াতাড়ি তা ঠাণ্ডা করে ফেলা হয়।

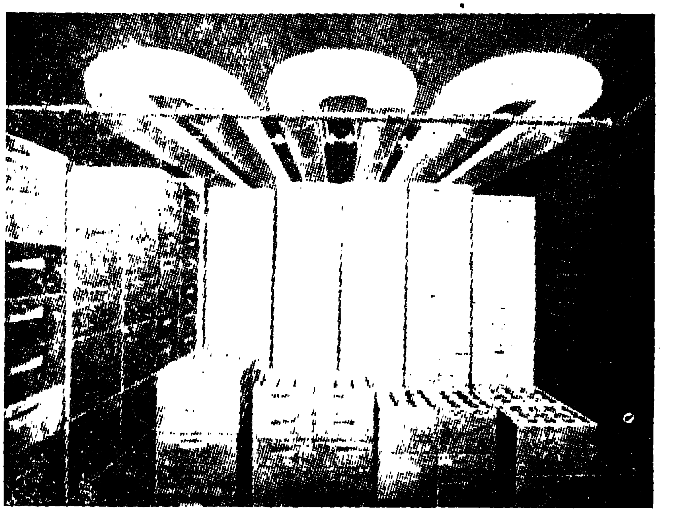
পাস্তুরাইজেসন করবার সময় যে মাত্রাতেই উত্তাপ দেওয়া হোক না কেন, তা সব সময়েই দুধ ফোটাতে যে উত্তাপের প্রয়োজন তার থেকে ঢের কম থাকে। ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইটের* খুব সামান্য কিছু বেশী উত্তাপে দুধ ফুটতে আরম্ভ করে। সেইজন্য এই উত্তাপে, অর্থাৎ যে উত্তাপে পাস্তুরাইজ করা হয়,—দুধের রাসায়নিক বা আকৃতিগত কোন পরিবর্তন বা খাদ্যগুণ নষ্ট হয় না, অথচ এতেই রোগোৎপাদক জীবাণুর সবগুলি এবং পচনকারী জীবাণুর অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। যা সামান্য কিছু থেকে যায় বা থাকবার সম্ভাবনা থাকে, গরম অবস্থার থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করে ফেলার জন্য তাপ-ক্রমের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে তাও মরে যায়। এর পরেও যদি কিছু থাকে তবে তা জীবাণু নয়,—জীবাণুর স্পোর (Spores) বা জীবাঙ্কুর। এই জীবাঙ্কুর অবস্থায় এরা কোন ক্ষতি করতে পারে না,—অর্থাৎ এই অবস্থা থেকে জীবাণুরূপে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত এদের কোন কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না। জীবাঙ্কুর থেকে



ডঃ লুই পাস্তুর (Dr. Louis Pasteur)

জীবাণুতে রূপান্তরিত হতে গেলে এদের উপযুক্ত মাত্রার উত্তাপের প্রয়োজন। শ্রেণী-ভেদে জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির পক্ষে যে উত্তাপ অনুকূল, জীবাঙ্কুর থেকে জীবাণুতে রূপান্তরিত হবার পক্ষে সেই উত্তাপই উপযুক্ত। যদিও ন্যূনাধিক মাত্রার উত্তাপেও তারা তা হতে পারে। ২১২° ডিগ্রীতে বাড়ীতে জ্বাল দেবার পর বা ১৪৫ ডিগ্রীতে পাস্তুরাইজ করার পর দুধ যদি ধীরে ধীরে,—অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয় তবে এক সময় সেটা জীবাণুর পক্ষে অনুকূল উত্তাপের মাত্রায় পেঁছোবেই এবং তখন সেই দুধে কোন জীবাঙ্কুর থাকলে তখনই তা জীবাণুতে রূপান্তরিত হবে ও বংশ বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করবে। ফলে সেই দুধে পচনকারী ও রোগোৎপাদক উভয়বিধ জীবাণুরই অস্তিত্বের পুনঃ সম্ভাবনা হবে। পাস্তুরাইজ করার পরই দুধ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য এবং সেই অবস্থায় (ঠাণ্ডা) রাখার জন্য জীবাঙ্কুর রূপান্তর গ্রহণ করতে পারে না। ফলে পাস্তুরাইজ করা দুধ অন্য দুধের তুলনায়,—অর্থাৎ উত্তপ্ত করার পর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা না করা দুধের তুলনায় ঢের বেশী সময় অবিকৃত থাকে। জনস্বাস্থ্যের দিক ছাড়াও ব্যবসায়ের দিক দিয়েও এর মূল্য সামান্য নয়। তারপর নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপে দুধ অনেকক্ষণ রাখার জন্য যদি তাতে সামান্য টুকুও জ্বাল-দেওয়া-গন্ধ হয়, দুধ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য সে গন্ধটুকুও থাকে না, ফলে সেই দুধ জ্বাল-না-দেওয়া দুধের মতই খেতে লাগে।

কতখানি সময়ের জন্য উত্তাপ দেওয়া উচিত তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কি মাত্রায় সেই উত্তাপ দেওয়া হবে; কারণ যত বেশী মাত্রায় উত্তাপ দেওয়া হয়, সময়ও সেই অনুপাতে কম করা হয়। যদি উত্তাপের মাত্রা ১৬৭° ডিগ্রী ফারেনহাইট্ করা হয় তবে সময় লাগবে ১০ মিনিট, ১৬০° ডিগ্রী হলে ১৫ মিনিট এবং ১৫০° ডিগ্রী হলে ২৫ মিনিট। ভারতবর্ষের যেসব স্থানে দুধ পাস্তুরাইজ করবার ব্যবস্থা আছে সেই সব স্থানে ১৪৫° ডিগ্রী উত্তাপে



স্থানান্তরে দুধ নিয়ে যাবার জন্য আধুনিক ঠাণ্ডা গাড়ী বাক্সবন্দী শিল করা দুধের বোতল নিয়ে যাচ্ছে। ওপর দিকে ঠাণ্ডা করবার কলকব্জার কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

---

* তিনটি বিভিন্ন প্রকারের মান-ফলকাংকিত তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সেইগুলির নাম ও মান-ফলকের পার্থক্য এইরূপঃ—

নাম	তুষারাঙ্ক (Freezing point)	স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point)
রেমার	০° ডিগ্রী	৮০° ডিগ্রী
সেন্টিগ্রেড	০° "	১০০° "
ফারেনহাইট্	৩২° "	২১২° "

৩০ মিনিট দুধ গরম করা হয় এবং তারপরেই তাড়াতাড়ি ৫০· ডিগ্রীতে ঠাণ্ডা করে ফেলা হয়। এই উত্তাপের মাত্রা ও তার স্থিতিকাল উদ্দেশ্যের পক্ষে যে যথেষ্ট নীচের তালিকা থেকে তা প্রমাণিত হবে। যে কয়েকটি সাংঘাতিক রোগের জীবাণু দুধে সাধারণত পাওয়া যায় তাদের ধ্বংস করতে যে পরিমাণ উত্তাপ ও সময় প্রয়োজন এই তালিকাতে তার উল্লেখ করা হলোঃ—

যক্ষ্মা	১৪০· ডিগ্রীতে	২০ মিনিট
আমাশয়	১৪০· ”	১০ ”
টাইফয়েড্	১৪০· ”	২ ”
ডিপথিরিয়া	১৪০· ”	১ ”
আনডিউল্যাণ্ট ফিভার	১৪০· ”	১ ”
স্তনপ্রদাহ (Mastitis—Streptococcal)	১৩৫· ”	১ ”
কলেরা	১৩২· ”	১০ ”

এই তালিকাতে দেখা যাচ্ছে যে কোন জীবাণুর ক্ষেত্রেই উত্তাপ ১৪০· ডিগ্রীর বেশী নেই. আর সব চেয়ে যে বেশী সময় তা হলো ২০ মিনিট। তা হলে ৩০ মিনিট ধরে ১৪৫· ডিগ্রী উত্তাপ দিলে এটা খুবই আশা করা যায় যে এই সব রোগোৎপাদক জীবাণু ছাড়াও আরো বহু প্রকারের জীবাণু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি কিছু থেকেই যায় তবে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য তারাও নিষ্কৃতি পাবে না।

দুধ পাস্তুরাইজ্ করার জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী পাস্তুরাইজ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রপাতি লাগে। যে প্রক্রিয়াটি বর্তমানে সব চেয়ে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে নীচে তার বর্ণনা দেওয়া হলো। কলিকাতার পাস্তুরাইজেসন্ কেন্দ্রসমূহে এই প্রক্রিয়াতেই দুধ পাস্তুরাইজ করা হয়। প্রক্রিয়াটি মোটামুটি এইঃ—

একটি বড় ঢেখে পাত্রে কাঁচা দুধ ছেঁকে ঢালা হয়। সেই পাত্রের এক পাশ দিয়ে একটা ফাঁপা নল ঢোকান আছে, যেটা সেই পাত্রের দুধের ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এই ফাঁপা পাক খাওয়া নলের ভেতর দিয়ে গরম বাষ্প ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ও দুধকে উত্তপ্ত করে। বাষ্প চলার কালে সেই নলের এই পাকখাওয়া অংশটি দুধের ভেতর অনবরত পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে, ফলে পাত্রের সমস্ত দুধটাই নাড়া পেয়ে ওলোট্-পালোট্ খায় ও সমানভাবে গরম হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপে (১৪৫· ডিগ্রী) ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (৩০ মিনিট) গরম হবার পর পাত্রের তলায় লাগান অন্য একটি নল দিয়ে দুধ বেরিয়ে ঠাণ্ডা হবার মেশিনে গিয়ে পড়ে। সেখানে নির্দিষ্ট মাত্রায় (৫০· ডিগ্রী) ঠাণ্ডা হবার পর সেই দুধ বোতলে বোতলে ভরা হয় ও মুখ শিল্ ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথমেই দুধ ছেঁকে পাত্রে ঢালার কাজটুকু বাদ আর সমস্তটাই মেশিনের সাহায্যে করা হয়,—এমন কি বোতলে দুধ ভরা ও শিল্ করা পর্যন্ত।

এইবার এই পাস্তুরাইজ করা দুধ খাওয়ার পক্ষে দু'একটি কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করবো। বড় বড় শহরের ও নগরের অধিবাসীদের, বিশেষ ক'রে শিশু ও রুগীদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাহেতু পাস্তুরাইজ করা দুধ খাওয়া যে কতখানি সমীচীন, এই প্রবন্ধের গোড়া থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব কথা বলা হলো, আশাকরি তাতেই তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে সবাই যদি এই দুধ খেতে চায় তবে তাদের সবার পক্ষেই এই দুধ পাওয়া সম্ভবপর কি না? এর উত্তরে কেবলমাত্র 'না' বললেই সমস্ত হাঙ্গামা মিটে যেতো; কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর 'না' হলেও কেন যে 'না'—এই প্রসঙ্গে সেটা না বলে এই 'না' উত্তরের প্রতি অবিচার করা হবে। যাঁরা এই দুধের ব্যবসা করেন, তাঁরা ততখানি দুধই পাস্তুরাইজ করেন ঠিক যতখানি দুধ তাঁদের বাঁধা গ্রাহকরা নেন; কারণ তার বেশি দুধ পাস্তুরাইজ করলে খদ্দেরের অভাবে তা শেষ পর্যন্ত কোন কাজেই আসবে না, উপরন্তু সাধারণ দুধের দামের ওপর পাস্তুরাইজ করার দরুণ যে খরচ সেটা তাঁদের লোকসান যাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে পাস্তুরাইজ করা দুধ বাজারে পাওয়া না গেলেও, পাওয়া যাবে কি না, এর উত্তরে কেবল 'না' উত্তরটি ঠিক-উত্তর হিসাবে যেন নেওয়া যায় না। এই প্রশ্নের ঠিক-উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় যে জনসাধারণ এই দুধ চায় কি না,—কারণ এই পাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে চাওয়ার ওপরই নির্ভর করে।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৩

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। দিন দুই-তিন পূর্বে পর্যন্ত কয়েকদিন ধরিয়া যে দুরন্ত বর্ষা প্রবল এবং অবিশ্রান্ত বারিপাতের দ্বারা নদ-নদী, খাল-বিল, তড়াগ পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়া সমগ্র বাঙলা দেশকে নাস্তানাবুদ করিয়া মারিয়াছিল সহসা তাহাকে এক ফুঁয়ে কোথায় উড়াইয়া দিয়া শরৎ ঋতু তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। অবশ্য, 'কাশাংশুকা বিকচ পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা নববধূরিব রূপরম্যা' রূপে বলিতে পারা যায় না; কারণ, ইট-কাঠ, পাথর-পিচমণ্ডিত কলিকাতা নগরীর মধ্যে তাহার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এখানেও আকাশ হইয়াছে ঘন নীল, বায়ু হইয়াছে তরল এবং রৌদ্র পীতাভ। তদ্ভিন্ন 'যখন দেখিবে ভাই, আকাশেতে মেঘ নাই, মাঝে মাঝে ডাক শুধু আছে, তখন জানিবে মনে সুখ দিতে জীবগণে সুখের শরৎ আসিয়াছে'। এমন প্রমাণের সরব অস্তিত্বও আকাশে বিরল নহে।

কলিকাতায় অশোকের গৃহে শক্তির আসা এক মাসের অধিক হইয়া গিয়াছে। কেশবলালের মৃত্যুর পর কয়েকদিন ধরিয়া সে স্কুলে নাম লিখাইয়া হোস্টেলে ভর্তি হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। সে বিষয়ে অশোক এবং কতকটা প্রণব চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রধানত দুইটি কারণে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রথমত দেশে এবং কলিকাতায় শক্তির যথার্থ অভিভাবক কে অথবা কাহারা এবং সে অভিভাবকদের অভিভাবকত্বের বুনিয়াদ কি, সে কথা লইয়া দুই-এক স্থলে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষের মধ্যে বোধ করি কোন পক্ষেরই এ ব্যবস্থার সহিত অন্তরের যোগ ছিল না। শক্তিহীন গৃহের বিরস মূর্তি কল্পনা করিয়া অশোক মনে-মনে মাথা নাড়িত; যে অপরূপ পুষ্প সহসা তাহার গৃহে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌন্দর্যে এবং সৌরভে সমস্ত গৃহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, সেই পুষ্পের নেশা লাগিয়াছে তাহার। অপর পক্ষে শক্তির লাগিয়াছে অশোকের সংসারের নেশা; অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তির সংসারের নেশা যে অনাত্মীয় হইয়াও পরমাত্মীয় হইবার অপেক্ষায় আছে। যে জাতি বাল্যকালে খেলার সংসার পাতিয়া আসল সংসারের আহার-নিদ্রা ভুলিয়া থাকে, সে জাতির পক্ষে এ-নেশা যে কত প্রবল নেশা, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং দুই-চার দিনের অসবল চেষ্টা-চরিত্রের পর স্কুল এবং হোস্টেলের পরিকল্পনা কতকটা সহজেই অবহেলার গর্ভে মিলাইয়া গেল। অশোক এবং বিনোদের মধ্যে ইহাতে কে অধিক খুশি হইয়াছিল, তাহা নিরূপিত করা খুব সহজ নহে।

বেলা তখন তিনটা। ভাঁড়ার হইতে শক্তি বৈকালের খাবার প্রস্তুত করিবার উপকরণাদি বাহির করিতেছে, এমন সময়ে একখানি চিঠি হাতে করিয়া গোবিন্দ আসিয়া কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বলিল, "দিদিমণি, আমার আর কিছুই নেই!"

ঘিয়ের টিন হইতে শক্তি ঘি ঢালিতে যাইতেছিল, গোবিন্দর কথা শুনিয়া টিনটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া গোবিন্দর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "নেই মানে? কি হয়েছে তোমার?"

"দামোদর আমার আর কিছু রাখেনি! ঘর-দোর ক্ষেত-খামার, জিনিসপত্র সবকিছু গিলে খেয়েছে!"

দামোদরের প্রবল বন্যার কথা শক্তি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিল; গভীর উৎকণ্ঠিত স্বরে সে বলিল, "আর তোমার ছেলেপিলে বউ-ঝি?"

"হাঁটু-জল পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে তারা গাই-বলদ নিয়ে পাঁচ কোশ দূরে সরষেপাতি গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।"

"সেখানে বন্যার জল যায় না?"

"যায়, তবে সরষেপাতি উঁচু জমি বলে গ্রামটুক আর অল্প একটু আশপাশ জেগে থাকে। সেইখান থেকেই আমার সম্বন্ধী চিঠি লিখেছে, পড়ে দেখুন না দিদিমণি।" বলিয়া গোবিন্দ চিঠিখানা শক্তির হাতে দিল।

চিঠি পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া শক্তি বলিল, "আহা ভারি দুঃখের কথা! কিন্তু কি আর করবে বল? দৈবের ওপর ত' মানুষের হাত নেই।"

"দিদিমণি!"

"কি বল?"

"আমার ছুটি চাই দিদিমণি! বাড়ি যেতে হবে আমাকে।"

সাগ্রহ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়ি যাবে! বাড়ি যাবে বই কি! কতদিনের ছুটি চাও?"

গোবিন্দ বলিল, "বলে যাব পনেরো দিন, কিন্তু আসব এক মাস পরে; সে তঞ্চকতা ত' আপনার সঙ্গে করতে পারব না দিদিমণি। এক মাস ছুটি চাই।"

"এক মাস ত' কিছুই বেশি নয় গোবিন্দ, আমার ত' মনে হয়, সব ব্যবস্থা শেষ করতে তোমার আরও বেশি সময় লাগবে। দাদাবাবুকে বোলো নিশ্চয় তিনি ছুটি দেবেন।"

"দাদাবাবুকে আর কি বলব দিদিমণি, তিনি ত' শেষ পর্যন্ত আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন। বলতে হয় আপনি বলবেন।"

শক্তির মুখে সকল কথা শুনিয়া অশোক বলিল, "দুঃখের কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার-আমার কাছে এটা যত বড় দুঃখ, গোবিন্দদের কাছে ঠিক তত বড়ই নয়। চিরকাল এই দুঃখকে স্বীকার করেই ওরা ওখানে বাস করে। দামোদরও ওদের মাঝে মাঝে দুঃখ দিতে ছাড়ে না, ওরাও দামোদরের এলাকা ছাড়ে না। কিন্তু সে যাই হোক, বড় হাকিমের কাছে ও যখন ছুটির হুকুম পেয়েছে, তখন ছোট হাকিমের হুকুমের আর দরকার কি?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "বড় হাকিম হুকুম দেয়নি, ছোট হাকিমের কাছে সুপারিশ করেছে।"

"বড় হাকিমের সুপারিশই ছোট হাকিমের কাছে হুকুমের সমান।"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "তাহলে বড় হাকিমের হুকুম ছোট হাকিমের কাছে কিসের সমান শুনি?"

অশোক বলিল, "সে উপাদেয় বস্তুর আস্বাদ পাবার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত ত' হল না, তাহলে কি করে বলি বল? দুটো-চারটে হুকুম কর, তাহলে হয়ত বলতে পারি কিসের সমান। তবে আপাতত যদি অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলতে বল, তাহলে বলব অমৃত-সমান। কেন জানো?"

মৃদু স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কেন?"

"কারণ, অমৃত হচ্ছে সেই জিনিস, যে-জিনিস এ পর্যন্ত কেউ দেখেনি অথবা আস্বাদ করেনি অথচ মনে-মনে জানে ভারি উপাদেয়।" বলিয়া অশোক হাসিতে লাগিল।

শক্তি বলিল, "কিন্তু অমৃতেও অরুচি বলে একটা কথা আছে জান? দুটো-চারটে

হুকুম তামিল করতে করতেই হুকুমে অরুচি হয়ে আসবে।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "এই প্রসঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য শুনবে?"

"কি বৈজ্ঞানিক সত্য?"

"একান্তই যদি অরুচি হয় ত' বিয়ের আগে কিছুতেই হবে না—বিয়ের পরে হলেও হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্য হচ্ছে, বিয়ের মতো মোহনাশক আর দ্বিতীয় কোন বস্তু নেই।"

"সেই জন্যেই বুঝি বিয়ে করতে তুমি ভয় পাও?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল "বারে, বিয়ে করবার জন্যেই ত' পাঁয়তারা কষছি। বিয়ে করতে ভয় পাই কি রকম?"

"কেন, সেদিন ত' পেয়েছিলে।"

"কোন্ দিন?"

"যেদিন কলমের ডগা দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরাতে গিয়ে ভয় পেয়ে টিপ পরিয়ে দিয়েছিলে। সিঁদুর পরিয়ে দিলে সেদিন ত' ছোট সংস্করণের একটা বিয়েই হয়ে যেত।"

শক্তির কথা শুনিয়া মুহূর্তের জন্য অশোকের মুখমণ্ডলে একটা মলিন ছায়া দেখা দিল; পরমুহূর্তেই কিন্তু সহসাগত দুর্বলতার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কপট উচ্ছ্বাসের সুরে বলিল, "নাঃ, সহ্য হয় না এত বড় কুৎসিত গঞ্জনা! নিয়ে এস তোমার কলমের ডগা আর সিঁদুর কৌটো। হয়ে যাক্ আজ একটা ছোট সংস্করণের বিয়ে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে শক্তি বলিল, "না, তা হয় না। যেচে মান, কেঁদে সোহাগ, সে বড় বিশ্রী জিনিস। হোত ত' সেদিনই হোত। এখন ছোট সংস্করণের বিয়ের লগ্ন শেষ হয়ে গেছে!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অশোক বলিল, "কিন্তু বড় সংস্করণের বিয়ের লগ্ন যেদিন আসবে, সেদিন ত' আর কলমের ডগায় নয়—সেদিন পালি দিয়ে সিঁথির এদিক থেকে ওদিক সিঁদুরে রাঙিয়ে দিয়ে কলমের ডগার শোধ তুলব।"

স্মিতমুখে অল্প একটু ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল "ধন্যবাদ!" তাহার পর লঘুপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

নীচে নামিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া শক্তি বলিল, "তোমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে গোবিন্দ। দরকার বোধ করলে তুমি আজই বাড়ি যেতে পার।"

গোবিন্দ বলিল, "না, দিদিমণি আপনাদের কষ্টে ফেলে আমি যেতে চাইনে। কাল লোক দিয়ে তারপর যাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তি বলিল, "না না, সে জন্য তোমার দেরি করবার দরকার নেই। তিনটে লোকের রান্না আমি নিজেই রেঁধে নিতে পারব। আজ গেলে যদি সুবিধে হয়, তাহলে আজই তুমি যাও।"

বিনোদ বলিল, "আজ গেলে সুবিধে আছে বইকি। রেতের বেলা বর্ধমানে পেঁছবে, তারপর ভোর হলেই বাজিতপুরে রওনা দিতে পারবে। একটা দিন এগিয়ে যাবে।"

গোবিন্দর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "তুমি আগে বাজিতপুরে যাবে না-কি গোবিন্দ?"

গোবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ দিদিমণি। বই-খাতা, হিসেব-পত্র সবই ত' বাজিতপুরের সদর দপ্তরে আছে। মাইনে, আগাম যা-কিছু সেখান থেকেই নিতে হবে। মহারাজও এই বিপদে কিছু দয়া করবেনই তা ছাড়া খড়, বাঁশ আর দড়ির ব্যবস্থাও বাজিতপুর থেকেই করতে হবে।"

"এখানে তোমরা মাইনে পাও না?"

"আজ্ঞে না, বাজিতপুরের বাইরে থাকলে আমরা মাইনে ছাড়া মাসে পাঁচ টাকা ক'রে হাতখরচ পাই। তাও দাদাবাবুর কাছ থেকে মাস দুয়েকের আগাম নেওয়া হয়ে গেছে। মাইনে আমরা পাই বাজিতপুরে।"

রাঁধিবার জন্য একজন পাচক স্থির করিয়া দিয়া পরদিন গোবিন্দ বাজিতপুরে রওনা হইল। গৃহ নির্মাণাদির বিষয়ে সাহায্য করিবার সঙ্কল্পে অশোক গোবিন্দকে পঁচিশ টাকা প্রদান করিল, এবং শক্তি নিজ তহবিল হইতে দিল পনের টাকা।

যাইবার পূর্বে এক সময়ে গোবিন্দকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া অশোক বলিল, "শোন গোবিন্দ, তোমাদের দিদিমণির কথা বাজিতপুরে কারুর কাছে গল্প কোরো না। বুঝলে? কারুর কাছে নয়।"

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল "আজ্ঞে, আপনি যখন নিষেধ করছেন তখন নিশ্চয় করব না।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় করবে না। শক্তি দিদিমণি যে আমাদের বাড়িতে বাস করছেন এ কথা বাজিতপুরে কারো জানবার দরকার নেই।"

"যে আজ্ঞে।" বলিয়া নত হইয়া অশোককে অভিবাদন করিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর অবশেষে অশোক গোবিন্দের প্রতি যে নিষেধ-বাক্য প্রয়োগ করিল তাহা করিবে অথবা করিবে না, গোবিন্দের বাজিতপুর যাইবার কথা অবগত হইয়া পর্যন্ত সে সমস্যা তাহার মনকে পীড়িত করিতেছিল। নিষেধ না করিলে শক্তির কথা বাজিতপুরে জানাজানি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা যত বেশি, নিষেধ করিলে তদপেক্ষা নিশ্চয় কম, এই বিবেচনা করিয়া সে শেষ পর্যন্ত নিষেধ করাই সমীচীন মনে করিয়াছিল। কিন্তু নিষেধের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শক্তি-প্রসঙ্গ গোবিন্দের মনের মধ্যে সহসা রহস্য-দুর্ভর হইয়া উঠিয়া এমনই বেগ দিতে আরম্ভ করিল যে, কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে সে বেগের খানিকটা অংশ বিনোদের কর্ণে মুক্ত না করিয়া দিয়া কিছুতেই সে পারিল না। বাকি অংশটুকু বাজিতপুরে পেঁছিয়া এলোকেশীর কর্ণে মুক্ত করিয়া হাল্কা হইল।

এলোকেশী বিধবা, নিঃসন্তান; বাজিতপুর জমিদার-গৃহে সে পরিচারিকাবর্গের অন্তর্ভুক্ত। দূর সম্পর্কে গোবিন্দের সে শ্যালিকা হয়, কিন্তু সম্পর্কের সে দূরত্ব এতই সুদূর যে, তাহাকে সংবাদ বলিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু যে যোগ সব সুদূরকেই নিকট করে, অন্তরের সেই প্রবল অসামাজিক যোগ গোবিন্দ এবং এলোকেশীর মধ্যে বর্তমান বলিয়া বাজিতপুরে রটনা আছে।

কথাটা এলোকেশীকে সংগোপনে বলিয়া গোবিন্দ পুনঃ পুনঃ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, "খবরদার এলো খবরদার! এ কথা যেন কাকে-কোকিলে জানতে না পারে। দাদাবাবুকে আমি কথা দিয়ে এসেছি যে, এ কথা আমি কাউকে বলব না।"

গোবিন্দর কথায় পরম আপ্যায়িত হইয়া একমুখ হাসি হাসিয়া এলোকেশী বলিয়াছিল, "কাউকে বলবে না ত' আমাকে বললে যে?"

উত্তরে গোবিন্দ বলিয়াছিল, "আরে, তুমি কি কাউকে যে তোমাকে বলব না? আমার জানায় আর তোমার জানার কোনো তফাৎ আছে না কি?"

খুসি হইয়া এলোকেশী বলিয়াছিল, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমার মুখ থেকে কাকে-কোকিলেও জানতে পারবে না। কিন্তু কি ঘেন্নার কথা গো! অ্যাঁ? সোমোত্থ কুমারী মেয়ে হ'য়ে কি না পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাস। বিধবা-টিধবা হলেও না-হয় কথা ছিল।"

গোবিন্দ বলিয়াছিল, "বল কেন, বড় ঘরের বড় কথা! তবে মেয়েটা খুবই ভাল।"

সগর্জনে এলোকেশী বলিয়াছিল, "ঝাড়ু মারো অমন ভালোর মাথায়!"

সে যাহাই হউক, এলোকেশী লোক মন্দ নহে, তাহার প্রতিশ্রুতি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল; অর্থাৎ, শক্তির কথা কাককেও জানায় নাই, কোকিলকেও জানায় নাই। কিন্তু গোবিন্দ বাজিতপুর ত্যাগ করিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই নিতাই সরকারকে জানাইয়া নিজের উদর-চাপের কিছু লাঘব ঘটাইয়াছিল। গোবিন্দর অনুপস্থিতিকালে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নিতাই এলোকেশীর অন্তরপ্রদেশে গোপন এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করে। অবশ্য কথাটা যাহাতে কাকে-কোকিলে না জানিতে

পারে নিতাইয়ের নিকট হইতে সে প্রতিশ্রুতি লইতে এলোকেশী ভুলে নাই।

জল যেমন পুষ্করিণী হইতে উপচাইয়া পড়িয়া নালা হইতে খালে, খাল হইতে নদীতে এবং অবশেষে নদী হইতে সাগরে গিয়া উপনীত হয়; ঠিক সেই প্রণালী অনুযায়ী শক্তির কাহিনী মুখ হইতে কাণের পর মুখ হইতে কাণে গড়াইতে গড়াইতে শেষ পর্যন্ত একদিন যাদবচন্দ্রের কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল। বয়লার যেমন বাষ্পের দুর্মদ বেগ নিজের অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে অবস্থান করে, ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত নেত্রে নীরবে সমস্ত কথাটা শুনিয়া যাদবচন্দ্র ঠিক সেইরূপে অন্তরের সমস্ত ক্রোধ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। যে বলিতে আসিয়াছিল, যাদবচন্দ্রের স্তব্ধ-তপ্ত মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়া কোনো রূপে পলাইয়া বাঁচিল!

গোবিন্দ বাড়ী যাইবার দিন দুই পরে অশোক শক্তিকে বলিল, "বস্তু হ'তে বস্তুর আমাদের যে ভেদবোধ, সেটা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয় শক্তি। আসলে সব জিনিষই যে এক, সেই পরম তত্ত্বের শিক্ষা আমরা আপাতত পাঁচু ঠাকুরের কাছ থেকে পাচ্ছি।"

নবনিযুক্ত পাচক, যাহাকে গোবিন্দ দিয়া গিয়াছে, তাহার নাম পাঁচু।

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কেন বল দেখি?"

অশোক বলিল, "এতদিন আলুকে আলু ব'লেই জানতাম। আর পটোলকে জানতাম পটোল ব'লে। এখন পাঁচু ঠাকুরের তরকারিতে দেখি ও দুইয়ে কোনো প্রভেদই নেই। তরকারির কোন্ অংশটা যে আলু, আর কোন্ অংশটা যে পটোল তা বোঝে কার সাধ্য। তাছাড়া, পাঁচু উদারনীতির মানুষ; শ্রেণীবিভাগ ও কোনো কিছুতেই পছন্দ করে না,—এমন কি তরকারিতেও না। তাই, শুক্তে আর ডালনাকে এমন কাছাকাছি টেনে এনেছে যে, যখন ডালনা খাই, তখন যেমন মনে করি ডালনা খাচ্ছি, যখন শুক্তো খাই তখনো তেমনি মনে করি ডালনাই খাচ্ছি।"

অশোকের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে শক্তি বলিল, "পাঁচু ঠাকুরের নুনের হিসেব জানো? ও মনে করে যেটুকু নুন রাঁধবার জন্যে ওকে আমি বার ক'রে দিই, যে-কোনো রকমে সবটুকু শেষ করতে পারলেই নুন দেওয়া নির্ভুল হল। তাই যেটুকু নুন ডালে কম পড়ে ডালকে আলুনি করে, সেইটুকু নুন ডালনায় বেশি পড়ে ডালনাকে নুনে পোড়ায়।"

অশোক বলিল, "তা হলে এহেন পাঁচু ঠাকুরের হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি তা স্থির কর।"

শক্তি বলিল, "সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে পাঁচু ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিয়ে শক্তি ঠাকুরুণের হাতে রান্না ছেড়ে দেওয়া।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিছুতেই না! অসংশয়িত না! Definite no!"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "কেন, না কেন শুনি?"

"তোমার হাতে রান্না ছেড়ে দিলে মুখ মিষ্টি হবে তা নিশ্চয় জানি, কিন্তু মন তেতো হবে। এখন দিনান্তে তবু এক-আধ-বার দর্শন পাওয়া যায়, তখন টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না। এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না যে, বন্যার জলে গোবিন্দর বাড়ি-ঘর ডুবে গেছে বলে সংসারের কাজে আমার ইয়ে ডুবে যাবে!

"তোমার কিয়ে ডুবে যাবে?" বলিয়া শক্তি খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিঃশব্দ সহাস্যমুখে ক্ষণকাল শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অশোক বলিল, "হাসি নয় শক্তি, তুমি যদি আমাকে প্রতিদিন পাঁচখানা করে গান শোনাও তা হলে দুবেলা আমি ঘাড় গুঁজে অপ্রতিবাদে পাঁচু ঠাকুরের রান্না খাব, তা শপথ করে তোমাকে বলছি।"

"আর, তুমি যদি আমার হাতে রান্না ছেড়ে দাও, তা হলে প্রতিদিন তোমাকে সাতখানা করে গান শোনাব, একথা শপথ করে বললাম।"

কিন্তু এত লোভনীয় সর্তেও অশোক রাজি হইল না।

পরদিন বিনোদ কিন্তু একটা মধ্য উপায়ের ব্যবস্থা করিল। পাঁচুকে বরখাস্ত করিয়া করালী নামে অপর এক পাচককে ধরিয়া আনিল। কিন্তু তাহার রান্না খাইয়া অশোক অতি কষ্টে বলিল, "পাঁচুকে যদি পাওয়া যায় তা হলে শীঘ্র আনিয়ে নাও শক্তি! পাঁচু যে মন্দ রাঁধত না, করালী তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে!"

এবার কিন্তু শক্তি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। একদিনের মাহিনা করালী ঠাকুরের হস্তে দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সে নিজে হাতা বেড়ি ধারণ করিল। বলিল, "তিন দিন আমার রান্না খেয়ে তোমরা যদি বল সুবিধে হচ্ছে না, তা হলে পাঁচু ঠাকুরকে আবার ডাকাবো।"

কিন্তু তিন দিনের স্থলে তিন-তিরিক্কে নয় দিন হইয়া গেল তথাপি কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইল না সুবিধা হইতেছে না, কারণ সুনিপুণ পাককার্যের গুণে আহার ক্রিয়াটা যে আনন্দের ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? শক্তির কষ্ট এবং পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া অশোক মাঝে মাঝে আপত্তি তুলিত, কিন্তু পাঁচু ঠাকুর এবং করালী ঠাকুরের ভয় দেখাইয়া শক্তি সহজেই সে আপত্তিকে দমন করিত।

একদিন সকালে চা-খাবার খাইয়া অশোক কলেজে গিয়াছে এবং শক্তি রান্নাঘরে উনানে একটা তরকারি চড়াইয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে একটা মোটর থামিবার শব্দ শুনা গেল।

শক্তি বলিল, "দরজা খুলে দাও বিনোদ, হয়ত' প্রণববাবু এসেছেন।"

বারান্দায় বসিয়া বিনোদ মাছ কুটিতেছিল। মাছ ফেলিয়া হাত ধুইয়া সে দরজা খুলিতে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া চিন্তিত-শুষ্ক মুখে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "প্রণববাবু নয় দিদিমণি, মহারাজ এসেছেন! কত্তা মহারাজ!"

গৃহে যাইবার পূর্বে গোবিন্দ তাহাকে অশোকের যে নিষেধবাণী শুনাইয়া গিয়াছিল সেকথার হিসাবে বিনোদ মনে করিয়াছিল, যাদবচন্দ্রের আগমন শক্তির পক্ষে অনুকূল ব্যাপার নহে।

বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঔৎসুক্যভরে শক্তি বলিল, "বাবা এসেছেন? কোথায় আছেন?"

"দোতলায় নিজের ঘরে গেছেন।"

"আচ্ছা, আমি আসছি।" বলিয়া উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া হাত ধুইয়া শক্তি এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। (ক্রমশঃ)



নারীর অধিকার

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল্
(অক্সন্)

নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়ে নানা আলোচনা বর্তমানে হইতেছে। নারীর অধিকার কি এবং কতটুকু হওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নরনারীর অধিকার সমান হওয়া উচিত কি না, তাহাই এস্থলে প্রধান বিচার্য বিষয়। কেহ কেহ বলেন যে, নরনারীর সমান অধিকারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কারণ নর ও নারী এক নহে, তাহাদের মধ্যে বহু দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ বিদ্যমান। সেইজন্য নরের সামাজিক অবস্থা ও নারীর সামাজিক অবস্থা এক হইতে পারে কিরূপে? পুরুষের কার্য বহির্জগতে, স্ত্রীর কার্য অন্তঃপুরে—অতএব স্ত্রীর অধিকার পুরুষের সমান হইতেই পারে না, এই হইল ইঁহাদের যুক্তি।

আমরা কিন্তু এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারি না। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অবশ্য প্রভেদ আছে; কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই প্রভেদ ফলত দৈহিক প্রভেদই মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ ও নারীকে এরূপভাবে গড়িয়াছেন যে, কেবল নারীরই মাতা হওয়ার ক্ষমতা আছে, পুরুষের নহে। কিন্তু এই দৈহিক প্রভেদ শাশ্বত ও অনিবার্য হইলেও মানসিক দিক হইতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এইরূপ কোন দুর্লঙ্ঘ্য পার্থক্য নাই। কোনো বিশেষ গুণ বা শক্তি সাধারণভাবে পুরুষ বা নারীর ক্ষেত্রে অধিক পরিলক্ষিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা যে কেবলই পুরুষ বা কেবলই নারীরই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি বা একচেটিয়া, তাহা ত কোনক্রমেই স্বীকার করা চলে না। যথা—সাধারণভাবে হয়ত বলা চলে যে, বুদ্ধি, সাহস, দৃঢ়তা প্রভৃতি বিশেষভাবে পুরুষের এবং কোমলতা, পরনির্ভরশীলতা, করুণা প্রভৃতি বিশেষভাবে নারীরই ধর্ম। কিন্তু ইহা বলা সম্পূর্ণ ভুল হইবে যে, সকল নারীই সকল পুরুষ অপেক্ষা বুদ্ধি, সাহস ও দৃঢ়তায় ন্যূন; অথবা কোন পুরুষই কোমলভাবাপন্ন ও পরনির্ভরশীল নহেন। সেইজন্য মানসিক দিক হইতে নারী যে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কেবল ভিন্নই নহে, ন্যূনও—এই সাধারণ ধারণা হয় অজ্ঞতা নয় কুসংস্কার হইতেই উদ্ভূত মাত্র, ইহার কোনরূপ সত্য ভিত্তি নাই। বিখ্যাত কবি রাজশেখর বলিয়াছেন—"পুরুষের ন্যায় নারীও কবি হইতে পারেন। প্রতিভা আত্মারই ধর্ম—স্ত্রী ও পুরুষে ভেদের অপেক্ষা ইহা করে না। শ্রুত হয় এবং দৃষ্টও হয় যে, রাজপুত্রী, মহামাত্য-দুহিতা গণিকা ও কৌতুকিভার্যাগণ শাস্ত্রজ্ঞা ও কবি ছিলেন।"

এইরূপে আত্মার দিক হইতে মনের দিক হইতে পুরুষ ও নারীর ভিতর প্রকৃতিগত প্রভেদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সমান সুযোগ ও শিক্ষা পাইলে নারীও যে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, শিক্ষায় ও দীক্ষায়, কর্মে ও ধর্মে পুরুষের সমকক্ষা হইতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত জগতের ও ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। সেইজন্য কেবল দৈহিক পার্থক্যের দোহাই দিয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে আকাশ-পাতাল রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদের সৃষ্টি করা কোনক্রমেই ন্যায়ধর্মানুমোদিত নহে। নারী নারীই, নর নহে বলিয়াই যে তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি শারীরিক ধর্ম এবং সুখ, দুঃখ, মান, অপমান প্রভৃতি মানসিক ধর্ম পুরুষের ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে—ইহা যিনি বলেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। যে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থা পুরুষের দৈহিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ, সেই ব্যবস্থাই নরনারীর প্রকৃতিগত ভেদের অজুহাতে নারীর ক্ষেত্রে রদ করা; অথবা যে ব্যবস্থা পুরুষের ক্ষেত্রে দৈহিক ও মানসিক দিক হইতে দুঃখজনক ও ক্ষতিকর, সেই ব্যবস্থাই একই অজুহাতে নারীর স্কন্ধে চাপান যে কতদূর সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়, তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়? অথচ এই বিংশ শতাব্দীতেও এই একই অজুহাতে ভারতীয় নারীকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার হইতে নানাভাবে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। যথা, পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার পুরুষের পক্ষে অতি হিতজনক বলিয়া সর্বজন-স্বীকৃত হইলেও, সেই একই অধিকার নারীর পক্ষে বিষবৎ মন্দফলপ্রসূ বলিয়া ভারতীয় সমাজে অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে। পুনরায় পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ শুভফলপ্রসূ বলিয়াই সমাজে অনুমোদিত ও আইনসঙ্গত; কিন্তু নারীর পক্ষে বহুবিবাহ ত দূরে থাক্, পূর্বে ছিল সতীদাহ, এখন হইয়াছে চিরবৈধব্যই সমাজের রীতি। এইরূপে প্রতিপদেই নরনারীর অধিকার বৈষম্যই হইয়া দাঁড়াইয়াছে হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি।

কিন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল ন্যায় ও ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সেই সুবর্ণ যুগে নরনারীর মধ্যে কোনরূপ সামাজিক বৈষম্য করা হইত না। কন্যা পুত্রেরই ন্যায় মাতা-পিতার আকাঙ্ক্ষার ধন ছিলেন এবং কন্যাকামী মাতাপিতা 'পুংসবন' প্রভৃতি নানাবিধ ক্রিয়াকলাপে রত হইতেন। কিন্তু অদ্যাপি বৈদিক হিন্দুসমাজে পুত্রের জন্ম হয় মাঙ্গলিক হুলুধ্বনিতে, কিন্তু কন্যা অভ্যর্থিতা হন কান্নার কলরোলে! পুনরায়, প্রাচীন যুগে কন্যা পুত্রেরই ন্যায় সমান আদরে প্রতিপালিতা হইতেন, পুত্রেরই ন্যায় উপনয়ন প্রভৃতি শাস্ত্রীয় সংস্কারে অধিকারিণী ছিলেন এবং পুত্রেরই ন্যায় সকল জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিতেন। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ সম্পাদন ও পিণ্ড প্রদান, গৃহ্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান প্রভৃতি বিষয়েও কন্যার সমান অধিকার ছিল। বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল না এবং বর নির্বাচনেও কুমারীর পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সেই সময়ে বিবাহও নারী-জীবনের একমাত্র কাম্য বলিয়া বিবেচিত হইত না এবং নারীগণের পক্ষে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল না। পুরুষের ন্যায় নারীও ইচ্ছা করিলে চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবাদিনী ঋষি ও আচার্যা হইতে পারিতেন। বিবাহের পরও স্ত্রী স্বামীর সহিত সকল বিষয়ে সমান অধিকার দাবী করিতেন। তিনি ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী, দাসী মাত্র নহেন। সকল শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে তিনিই ছিলেন

পতির দক্ষিণ-হস্ত। শ্বশুরগৃহে তিনি পিতৃগৃহের ন্যায়ই সমান আদর ও সম্মানের সহিত পরিপালিতা হইতেন। "শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও"—ঋগ্বেদের এই সুবিখ্যাত বধূবরণ মন্ত্র শ্বশুরগৃহে নারীর উচ্চস্থানের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সমাজে মাতার স্থানও অতিউচ্চে ছিল। পুত্রকন্যা পিতার ন্যায় মাতার জন্যও পৃথক পিণ্ড প্রদান করিতেন। বস্তুত সন্তানের নিকট মাতাই ছিলেন পিতার অপেক্ষা অধিকতর গরীয়সী। গৃহ্যসূত্রাদির মতে, ধর্মত্যাগী পিতাকে সন্তানও পরিত্যাগ করেন এবং পিতার জন্য সন্তানের করণীয় শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি ধর্মাচারও কিছুই নাই। কিন্তু সহস্র দোষেও মাতাকে সন্তান পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তাঁহার জন্য ঔর্ধ্বদৈহিক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রীয় আচারই সন্তানের পক্ষে সকল অবস্থাতেও অবশ্য-করণীয়। মনুর মতেও, দশজন উপাধ্যায় একজন আচার্যের সমান, একশত আচার্য একজন পিতার সমান, কিন্তু মাতা গৌরবে ঈদৃশ সহস্র পিতাকেও অতিক্রম করিয়া যান। এইরূপে, প্রাচীন যুগে নরনারীর অধিকার ছিল সম্পূর্ণ সমান।

বৈদিক যুগের পরবর্তী স্মৃতি যুগে নানাদিক্ হইতেই সমাজের দুরবস্থা উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের পূর্ব গৌরবোজ্জ্বল অবস্থারও অবসান ঘটে। স্মার্ত সমাজপতিগণ নারীগণের জন্য নানাবিধ বেদবিরুদ্ধ আইনকানুন প্রচলিত করেন এবং ফলে নারী সকল স্বাতন্ত্র্য, সকল ন্যায্য অধিকার হারাইয়া পুরুষের ক্রীতদাসী-রূপে পরিণত হন। এইরূপে নারী উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ে অধিকার হইতে বিচ্যুত হন; এবং সমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, পণপ্রথা প্রভৃতি বহু কুপ্রথার প্রচলন হয়। বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন প্রথম সজোরে সতীদাহ প্রথা বঙ্গদেশে প্রচলন করেন। এই জঘন্য প্রথা যে বেদসম্মত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি "আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্রে"—এই প্রকৃত বৈদিক পাঠস্থলে "আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নেঃ—এই পাঠ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকৃত বৈদিক পাঠের অর্থঃ—শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে, নারীগণ প্রথমে গৃহে প্রবেশ করিবেন। সতীদাহের কোন উল্লেখই এস্থলে অথবা বেদের অন্যত্র কোনস্থলে নাই। কিন্তু রঘুনন্দন স্বকপোলকল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়া, ইহার কদর্থ করিলেন এই যে, নারীগণ অগ্নির গর্ভে প্রবেশ করুক, অর্থাৎ বিধবা নারীকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হউক। এইরূপে 'র'-এর স্থলে 'ন'—এই একটি মাত্র অক্ষরের পরিবর্তন দ্বারা রঘুনন্দন বাঙলা দেশের সহস্র সহস্র অবলা নারীকে যেরূপ পৈশাচিকভাবে জ্বলন্ত অগ্নিতে হত্যা করিতে বিধান দিলেন, সেরূপ নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে নাই। এইরূপে স্মার্ত ভট্টাচার্যগণের সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ, বৈষম্যমূলক, অন্যায্য বিধিবিধানে নারীগণ ক্রমশ দুর্গতির চরম গর্ভে নিক্ষিপ্ত হন এবং এই অবস্থা হইতে উদ্ধারের আর তাঁহাদের কোনই উপায় থাকে না।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক যুগপ্রবর্তক মহাত্মার আবির্ভাব হয়, তিনি বিশ্ববরেণ্য রাজা রামমোহন রায়। তিনি এই অতি বীভৎস সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া, সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া লর্ড বেণ্টিঙ্কের সহায়তায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর এই প্রথা আইনত রদ করিতে সমর্থ হন। রামমোহনই প্রথম রঘুনন্দনের পাঠ অবৈদিক বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন। এইরূপে এই নির্ভীক, অক্লান্তকর্মী, নারীত্রাতা রামমোহনের কৃপাতেই নারীগণ প্রথম বাঁচিবার অধিকার পাইলেন। ইহাই হইল নারীগণের অধিকারের দিক হইতে প্রথম উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার। কিন্তু বাঁচিবার অধিকার পাইলেও, নারীগণ মানুষের মত বাঁচার অধিকারে ছিলেন তখনও বঞ্চিতা। তাঁহারা ছিলেন পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র—সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না ও পরমুখাপেক্ষিণী। সেই সময়ের সমাজপতিগণ নারীদের হীন প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অপবাদ প্রচারেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না—যথা, নারীগণ হীন-চরিত্র, দৃঢ়তাহীন, স্বার্থসর্বস্ব, স্বল্পবুদ্ধি প্রভৃতি। শিক্ষাদীক্ষাহীনা অবলা নারীরা এই সকল মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করিতে সমর্থ ছিলেন না। তজ্জন্য মহাত্মা রামমোহনই ইহাদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নারীদের শিক্ষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

নারীদের অধিকারের দিক্ হইতে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আইন। রামমোহন বিধবাদের মাত্র বাঁচিবার অধিকার দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর দিলেন তাঁহাদের আনন্দের অধিকার, জীবন্মৃত অবস্থার স্থানে স্বেচ্ছাক্রমে সংসারে পুনঃপ্রবেশের অধিকার। সকলেই জানেন, মহামতি বিদ্যাসাগরকেও কিরূপ প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে জীবন তুচ্ছ করিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

নারীদের অধিকারের দিক হইতে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার শরদা প্রবর্তিত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন। ইহা ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অবশ্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রযোজ্য। কিন্তু নারীর দিক হইতেই ইহা বিশেষরূপে কার্যকরী হইয়াছিল, কারণ, বাল্যবিবাহ নারীর ক্ষেত্রেই সমধিক দৃষ্ট হয়। অষ্টম বর্ষে গৌরী দান করিয়া পুণ্য সংগ্রহের লোভে কত পিতাই যে স্নেহধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যাকে অকাতরে বলি দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

নারীদের অধিকারের দিক হইতে চতুর্থ উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার ১৯৩৭ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত হয়। নারীর সম্পত্তিতে অধিকার আইন। ১৯৩৮ সালে ৮ই এপ্রিল হইতে এই আইন সংশোধিত হইয়া স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর নিব্যূঢ় অধিকার স্বীকৃত হয়।

নারীদের অধিকারের দিক হইতে পঞ্চম উল্লেখযোগ্য আইন সংস্কার প্রচেষ্টা রাও কমিটি প্রণীত 'রাও বিল'। ইহা ১৯৪১ সালে উত্থাপিত হয়। ইহাতে আইনের বলে বহু বিবাহ রদ, অসবর্ণ ও সগোত্র বিবাহ প্রচলন, বিবাহ বিচ্ছেদ, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার এবং স্ত্রী-ধনে পুত্রের অর্ধাংশ অধিকার প্রভৃতি বহুল সংস্কারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা কবে এবং কিভাবে সত্যই আইনে পরিণত হইবে, তাহা অদ্যাপি অনিশ্চিত।

এইরূপে, ভারতীয় সমাজে নারীর অধিকারের কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বৈদিক যুগে নারীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকার কোনো অংশেই পুরুষের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। কিন্তু স্মৃতির যুগে নারী প্রায় সকল অধিকার হইতেই বিচ্যুত হন। পুনরায় ইংরাজী আমলে বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও নারী ক্রমশ পূর্বতন অধিকারের কিছু কিছু পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কতিপয় সুদূরদর্শী, ন্যায়বান, করুণাবান যুগপুরুষের সাহায্যেই নারী এই সকল অধিকার লাভে সমর্থা হইতেছেন। আইনত রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যতীতও শিক্ষা স্বাধীনতা, চাকুরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে, আইনের সাহায্য ব্যতীতই নারী ক্রমশ নানাবিধ অধিকার ফিরিয়া পাইতেছেন এবং ইহাও প্রধানত দেশপ্রেমিক জননায়ক ও সমাজপতিগণের সাহায্যেই। এইরূপে নারীর স্বাধীনতা সংগ্রামে, কতিপয় মহাত্মা পুরুষের দান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আজ কোনো কোনো নারী নিজেদের কথা নিজেরাই বলিতে শিখিয়াছেন, নিজেদের অধিকারের জন্য নিজেরাই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু নারী জাতির অতি ঘোরতর দুর্দিনে মূক অবলা, শিক্ষাদীক্ষাহীনা, সর্বপ্রকারে পরনির্ভরশীলা নারীদের জন্য খড়্গ ধারণ করিয়াছিলেন প্রথম পুরুষই। নারী সমাজ চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই পুণ্যশ্লোক মহর্ষিদের ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। কিন্তু অপর দিকে ইহাও অতি দুঃখের বিষয় যে, অধি-

কাংশ পুরুষই নারীদের ন্যায্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নানাভাবে বাধা প্রদান করিয়াছেন। প্রথমত সংস্কার প্রয়াসী মহাত্মগণের বিরুদ্ধে তাঁহারা অতি হীন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের হত্যার চেষ্টাও করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত নারীগণের বিরুদ্ধে তাঁহারা নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ প্রচারেও ক্ষান্ত হন নাই। তৃতীয়ত, আইন সংস্কার যে নারীর নিজের, দেশ ও সমাজের সর্ববিধ ক্ষতিজনক, তাহাও গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্থত, এই আইনগুলি যে সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরোধী, তাহাও মিথ্যা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা যুগপ্রবর্তক রামমোহনকে হত্যার প্রচেষ্টা, দলবদ্ধ হইয়া প্রিভি কাউন্সিলে আপীল, অতি তীব্র দেশ-ব্যাপী আন্দোলন প্রভৃতির কথা সর্বজন-বিদিত। অপর দিকে তৎকালীন সমাজ-পতিগণ নারীগণের বিরুদ্ধেও নানাবিধ হীন অপবাদ প্রচার করেন—যথা, নারীগণ স্বভাবতঃই এরূপ দুশ্চরিত্রা ও তরলমতি যে স্বামীর মৃত্যুর পরে তাঁহাদের আর সামলাইবে কে? তাঁহারা তো তখন যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পরিবার ও সমাজের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিবেন, ইত্যাদি। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও হত্যার জন্য প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল এবং সমগ্র সমাজ কি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সত্য। অপর দিকে এ স্থলেও নারীদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা অপবাদ রটিত হয়—যথা, বিধবা বিবাহের লোভে স্ত্রীগণ সকলেই স্ব স্ব স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিবে, ইত্যাদি। শরদা আইন ও গৌর আইন লইয়াও যে প্রবল বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও সকলেই জানেন। এ স্থলেও বলা হয় যে, নারীগণ এরূপ আত্মসংযমহীনা যে বাল্য-কালে বিবাহিতা না হইলে, তাঁহারা যৌবন প্রাপ্তা হইয়াই অবৈধ প্রেমে লিপ্তা ও কুল-ত্যাগিনী হইবেন; পুনরায়, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইলে, কুলোকের প্ররোচনায় সেই সম্পত্তি ধ্বংস করিবেন, ইত্যাদি। বর্তমানে রাও বিলের বিরুদ্ধেও যে দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সকলেই চক্ষের সম্মুখে দেখিতে-ছেন। এবং এই প্রসঙ্গেও নারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নিন্দা রটনার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথা, নারীরা বিবাহ-বিচ্ছেদে আইনত অধিকারিণী হইলে, তাঁহারা ক্রমাগত বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করিবেন, ইত্যাদি। এবং এই সকল স্থলেই যে প্রস্তাবিত আইনসমূহ—সতী-দাহপ্রথা রদ, বিধবা-বিবাহ, বাল্যবিবাহ বদ স্ত্রীর স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার, এক বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, কন্যার পিতার সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতি—সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরোধী, তাহাও তাঁহারা কেবল গলার জোরেই প্রমাণ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুত, ইহারা কোনো-ক্রমেই শাস্ত্রবিরোধী নহে। "শাস্ত্র" বলিতে আমরা "বেদই" বুঝিয়া থাকি। বৈদিকযুগে নরনারীর যে সমান অধিকার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই যুগে, সতীদাহ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না; বিধবা-বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এবং বিধবা নারীগণ প্রায়ই দেবরের সহিত পুনর্বিবাহিত হইতেন বলিয়া, "দেবর" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থঃ "দ্বিতীয়োবরঃ"; বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল; নারীর স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার ছিল; বহু বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, এক বিবাহই যে ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; অসবর্ণ বিবাহও প্রচলিত ছিল; বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল কি না, সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। অপর দিকে, শিক্ষাদীক্ষা, কর্ম বেদাধ্যয়ন ও উপবীতধারণ, মন্ত্রোচ্চারণ, যজ্ঞাদি সম্পাদন সকল বিষয়েই যে পুরুষেরই ন্যায় নারীরা সমান অধিকারিণী ছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। বস্তুত বৈদিক যুগ ছিল নারী স্বাধীনতার ও নারী প্রগতির সুবর্ণ যুগ। অতএব, বৈদিক হিন্দুসমাজ কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যে ক্রমশ নারীর সকল অধিকার, সকল স্বাধীনতা হরণ করিয়া, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ, নানা বিদ্যাশিক্ষা, উপবীতধারণ, মন্ত্রোচ্চারণ, নিজ ইচ্ছামত বর বরণ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক, মুখ্য অধিকার হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছে,—কেবল তাহাই নহে, সেই সকল অধিকার পুনঃ-স্থাপনের প্রচেষ্টাকেও অশাস্ত্রীয় বলিয়া "জাতি গেল, ধর্ম গেল" রব তুলিয়াছে—তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

বস্তুত, বর্তমানে হিন্দুসমাজ বহুলাংশেই স্মৃতিমূলক, বেদমূলক নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অধিকাংশ স্মার্ত সমাজপতি গণই অতি অন্যায়ভাবে নারীর পূর্বতন সকল ন্যায্য অধিকারই হরণ করেন। কিন্তু নারী জাতির সেই ঘোরতর দুর্গতির দিনেও, কতিপয় ন্যায়ধর্মবান্ উদারহৃদয় স্মার্ত পণ্ডিত নারীর অধিকার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হন, এবং বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, নারীর সম্পত্তিতে অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায়ানুমোদিত বিধান দেন। এইরূপে, নারীর অধিকারের দিক্ দিয়া, স্মৃতি দ্বিবিধ—যাহা নারীর অধিকারের স্বপক্ষে, যাহা ইহার বিপক্ষে। পূর্বোক্ত স্মৃতিই কেবল বেদসম্মত, শেষোক্ত স্মৃতি নহে, যেহেতু, বেদ নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করেন। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈদিক হিন্দুসমাজ পূর্বোক্ত বেদ-সম্মত স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া, শেষোক্ত বেদ-বিরুদ্ধ স্মৃতিই সাদরে গ্রহণ করিয়া নারী জাতির ও নিজের অশেষ দুর্গতিরই কারণ

হইয়াছে। ইহার ত কোনোরূপে ন্যায্য, ধর্মসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কেবল দুঃখের সহিত শরচ্চন্দ্রের ভাষায় স্বীকার করিতে হয় যে, "এস্থলে পছন্দ করি না, এইটাই আসল কারণ। বাস্তবিক কোনো শাস্ত্রই পুরুষে অধিক দিন মানিয়া চলে না যদি না তাহা তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সহিত মিশ খায়!"

অতএব, আজ আমাদের নারীদের এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে যে, নারীস্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের পুরুষ জনসাধারণের নিকট হইতে আমাদের উৎসাহ বা সাহায্য পাইবার বিন্দুমাত্রও আশা নাই। উপরন্তু, একদিকে সমাজের উপর বিষময় ফল, শাস্ত্রবিরুদ্ধতা প্রভৃতি সম্বন্ধে 'লম্বা চওড়া' কথা বলিয়া; অপর দিকে নারীর স্বভাবজ উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা, স্বল্পবুদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে হীন কটূক্তি প্রচার করিয়া তাঁহারা সর্বদাই নারী প্রগতির পথে প্রবল বাধাস্বরূপে হইয়া দণ্ডায়মান হইবেনই। জগতের সকল নারী আন্দোলনের সহিতই বিজড়িত হইয়া আছে পুরুষের এইরূপ স্বার্থপর প্রতিকূলতার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ, কারণ নারীর অধিকারের অর্থই ত পুরুষের অখণ্ড প্রভুত্বের বহুল হ্রাস। বিশেষভাবে, আমাদের দেশে এক্ষেত্রে পুরুষের প্রতিকূলতা ত চরমে উঠিবেই, কারণ কোনো দেশেই পুরুষ ও নারীর প্রতি কেবল সেই কারণেই এরূপ আকাশ পাতাল পার্থক্য করা হয় না; কোনো সমাজেই পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ অত্যধিক পক্ষপাত, অনুগ্রহ ও নিয়মকানুন শৈথিল্য, এবং নারীর ক্ষেত্রে সর্বদিক হইতে এরূপ অতি কঠোর বিধিবিধান দৃষ্ট হয় না। অতএব ক্ষমতা হ্রাসের ভয়ে, ভারতীয় পুরুষ স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নারীকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছে। সতীদাহ প্রথার মত নিষ্ঠুরতম প্রথা রদের বিরুদ্ধেও যে পুরুষ অতি প্রবল ভাবেই দাঁড়াইতে পারেন, তাহার নিকট আর নারীর আশা কি? বস্তুত, উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, বৈদিকযুগের পর হইতেই, ভারতের জনসাধারণ যে কোনো উপায়েই হউক, সর্বদাই নারীস্বাধীনতা আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করিতেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। পুনরায় বলিতেছি যে, যে সকল মহাপ্রাণ সমাজসংস্কারক নারীদের সপক্ষে সংগ্রাম করিয়া জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট সমগ্র নারীসমাজ অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ। কিন্তু দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে যে নারীগণ কেবল প্রবল প্রতিকূলতাই পাইয়াছেন, তাহাও সমভাবে স্বীকার্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন নারীও থাকেন। কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক স্বাধীনতা আন্দোলনেই "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর" এইরূপ দুইচারিজন সর্বদাই জুটিয়া যান। আমেরিকাবাসিগণের নিগ্রোদের দাসত্ব প্রথা দূরীকরণের নিমিত্ত সংগ্রামে নিগ্রোদের অনেকেই ঐ প্রথা দূরীকরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। সেইজন্য মহাত্মা এব্রাহাম্ লিঙ্কন্ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন; "দাসগণই দেখি দাস থাকিতে চায়!" এক্ষেত্রে আমাদের নারীদের নির্ভয়ে ও সজোরে স্বীয় মতামত প্রকাশের শিক্ষা, সাহস ও সুযোগ অতি অল্পই।

সনাতনপন্থিগণ কেহ কেহ বলেন যে, "নারী আন্দোলনের" আগাগোড়াই সবটুকুই ভুয়া—বস্তুত "নারীস্বাধীনতা আন্দোলন" কথাটিই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ বশতই গৃহীত মাত্র, আমাদের ঋষি শাসিত সুপ্রাচীন, সুপবিত্র আর্যসভ্যতায় এই শব্দটির কোনো অর্থই নাই, কারণ আমরা ত চিরকালই নারীকে "দেবী" বলিয়াই পূজা করি; সুতরাং সমাজে নারীর স্থান চিরকালই অতি উচ্চে; নূতন করিয়া আন্দোলনের আর প্রয়োজনটা কি? সুতরাং এই আন্দোলন কেবল সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করিবার জন্যই কতিপয় অত্যুৎকটরূপে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানিনী নারীর কুপ্রচেষ্টা মাত্র।

নারীস্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সনাতনিগণের এই চিরপুরাতন আপত্তির বিরুদ্ধে আমরা বিশেষ কিছু এইস্থানে বলিবার চেষ্টা করিব না। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদি সত্যই আধুনিক ভারতীয় সমাজ বৈদিক ঋষি শাসিত হইত ত, সমাজে নারীর এরূপ দুর্গতি কদাপি সম্ভবপরই হইত না—হিন্দুসমাজ নারী অধিকারের দিক হইতে বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই না আজ এইরূপ দুর্গতি! এবং বর্তমান হিন্দুসমাজে "দেবী"রূপে পূজিতা নারীর যে-কোনো দুঃখ, কোনো গ্লানি, কোনো ন্যায্য অধিকারের অভাবই নাই যাহার জন্য কোনোরূপ আন্দোলনের প্রয়োজন আছে,—ইহা যিনি বলেন, তিনি তাহা কেবল গায়ের জোরেই বলেন, সত্যের জোরে নহে। "দেবী" প্রভৃতি কেবল কতগুলি 'গালভরা' কথাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার দিন আজ আর নারীর নাই। নামে "দেবী", কিন্তু কাজে দাসীরও অধম—ইহার দৃষ্টান্তও ঘরে ঘরে। বৃথা চীৎকার বা বাদপ্রতিবাদ দ্বারা সেই সত্যকে এতদিন ঢাকিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেদিন আর নাই। সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে পিতা যখন মায়াদয়াহীন হইয়া অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা কন্যাকে সুপাত্রের অভাবে অপাত্রেই গৌরীদান করেন, তখন শাস্ত্রানুসারে পুণ্য সঞ্চয় হইল ত পিতারই। কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতী "গৌরী" তুল্য সেই নির্দোষা বালিকাকে যে সারাজীবনই জ্বলন্ত তুষানলে দগ্ধ হইতে হইল, তাহার প্রতিকার কি? সে দুঃখ কি দুঃখ নহে, সুখ? অথবা পুরুষকে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সুযোগ দিয়া নিজে দুঃখানলে দগ্ধ হওয়াই শাস্ত্রমতে নারীর অনন্ত পুণ্য ও সুখ? পুনরায়, বিধবা নারী পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনেরই অধিকারিণী হইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত জীবন যাপন করেন, তাহার ত ইয়ত্তা নাই। বিনা দোষে স্বামিপরিত্যক্তা ও সপত্নীপরিবৃতা নারীর চক্ষের জল একত্র করা সম্ভবপর হইলে যে, হিন্দুসমাজ ভাসিয়া যাইত তাহা নিঃসন্দেহ। অপরপক্ষে, অতি দুশ্চরিত্র, কুৎসিত রোগগ্রস্ত স্বামীর কবল হইতেও নিস্তারের কোনো উপায় তাঁহার নাই। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। এই যে তিলে তিলে জীবন্তে মরণ, এই যে প্রাত্যহিক জীবনের পুঞ্জীভূত পর্বত প্রমাণ দুঃখ অপমান—ইহা কি কেবল গলার জোরে 'নাই' বলিলেই ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে? অতএব নারী আন্দোলনের এবং নারীসম্বন্ধীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতির সংস্কারের যে কোনই প্রয়োজন নাই, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা লোক হিসাবে হয় অন্ধ নয় অতি মন্দ।

অতএব, বাধ্য হইয়া আজ দেশের নারীসমাজকে স্বীয় অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জনসাধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। ইহা আমরা নিরুপায় হইয়াই করিয়াছি, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নহে, কারণ আমাদের মতে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক প্রতিযোগী সম্পর্ক নহে, সহযোগী সম্পর্ক। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারীর শুভাশুভ পরস্পরবিরোধী ত নহেই, উপরন্তু পরস্পরাশ্রয়ী। তজ্জন্যই যাহা নারীর পক্ষে অশুভ, তাহা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের পক্ষেও সুখের কারণ হইতে পারে না। নারীকে সম্পূর্ণ অন্যায্যভাবে পদদলিত করিয়া রাখিলে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, পুরুষের বুঝি আর সুখের সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু যাঁহারা সুদূরদর্শী তাঁহারা বলিবেন যে, যেহেতু পুরুষ ও নারী লইয়াই সমাজ, কেবল পুরুষকেই লইয়া নহে, সেহেতু নারীর দুর্গতি সমাজেরই দুর্গতির কারণ এবং সমাজের দুর্গতি পরিশেষে পুরুষেরও অশেষ দুর্গতির হেতু হয়। শরীরের একটি অঙ্গ পচিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে সমগ্র শরীরই আক্রান্ত হয়, এবং সেক্ষেত্রে অপরাপর অঙ্গের সুখের আশা আর কই? বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মা পুরুষরূপে

বিদ্যমান্ ছিলেন, এবং তিনি স্বীয় দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন—এইরূপে পতি ও পত্নী হইল। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক পুরুষ অর্ধ বিদলের (ঝিনুকের) ন্যায়, এই শূন্য স্থান স্ত্রীই পূর্ণ করেন। এইরূপে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই নারী পুরুষের অর্ধাংশ, অর্ধাঙ্গী, দাসী বা সম্পত্তি নহে। এই মূলীভূত সত্য যিনি বিস্মৃত হন, তিনি স্বীয় দেশের ও সমাজের হিতও বিস্মৃত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণের অধিকাংশই অদ্যাপি, অজ্ঞতাবশতই হউক বা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, নারীপ্রগতির সর্ববিধ প্রতিকূলতা করাই জীবনের মূল-মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আমাদেরও বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে! "If you come, with you; if you do not come, inspite of you":—"তোমরা যদি আমাদের সপক্ষে যোগ দাও ত তোমাদের সঙ্গেই, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের বিপক্ষে দাঁড়াও ত তোমাদের বিরুদ্ধেই আমাদের নারীস্বাধীনতার স্থির লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।" এখন দেশের জনসাধারণ স্থির করুন কোন্ পন্থা তাঁহারা অবলম্বন করিবেন—মৈত্রী না সংগ্রাম, জীবন না মরণ, জাতির অশেষ কল্যাণ না চরম দুর্গতি।

দেশের কথা

(২০শে কার্তিক—২৬শে কার্তিক)

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল"—নির্বাচন সভা—অন্নভাব বস্ত্রাভাব—বর্ধমানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ।

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল"—গত ৫ই নবেম্বর দিল্লীর দুর্গে 'ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" ৩ জন নায়কের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। জানা গিয়াছে—

ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ
সুবেদার সিদারা সিংহ
জমাদার ফতে খান

এই ৩ জনেরও বিচারের আয়োজন হইতেছে।

দিল্লী দুর্গে বিচারকালে আসামীপক্ষের প্রধান ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই ৩ সপ্তাহের জন্য মামলা স্থগিত রাখিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে স্থির হয় সরকার পক্ষের ব্যবহার জীবের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও সরকারপক্ষের প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যদান শেষ হইলে ২১শে নবেম্বর পর্যন্ত মামলা স্থগিত থাকিবে।

সরকারের পক্ষে প্রথম সাক্ষী—লেফটেন্যান্ট ডি সি নাগ। ইনি ঢাকা বারদীর নাগ পরিবারের লোক; প্রথমে সাবডেপুটি থাকিয়া পরে ডেপুটি হন এবং পদোন্নতিতে শেষে সামরিক কর্মচারী হন। তিনি ভারতীয় জাতীয় সেনাদলে ছিলেন এবং ঐ দলের সেইন বিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। এখন তিনি সরকারপক্ষের সাক্ষী হইয়াছেন।

৬ই নবেম্বর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। সেদিন আসামী সেগলের ২ ভগিনী হিন্দু রীতি অনুসারে ভ্রাতার ললাটে চন্দন দিয়া তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন। সেগলের জননীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাশ্রুনেত্রে পুত্রের মুখ চুম্বন করেন।

বোম্বাই শহরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ৫ই নবেম্বর "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" মুক্তি চাহিয়া সভার উদ্বোধন করেন এবং ঐদিন কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি সৈয়দ নৌসের আলীর সভাপতিত্বে ঐ উদ্দেশ্যে বিরাট সভা হয়। সভায় জনগণ সেনাদলের সকলের মুক্তি দাবী করেন। নৌসের আলী সাহেব বলেন—আমরা সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদিগকে জানান কর্তব্য বলিয়া মনে করি—এই সকল লোকের মুক্তি সম্বন্ধে দেশবাসীর দাবী যদি অবজ্ঞাত হয়, তবে ভারতবর্ষ কখনও তাহা সহ্য করিবে না এবং যদি তাহার ফলে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে, তবে সেজন্য রাজকর্মচারীরাই দায়ী থাকিবেন। যদি তাঁহাদিগের কাহারও কেশাগ্র স্পর্শিত হয়, তবে ভারতবর্ষ সেই কাজের বিষয় ভুলিবে না—তাহা কখনও ক্ষমা করিবে না।

যশোহর জিলার ঝিকরগাছায় বন্দী "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" ৬ হাজার লোক আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকের বিচারের প্রতিবাদে পায় ২ দিন অনশনে থাকিয়া তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে।

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দিল্লী দুর্গে বিচারাধীন ক্যাপ্টেন শা নওয়াজকে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন।

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লোক ও তাঁহাদিগের স্বজনগণকে সাহায্যদানের জন্য কলিকাতায় যে সমিতি গঠিত হইয়াছে—সৈয়দ নৌসের আলী তাহার সভাপতি; বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সহকারী সভাপতি; কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খান ও শ্রীযুক্ত ভগীরথ কানোরিয়া যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ; শ্রীযুক্ত সীতারাম সাকসেরিয়া ও শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বসু যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শীঘ্রই মধ্য কলিকাতায় সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্থান বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্বে ১নং উডবার্ন পার্কে সাহায্য গৃহীত হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আশা প্রকাশ করিয়াছেন—বাঙলায়ও বোম্বাইএর মত অর্থ সংগৃহীত হইবে। তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে, এমন লক্ষণ ইতিমধ্যেই চারিদিকে লক্ষিত হইতেছে।

জানা গিয়াছে, "সেনাদলের" ৫ জন লোক কামটীতে আটক রহিয়াছে।

৫ই নবেম্বর বহু লোক লাহোর কৃষ্ণনগরে মহিলা বিদ্যাপীঠের সম্মুখে উপনীত হইয়া ঐ দিনের জন্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয় বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। পুলিস ২ ঘণ্টার মধ্যে ৩ বার সমবেত জনতার উপর লাঠি চালাইয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে।

৪ঠা নবেম্বর "জাতীয় সেনাদলের" বন্দীদিগের সম্বন্ধে বক্তৃতা করায় তাহা আপত্তিজনক মনে করিয়া পুলিস ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য লালা কেদারনাথ সেগালকে ভারতরক্ষা নিয়মের বলে পরদিন গ্রেপ্তার করে। লাহোরে পুলিস আরও কয়জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মহেন্দ্র গোপের ফাঁসি—গত ১০ই নবেম্বর ভাগলপুর জেলে আগস্ট মাসের (১৯৪২ খৃঃ) হাঙ্গামা সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ গোপের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রিভি কাউন্সিলে মৃত্যুদণ্ডের সম্বন্ধে আপীল নামঞ্জুর হইলে গত ৫ই নবেম্বর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সরকারকে মৃত্যুদণ্ড নাকচ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক বিবৃতি প্রচার করেন। ৮ই নবেম্বর তিনি সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বড়লাটের ও বিহারের গভর্নরের নিকট তারও করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই সরকার সে অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে—মহেন্দ্রনাথ গোপেরও তাহাই হইল। উভয়ের প্রাণরক্ষার জন্য দেশের সর্বস্থান হইতে যে আবেদন জানান হইয়াছিল, তাহা যে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা তিনি বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিয়াই বিবেচনা করেন।

রেল দুর্ঘটনা—গত ৭ই নবেম্বর প্রত্যূষে কলিকাতাগামী দার্জিলিঙ ডাক ট্রেনের সহিত আত্রাই ঘাট স্টেসনে বিপরীত দিকগামী উত্তর-বঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। প্রথমেই ৯ জনের মৃত্যুর ও ৫২ জনের আহত হইয়ার সংবাদ পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে বলা হইতেছে, উত্তর-বঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক নিষেধজ্ঞাপক চিহ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বর্তমান সময়ে ট্রেন দুর্ঘটনা যে পূর্বের তুলনায় অত্যন্ত অধিক হইতেছে, তাহার কারণ কি?

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গত ৫ই নবেম্বর তাঁহার টালিগঞ্জস্থিত ভবনে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-কর্মী, সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী ডক্টর চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৬ মাসকাল আমাশয়ে ভুগিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। বর্ধমান জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে তিনি ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করেন এবং টালিগঞ্জ অঞ্চলে জমির উন্নতি সাধন করিয়া বহুলোকের বাস-ব্যবস্থা করেন। তিনি যাদবপুরে যক্ষ্মা-হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতাল, বেলতলা বালিকা বিদ্যালয় সমিতি, নারী-কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতিরক্ষার্থ ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। টালিগঞ্জে চারু এভিনিউ, চারু বাজার, চারু পার্ক তাঁহার সৃষ্টি।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু-সংবাদ—আমেরিকার "ইউনাইটেড প্রেস" নামক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যে সংবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, জাপান প্রবাসী ভারতীয়গণ বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু-সংবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, জাপানী সরকারী সংবাদে ও ঘটনা-সংস্থান সংবাদে অনেক অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। কাজেই

তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ রহস্যাচ্ছন্ন রহিয়া গেল।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন—গত ৯ই নবেম্বর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্বাচন কার্যের উদ্বোধন করিয়াছেন।

সভায় কিরূপ বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা কয়টি দুর্ঘটনায় সহজে অনুমান করা যায়।

(১) ভীড়ে—রথীন্দ্রনাথ কুণ্ডু নামক একজন যুবক ও জ্যোতি পাল নামক একটি বালক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইবার পূর্বেই শেষ শ্বাস ত্যাগ করে।

(২) নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আহত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হয়—

যোগেশ্বর সাহা, প্রশান্ত রায়, শৈলেন্দ্র চৌধুরী, ভূপেন্দ্রমোহন মণ্ডল, সতীনাথ ভট্টাচার্য ও উষারঞ্জন বিশ্বাস ইত্যাদি।

প্রথমোক্ত ২ জনের শব পুষ্পস্তবক সজ্জিত করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহ করা হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এই দুর্ঘটনার জন্য হতাহতের স্বজনগণের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি পরদিনই কংগ্রেসের কার্যে কার্সিয়াং যাত্রা করায় স্বয়ং

তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারেন নাই।

সভায় কয়জন মুক্তিপ্রাপ্ত "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লোক উপস্থিত ছিলেন।

শরৎবাবু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—কংগ্রেসকে ভোট প্রদান ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভোট প্রদান। কংগ্রেসই গত ৬০ বৎসর কাল ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভার মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে নাই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যখন গান্ধীজী ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করেন, আর ভারতের বাহিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাঁহাদিগের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করেন—তখন এই সকল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কি করিয়াছিলেন ? তাঁহারা যদি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন, সে-ও ভাল ছিল। কিন্তু তাঁহারা তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস যে মুসলিম লীগের পাকিস্থান পরিকল্পনার বিরোধী, তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে।

শরৎবাবু বলেন—বাঙলা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমানাতিরিক্তদিগের জন্য ৮টি পদে কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়নের পূর্বে তিনি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ২টি পদ তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিদিগের জন্য দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কংগ্রেস ৮টি পদেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৮টি পদের মধ্যে একটি জমিদারদিগের ও একটি মহাজন সভার। অবশিষ্ট ৬টির মধ্যে যদি কংগ্রেস শ্যামাপ্রসাদবাবুর মনোনীত ২ জনকে ২টি পদ দিতেন, তবে তিনি হয়ত ৩টি বা ৪টিও পদ পাইতে পারিতেন।

পাছে লোক মনে করে, শরৎবাবু স্বয়ং নিরাপদ নির্বাচন-কেন্দ্রে প্রার্থী হইতেছেন, সেইজন্য শ্যামাপ্রসাদবাবু বর্ধমান কেন্দ্র হইতে প্রার্থী হইবেন শুনিয়া তিনি ঐ কেন্দ্রেই প্রার্থী হইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু বর্ধমান কেন্দ্র হইতে বা কলিকাতা কেন্দ্র হইতে নির্বাচন প্রার্থী না হইয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে প্রার্থী হইয়াছেন। তথায় কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত - নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হইবার সম্ভাবনা। বর্ধমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপক্ষীয় প্রার্থী—কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ।

বাঙলার মুসলমান কেন্দ্রসমূহ হইতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা মুসলিম লীগ-মনোনীত প্রার্থীদিগের বিরোধিতা করিতেছেন।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ—পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলায় ও পশ্চিম বঙ্গে বর্ধমানে হিন্দুর প্রতিমা বিসর্জন লইয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। পুলিস সংঘর্ষ রোধ করিতে পারে নাই। ঢাকা শহরেও ২ জন লোক ছুরিকাঘাত সহ্য করিয়াছে—কতকগুলি দোকান লুণ্ঠিত হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর বর্ধমানে কালী-প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রার সময় ভেড়ীখানা মসজেদের সম্মুখে হাঙ্গামা বাধে। পুলিস যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও শোভাযাত্রাকারীদিগের প্রতি ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাতেই হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। সদর থানার দারোগা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিসের ইন্সপেক্টর আহত হন। ঐ অঞ্চলে কয়খানি দোকানে অগ্নিযোগ করাও হয়। বর্ধমান শহরে ভেড়ীখানা মসজেদ ইতিপূর্বেও হাঙ্গামার কেন্দ্র হইয়াছে।

গান্ধীজীর বাঙলা সফর—জানা গিয়াছে, গান্ধীজী আগামী ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। তিনি কলিকাতায় উপনীত হইবার পরে তাঁহার আসাম গমনের দিন নির্ধারিত হইবে। গান্ধীজী ডায়মণ্ডহারবারে গমন করিবেন। তথায় তাঁহাকে ১০ হাজার টাকা উপহার প্রদানের আয়োজন হইতেছে। তিনি মেদিনীপুর জেলায়ও গমন করিবেন।

গান্ধীজীর আগমনে যে বাঙলায় কংগ্রেস-পক্ষীয় নির্বাচনের আন্দোলন প্রবল হইবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

অন্নাভাব-বস্ত্রাভাব—ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নিরন্নের ও অর্ধনগ্নের অভিযান সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

স্যার ফিরোজ খাঁ নুন—স্যার ফিরোজ খাঁ নুন ভারত সরকারের আদরের আধিক্য লাভ করিয়াছেন। শেঠ সুদর্শন পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী দলের "চীফ হুইপ"। তিনি গত ১০ই নভেম্বর লাহোরে বলিয়াছেন—দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে স্যার ফিরোজ খাঁ বড়লাটকে ও জঙ্গীলাটকে "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" বিচারের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—ঐ সকল লোককে মুক্তি দিলে পাঞ্জাবে ও অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহের বন্যা বহিবে। স্যার ফিরোজ খাঁ এবার পাঞ্জাব হইতে ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচনপ্রার্থী। তিনি গত ১১ই তারিখে ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—বড়লাট শেঠ সুদর্শনকে মামলা সোপর্দ করুন।

আসামের গভর্নর—প্রকাশ, ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের সেক্রেটারী মিস্টার ওয়াগ আসামের গভর্নর হইবেন। কিন্তু আপাতত তাঁহার সার রামস্বামী মুদেলিয়ারের বিদেশ গমনে বড়লাটের শাসন পরিষদে সদস্য হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহা হয়, তবে তিনি আগামী এপ্রিল মাসে আসামে গভর্নর হইবেন।

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল"—প্রকাশ, যুদ্ধের সময় ব্রহ্মে বেসামরিক কার্যে নিযুক্ত ২ হাজার উড়িয়া "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলে যোগ দিয়াছিল, ঐ ২ হাজার উড়িয়ার মধ্যে বোধ হয় ৪ জন সেনাদলে নায়কের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

বৈদেশিকী

আগেই বলা হইয়াছে যে, আণবিক বোমা দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষ হইবে না। ইহা দ্বারা শান্তি স্থাপন করা দূরে থাকুক বরঞ্চ অশান্তির সৃষ্টি হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। সম্প্রতি এই ব্যাপারে মিঃ মলোটভ অকাট্য যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আণবিক বোমার আসল উদ্দেশ্য কখনই আত্মরক্ষা হইতে পারে না, কারণ যতদূর দেখা যাইতেছে, ইহা সব সময়েই শত্রুকে আক্রমণ করার কাজেই লাগিবে। মার্কিনবাসী ও ইংরেজেরা যদি ইহার ব্যবহার ও গোপন-তথ্য একচেটিয়া করিতে চায়, তবে ইহা কার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইবে? পরাধীন দেশ বা বিজিত দেশ-গুলির এখন এমন ক্ষমতা নাই যে তাহাদের বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে। তাহাদের পক্ষে সাধারণ রকমের বন্দুক কামানই যথেষ্ট। তারপর আসে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিগুলি। বিজিত দেশ-গুলি সম্বন্ধে যে যুক্তি প্রযোজ্য এইগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যাইতে পারে। বাকী থাকে কেবল সোভিয়েট রাশিয়া। মিঃ চার্চিলের গত দুইটি বক্তৃতাতেই আণবিক বোমার রাজনৈতিক দিকটার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই বিষয়ে আমেরিকার মতামতকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করিয়াছেন এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই অদ্বিতীয় অস্ত্রের গুপ্ত রহস্য এ যাবৎ কেবল আমেরিকারই জানা আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ বলিতেও ভুলেন নাই যে, এই ব্যাপারে বছর তিনেক পরে ইঙ্গ-মার্কিনদের প্রাধান্য আর থাকিবে না। ইংরেজীতে একটা বচন আছে—রোদ থাকিতে খড় বানাইয়া লও। এও খানিকটা সেইরূপ। যতদিন ইহাদের বর্তমান প্রাধান্য আছে, পাশ্চাত্য শক্তিগুলির ক্ষমতা যত পার বাড়াইয়া লও। কিন্তু আসলে কে জোর করিয়া বলিতে পারে যে, সোভিয়েটেরা আণবিক বোমার গুপ্ত রহস্য সত্যই জানে না। অনেকেই জানেন অধ্যাপক পিটার ক্যাপিৎসা লর্ড রাদারফোর্ডের সঙ্গে বহুকাল ক্যাম্ব্রিজে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে আণবিক গবেষণায় জগৎ বিখ্যাত তাহা নহে, তিনি সোভিয়েট রাশিয়ারও একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক-গবেষক। আরও কথা এই যে, অর্থের দিক দিয়াও গবেষণা চালাইবার সামর্থ্য আমেরিকা হইতে সোভিয়েটের কম নয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা ভাল যে, আজ-কালকার জগতে কোন মৌলিক গবেষণা প্রচুর অর্থ ও সুযোগ না থাকিলে করা অসম্ভব। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুন্নত অবস্থার জন্য আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বহুল ভাবে দায়ী।

ইন্দোনেশিয়া হইতে খবর আসিয়াছে যে, ডাচ গবর্ণমেণ্ট ডাঃ ফান্ মোকের মারফতে বিপ্লবীদের সঙ্গে একটা রফা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য, রফাই যদি করিতে হইল তবে এত রক্তারক্তির কি দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত ডাচরা যা দিতে রাজী হইয়াছে, তাকে স্বাধীনতা বলা চলে কি না। তাঁরা দয়া করিয়া ইন্দোনেশিয়দের 'ডাচ কমনওয়েলথে সমানভাবে স্থান দিবেন স্থির করিয়াছেন! 'ডোমিনিওন' পদবী' যদি সত্যই স্বাধীন পদবীর সমান হয়, তবে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে এত আপত্তি কেন? ডাঃ সুকর্ণের উত্তর হইতে বুঝা যায় যে, ইন্দোনেশিয়াবাসীরা ডাচদের সঙ্গে এই ভাবে জড়িত হইতে চায় না। নূতন ব্যবস্থাতে ক্ষমতার দিক দিয়া ওলন্দাজ শাসকদের বর্তমান অবস্থার কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। ডাচ গবর্ণমেণ্টের এই রাজনৈতিক চালের পিছনে দুইটি [illegible] জবর-দস্তির পর হঠাৎ যখন ইন্দোনেশিয়দের সঙ্গে 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' নীতি প্রবর্তিত হইল তখন বুঝিতে হইবে যে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের নীতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। তারা বুঝিয়াছে যে, দমন-নীতি পুরাদমে চালাইলে উপনিবেশিক বিপ্লব আরও ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। সুতরাং নরম নীতি দিয়া যদি ইহার গতি ফিরানো যায়, তবে সাম্রাজ্যবাদ আরও কিছুকাল কায়েম থাকিবে। এশিয়াবাসীর ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান ক্রমেই বাড়িতেছে। পশ্চিম ইউরোপের টনক নড়িয়াছে। ইন্দোচীনেও গরম ও নরম নীতির প্রয়োগ সমতালে চলিতেছে। কিন্তু নরম পন্থার দিকে ক্রমেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের আসল রূপটি এখনও একই রহিয়াছে, কেবল মুখোস বদলাইতেছে মাত্র।

প্র-না-বি-র পাতা

ফুলকপি

'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল' প্রত্যক্ষ কোথাও যদি একত্র থাকে—তবে ওই ফুল কপি। শুধু একত্র নয়—এক তোড়াতে। একটি ফুলেই একটি তোড়া। হেমন্ত লক্ষ্মী নিজে আসিয়া পৌঁছিবার আগে বাণী বহন করিয়া এই পুষ্প দূতটিকে পাঠাইয়া দেন। প্রকৃতি নিজের হাতে তোড়াটি বাঁধিয়াছে—এমন কি ফুলের পটভূমি রচনায় কয়েকটি সরস সবুজ পাতারও অভাব হয় নাই। পেশীবহুল ফুল কপিটি কেমন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, যেন মেদের স্ফীতি আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। শুভ্র রঙের সঙ্গে সঙ্গে একটু হলদের আভামেশানো শ্বেতাঙ্গ আর চীনা দম্পতির সন্তানটি যেন।

ফুল কপি এপর্যন্ত কোন কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ইহার প্রতি একটা আভ্যন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও বেচারার প্রতি কবিদের কি অবহেলা! কবিরা ইহার ফলত্বের দিকটাই দেখে—অপরদিকে ভোগীরা ইহার ফুলত্বটা দেখিতে পায় না। ফলে বেচারা কোন কালে আর ললিতকলার আসরে স্থান পাইল না। কিন্তু ভাবিয়া দেখো, এমনভাবে একাধারে ভোগীকে ও কবিকে পরিতৃপ্ত করিবার ক্ষমতা আর কার আছে? ফুলের সৌন্দর্য ও ফলের স্বাদুতা আর কে মিলাইতে পারিয়াছে?

শেক্সপীয়র যে মাপের কবি সেই মাপের ভোজন রসিক হইলে 'সোয়ালো' পাখী ভরসা করিয়া আসিবার আগেই ডাফোডিল ফুল বসন্তের আসরে আসিয়া সৌন্দর্যের ওড়না উড়াইয়া দেয় না বলিয়া বলিতেন শীতের বাজারে হরেল, সরাল প্রভৃতি পাখী উঠিবার আগেই ফুল-কপি আসিয়া বাজারের একটি কোণ পীতাভ শুভ্রতায় উজ্জ্বল করিয়া তোলে। এখন শেক্সপীয়র নাই—কিন্তু প্র-না-বি আছে, কাজেই সে একেবারে অনাদৃত থাকিয়া যাইবে না। কিন্তু তার আগে একটা গল্প বলিয়া লই।

রাধা প্রতি রাত্রে ঘরটি নানা ফুলে সাজাইয়া কৃষ্ণের জন্য বাসক সজ্জিতা হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর আসেন না। ভোরবেলা বাসি ফুলের স্তূপ মলিনা রাধা বাহিরে ফেলিয়া দেন। এমন প্রতি রাত্রি হয়—রাধার রাত্রি জাগরণ, আর ভোরবেলা বাসি ফুল নিক্ষেপ। অবশেষে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া রাধা রাত্রে ঘরটি সাজাইলেন সজনে ফুলে। সে রাত্রেও কৃষ্ণ আসিলেন না—কিন্তু রাধাকে আর ফুল ফেলিয়া দিতে হইল না। তিনি দুপুর বেলা শর্ষে বাঁটা দিয়া সজনে ফুলের চচ্চড়ি রাঁধিয়া খাইলেন। সজনে ফুলও একাধারে ফুল ও ফল অর্থাৎ খাদ্য। (সজনে ফুলের বিষয়েও লিখিতে পারিতাম কিন্তু শীতকালে ফুলকপিই প্রশস্ত। বিশেষ ফুলকপি এবারে এমন দুর্মূল্য যে, প্রবন্ধ রচনা ছাড়া আর কোন ঘনিষ্ঠ উপায়ে তাহাকে ভোগ করা বড়ই কঠিন।)

পাঠক, এতক্ষণে বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ফুলকপিকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা তত্ত্বকথা বলিতে বসিয়াছি। (বাস্তবিক কি বুদ্ধি!) ফুলকপি মানুষের জীবনের পূর্ণতার প্রতীক। ফুল এবং ফল, সৌন্দর্য এবং বাস্তব সত্য, আর্ট এবং ক্রাফ্‌ট যুগপৎ যেন প্রতীকিত ফুলকপির মধ্যে। আধুনিক সভ্যতার বিপদ এই যে এই সব আপাত-বিরুদ্ধের মধ্যে সমন্বয় করিতে না পারিয়া মানুষে এগুলিকে স্বতন্ত্র কোঠায় ঠেলিয়া দিয়াছে। ফলে শিল্পের পূর্ণতার মধ্যে স্বৈরাজ্য নীতি উপস্থিত। ভারতীয় ঋষি-দের দৃষ্টিতে (প্রাচীন কালের সব দেশের মনীষীদের চোখেই) শিল্পে ছিল অদ্বৈত-বাদ, সব শিল্পই এক, সূক্ষ্ম স্থূলের ভিত্তিতে ভেদ ছিল না, কেবল কাজের সুবিধার জন্য চৌষট্টি ভাগ করিয়া দেখা হইত মাত্র। এখন শিল্পে আসিয়াছে দ্বৈত-বাদ। আর্ট ও ক্রাফট; ললিতকলাও কি? রূঢ় শিল্প, বলা যাক্‌। এই ভাগের ফলে একদল বাস্তব বিরহিত আর্টিস্ট হইয়াছেন, আর একদল সৌন্দর্য বিরহিত ক্রাফ্‌টসম্যান। সৌন্দর্য ও বাস্তব বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে; ফুল আর কপি জরাসন্ধের মতো ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; দুইয়ে সন্ধি করিয়া কিছুতেই আর ফুলকপি হইতে পারিতেছে না। (ফুলকপির মধ্যে এত তত্ত্ব আছে জানিলে আর কি নিশ্চিন্তভাবে ফুলকপির শিঙাড়া খাইতে পারিবে? বিষম না লাগে!)

শিল্পে দ্বৈতবাদের ফলে কবিরা এখন শিল্পের জন্য কবিতা লেখে, ক্ষুধায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য লেখে না। চিত্রকরের যে ছবি আঁকা উচিত ছিল মাটির হাঁড়ি, কলসীর উপরে, মন্দিরের গায়ে, এখন তা সে আঁকে ঘরে বসিয়া কাগজের টুকরায় মাসিকে ছাপায়, মাসান্তে কেহ চাহিয়াও দেখে না। ভাস্করের যে মূর্তি খোদাই করা উচিত ছিল মন্দিরের প্রাচীরে, দেবতার উদ্দেশ্যে, সেই মূর্তি খোদিত হয় রাজনীতিকের চেহারা দেখিয়া, অচিরকালের মধ্যে রাজ-নীতিক ও তাহার স্বরূপ বৈতরণীর জলে তলাইয়া যায়। আগে স্থপতিরা গড়িত মন্দির, চৈত্য, বিহার; এখন গড়ে হাসপাতাল ব্যারাক, পাগলাগারদ, থাকিবার লোকের অভাব হয় না। সে-সব আশ্রয়ে দেবতা ও মানুষ দুই-ই থাকিত, এখনকার অট্টালিকায় দেবতা যে থাকেন না তাহা নিশ্চয়।

কবিরা কবে আবার ক্ষুধার জন্য কাব্য লিখিবে? হোমারের মতো, চন্ডীদাসের মতো গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে? নাট্যকারেরা কবে আবার শেক্সপীয়র মলিয়েরের মতো যাত্রাদলের অধিকারী হইয়া পালা রচনা করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে? শিল্পীর তুলিতে কবে আবার হাঁড়ি, কলসী, ঘর দ্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? ক্ষুধায় ক্ষুধায় মানুষে মানুষে যে আদিতম ও নিশ্চিততম যোগ তারি সার্বভৌম ভিত্তিতে কবে আবার শিল্প আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে? আর্ট ও ক্রাফ্‌টের হেরফের ঘুচিবে! বাস্তব ও সৌন্দর্যের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়া অর্ধনারীশ্বর মূর্তি প্রকাশিত হইবে। সংক্ষেপে ফুল আর কপি একসঙ্গে মিলিয়া ফুলকপি হইবে। মানুষের সভ্যতা শিল্পের এই পূর্ণতার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সেই পূর্ণতার প্রতীক ফুলকপি—'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল'—একদেহে।

"গান"

ইন্দুপ্রভা দেবী

এসো ফিরে মোর নীড়ে।
জ্যোছনার রাতি মেঘেতে ঢেকেছে
আঁধার আসিছে ঘিরে॥

কামনার ধূপ পুড়ে ছাই হ'লো
গানের মুকুল নীরবে ঝরিল,
প্রদীপের শিখা নিভিয়া আসিছে
নিরাশায় ধীরে ধীরে॥

ফুটিবে না ফুল ওগো প্রিয় মোর
ফিরে নাহি আসো যদি,
আমার বিরহী অন্তরখানি
কাঁদিবে সে নিরবধি।
তোমারি বিহনে বিশ্ব আমার
হ'য়েছে শূন্য হয়েছে আঁধার,
এসো প্রিয় তুমি জ্বালিয়া তোমার
প্রণয় প্রদীপটিরে॥

দিল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় যেখানে আজ আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিচার চলিতেছে সেখানে কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করিতে পণ্ডিত জওহরলাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই উক্তিটি করিয়াছিলেন শ্রীমতী নাইডু, লাহোরের এক জনসভায়। শ্রীমতীর এই উক্তির উপর টীকা করিয়া পাকিস্থানী "আজাদ" বলিতেছেন—এমনি করিয়াই কংগ্রেস মুসলমানদের স্মৃতিচিহ্নগুলি ধ্বংস করিতে এবং মুসলমানদের অপমান করিতে চায়। আজাদের এই মন্তব্যের উপর টীকা করিয়া বিশু খুড়ো বলিতেছেন—ঢেঁকী শুধু ধানই ভানে না, ঢেঁকী মাঝে মাঝে বুদ্ধির কথাও বলে!

* * * *

THERE are two kinds of hunger in Europe—physical and spiritual"—এই কথাটি



বলিয়াছেন মিঃ বেভিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এটা কি সত্যিকারের ক্ষুধা, না হ্যাংলামি? ক্ষুধা মিটিতে পারে কিন্তু শেষেরটার যে শেষ নাই!

* * * *

ভারতীয়দের হাতে ভারত রক্ষার ভার ছাড়িয়া দিতে এখনও নাকি ত্রিশ হইতে ষাট বছর সময় লাগিবে। উক্তিটি জ্যোতিষের নয়, জেনারেল মোলসওয়ার্থের। কিন্তু প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া যে শিশুর উপর পেঁচোর দৃষ্টি পড়িয়া আছে সে কি আর মাত্র ষাট বছরে সাবালক হইতে পারিবে?

* * * *

অমেরি সাহেবকে আবার হাউস অফ কমন্সে ফিরাইয়া আনিবার তোড়জোড় চলিতেছে। "ইভিনিং স্ট্যাণ্ডার্ড" লিখিতেছেন—The House of Commons badly needs your voice



and authority. আমরাও বলি—আ-মরি আমেরি সাহেব, গো-রক্ষপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে বলিয়াই তোমার বুদ্ধির এত কদর! তুমি ফিরিয়া আইস এবং ভারত সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানগর্ভ বাণী প্রেরণ কর; নরলোক কৃতার্থ হউক।

* * * *

যুদ্ধের সময় যাঁরা ভারতরক্ষার কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় আট লক্ষ কর্মী নাকি অচিরেই বেকার হইয়া পড়িবেন। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। কাজ ফুরাইয়া গেলে কাজিরা আপনা হইতেই পাজীর পর্যায়ে পড়েন। সরকার বাহাদুরেরও ইহাতে বিব্রত বোধ করিবার কারণ নাই। আমরা জানি তাঁহাদের দায়িত্ব ভারত রক্ষায়, আর্ত রক্ষায় নয়!

* * * *

সিংহল সরকার একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন যে, অতঃপর আর কোন মেয়ে-কর্মী সরকারী চাকুরীতে নেওয়া হইবে না। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদের



সংবাদ আমরা পাই নাই। লঙ্কার মেয়েদের দেখিতেছি ঝাঁজ একেবারে নাই। তাঁহারা হয়ত "অশোকবনে শোকাকুলা" হইয়া নীরবেই অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন।

* * * *

কলিকাতায় পকেটমারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া পুলিশ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। পুলিশের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে কিনা সেই কথা অবশ্য বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় নাই।

নিরাপত্তার জন্য কলিকাতার "রেড রোড" এতদিন বন্ধ ছিল। সেই রাস্তা সম্প্রতি খুলিয়া দেওয়ার সংবাদ সহযোগী 'স্টেটস্‌ম্যান' খুব ফলাও করিয়া প্রচার করিয়াছেন। আটকবন্দীদের জেলের ফটক এখনও খুলিয়া দেওয়া হয় নাই, হয়ত সেই রাস্তা আপদমুক্ত হয় নাই বলিয়াই। সহযোগী কি বলেন?

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, নাৎসীরা নাকি ক্রিকেট খেলাটাকে একটা পুণ্য কর্মের মতই মনে করিতেন এবং জার্মানীকে এই খেলায় ইংলণ্ডের মত সুদক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টাও নাকি চলিতেছিল। রাশিয়ার 'গুগ্‌লি' বলে আউট হইয়া না গেলে এতদিনে জার্মানী ইউরোপের ছাই—(Ashes) নিয়া মাতামাতি করিতে পারিতেন!

* * * *

অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে বোম্বাইর ক্রিকেট খেলায় দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ "বোল্ড" বলিয়া ব্যারাক করায় ক্রিকেটার কারমডি নাকি খুবই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। Jardineকে 'Sardine' এবং পতৌদিকে "গান্ধী" বলিয়া যাঁরা একদিন ব্যারাক করিয়াছেন শুনিতে পাই কারমডি সেই দেশেরই লোক। তবে এইবিরক্তি কি যুদ্ধোত্তর যুগের উষ্ণতার জন্যই?

* * * *

বোম্বাইর গোলবালা ক্লাব নাকি অস্ট্রেলিয়াতে একটি সাঁতারুর দল প্রেরণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া হইতে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সাঁতারুদের রাহা খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া সেখানে খাইবার থাকিবার পর্যন্ত সমস্ত খরচ গোলবালা ক্লাবকেই বহন করিতে হইবে। আমরা বলি পারাপারের কড়ি জোগাড় না হইলে সাঁতার কাটিয়াই তো

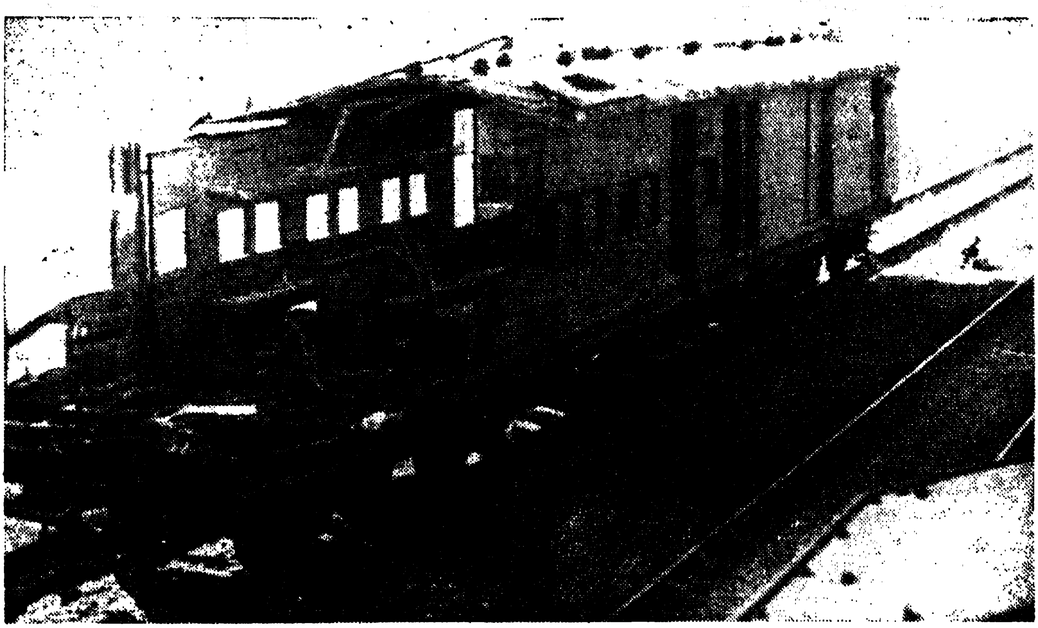


এই কাজটা সম্পন্ন করা যায়। এই গৌরবপূর্ণ পরিভ্রমণের জন্য এইটুকু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলিবে কেন?

গ্রাই ব্রীজের নিকটে ট্রেন দুর্ঘটনা



গত ৬ই নভেম্বর রাত্রিতে দার্জিলিং মেল ও নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সংঘর্ষের ফলে বিধ্বস্ত একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা।



দার্জিলিং মেলের একটি বিধ্বস্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরা।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী পদত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। রাজনীতিতে তিনি বিলাতের সাম্রাজ্যবাদী মিস্টার চার্চিলের চেলা এবং মিস্টার চার্চিলই তাঁহাকে বাঙলার গভর্নর করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এদেশে অন্য ইংরেজ শাসক স্যার মরিস হ্যালেটও নাকি যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের কার্যভার ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আশুকামমুক্ত স্বদেশ বিলাতে "পাড়ি জমাইতে" ব্যাকুল হইয়াছেন। স্যার মরিস আমলাতন্ত্রের নামকরা লোক। অনেকের বোধ হয় মনে আছে, যখন গান্ধীজী গ্রাম-উদ্যোগ কার্যে কংগ্রেসীদিগকে অবহিত হইতে পরামর্শ দেন, তখন ভারত সরকারের পক্ষে ইনিই এক সার্কুলার জারি করিয়া রাজকর্মচারীদিগকে সতর্ক হইতে বলেন—সরকার ঐ সংগঠন কার্যের জন্য অর্থ দিবেন; সাবধান কংগ্রেসীরা যেন জনগণের মনে শ্রদ্ধালাভ করিতে না পারে। সরকার পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সেই সার্কুলার প্রচার সহজে স্বীকৃতও হয় নাই। তিনি যুক্তপ্রদেশে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের আন্দোলনাবধি কিরূপ কাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সেই সব কাজ যেভাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন, তাহাতে তিনি নাকি বড় "উষ্ম" হইয়াছেন। তিনি নাকি অবিলম্বে কার্যভার ত্যাগের অনুমতি চাহিয়াছেন এবং বড়লাটকে জানাইয়াছেন, কংগ্রেসী নেতারা যেরূপ উক্তির স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস—কংগ্রেসী নেতাদিগের উগ্র বক্তৃতার পশ্চাতে তাঁহাদিগের জনগণকে অদূর ভবিষ্যতে আবার বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিবার চেষ্টা রহিয়াছে। পাছে সরকার অতর্কিতভাবে বিব্রত হইয়া পড়েন, সেই জন্য তিনি কংগ্রেসী নেতৃগণকে দমন করিয়া রাখিতে চাহেন। আবার সরকারী চাকরীয়ারাও নাকি কংগ্রেসের শাসনভার লাভ অনিবার্য বুঝিতে পারিয়া কংগ্রেসী-দিগের দরগায় সিন্নী দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মিস্টার কেসীর পদত্যাগের সেরূপ কোন কারণও আছে কি না, কে বলিবে? তিনি যে তাঁহার ব্যবস্থার প্রশংসা ব্যতীত সমালোচনা সহ্য করিতে পারেন না, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু যখন বলিয়াছিলেন, দুর্ভিক্ষের পরে বাঙলায় যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ত্রুটি আছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া যাঁহারা ঐরূপ মত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা বাঙলার মঙ্গলই করেন না। সেই উক্তি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের মত লোকও অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন নাই এবং তিনি বলিয়াছিলেন—গভর্নরকে যে সকল স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সে সকল স্থানে "সাজান বাগান" দেখান হয়—তিনি প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না।

মিস্টার কেসী—তাঁহার সচিবদিগের কথায়—হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার হরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রায় বহাল রাখা সম্ভব হয় নাই। কারণ হাইকোর্ট রায় দিয়াছিলেন, যে যুক্তি দেখাইয়া হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার হরণ করা হইয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন অর্থাৎ গজ-ভক্ষিত কপিত্থবৎ—একজন সচিবকে মামলার ফল হইতে অব্যাহতিলাভের সুযোগ দিতেই সচিবরা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার হরণ করিতে বলিয়াছিলেন আর মিস্টার কেসী তাহাতেই সায় দিয়াছিলেন।

আবার তিনি সেই সচিবসঙ্ঘকেও পতন হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমরা শুনিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন, ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার যে রায় দিয়াছিলেন—ঐ সচিবসঙ্ঘ আর বহাল থাকিতে পারে না, তাহা তাঁহার গভর্নরের অধিকারের অংশ গ্রহণ করা।

আমাদিগের মনে আছে—

(১) বাঙলার ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট বাঙলায় জুরীর বিচার রদ করিয়া যখন সে আদেশ বহাল রাখিতে পারেন নাই আর

(২) যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট লর্ড মেস্টন যখন কানপুরে মসজেদ ভাঙ্গিবার আদেশ দিয়া তাহা বহাল রাখিতে পারেন নাই

তখন তাঁহারা দিন কয়েকের জন্য বিলাতে যাইয়া ভাঙা মান জোড়া দিবার—মনোবেদনা ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই, মিস্টার কেসীর কাজে আমরা বিস্মিত হইতেছি না।

আবার বাজারে জনরব—সরকারের সরবরাহ ব্যাপারে তিনি যাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই কেহ কেহ অসাধুতার জন্য মামলা সোপর্দ হইবার সম্ভাবনা।

সরকার চারিদিকে অসাধুতার প্রাবল্য দেখিয়া তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটি বলিয়াছেন—যেস্থানে সর্বাঙ্গে ক্ষত তথায় কোন্ স্থানের উল্লেখ করিব? মিস্টার কেসী সে অবস্থার প্রতিকার করিতে পারেন নাই।

মিস্টার কেসী যে সচিবসঙ্ঘের সমর্থক ছিলেন, সেই সচিবসঙ্ঘ সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন যাহা বলিয়াছেন, তাহার পরেও যে তিনি সেই সচিবসঙ্ঘের সচিব-দিগকে দণ্ড দিবার উপায় করেন নাই, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়।

মিস্টার কেসী যে কলিকাতার উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল বাগানে যাইয়া চাউল রপ্তানি দেখিয়াছিলেন, তাহা বাঙলা সরকারের প্রচারপত্রে প্রকাশিত বিবরণে ও চিত্রে প্রকাশ পায়। অথচ তথায় তিনি পর্বতপ্রমাণ বিকৃত চাউল লক্ষ্য করেন নাই!

মিস্টার কেসী বড় বড় ব্যাপারের মত ছোট ছোট ব্যাপারেও সাফল্যের সন্নিহিত হইতে পারেন নাই। কলিকাতার বস্তি-সমূহের সংস্কারেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কলিকাতার বস্তিগুলি যে কোন শহরের কলঙ্ক বলা যায়। বিদেশী দর্শকরা বহু দিন হইতে এইগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু প্রতিকার হয় নাই। যাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, তাঁহারা কেহ কেহ বস্তির মালিক আর বস্তির অধিবাসিগণের ভোটের আশায় কাউন্সিলাররা অনেকক্ষেত্রে বস্তির ধনী মালিকদিগের স্বার্থহানি করিতে অসম্মত। কাজেই, বস্তির সংস্কার এ পর্যন্ত হয় নাই। মিস্টার কেসী গভর্নর হইয়া বস্তি সংস্কারে উৎসাহ দেখান। কিন্তু তাঁহার সেই উৎসাহ খড়ের আগুনেরই মত হইয়াছে। বস্তি সংস্কারের কথাও আর কেহ শুনিতে পায় না।

বাঙলায় গভর্নর থাকিয়া মিস্টার কেসী কোন উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় কাজ করেন নাই।

তাঁহার পূর্ববর্তী একজন গভর্নরের কার্য ফলে যে নির্বার্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া বাঙলার সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার পরে সংগঠন কার্যের প্রয়োজনও যে সরকার উপলব্ধি করেন নাই, ইহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু সেদিকে কি হইয়াছে?

মানুষের প্রথম প্রয়োজন অন্নের—দ্বিতীয় প্রয়োজন বস্ত্রের।

বাঙ্গলার বস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় নাই। বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে যাহারা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে দণ্ডিত করাও বাঙলা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, কেন? বাঙলার যে পরিমাণ বস্ত্রের প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া তাহার অভাবের অনুপাতে বাঙলাকে বস্ত্র দিতে বাঙলার গভর্নর ভারত সরকারকে বাধ্য করেন নাই। অথচ বাঙলার বস্ত্রের অভাব যত প্রবল, তত আর কোথাও নহে। তাহার সর্বপ্রধান কারণ—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাঙলার নরনারী বস্ত্র ক্রয়ের জন্য আবশ্যক অর্থও রাখিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদিগের স্বদেশীয় বিশেষ বোম্বাই ও আমেদাবাদের ব্যবসায়ী-দিগের ত্রুটির উল্লেখ করিতে বাধ্য। বোম্বাই প্রদেশ কাপড়ের কলের কেন্দ্র। তথায় ব্যবসায়ীরা যে দেশের লোককে শোষণ

করিয়া লাভবান হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনুভব করেন না, তাহার প্রমাণ বাঙলা স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও পাইয়াছে। যখন বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্য করিয়া বাঙলায় বৃটিশ পণ্য বর্জন আরম্ভ হয়, তখন বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। বাঙলার আন্দোলনে তাহারা মরণাহত রোগীর অমৃত লাভের মত লাভবান হয়। কিন্তু তখনই তাহারা যে অতিলাভ-লোভ দেখাইয়াছিল, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় —সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন—এই দুইজনকে বোম্বাইয়ে কলওয়ালাদিগের নিকট পাঠাইয়া অনুরোধ করেন—তাঁহারা যেন অসংগতরূপ অতিলাভের লোভ সংযত করেন।

তাহার উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—তাঁহারা ব্যবসায়ী; বাঙলা যদি ভাবাবেগে ভুল করে, তবে তাঁহারা কি তাহার সুযোগ লইয়া লাভবান হইবেন না? যখন ঐ কলওয়ালারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বলিয়া (বাঙলার কয়লা বর্জন করিয়া) দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা কলে ব্যবহার করিতে থাকেন, তখন বাঙলার কয়লার খনি মালিকরা তাহাতে আপত্তি করিয়া গান্ধীজীকে সেকথা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীও তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ঐ কলওয়ালারা ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই কাপড়ের মূল্য অকারণ বৃদ্ধি করিয়া বাঙলার গৃহস্থদিগকে সঞ্চয়শূন্য করিয়াছিলেন। তাহার পর যুদ্ধকালে তাঁহারা কিরূপ "অতিরিক্ত লাভের জন্য কর" সরকারকে দিয়াছেন, তাহার হিসাব সহজেই পাওয়া যায়। তাঁহারা—কাপড়ের মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইবার পূর্বে— আপনারা আশাতীত লাভ করিয়াছেন—সরকারকে সেই অতিরিক্ত লাভের অংশ দিয়াছেন কিন্তু কাপড়ের দাম কমাইয়া দেশের লোককে সুবিধা দেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বাঙলার লোকের দুঃখের জন্য মারওয়াড়ীদিগকে কতকাংশে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু কেন যে বোম্বাই-এর কাপড়ের কলওয়ালাদিগের ব্যবহার তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু বাঙলা সরকার এবিষয়ে বাঙালীর জন্য কি করিয়াছেন?

অন্ন সম্বন্ধ মিস্টার কেসী নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দী সচিব সঙ্ঘের অবলম্বিত প্রচার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বাঙলায় খাদ্য দ্রব্যের অভাব নাই, এই প্রচারকার্যের আগ্রহে তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই—খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসমূহে যে পরস্পর-বিরোধিতা আছে তাহা সহজেই দেখা যায়। তিনি একদিকে বলিয়াছেন—(বিদেশ হইতে) বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া বাঙলা সরকার যে সব গুদাম প্রস্তুত করিয়াছেন, সে সকলে শস্য আর বিকৃত হইতে পারিবে না; আর একদিকে তিনি বলিয়াছেন, বাঙলার জলবায়ু যেরূপ তাহাতে সকল সময়ে—বিশেষ বর্ষাকালে শস্যের বিকৃতি নিবারণ করা যায় না! তাঁহার শেষের উক্তি বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি সমর্থনের সময় করা হয়। অথচ তাঁহার কৃষি বিভাগের জানা উচিত—এ দেশের লোক যেভাবে শস্য সঞ্চিত রাখিতে পারে, তাহাতে ২০ বৎসরেও তাহা বিকৃত হয় না।

বাঙলায় চাউলের মূল্য যেরূপ, তাহাতে যে দরিদ্র গৃহস্থরা তাহা কিনিয়া আবশ্যক অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

বাঙলার এই অবস্থায় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন। এই নির্বাচনের উপর বাঙলার পুনর্গঠন কার্য নির্ভর করিবে।

কলিকাতার সাবান প্রস্তুতকারিগণের পক্ষে একটি বিশেষ শিক্ষা

"শিপলাইট সোপ"-এর প্রস্তুতকারক কলিকাতার মেসার্স পেবকো (পাঞ্জাবী ব্রাদার্স)-এর বিরুদ্ধে "সানলাইট সোপ"-এর প্রস্তুতকারক লীভার ব্রাদার্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক আনীত 'ট্রেড-মার্ক জালকরণ' সম্পর্কে একটি মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট গুরু দণ্ড দান করিয়াছেন। 'শিপলাইট সোপ'কে লীভার ব্রাদার্স-এর সুবিখ্যাত 'সানলাইট সোপ'-এর নাম, উহার চাকতির আকার এবং লেবেলের আকার ও নমুনা ইত্যাদির হুবহু নকল করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। গুরুতর শাস্তিবিধান করা হইয়াছে। আদালত অনুকরণে প্রস্তুত উক্ত 'শিপলাইট সোপ'-এর সমস্ত মজুত মাল এবং সমস্ত মোড়ক লীভার ব্রাদার্সকে ডেলিভারী দিতে এবং অনুকরণে প্রস্তুত উক্ত সাবানপ্রস্তুতকল্পে যেসব ছাঁচ আবশ্যক হইয়াছিল, তৎসমুদয় অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত 'শিপলাইট সোপ' প্রস্তুত ও বিক্রয় বা সানলাইট সাবানের হুবহু অনুকরণে অন্য কোন সাবান প্রস্তুত বা বিক্রয় করা চিরতরে নিষিদ্ধ করিয়া মেসার্স পেবকো (পাঞ্জাবী ব্রাদার্স)-এর উপর একটি ইনজাংশনও জারী করিয়াছেন। খরচা আদায়ের উদ্দেশ্যে লীভার ব্রাদার্সকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্যও আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকা থেকে ভারতের জন্যে সম্প্রতি সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল রওনা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেল। অর্থাৎ একচোটে ভারতের রক্ত জল-করা সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা বিদেশে চালান হয়ে যাবার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। আর সবচেয়ে এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, এই টাকাটা বিদেশীরা যাতে নিয়ে যায়, তার জন্যে এখান থেকে লোকে আমেরিকায় গিয়ে কিছুদিন ধরে ধর্না দিয়ে পড়েছিল এবং অনেক সাধ্য-সাধনা ও অনুনয়ের পর তারা বিদেশী প্রতিষ্ঠানদের টাকাটা নিতে রাজী করাতে পেরেছেন—যারা এই অসাধ্য সাধন করলেন দেশবাসী তাদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়ই। এই মাল আমদানীর মধ্যে আরও অনেক রহস্য রয়েছে। অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান শোনা যাচ্ছে, কেউ পঁয়ত্রিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউবা পঁচিশ লাখ টাকা করে জিনিষের অগ্রিম অর্ডারই পেশ করে রেখেছিলেন অর্থাৎ তারা সম্মিলিতভাবে কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে আমদানী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কেনার জন্যে আগে থাকতেই বরাদ্দ করেই রেখেছেন। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে তারা যে টাকাটা বিদেশীর হাতে তুলে দেবার জন্যে এতটা উৎসুক তার খানিকটা অংশ এদেশেই ঐসব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল তৈরির জন্যে নিয়োজিত করার কথা একবারও কি ভাবতে পারেল না? আত্মঘাতী মনোবৃত্তির কি শোচনীয় পরিচয়! শুধু তাই নয়—এমনও শোনা যাচ্ছে যে, বিদেশী ব্যবসাদাররা এদেশের লোকের নামে এদেশেই ব্যবসা ফেঁদে বসবার চেষ্টা করছে, অনেকে কাজে নেমেও পড়েছে এবং এই যে কোটি কোটি টাকার জিনিস আসছে, তার অনেকখানি বিদেশী ব্যবসাদাররা এদেশের লোকের বেনামে নিজেদের কারবার ফাঁদবার জন্যেই আনাচ্ছে। বিদেশীর ঘুষ খেয়ে তাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে যারা এই ভাবে সহায়তা করছেন, তাদের মধ্যে এদেশের প্রতিষ্ঠাবান চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদেরও কেউ কেউ রয়েছেন বলেও শোনা যাচ্ছে। সত্যিই স্তম্ভিত হবার মত কথা। সর্ববিষয়ে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হবার দেশব্যাপী চেষ্টা চলেছে যখন ঠিক সেই সময়ে খাল কেটে কুমীর আনার এমনি ধারা কথা কেউই শুনবে বলে আশা করে না। কিন্তু যখন এই ধরণের জল্পনা কানে আসচে তখন একেবারে উড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকাও যায় না। আশা করি, দেশের চিত্রব্যবসায়ীরা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং আমাদের ধারণা অমূলক বলে যাতে প্রতীয়মান হয়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

ছদ্মবেশী

রঙ্গজগৎ

ছমিয়া (পি ডি সি প্রডাকসন্স)—কাহিনী ও সংলাপঃ কাবিল, গানঃ পণ্ডিত ইন্দ্র ও কাবিল, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ প্রতিমা দাশগুপ্তা, আলোকচিত্রঃ দিবেচা, শব্দ নিয়ন্ত্রণঃ অরোরা, সুরযোজনাঃ জ্ঞান দত্ত, ভূমিকায়ঃ বেগম পারা, প্রতিমা দাশগুপ্তা; আরিফ, ডেভিড, আজুরী, দিক্ষীত ও গুলাব।

দেসাস পিকচার্সের পরিবেশনে ৯ই নবেম্বর থেকে সেণ্ট্রাল ও পার্ক শো হাউসে দেখানো হচ্ছে।

ভারতের প্রথম মহিলা চিত্রপরিচালক প্রতিমা দাশগুপ্তার এই ছবিখানির জন্যে লোকে প্রায় বৎসরাধিক কাল বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে আসচে। প্রথমে এখানি তোলা হয় 'চোর' নামে, পরে লাইসেন্স সংক্রান্ত কোন গোলমাল ঘটায় নাম বদলে হয় 'ছমিয়া'। মহিলা পরিচালকের ছবি, তার ওপর নায়ক ও নায়িকা দুজনেই নতুন এবং বহুভাবে প্রচারিত তাই লোকের ছবিখানি সম্পর্কে আগ্রহ বড় ছিল না। 'ছমিয়া' দেখবার পরও লোকে তাদের সেই আগ্রহ নিতান্তই নিরর্থক হয়েচে বলে অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছু বলবে না। মহিলা পরিচালনা করেচেন কিন্তু যে নমুনা দেখা গেল, তাতে আর কোন মহিলা ভবিষ্যতে পরিচালনা কাজে নিযুক্ত থাকতে চাইলে কেউই তাকে উৎসাহিত করবে না। পুরুষেরা ছবিতে নারীর শ্লীলতা নিয়ে যদেচ্ছাচার করে বলে বহু নারীই অভিযোগ করেছেন. কিন্তু নারী পরিচালিকা প্রতিমা নারীরই শ্লীলতার আবরণ যেভাবে মোচন করেছেন অতঃপর আর কেউ পুরুষদের এ বিষয়ে দোষ দিতে সাহস করবে বলে মনে হয় না। এই বিষয়টি ছাড়া প্রতিমা দাশগুপ্তা এমন কোন মৌলিকতত্ত্ব বা কোনদিকের কোন রকম কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি যার জন্যে এরপর লোকে তার ছবি দেখবার জন্যে এতটুকুও উৎসাহ পেতে পারে।

গল্পটা নেওয়া হয়েছে বার্ণার্ড শ'র পিগমেলিয়ান থেকে, কিন্তু তার কাঠামোই সার; অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধি বা অনুধাবন করার ক্ষমতা যে চিত্রনাট্যকার-পরিচালিকার নেই তা ছবিখানির ঘটনা বিন্যাসেই ধরা পড়ে গেছে। সমগ্র ছবিখানির মধ্যে এমন একটা দৃশ্য বা ঘটনা পাওয়া গেল না, যার জন্যে প্রতিমা দাশগুপ্তাকে পরিচালনা কাজে ভবিষ্যতেও নিযুক্ত থাকার জন্যে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

ছবিখানি হচ্ছে বেগম পারা-ময়। বেগমের এইখানিই প্রকৃতপক্ষে প্রথম ছবি (বাস্তব জীবনে বেগম হচ্ছেন প্রতিমার ননদ), যদিও পরের ছবি 'চাঁদ'ই পূর্বেই মুক্তিলাভ করে। পরিচালিকা শ্রী ও বিশ্রীর তোয়াক্কা না রেখে বেগমকে যতদিন থেকে এবং যতভাবে সম্ভব পর্দায় প্রকাশ করিয়েই মাৎ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বেগম পারা একেবারে বাজে স্তরের শিল্পী নয় যে, তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও মূল ছবির উৎকর্ষে কোন সাহায্য করেনি। আর নতুন নায়ক আরিফ তো একেবারেই অচল। প্রতিমা অবশ্য নিজের ভূমিকাটি মন্দ করেন নি। অভিনেতাদের মধ্যে ডেভিডের নাম করা যায় যদিও অন্যান্য ছবিতে ডেভিড যেমন চট করে লোকের মনে আসন করে নেন, এক্ষেত্রে ততটা সহজ হয়নি।

কলাকৌশলাদির দিক থেকে অবশ্য ছবিখানি অপ্রশংসনীয় নয়। জ্ঞান দত্তের সুরযোজনা ভালই হয়েছে এবং একেবারে একঘেয়ে ছবি থেকে লোককে আসন ছেড়ে আসতে যদি নিবৃত্ত করে থাকে তো সেটা সঙ্গীতের দিকটার জন্যেই। ছমিয়া মহিলা পরিচালিত প্রথম ছবি বলে পরিচালিকাকে উৎসাহিত করার জন্যে আগে থেকে যতটা তৎপর ছিলুম, ছবিখানি দেখার পর তার আর কোন সুযোগই না পাওয়ায় সত্যিই আমরা নিরাশ হয়েছি।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

বৃহস্পতিবার ১৫ই নবেম্বর থেকে শ্রীরঙ্গমে নতুন নাটক 'মায়া' মঞ্চস্থ হচ্ছে।

* * * *

সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই মুক্তিলাভ করতে পারে এমন বাঙলা ছবি খানকয়েক নজরে পড়চে। শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'গৃহলক্ষ্মী' প্রায় বছর দুই আটক থাকার পর রূপবাণীর পরবর্তী আকর্ষণ বলে ঘোষিত হয়েছে; ছবিখানি পরিচালনা করেছেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ভূমিকায় নামকরা বাঙালী অভিনয় শিল্পীদের বেশীর ভাগই আছেন। দ্বিতীয় ছবিখানি হচ্ছে কে বি পিকচার্সের 'ভাবীকাল'—যার ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে চন্দ্রা, অমর মল্লিক, দেবী মুখোপাধ্যায়, ফণী রায়, রবীন মজুমদার, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে—পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এই ছবিতে একটা নতুন পরীক্ষা করচেন একখানিও গান না সন্নিবেশিত করে। রূপশ্রীর 'মৌচাকে ঢিল'ও তোলা শেষ হয়েছে এবং অচিরেই কয়েকটি চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তি দানের আয়োজন হচ্ছে; এর পরিচালক মনুজেন্দ্র ভঞ্জের স্বাধীনভাবে তোলা প্রথম ছবি এবং তিনি নিজে যেমন নতুন তেমনি ছবির প্রধান ভূমিকাগুলিতে একেবারে নতুন শিল্পীদের নামিয়েছেন—এ ছবির এটা একটা মস্ত বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া এস ডি প্রডাকসন্সের 'সাত নম্বরের বাড়ি' এবং অরোরার 'পথের সাথী'ও মুক্তি প্রতীক্ষায়।

* * * *

এই মাসেই হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করচে—শ্রী ও রূপবাণীতে নবযুগ চিত্র 'দিনরাত' সিটিতে 'শরারাৎ', দীপক ও ছায়ায় 'শিরী ফরহাদ' এবং ক্রাউন সিনেমায় 'ভাইজান'।

বিবিধ

কাঁচা ফিল্মের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নতুন খবর হচ্ছে যে, ডিসেম্বরে উঠিয়ে দেওয়া হবে বলে আগে যে ঘোষণা হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত বোধ হয় কার্যকরী

হবে না এবং নিয়ন্ত্রণ মার্চের আগে তোলা সম্ভব হবে না। অথচ এই সপ্তাহেই খবর পাওয়া যাচ্ছে, আমেরিকা থেকে প্রচুর কাঁচা মাল ইতিমধ্যে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেছে—সরকারী মতলব বোঝা ভার।

* * *

এ সপ্তাহের একটি দুঃখের খবর হচ্ছে বম্বে টকীজের অভিনয়শিল্পী পিঠাওয়ালার মৃত্যু। গত ২৮শে অক্টোবর বম্বেতে কিছুকাল রোগ ভোগের পর পিঠাওয়ালা পরলোকে যাত্রা করেছেন। বম্বে টকীজ আরম্ভ হওয়া থেকেই তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করেন এবং বম্বে টকীজের প্রায় প্রত্যেক ছবিতেই অবতরণ করেন। তাঁর শেষ ছবি 'প্রতিমা'।

* * *

হলিউডের কলাকুশলী ও কর্মিদের অধিকাংশই আজ ন' মাস ধরে পারিশ্রমিক না বাড়ানোর প্রতিবাদে ধর্মঘট করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে গেলেও মালিকরা এখনও অনমনীয় ভাব দেখিয়ে যাচ্ছে।

* * *

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘ আগামী ১০ই ডিসেম্বরে বাঙলা কেন্দ্রের যাবতীয় চিত্রগৃহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যার্থে দান করার জন্য সমস্ত প্রদর্শকদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস বাঙলা কেন্দ্রের সব প্রদর্শকই নির্দ্বিধায় এই আবেদন মত সাহায্যদানে এগিয়ে আসবে—দান করার এর চেয়ে মহত্তর সুযোগ আর কখনও আসে নি।

* * *

স্বনামধন্য নট পৃথ্বীরাজ বম্বের প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যপদের প্রার্থী হবেন বলে একটা খবর পাওয়া গেল। পর্দার ভিতর দিয়ে মঞ্চের ওপর থেকে এবং ব্যক্তিগত আরও বহু কাজ করে পৃথ্বীরাজ একজন নামী দেশসেবক এবং ত্যাগী বলে পরিচয় লাভ করেছেন।

* * *

কানন অভিনীত 'কৃষ্ণলীলা' ছবিখানি তোলায় দেবকী বসু নিজের রেকর্ড ভাঙতে দৃঢ় সংকল্প হয়েছেন, কারণ মাস দুয়েরও কম সময়ে ছবির প্রায় অর্ধেক চিত্রগ্রহণ সমাধা করলেন এই প্রথম। ছবিখানি সম্পর্কে ষ্টুডিও মহলের ধারণা খুব উঁচু। কাননের সঙ্গে প্রধান অংশে অভিনয় করছেন প্রেম অদীব ও পরেশ ব্যানার্জি।



খেলাধূলা

ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া বনাম পশ্চিম ভারত

বোম্বাইতে অস্ট্রেলিয়া বনাম পশ্চিম ভারত দলের খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলাতে ভারতীয় খেলোয়াড়গণ পুনরায় অস্ট্রেলিয়া দলকে প্রথম ইনিংনস বহু রাণ পশ্চাতে ফেলিতে সক্ষম হন। আরও আনন্দের বিষয় যে, এই খেলাতে বোম্বাইর উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ের অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল :—

অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস :—৩৬২ রাণ (কিথ মিলার ১০৬, কারমোডী ৪৩, পোর্টফোর্ড ৩০, প্রাইস ৫৫, এস ডবলিউ সোহণী ৫৫ রাণে ১টী, বিনু মানবাড় ৬৫ রাণে ৩টী আমীর ইলাহি ৮৭ রাণে ৪টী ও কে, কে, তারাপোর ৪৭ রাণে ২টী উইকেট পান)।

পশ্চিম ভারত দলের প্রথম ইনিংস :— এ উই ৫০০ রাণ (আর এস মোদী ১৬৮ বিজয় মার্চেণ্ট ৭৭, বিজয় হাজারী ৭৩, ভি ফাদকার ৭১ রাণ নট আউট. কিষেণচাঁদ ৩৪ প্রলিস ১১২ রাণে ৪টী, পেপার ১৬৬ রাণে ২টী উইকেট পান।

অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংস :— ই উই ঃ ৮৮ রাণ (হুইটিংটন ৪০, কারমোডী ৪১ রাণ. আমীর ইনাহি ৬ রাণে ১টী ও তারাপোর ৬ রাণে ১টী উইকেট পান)।

অধ্যাপক দেওধরের অপূর্ব দৃষ্টান্ত

অধ্যাপক দেওধর পুণার সম্মিলিত কলেজ দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই পদত্যাগ করিয়া তিনি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয় ও স্মরণযোগ্য। তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, আমার মনে হয় ছাত্রদের নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া অস্ট্রেলিয়া দলের সহিত সমান প্রতিযোগিতা চালান উচিত। গতবার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক মন্ত্রী বিশেষ যোগ্যতার সহিত স্বীয় দলকে জয়যুক্ত করেন। এই ম্যাচে তিনি অধিনায়ক হইবেন। আমি অবশ্য দরকার মনে হইলে মাঠের বাহির হইতে তাহাকে যথাযথভাবে পরামর্শ দিব।

অধ্যাপক দেওধর পদত্যাগ করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা তাঁহারই উপযোগী ও তাঁহার মনের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছে। তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এই প্রসংগে মনে পড়িতেছে তিনি যখন রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে দ্বিশতাধিক রাণ করেন তখন সাংবাদিকগণ তাঁহার সহিত দেখা করিলে বলেন, "আমার তরুণ সহযোগী খেলোয়াড়গণই ইহার জন্য প্রশংসা দাবী করিতে পারে।" একজন প্রবীণ খেলোয়াড়ের পক্ষে দ্বিশতাধিক রান কত বড় কৃতিত্বের পরিচয়! কিন্তু দেওধর নিজ কৃতিত্বের সকল কিছু সহযোগীদের দান করিলেন। সেই অধ্যাপক দেওধর পুনরায় নিজের সম্মানজনক স্থান তরুণ খেলোয়াড় মন্ত্রীকে দান করিবেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। অধ্যাপক দেওধরের এই অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রত্যেক ক্রিকেট খেলোয়াড় স্মরণ রাখিলেই আমরা বিশেষ প্রীত হইব।

সম্মিলিত কলেজ দলে খেলিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাত্র ছাত্র মনোনীত হইয়াছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত দলে খেলিতে পারিবেন কিনা জানি না। তবে খেলিতে পাইলে বাঙলার সুনাম বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন এইটুকুও আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। নিম্নে সম্মিলিত কলেজ দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল :—

এম কে মন্ত্রী, আর এস মোদী, ডি জি ফাদকার (বোম্বাই), এম কে রিজি, এস সিন্ধি ও গজালি (পুণা), আব্দুল হাফিজ ও ইমতিয়াজ আমেদ (লাহোর) রাজিন্দর নাথ (বেনারস) পি কে দত্ত (কলিকাতা) ও পালওয়াংকার (বোম্বাই)।

অস্ট্রেলিয়া বনাম পূর্ব ভারত

অস্ট্রেলিয়া বনাম পূর্ব ভারত দলের খেলা আগামী ২১শে নভেম্বর হইতে কলিকাতায় আরম্ভ হইবে। এই খেলায় খেলিবার জন্য পূর্ব ভারত দলের পক্ষে যে সকল খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করিয়াছেন তাহার মধ্যে একমাত্র কুচবিহার মহারাজার নাম প্রকাশিত হওয়ায় খুবই আশ্চর্য হইতে হয়। গত কয়েক বৎসর ইনি বাঙলো দলের অধিনায়ক হিসাবে খেলিয়া যেরূপ নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ই'হার কোনরূপেই পূর্বাঞ্চলের দলে স্থান হওয়া উচিত নহে। কার্তিক বসু, নির্মল চ্যাটার্জি, এন চৌধুরী প্রভৃতির প্রকৃতই দলে স্থানলাভের যোগ্যতা আছে। উইকেট রক্ষক হিসাবে তরুণ খেলোয়াড় পি, সেনকে লইলে খুব অন্যায় হইবে না। কোন কোন খেলোয়াড় এই দলে খেলিবেন আমরা জানি না। শীঘ্রই নাম প্রকাশিত হইবে। আমরা আশা করি, নির্বাচকমণ্ডলী এন চৌধুরী, এন চ্যাটার্জি, ও কার্তিক বসু এই তিজনকে দলে স্থান দিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

সন্তরণ

বেঙল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন প্রাদেশিক সন্তরণ প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসের শেষে করিবেন বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অক্টোবর মাস অতিবাহিত হইয়া যাইবার পরও তাঁহারা এই সম্পর্কে কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। আগামী বৎসরে নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা যখন অনুষ্ঠিত হইবে তখন বাঙলার প্রতিনিধি কিরূপে নির্বাচিত হইবে বুঝিতে পারি না। একটা গুরুদায়িত্ব লইয়া এইরূপ ছেলে খেলা করা কোনরূপেই শোভা পায় না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৬ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, বাঙলার গভর্নর মিঃ আর জি কেসী তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন এবং তাহা গৃহীত হইয়াছে। মিঃ ফ্রেডারিক জন বারোজ নূতন গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, এম-এল-এ, শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এল-এ এবং ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জি এম-এল-এ বাঙলার এই তিনজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা তিন বৎসরের অধিককাল আটক থাকার পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বর্ধমানের সংবাদে প্রকাশ, গত ২রা নবেম্বর পানাগড়ে একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের ফলে একজন ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী নিহত, সেনাবিভাগের ১৪ জন লোক নিখোঁজ এবং ২৩ জন লোক আহত হইয়াছে। এই বিস্ফোরণের ফলে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে আগুন লাগিয়া ২ খানি কুটীর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে তিনজন গ্রামবাসী নিহত হইয়াছে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিরুদ্ধে বিচারের শুনানী আগামী ২১শে নবেম্বর বুধবার পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। তিন সপ্তাহ মামলা স্থগিত রাখার জন্য আসামীপক্ষ গতকল্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

মাদুরায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীদের বিচারের প্রতিবাদ করিবার জন্য সমবেত এক জনতার উপর পুলিস গুলীবর্ষণ করে; ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

৭ই নবেম্বর—গতকল্য শেষ রাত্রে বেঙ্গল আসাম রেলের শান্তাহারের নিকটবর্তী আত্রাই-ঘাট স্টেশনে ডাউন দার্জিলিঙ মেল ও আপ নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের মধ্যে এক ভীষণ সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে এযাবৎ মোট ৯ জন মারা গিয়াছে; মোট আহতের সংখ্যা ৫২।

সর্দার অমরসিং গিল, শ্রীযুত জ্যোতিষ বসু, শ্রীযুত হরিদাস মিত্র ও ডাঃ পবিত্র রায় এই চারিজন বন্দীর মৃত্যুদণ্ড বড়লাট মকুব করিয়াছেন। আদালত বন্দী চারিজনের যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাতেই তাহা মকুব হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় তাঁহাকে ইন্দোনেশিয়ায় যাইবার সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

৮ই নবেম্বর—মৌলবী আশরফউদ্দীন আমেদ চৌধুরী বক্সা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ৩০শে মার্চ তাঁহাকে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

৯ই নবেম্বর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অদ্য কংগ্রেসের নির্বাচন আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে কংগ্রেসের আহ্বানে প্রায় দুই লক্ষাধিক লোকের এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদিগকে ভোট দিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। এই সভায় যে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল, শীঘ্র এরূপ দেখা যায় নাই। সভা ভাঙিবার পর এত অধিক ভিড় হয় যে, ভিড়ের চাপে শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু ও জ্যোতিলাল পালের মৃত্যু হয়।

১০ই নবেম্বর—অদ্য সকাল ৫টায় ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গোপের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত গোপের মৃত্যু-দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করা হইলে তাহা অগ্রাহ্য হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচনে বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ড পাকাপাকিভাবে মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া জানান হইয়াছেঃ—(১) কলিকাতা (অ-মুসলমান)—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, (২) কলিকাতা শহরতলী (অ-মুসলমান)—শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) বর্ধমান বিভাগ (অ-মুসলমান)—নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, (৪) প্রেসিডেন্সী বিভাগ—শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্যাল, (৫) রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ (অ-মুসলমান)—শ্রীযুত সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি এবং (৬) ঢাকা বিভাগ (অ-মুসলমান)—মিঃ কে সি নিয়োগী (বর্তমান সদস্য)।

১২ই নবেম্বর—'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবস' পালন উপলক্ষে লাহোর ও লক্ষ্ণৌয়ে পুলিস মিছিলকারীদের উপর লাঠিচালনা করে। লাহোরে পুলিস ছাত্র ও ছাত্রীদের উপর লাঠি চালায়। ফলে ১০ বৎসরের নিম্নবয়স্কা কয়েকটি বালিকা আহত হইয়াছে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ রিলিফ ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিবার জন্য জন-সাধারণের নিকট এক আবেদন জানাইয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের লোকদিগকে এবং তাহাদের পরিবার ও পোষ্যবর্গকে অর্থসাহায্য প্রদানের জন্য অন্তত এক কোটি টাকা আবশ্যক হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই নবেম্বর—ওয়াশিংটনে ইঙ্গ-মার্কিন আণবিক আলোচনা আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ এক বক্তৃতায় বলেন যে, আণবিক বোমাকে গোপন রাখা চলিবে না।

৭ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া-ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের মধ্যে অংশীদার হিসাবে থাকিবার জন্য ডাঃ ভ্যানমুক ইন্দোনেশিয়ানদের নিকট যে প্রস্তাব করেন, ডাঃ সুকর্ণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

৮ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া—অদ্য পুনরায় বাটাভিয়ায় ইন্দোনেশিয়ান ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

জাপানে প্রবাসী কে ভি নারায়ণ নামক জনৈক ছাত্র এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্পর্কে জাপানের প্রবাসী ভারতীয়গণের মনে গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার মত্যু সম্পর্কে জাপ সরকারের বিবৃতি ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়াই এই সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া—৫ম ভারতীয় ডিভিসনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মেনার্গ ইন্দোনেশিয়ান নেতৃবর্গকে বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণের জন্য চরমপত্র দিয়াছেন।

১০ই নবেম্বর—চীন—চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ, সরকারী বাহিনী ও কম্যুনিষ্ট বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়াছে।

১১ই নবেম্বর—মালয়—মিঃ আসফ আলী এই মর্মে একটি সংবাদ পাইয়াছেন যে, মালয়ে শত্রুর সহিত সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রায় ৪ শতজন ভারতীয় বিচারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহা ছাড়া সামরিক কর্তৃপক্ষ আরও কয়েক হাজার অসামরিক ভারতবাসীকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের বিচারের জন্য সিঙ্গাপুরে ২ জন ইউরোপীয়ানকে লইয়া একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হইবে।

১২ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডস নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, তিনদিন-ব্যাপী তুমুল যুদ্ধের পর বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ প্রায় সমগ্র সুরাবায়া ইন্দোনেশিয়ান চরমপন্থীদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে। সুরাবায়ায় যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সুরাবায়া বেতারে আমেরিকা, চীন এবং রাশিয়াকে অনুরোধ জানান হয়।

নরওয়েজিয়ান নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হালকে শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে।

দেশ পত্রিকা

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ। ৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 24th November, 1945. [৩য় সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আগস্ট-বিপ্লবে মেদিনীপুর

মেদিনীপুরে আগস্ট-আন্দোলন দমনকল্পে যে সরকারী অত্যাচার, উৎপীড়নের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে গভর্নমেণ্টের প্রচণ্ড দমননীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মেদিনীপুরে আগস্ট-বিপ্লবে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে যে সমস্ত যোগযোগ-রক্ষার ব্যবস্থা, থানা, ডাকঘর, সাবরেজেস্ট্রী অফিস, আবগারি অফিস, ডাকবাংলো, জমিদারী কাছারী প্রভৃতির ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণও এই রিপোর্টে প্রদত্ত হইয়াছে। রিপোর্টটি আনুপূর্বিক পাঠ করিয়া মনে হয়,, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি একান্ত নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে সমস্ত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই রিপোর্ট হইতে আরও জানা যায়, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তমলুক মহকুমায় একটি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জাতীয় গভর্নমেণ্টের নিজস্ব পাঁচটি থানা ও ছয়টি ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েৎ অফিস ও বিচারালয়সমূহ ছিল। এই জাতীয় গভর্নমেণ্ট হইতে অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, দুগ্ধ দান করা হইত। সাহায্যার্থে বিতরণকার্যে দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। জাতীয় গভর্নমেণ্টের কার্যকলাপ মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুক এই চারিটি থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আগস্ট-আন্দোলনের ফলে মেদিনীপুরে বিক্ষুব্ধ জনগণের ধ্বংসাত্মক কার্য ও জাতীয় গভর্নমেণ্টের লোকহিতকর কার্যকলাপ ছাপাইয়া যে মর্মন্তুদ ব্যাপার অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে, বিবেক-বিবেচনাহীন নির্বিচার ও নির্মম দমননীতি। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুরের ত্যাগস্বীকার ও সরকারী দমননীতির কথা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। আগস্ট-বিপ্লব দমনে এই সরকারী অমানুষিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্রিটিশ-শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকলঙ্কস্বরূপ হইয়া থাকিবে। এই দমননীতি হইতে, গুলীচালনা, স্ত্রীলোকগণের উপর পাশবিক অত্যাচার, প্রহার ও আটক, পাইকারী জরিমানা, লুণ্ঠন গৃহদাহ, বিমান হইতে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি কিছুই বাদ যায় নাই। পুলিশ ও সৈন্যদলের গুলীচালনার ফলে মোট ৪৪ জন নিহত, ১৯৯ জন আহত এবং ১৪২ জন সামান্যরূপে আহত হয়। ৬৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার, ৩১ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা এবং ১৫০ জন স্ত্রীলোককে প্রহার ও শ্লীলতাহানি করা হয়। ১২৪ খানি বাড়ি ভস্মীভূত, ৪৯ খানি বাড়ির ক্ষতিসাধন এবং ১০৪৪ খানি বাড়ি হইতে সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। গৃহদাহে ও লুণ্ঠনে সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা পরিমিত ক্ষতিসাধন করা হয়। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রহার ও গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ। অত্যাচার-উৎপীড়নের এই বিবরণ সভ্যজগতের ইতিহাসে বিরল এবং ইহা পাঠে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা-উপধারার যে সমস্ত অস্ত্র গভর্নমেণ্টের হাতে রহিয়াছে, তাহাই কি বিক্ষুব্ধ আন্দোলন-দমনে যথেষ্ট ছিল না? এই নির্মম দমননীতির উপর মেদিনীপুরে বন্যা ও ঝটিকায় মৃত্যু ও ধ্বংসের তাণ্ডব-লীলা চলার পরেও গভর্নমেণ্ট যে সে সংবাদ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন ও বঞ্চনা-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সমভাবেই হৃদয়বিদারক। রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্টে মেদিনীপুরে নির্বিচারে নির্যাতনের যে বীভৎস লীলা চালান হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, গভর্নমেণ্টের সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিবার কি আছে, দেশবাসী তাহা জানিতে অবশ্যই দাবী করিতে পারে।

দু'মুখো নীতি

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ৫৭ তম জন্মদিবস উৎসব উপলক্ষে গত ১৪ই নবেম্বর রাত্রিকালে লণ্ডনের সেণ্ট্ প্যাংক্রাস্ টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি পণ্ডিত নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসঙ্গে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলিয়া লইতে ভোলেন নাই যে, "তিনি শ্রমিক গভর্নমেণ্ট বা শ্রমিক দলের পক্ষে কথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন, একজন ইংরেজ নাগরিক হিসাবে, বৃহত্তর কমন্‌ওয়েল্‌থের নাগরিকরূপে।" ইংরেজ জনোচিত নাগরিক স্বাধীনতা লইয়া যখন অধ্যাপক ল্যাস্কি ভারত সম্পর্কে কোন কথা বলেন, তখন তিনি নিরপেক্ষ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। তাঁহার এই অকুণ্ঠ উক্তির জনাই তিনি ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল সম্পর্কে তাঁহার সাম্প্রতিক সশ্রদ্ধ ভাষণ, ভারত সম্বন্ধে স্পষ্ট উক্তি ও প্রাচ্যে ব্রিটিশ নীতির কঠোর সমালোচনায় ভারতের ও প্রাচ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধৃগণের প্রতি যে সহানুভূতি ও নির্ভীক আন্তরিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব গভীরতর হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি

শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া তিনি বলেন,—'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন'—ব্রিটেনের এই ধরণের স্তোকবাক্যে আমরা আর বিভ্রান্ত হইতেছি না। ভারতের জেলাসমূহে গুলী বর্ষণ করিয়া, সামান্য অস্ত্র-সজ্জিত ইন্দোনেশিয়ানদিগকে গুলী করিয়া, আনামীদের স্বাধীনতালাভের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক যুগের সমরাস্ত্র ব্যবহার করিয়া আমরা যদি আমাদের আদর্শ পূরণ করিতে চেষ্টা করি, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা বিদেশীয়-দিগকে মিথ্যার জন্য মৃত্যু বরণ করিতে বলিয়াছি।" কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁহার "ব্লু-প্রিণ্ট" সম্পর্কে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট অতঃপর যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহার এই তেজোগর্ভ নিরপেক্ষ ভাষণের অপলাপ সাধিত হইয়াছে। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পর্কিত তাঁহার "ব্লু-প্রিণ্ট" সংক্রান্ত উক্তিতেই আমরা আদি ও অকৃত্রিম ইংরেজ নাগরিক অধ্যাপক ল্যাস্কির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। এখানে ভারতের প্রতি তাঁহার বন্ধুত্বের মুখোস খুলিয়া গিয়া তাঁহার খাঁটি রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের কথার পরিবর্তে চিরন্তন "শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পন্থা"—নীতিই প্রকাশ পাইয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কিকে দোষ দিতেছি না। কারণ পণ্ডিত জওহরলালের জন্মদিবস-উৎসব সভায় তিনি স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিনি শ্রমিক গভর্ন-মেণ্ট অথবা শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে কথা বলিতেছেন না, তিনি বলিতেছেন একজন ইংরেজ নাগরিক হিসাবে। "ব্লু-প্রিণ্ট" সম্পর্কে তিনি যখন উক্তি করিয়াছেন, তখন তিনি ব্রিটিশ শ্রমিক দলের পরিচালক সমিতির সভাপতি ও ব্রিটেনের শ্রমিক গভর্নমেণ্টের ধারক ও বাহকগণের অন্যতম। তাঁহার এই double personality বা দ্বৈতরূপই তাঁহার মুখ দিয়া মামুলী দু'মুখো নীতির কথা বাহির করিয়াছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির এই সাধু সংকল্প প্রকাশের কারণ হৃদয়ংগম করিতে আমাদের বাকি নাই। পণ্ডিত জওহরলালের জন্ম-দিবস সভায় গরম গরম মন্তব্য করার জন্য শ্রমিক গভর্নমেণ্টের উষ্মার সঞ্চার হইয়াছিল এবং শ্রমিক দলের পরিচালক সমিতি হইতে তিনি বহিষ্কৃত হইতে পারেন, এরূপ সংবাদও রটিয়াছিল। তিনি সে সংবাদের প্রতিবাদ করিলেও শ্রমিক দল ও শ্রমিক গভর্নমেণ্টের তোষণের জন্যই তিনি যে তাঁহার রচিত এই "ব্লু-প্রিণ্টের" আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। ইংরেজেরা, শ্রমিকরাই হউন, আর প্রগতিবাদীই হউন, যখনই ভারত সম্পর্কে কোন বন্ধুত্ব ও হিতৈষণাপূর্ণ কথা বলেন, আমাদের মন সেই আপাতমধুর কথায় প্রীত হইলেও আমরা তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমরা অতীতে শ্রমিক-নেতা মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের অদ্ভুত-পূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রমিক-নেতা মিঃ এট্‌লীর রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা জানি ব্রিটিশ রাজনীতি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। নূতন গতিপথ উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা ইহার নাই। সনাতন সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার পথই ব্রিটেনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের গোলক ধাঁধায় যিনিই আসুন না কেন, তাঁহাকেই পাক খাইতে হইবে। সাম্রাজ্য-বাদের সমাধি রচনা না হইলে তাঁহাদের এই চক্রগতি হইতে মুক্তি নাই।

প্রাচ্য খণ্ডে স্বাধীনতার যুদ্ধ

প্যালেস্টাইন হইতে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের স্নায়ুকেন্দ্র হইতেছে ভারত। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় নির্যাতন, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের মহিমোজ্জ্বল আদর্শ এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির মনে নূতন প্রেরণা ও অটুট সংকল্প জাগ্রত করিয়াছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছে, ভারতের সমস্যাই এশিয়ার নিপীড়িত জাতিপুঞ্জের সমস্যা, ভারতের সমস্যার সমাধান না হইলে জগতের শান্তি বিপন্ন হইবে। কার্যতঃও হইয়াছে তাহাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে মিত্রশক্তিবর্গ যখন শান্তিবারি সিঞ্চনে উদ্যত, তখনই মহাযুদ্ধের স্ফুলিংগ হইতে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দ্বারা শোষিত দেশগুলিতে স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভারত যে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসান ও আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছে, আজ ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও প্যালেস্টাইনও তাহাই চাহিতেছে। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের ধন-সম্পত্তি ও শহরের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হাইফা বন্দরে ব্রিটিশ রণতরী সমাবেশ করা হইয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হুঁসিয়ারী সত্ত্বেও "হাংগামাকারীরা" নিরস্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশে জাতীয়তাবাদী দলকে উপেক্ষা করিয়া ব্রিটিশের অনুগত কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া শাসন-সভা গঠন করা হইয়াছে। এজন্য ব্রহ্মদেশে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের, জাতীয়তাবাদী দলের নেতা আউং সান এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আধুনিক যুগের সমরাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম দলনে প্রচণ্ডভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের "নিউ লীডার" পত্রে স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের নেতা ফেনার ব্রকওয়ে পার্লামেণ্টের ৩৯৩ জন সদস্যের উদ্দেশ্যে লিখিত এক খোলা চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিঠিতে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে কলঙ্কস্বরূপ। তিনি আরও বলেন—"বর্তমানে যে সমস্ত নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, যদি সেই সমস্ত নীতিই অনুসৃত হইতে থাকে তবে শুধু ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন নহে, ভারতবর্ষেও শ্রমিক গভর্ন-মেণ্ট জনগণের উপর পুরোপুরিভাবে এমন নির্যাতন চালাইবার জন্য দায়ী হইতে পারেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর আর কোন দিন তেমন নির্যাতন ঘটে নাই। যদি এইরূপ ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে শ্রমিক দল চিরদিনের জন্য নিন্দিত হইবে।" কিন্তু এই নিন্দার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইন্দো-নেশিয়ায় অস্ত্রসম্ভার প্রেরিত হইতেছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রেরণের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জাহাজে তুলিতে অস্বীকার করিয়া অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকগণ যে আদর্শ দেখাইয়াছে, তাহা ব্রিটিশের পক্ষে পথ-প্রদর্শক হইয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন। কেবল অস্ট্রেলিয়ায় নহে, বোম্বাইয়ের ওলন্দাজ জাহাজের ভারতীয় নাবিকগণও ইন্দোনেশিয়ার জন্য জাহাজে সামরিক সম্ভার লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়া ধর্মঘট করিয়াছে। ১৫ই তারিখের বাটাভিয়া হইতে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোনেশিয়ার এক বুলেটিনে এরূপ বলা হইয়াছে যে, সুরাবায়ায় অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীর মুসলমান সৈন্যগণ ইন্দোনেশিয়ান-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে সামরিক পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। শাস্তির ভয় উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি স্বরূপেই তাহারা এরূপ করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম দলনের উদ্দেশ্যে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ হইতে ব্রিটিশ বাহিনীর এই সামরিক শক্তি নিয়োগের প্রতিবাদ ক্রমশঃই স্পষ্ট ও ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে। গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের দেশ রুশিয়া এ পর্যন্ত নীরব থাকার পর বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুসৃত ব্রিটিশ নীতির কঠোর সমালোচনা করিতেছে। মস্কোর "ট্রুড" নামক সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হইয়াছে—"বিভিন্ন দেশের প্রগতিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণ নিপীড়িত জাতি-গণের স্বাধীনতা সংগ্রাম দলনে ইংগ-ওলন্দাজ সৈন্য ও আমেরিকার অস্ত্রসম্ভার ব্যবহারের জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। ওলন্দাজ ও অন্যান্য একচেটিয়া বাণিজ্যের সুবিধাভোগিগণ উপনিবেশগুলিতে তাঁহাদের

প্রাধান্য রক্ষার স্বার্থে ঔপনিবেশিক জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এই বলিয়া মসীলেপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, জাপানীরাই এই আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে।" লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এশিয়ার যে অংশে স্বাধীনতার সমরানল প্রজ্বলিত হইতেছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সেনারাই তাহা দমন করিতে তৎপর হইয়াছে। যে ব্রিটিশ গত মহাযুদ্ধের ফলে আমেরিকার কাছে ঋণজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, যে ব্রিটিশ আমেরিকার সামরিক শক্তির সাহায্যে যুদ্ধজয়ের অর্থহীন আত্মম্ভরিতায় আজ স্ফীত, সেই ব্রিটিশ-আমেরিকার নিকট হইতে ঋণ ও ইজারা সূত্রে প্রাপ্ত অস্ত্র অতি নগণ্য অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধৃগণের উপর প্রয়োগ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছে না। সাম্রাজ্যবাদের উগ্র অহমিকায় তাহারা এরূপ প্রমত্ত হইয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া এরূপ নির্লজ্জ অভিনয় আর কতদিন চলিবে? মিঃ উইনষ্টন্ চার্চিল বেলজিয়ান সেনেটকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে "অনাবশ্যক যুদ্ধ" নামে অভিহিত করিতে বলিয়া শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, গত মহাযুদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে নিরর্থক হইয়াছে, তাঁহাদের কোন লাভ হয় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে মিঃ চার্চিল যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, মিঃ এটলী তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ করিবেন কি?

জিন্না সাহেবের সরকারী বৃত্তি!

গত ১০ই নভেম্বর তারিখের "হকিকত" নামক উর্দু সংবাদপত্রে মিঃ জিন্নার সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, "নবযুগ" তাহার নিম্নলিখিত বাঙলা অনুবাদ পরিবেশন করিয়াছেন—"কয়েকখানি সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, পাকিস্থানী প্রচারকার্যের দ্বারা ভারতে হিন্দু মুসলমানের অনৈক্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট হায়দরাবাদ স্টেটের মারফৎ মিঃ জিন্নাকে বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেছি যে, একাধিক পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ জিন্নার পক্ষ হইতে ইহার কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই। এই খবরটি প্রথমে বিখ্যাত শিখ নেতা মাস্টার তারা সিং প্রকাশিত করেন এবং উহার প্রমাণস্বরূপে তিনি সরকারী ইনকামট্যাক্স বিভাগ হইতে আবিষ্কৃত প্রমাণও উপস্থিত করেন। ইহার পর তিনি বলেন যে, মিঃ জিন্নার স্বাভাবিক আয়ের উপর বিশ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কোথা হইতে এই টাকা আসিতেছে, তাহা জানিতে চাওয়া হয়। উত্তরে মিঃ জিন্না নাকি জানান যে, নেটিভ স্টেট হইতে ঐ টাকা তাঁহার নিকট আসিয়াছে। এমতাবস্থায় মিঃ জিন্নার পক্ষে হয় মাস্টার তারা সিং-এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা কর্তব্য, অন্যথায় তিনি সত্য স্বীকার করিলে দেশবাসী তাঁহার পাকিস্থানী ধুয়ার প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া ফেলিতে পারে।"

৯ই নভেম্বর তারিখের 'মদীনা' এবং দিল্লীর 'আনসারী'ও এই সংবাদটি ঠিক অনুরূপভাবে প্রকাশ করিয়া ব্যাপারটির উপর আরও কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করিয়া বলিতেছেন যে, "কেবল এক হায়দরাবাদ স্টেটের মারফৎ নহে—পাকিস্থানী প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা ভারতের স্বাধীনতায় বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য মিঃ জিন্নাকে আরও কয়েকটি নেটিভ স্টেটের মারফৎ প্রচুর আর্থিক সাহায্য করা হইতেছে।" ইহার উপর টিকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। তবে এ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিংবা মিঃ জিন্নার পক্ষ হইতে এই সংবাদের প্রতিবাদ না হওয়ায় জনসাধারণের মনে মিঃ জিন্নার নিঃস্বার্থ পাকিস্থানী ব্রত সম্বন্ধে সন্দেহের ভাব বদ্ধমূল হইতেছে। কায়েদে-আজম কি বলেন?

সরকারী ঘোষণায় অন্নবস্ত্রের কথা

ভারত সরকারের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বাঙলায় দুই দিন অবস্থান করিয়া এবং "বিমান হইতে স্বচক্ষে" বাঙলার ধান্য ফসলের যে অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছে যে, বাঙলায় আগামী বৎসরে আর দ্বিতীয় মন্বন্তর সংঘটিত হইবে না। শেষকালে যে অকাল বর্ষণ হইয়াছে, তাহাতেই ফসলের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে, ফসলের অবস্থা যেরূপ মন্দ বলিয়া আশঙ্কা করা গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। "দূরের ঘাস ঘন দেখায়"—স্যার শ্রীবাস্তব যদি এই প্রবচনটির অন্তর্নিহিত সত্য জানিতেন, তবে তিনি বিমান হইতে দেখিয়া এই অবাস্তব ভরসার কথা আমাদিগকে শুনাইতে পারিতেন না। কিছুদিন পূর্বে মিঃ কেসিও আবহতত্ত্ববিদগণের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছিলেন, এ বৎসর সুবৃষ্টি না হইয়া যায় না এবং তাহার ফলে ফসল ভাল হইবে আশা করা যায়। আসল কথা হইতেছে এই যে, এই ধরণের ফাঁকা কথার কোন অর্থ হয় না। পরন্তু দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি এইরূপ অর্থহীন উক্তি করিলে তাহাতে হাসি ও বেদনা—দুয়েরই উদ্রেক হয়। এই প্রসঙ্গে বাঙলার ভাবী লাটের সহধর্মিনী খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও মনে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর আমলে বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ হইবে না। কিন্তু বাঙলার মাটিতে পদার্পণ করিয়া বাঙলার অবস্থা তাঁহার চাক্ষুষ দেখিবার যদি সুযোগ হয়, তবে তাঁহার মতামত কিরূপ গঠিত হয়, তাহাই লক্ষণীয় হইবে। এইত গেল অন্নের কথা। বস্ত্র সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী যেসব মতামত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অন্তর্নিহিত সত্য গবেষণার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের ডেপুটি টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ বি সি প্যাটেল সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতীয় কাপড়ের কলে যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদিত হইত, বর্তমানে তাহার উপর শতকরা ৩০ ভাগ বস্ত্র বেশি উৎপাদিত হয়। সেদিন খোদ টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ধর্মবীর বলিয়াছেন যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ বস্ত্র বেসামরিক ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইত, বর্তমান তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ পাওয়া যাইতেছে। আবার কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই মিলমালিক সমিতি হিসাবসমেত যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, যুদ্ধ-পূর্বকালে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি হইতে যে পরিমাণ কাপড় বেসামরিক ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইত, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তাহার ৯৪ ভাগ পাওয়া যাইতেছে। এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী বিবৃতির কোন্‌টিকে জনসাধারণ বিশ্বাস করিবে, তাহা মিঃ প্যাটেল বলিয়া দিবেন কি? মিঃ প্যাটেল আরও একটি অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বাজারে কাপড়ের অভাব নাই, তবে লোকে রকমারি ও মিহি সুতার কাপড় চায়, যাহা বর্তমানে সরবরাহ করা অসম্ভব। মিঃ প্যাটেল কি খবর রাখেন, মফঃস্বলে কিছুদিন হইতে কেবল জামার থান সরবরাহ করা হইতেছে, ধুতি ও শাড়ি পাঠান হইতেছে না? বাঙলার জনসাধারণ অধিকাংশই দরিদ্র। তাহারা মিহি কাপড় চায় না, তাহারা মোটা কাপড় পরিতেই অভ্যস্ত। বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা, শবাচ্ছাদনের পরিবর্তে কলাপাতার ব্যবহার, ইত্যাদি যে সমস্ত মর্মন্তুদ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার এ পর্যন্ত সরকারী প্রতিবাদ হয় নাই, তাহা কি সবই মায়া? এদেশের রাজদপ্তরে গবুচন্দ্রের অভাব নাই, জনসাধারণ তাহা জানে বলিয়াই তাহারা মোটা মাহিয়ানার সরকারী চাকুরিয়ার শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী মাত্রই "গসপেল ট্রুথ" বলিয়া গ্রহণ করে না। তাহাদের দুর্গত অবস্থার বেদনার অভিজ্ঞতাই তাহাদিগকে সত্যের সন্ধান দেয়।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের সৌজন্যে



ধানের আটী

শিল্পী দয়ানন্দ

বাঙলার চাউল—ভারত সরকারের খাদ্য-সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বাঙলায় আসিয়াছিলেন। গত ১২ই নবেম্বর তিনি কয়জনকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত—

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় চাউলের অবস্থা
চাউলের মূল্য
চিনি সরবরাহ
সর্ষপ তৈল সরবরাহ
গোল আলু ও খৈল সরবরাহ
ঘৃত সরবরাহ

এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনা হইয়াছে; আশ্বাসও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু "হনোজ দিল্লী দূর অস্ত।" মেদিনীপুর জিলায় অন্নাভাবে মাতার কন্যা বিক্রয়ের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল"—দেশে সর্বত্র "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লোকের ও তাঁহাদিগের পরিজনবর্গের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। প্রকাশ, ঐ সেনাদলে প্রায় দেড় লক্ষ নরনারী যোগ দিয়াছিলেন। সেনাদলের ব্যয় নির্বাহার্থ রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুরে, শ্যামে বহু ভারতীয় তাঁহাদিগের সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বিদেশে সেই সকল ভারতীয় এখন নিঃস্ব হইয়াছেন। যাঁহারা সেনাদলে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের পরিজনদিগকে ধরিলে প্রায় ৪ লক্ষ লোককে সাহায্য প্রদান প্রয়োজন। সে কাজ উপযুক্তরূপে করিতে ৪।৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। বোম্বাই আপাতত ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে বদ্ধ-পরিকর। বোম্বাই ব্যতীত এ পর্যন্ত কেবল কলিকাতায় সাহায্য দান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সমিতিতে ইতোমধ্যেই প্রায় ৩০ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখনও সমিতি টাকা সংগ্রহের জন্য রসিদ বহি ও "কুপন" দিতে পারেন নাই। জানা গিয়াছে, কতকগুলি লোক বা প্রতিষ্ঠান বিনানুমোদনে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। যাহাতে সাহায্য দান সমিতি ব্যতীত আর কাহাকেও অর্থ প্রদান করা না হয়, সমিতির পক্ষ হইতে সেই অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কলিকাতার পথে যে সকল সৈনিক যে যাহার গৃহে যাইতেছেন, কলিকাতায় সমিতি তাঁহাদিগের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছেন। গত শনিবারে কয়জন সৈনিক মাদ্রাজে যাত্রা করিয়াছেন। সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে যে হোটেলে রাখা হইয়াছিল, সেই হোটেলের মালিক তাঁহাদিগের জন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

দেশের কথা

(২৭শে কার্তিক—৩রা অগ্রহায়ণ)

বাঙলার চাউল—"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল" —নির্বাচন—ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সেনাদল

যে ট্যাক্সীতে তাঁহারা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন, তাহার চালক যখন জানিতে পারেন, আরোহীরা "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লোক তখন ভাড়া লইতে অস্বীকার করেন এবং আরোহীদিগের সাহায্যার্থ ৫ টাকা প্রদান করেন।

দেশের সর্বত্র এই ভাব প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে।

লাহোরে "জাতীয় সেনাদল দিবস"

কলিকাতায় ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলীবর্ষণ

২১শে নবেম্বর বুধবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ দিবসে কলিকাতায় ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলী বর্ষণে এক জন নিহত ও ৬০ জন আহত হইয়াছে।

ঐদিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রদের এক সভা হয়। সভার পর তথা হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ধর্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া অগ্রসর হইবার কালে পুলিশ উহাদের গতি রোধ করে। ছাত্রগণ বিনা প্রতিবাদে রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়ে। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার পর জনতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং পুলিশ শোভাযাত্রাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টায় অতঃপর লাঠী চার্জ ও গুলীবর্ষণ করে।

উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা হয়, পুলিশ তাহার উপর লাঠি চালনা করে। দশ বৎসরেরও নূন বয়স্কা কয়েকটি বালিকা আহত ও অজ্ঞান হয়।

লক্ষ্মৌ শহরে হাঙ্গামা হয় এবং একজন সাংবাদিক গ্রেপ্তার ও আরও কয়েকজন প্রহৃত হন। একজন সাংবাদিকের ক্যামেরা পুলিশ কাড়িয়া লয়। সশস্ত্র পুলিশ লক্ষ্মৌ শহরে টহল দিতেছে।

গত ১৮ই নভেম্বর চন্দননগরে সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য তথায় একটি সভা হয়।

নির্বাচন—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচনে আর বিলম্ব নাই। অনেক স্থানে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙলায় কংগ্রেসের সহিত নির্বাচনে হিন্দু মহাসভার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, তাহা দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, তিনি মনোনয়ন বোর্ড গঠিত হইবার পূর্বে—নিজ দায়িত্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ২টি আসন দিতে চাহিয়াছিলেন—শ্যামাপ্রসাদবাবু তাহাতে সম্মত হন নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এখনও প্রার্থী আছেন। শরৎবাবু তাঁহাকে সংবাদপত্রের মারফতে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে সকল কেন্দ্র হইতে হিন্দু মহাসভার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করুন, তাহাতেই ঐক্যের পথ সুগম করা হইবে। গত ১৮ই নবেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক পত্রে লিখিয়াছেন,—যিনি কংগ্রেসে যোগ দিবেন, তিনিই কংগ্রেসকে সাহায্য করিতে পারিবেন। হিন্দু মহাসভার সকল সদস্য মহাসভা বন্ধ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান করুন; ইহাই তাঁহার অনুরোধ। 'ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের' সম্বন্ধে দেশে যে উৎসাহের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার পরে যে, কংগ্রেসের পক্ষেই লোক আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু রাজনীতিক কারণে যাঁহারা বন্দীদশায় কালাতিপাত করিতেছেন, এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই, আবার তাঁহাদিগের মুক্তির দাবী জানাইয়া গত ১৮ই নভেম্বর এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। সমগ্র দেশ ইঁহাদের মুক্তি চাহিতেছে।

বন্দীদিগের মধ্যে সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী অন্যতম। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য এবং তাঁহাকে চিকিৎসার্থ নাইনী জেল হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইতেছে না।

ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সেনাদল—বেটেভিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সৌরাবায়ায় ভারতের মুসলমান সৈনিকগণ ইন্দোনেশিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং বৃটিশ সামরিক পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ায় সেদেশের লোকের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য ভারতীয় সৈনিক ব্যবহারে ভারতবর্ষের লোক বহুবার আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কথায় সাম্রাজ্যবাদীরা কর্ণপাত করেন নাই।

অকাল মৃত্যু—সন্তোষকুমার জানা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। সন্তোষকুমার এবার এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন হইতে যক্ষ্মায় কাতর ছিলেন এবং তিনি যখন আটক ছিলেন, সেই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু

ছাত্রগণ তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যয় বহন করিতেছিলেন। গত ১৫ই নভেম্বর হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতার ছাত্রগণ এখন অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক বা একাধিক হাসপাতালে পীড়িত, বিশেষ যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ছাত্রদিগের চিকিৎসার জন্য 'বেড' স্থাপনের সাধু চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যদি এই কার্যে সাফল্যলাভ করেন, তবে যে বাঙলার ছাত্র সমাজের একটি বিশেষ অভাব দূর করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মেদিনীপুরের অবস্থা—মেদিনীপুর মেডিক্যাল রিলিফ ও স্বাস্থ্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মেদিনীপুরে এখনও ব্যাধি বিস্তার হইতেছে, সেই জন্য তথায় এখনও পূর্ববৎ চিকিৎসা বিষয়ে অর্থাৎ ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ম্যালেরিয়াই সর্বপ্রধান রোগ। বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কমিটি ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। মাড়বারী রিলিফ কমিটিও শীঘ্র ১২টি সাহায্য দান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন। গত ৪ সপ্তাহে মেডিক্যাল রিলিফ কমিটির দ্বারা যে ১৫ হাজার ৫ শত ৮২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ১২ হাজার ৯ শত ১০ জনই ম্যালেরিয়ায় কাতর।

গ্রামের উন্নতি সাধন—বাঙলা সরকার দেশের লোকের মত গ্রহণ করিয়া এমন কি ব্যবস্থা পরিষদের অপেক্ষাও না রাখিয়া যে কমিটি গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার নির্ধারণ কলিকাতা ইমপ্রুফমেণ্ট ট্রাস্ট আলোচনা করিয়াছেন। ট্রাস্ট বলেন, সরকার প্রথমে শহরের কি প্রথমে গ্রামের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিবেন, তাহা বিবেচ্য নহে; কিছু কাজ করাই প্রয়োজন। ট্রাস্টের মত বর্ধমান জিলার পানাগড় অঞ্চল কলিকাতার শিল্প অঞ্চলে পরিণত করা হউক। সামরিক প্রয়োজনে তথায় বিদ্যুৎ সরবরাহের, জল সরবরাহের ও অন্যান্য ব্যবস্থার আবশ্যক কাজ করা হইয়াছে। সুতরাং আরও উন্নতি সাধন করিয়া তথায় শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে সহজসাধ্য। বাঙলা সরকার ট্রাস্টের এই পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, হাতে হাতিয়ারে কাজ না করিয়া তেমন কাগজে কলমে যে কাজ করা হয়, তাহাতে প্রকৃত উন্নতির কোন উপায় কোনরূপে হইতে পারে না।

ডাক্তার লক্ষ্মী—"ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" লেফটেনাণ্ট ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী—"ঝাঁসীর রাণী রেজিমেণ্টের" গঠনকার্যে সহায় ছিলেন। তিনি রেঙ্গুন হইতে এক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—তিনি তাঁহার আত্মসমর্পণের পরে কোনরূপে বৃটিশের সাহায্য করেন নাই। তিনি আত্মসমর্পণ করিবার পরে তাঁহাকে বৃটিশ "গরিলা" বাহিনীর কেন্দ্রী শিবিরে আটক রাখা হয়। তথায় প্রায় ২ শত বেসামরিক ভারতীয় ছিল—তাহাদিগের অধিকাংশই গুর্খা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা—নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। ইহাদিগের অনেকেই তখন অসুস্থ—ঐ "গরিলা" বাহিনীর নায়ক জিজ্ঞাসা করেন—তিনি কি উহাদিগকে চিকিৎসা করিবেন? তিনি বলেন, তিনি বেসরকারীভাবে ও কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত আছেন। সেই শিবিরে ৩ সপ্তাহ রাখিয়া তাঁহাকে রেঙ্গুনে আনিয়া প্রায় দেড় মাস কাল কড়া পাহারায় রাখা হয়। তিনি অস্থায়ীভাবে একটি বৃটিশ সামরিক হাসপাতালে কাজ করিতে সম্মত আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাহার পরে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয়। কাজেই তিনি বৃটিশকে কোনরূপ সাহায্য দেন নাই; কেবল বেসামরিক ভারতীয়দিগকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

দুইদিনের অভিজ্ঞতা—ভারত সরকারের খাদ্য সদস্য সার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বাঙলার গভর্নরের সঙ্গে ২ দিন বিমানে বাঙলার উপর উড়িয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অল্পদিন পূর্বে যে বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বাঙলায় ধানের ফসলের অনেক উন্নতি হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের যে আশঙ্কা ছিল, তাহা আর নাই বলিলেই চলে। কেবল স্থানে স্থানে চাউলের অভাব আছে। এই সিদ্ধান্ত ২ দিনের বিমান বিহারের ফল।

কুচবিহারে অভিযুক্ত সামরিকদিগের বিচার—এতদিনে কুচবিহারে যে সকল সামরিক ব্যক্তি কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাদিগের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। এই অভিযোগে শতাধিক সামরিক লোক অভিযুক্ত। মামলা এখন বিচারাধীন।

গান্ধীজীর সফর—বর্তমান ব্যবস্থানুসারে গান্ধীজী বাঙলায় সফর উপলক্ষে আগামী ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা আসিবেন, শ্রীযুক্ত প্যারীলাল, ডাক্তার সুশীল নায়ার তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিবেন। তিনি ১০ দিন কলিকাতার উপকণ্ঠে সইদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থিতি করিবেন। প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীজীর অবস্থিতির জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতেছেন।

ছবি নিলাম—গত ১৭ই নবেম্বর মধ্যেই শহরে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু ও পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ডাকাডাকি করিয়া একখানি চিত্রের মূল্য ৬ শত টাকায় তুলিয়াছিলেন। ঐ ৬ শত টাকা ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইয়াছে। ছবিখানি বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত—চিত্রকর ঈশ্বর দাস কর্তৃক অঙ্কিত।

পণ্ডিত মদনমোহনের কংগ্রেস সমর্থন—পণ্ডিত মদনমোহন মালাব্য আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আবার কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রথমাবধি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন—তিনি কংগ্রেসের সভাপতিও হইয়াছিলেন।

কালা আদমী—বিলাতের 'ডেলী হেরাল্ড' পত্র তথায় শ্রমিক দলের মুখপত্র। সেই পত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—যে "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" ইংরেজের সাহসের সর্বপ্রধান পুরস্কার—রাজার নিকট হইতে সেই পুরস্কারের নিদর্শন লইয়া আসিয়া ২ জন ভারতীয় সৈনিক কোন খাদ্যাগারে যাইলে ইটালীয় ভৃত্য বলে—"আমরা কালো আদমীদের এখানে খাইতে দিই না।" অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে বৃটেনের জয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে এবং যে সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে রাজা তাহাদিগকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত করিয়াছেন, তাহারা ভারতীয় বলিয়া বিলাতের খাদ্যাগারে বসিবার অধিকারে বঞ্চিত হয়।

সার জন উডহেডের মত—সার জন উডহেড কিছুদিন বাঙলার গভর্নর ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণের বার বৎসর পরে গত দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের সভাপতি হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। বিলাতে এক সভায় গত ১৭ই নভেম্বর তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে যদি চাউল সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে হয়, তবে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বর্ধিত করিতে হইবে। ধানের ফলন শতকরা ৬০ ভাগ বর্ধিত করা সম্ভব; এখন এক একর জমীতে ১৫ টন মাত্র ধান হয়, তাহা ৩০।৩৫ টন করা যায়। তিনি বলেন, মৎস্যই ভারতবর্ষে জনসাধারণের দেহে শক্তি রক্ষার প্রধান খাদ্য হওয়া উচিত।

মন্বন্তরের অভিশাপ

শ্রীঅমর সান্যাল

ভোরের আলো তখনও ভাল ফোটে নি। পূর্বদিকে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র। আশ্বিনের শিশিরাক্ত হাওয়ায় ময়ূরাক্ষীর জলে কাঁপন লেগেছে। জল ও হাওয়ায় চলেছে মাতামাতি, হাওয়ার কোমল স্পর্শে থেকে থেকে জল শিউরে উঠছে। নদীতীরে ঘুমন্ত শহর, শব্দহীন বাড়িগুলি রাতের প্রহরীর মত নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করছে।

পাখীর ডাকে পৃথিবী জেগে উঠল। দিগ্‌বধূদের ঘোমটার আবরণ খুলে গেল একে একে। নদীর গায়ে একটা জীর্ণ একতলা বাড়ির কপাটও তীব্র আর্তনাদ করে খুলে গেল। বড় একটা কলসী নিয়ে রমা বেরিয়ে এল। বাড়ির নিচেই ঘাট, রমা সন্তর্পণে নামতে লাগল।

জনহীন ঘাট, রমা একবার তাকাল চারদিকে। নদীর ওপারে অন্ধকার জড়িয়ে আছে গাছের গায়ে। এপারে খেয়াঘাটে আটদশখানা পান্‌সী বাঁধা। নীরব নদীতীরে পান্‌সী কখানাই মনে হচ্ছে সজাগ ও কর্মব্যস্ত। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় খেয়াঘাটের পথে লাগান রয়েছে একসার গরুর গাড়ি,—বস্তার পর বস্তা চাড়িয়ে নিখুঁতভাবে বোঝাই করা। পান্‌সী থেকে একদল লোক দ্রুত ত্রস্তপদে গাড়ির বস্তা একের পর এক নৌকার কুক্ষিজাত করছে। তস্করের মত রহস্যময় তাদের আচরণ, রাতের অন্ধকারে সংগোপনে তারা তাদের কাজ সমাধা করে চলেছে।

অনুচ্চস্বরে রমা বলল,—ওঃ, আজও! তারপর আঙুল গুণতে আরম্ভ করল,—এক, দুই, এই আজকে নিয়ে ছদিন। সূর্যনগরের চাল আর থাকল না। রোজ এই রাতের অন্ধকারে নৌকা বোঝাই চাল পাড়ি দিচ্ছে অজানা দেশের উদ্দেশে। এর শেষ কোথায়? চালের দর হয়ে গেছে দশ টাকা। মাধবের ষাট টাকা মাহিনায় তাদের চলবে কি করে? ঠাণ্ডা হাওয়ার আবেষ্টনীতে দাঁড়িয়েও রমা ঘেমে উঠল।

হঠাৎ এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল সে। জলভরা কলসীটা মাটিতে নামিয়ে পা বাড়াল খেয়াঘাটের দিকে। কতটুকুই বা পথ, রমা একপা একপা করে অগ্রসর হল। স্নানের ঘাট তখনও নির্জন। আমবাগানের ভিতর দিয়ে খেয়াঘাটের পথও যেন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে। আজ এই পথ একাকী অতিক্রম করতে বুকের ভিতর তার একটুও কেঁপে উঠল না। আজ সে দেখবেই, এই তস্করবৃত্তির নায়ক কে।

এইটুকু পথ, তবু যেন ফুরোয় না। বাগানের পথে ভ্রমণরত দুএকটা শেয়াল বিস্ময়ে মুখ তুলে চাইল রমার দিকে। দমকা বাতাসের সংগে ভেসে এল কি একটা পচা গন্ধ, রমার গতি একটুও শিথিল হল না। প্রায় এসে গেল সে। ছায়ামূর্তিগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শোনা গেল অস্পষ্ট কথাবার্তা। তাকে কেউ লক্ষ্য করেনি বোধ হয়। রমা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল।

ভয়ানক ক্লান্ত হয়েছে সে। এইটুকু পথ,—মনে হয়েছে কত দূর! প্রাথমিক উত্তেজনার ধাক্কা কেটে গেছে, শ্রান্তির অবসাদে রমা বারবার শিউরে উঠতে লাগল। তবুও একপা নড়ল না সে: আজ দেখে যাবে তাদের দেশের এই সর্বনাশের চক্রধারী কে।

পান্‌সীর লোকদের কর্মচাঞ্চল্য মন্দীভূত হয়ে এসেছে। শেষ গাড়িখানাও খালি হয়ে এল। বস্তা বহনকারীরা মাথার গামছা খুলে হাওয়া খাচ্ছে। তারার দল আকাশ থেকে বিদায় নিয়েছে। সংগীহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত ধরিত্রীর দিকে তাকিয়ে আছে শুধু প্রভাতী তারা।

দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে উঠল রমা। এরা ত কুলি-মজুর, পয়সার লোভে একাজ করেছে। চক্রান্তের চক্রী যারা, তারা কোথায়? কুলীর দল সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল। মৃদু গুঞ্জরণ উঠল তাদের মধ্যে—বাবুরা এয়েচে। কম্পিত দৃষ্টি খেয়াঘাটের দিকে নিক্ষেপ করল রমা। পান্‌সী থেকে বেরিয়ে আসছে মাথায় পাগড়ী জড়ান এক ভিনদেশী মূর্তি, সংগে ধুতি-পাঞ্জাবীপরা এই বাঙলা দেশেরই এক সজ্জন। তাদের মুখ দেখা যাচ্ছে না, কথাবার্তাও তারা বলছে ফিসফিস করে। বোধ হয় রচনা করছে নতুন এক চক্রান্তের খসড়া।

হঠাৎ রমা চমকে উঠল। বিদেশী ভদ্রলোক বিদায় নিয়েছে, এদেশীয় এগিয়ে আসছে। মুখ চেনা,—নিশাপতি চ্যাটার্জি, জনরক্ষা-কমিটির সম্পাদক।

রমা যেন ভূত দেখেছে! অস্ফুট আর্তনাদ করে প্রাণপণে গাছটাকে আঁকড়ে ধরল সে। নিশাপতিদা! সে কেমন করে হবে! হয়ত ভুল দেখেছি আমি। আবার মুখ তুলে চাইল রমা। নিশাপতিই বটে! কোন ভুল নেই,—নিজের চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

ছোট শহর এই সূর্যনগর, হাজার দশেক লোকের বাস। ছোট হলেও শহরের ঠাট সব ঠিক আছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানকার ব্যাঙ্কের সংখ্যা। কি অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে এর অণুপরমাণুতে যে, প্রত্যেকটি নামকরা ব্যাঙ্ক এখানে শাখা খুলে বসেছে!

ব্যাপার খুব আশ্চর্য মনে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদে সূর্যনগর সম্পন্ন নয়, এর রুক্ষ মাটিতে ফসলের সোনা ফলে না। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া বিত্তবান লোকও বিরল। তাই শহরে অজ্ঞান অধিবাসীরা আনন্দগর্বে চঞ্চল হয়ে উঠল তাদের এই ছোট শহরে বড় ব্যাঙ্কের আমদানী দেখে।

স্কুলের ছুটির পর গাছতলায় দাঁড়িয়ে সেদিন এই কথাই আলোচনা হচ্ছিল। রতনবাবু বললেন,—বাইরে নামডাক আছে দেখছি আমাদের শহরের। নইলে এই দুর্দিনে এতগুলি ব্যাঙ্ক এখানে সোনার খনি আবিষ্কার করে বসল কি করে!

রুক্ষমেজাজী ও স্পষ্টবক্তা বলে পরিচিত মহলে অনাদির দুর্নাম আছে। সে বলল,—দেশের কোন খবর আপনারা রাখবেন না মাস্টার মশায়। খবরের কাগজখানা পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দেখার ক্লেশটুকুও স্বীকার করবেন না। চালের দর দশ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। জেলায় জেলায় উঠেছে হাহাকার আর টনক নড়েছে রাজধানীর বণিকসম্প্রদায়ের। তাই না তারা ছুটে এসেছে, সূর্যনগরের মত জায়গায় একটা পৈশাচিক চাপা উল্লাস নিয়ে। এ আর কিছু নয় মাস্টারমশায়, এ শুধু আপনাদের দেশের ধনতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের একটুখানি নমুনা।

অনাদির উচ্ছ্বাসে বাধা দিল মাধব, বলল—তোমার সব অভিযোগই মেনে নিলাম অনাদি, দেশের খবরাখবর রাখা সত্যিই আমাদের হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্ক যে আমাদের সর্বনাশের মতলব নিয়ে এসেছে, একথা বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই।

মাধবের মন্তব্য রতনবাবুর কণ্ঠে অনেকখানি জোর এনে দিল। তিনি বললেন,—এরা ত শুনছি, এর মধ্যেই কৃষকদের টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে।

অনাদির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। সে বলল,—হ্যাঁ, কৃষকদের কেন, আপনাকেও সাহায্য করেছে। বাড়ি বাঁধা দিয়ে কত টাকা পেলেন শুনি?

রতনবাবুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, তারপর হতবুদ্ধি সহকর্মীদের নমস্কার করে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

রতনবাবু চলে যেতেই সকলের রাগ ফেটে পড়ল অনাদির উপর। অনাদি একটুও অপ্রতিভ হল না, বলল,—স্বীকার করছি আমার অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু একথাও খাঁটি সত্যি, বাড়ি উনি বাঁধা রেখেছেন।

হেসে মাধব বলল,—কিন্তু বাড়িটা ওঁর, আমাদের নয়। বাড়ি বাঁধা দেওয়াও ওঁর পক্ষে দরকার, মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।

এবার অনাদি চুপ করে গেল। মাধবের এই উক্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তি দাঁড় করান চলে না। অনাদি নীরবে প্রস্থান করল।

একে একে সকলেই বিদায় নিল। রাজপথ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পোস্ট আপিসের মাঠটা হয়ে উঠেছে খেলাধুলায় সরগরম। কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেছে আজ, রমা আবার ভাবতে বসবে। বাড়ির দিকে জোরে পা চালিয়ে দিল মাধব। পথ চলতে চলতে রমাকে বারবার মনে হল মাধবের। সূর্যনগর স্কুলে চাকুরীর প্রথম দিনে তার চেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়েছিল রমা। কাজে বেরুবার সময় তার ধুতি-পাঞ্জাবী নির্বাচনের ভার নিল সে স্বয়ং। নিজহাতে চুল আঁচড়ে ছোট্ট একটা চুমো দিয়ে তাকে বিদায় দিল। তারপর ঘাতপ্রতিঘাতময় পাঁচটি বছর কেটে গেলেও প্রথম দিনের স্মৃতি মাধবের মনের সমস্তখানি চির উজ্জ্বল করে রেখেছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে মাধব নদীর পথ ধরল। এ-পাড়ার বাসিন্দারা সস্তার ভাড়াটে। সামান্য আয়ে কোনরকমে সংসার চালায়। স্ত্রীপুরুষ সকলেরই শীর্ণ দেহ, যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের দেখায় প্রৌঢ়ের মত। নদীর ধারের পথও অধিবাসীদের মত দীন অবস্থাপ্রাপ্ত। পথের ধারে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা শহরের আবর্জনার গাড়ি খালি করে যায়, ওরা প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। মাঝে মাঝে মড়ক লাগে, ঘরে ঘরে লোক মরে; ময়ূরাক্ষীর তীরে মৃতের শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে যায়।

—আনমনে শিউরে উঠে দ্বিগুণ জোরে মাধব এগিয়ে চলল।

সেদিন রবিবার, কাজের তাড়া নেই। উনুনে আগুন দিয়ে রমা বসে আছে। মাধব গেছে বাজারে। সঙ্গে তাদের পাঁচ বছরের ছেলে অনু।

বসে বসে রমা ভাবছে শুধু নিশাপতির কথা। তাকে বেশ ভাল করেই চেনে সে। নিশাপতির কথা বলতে তারা গর্ব অনুভব করত। একজন কর্মী বটে! ওকালতি ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজ করছে, নীলকণ্ঠের মত সকল বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে নিয়েছে। সূর্যনগরের এই সর্বনাশের নায়ক সেই নিশাপতিদা!

সেদিনকার অভিযানের কাহিনী রমা ইচ্ছে করেই কাউকে বলে নি, মাধবকে পর্যন্ত নয়। তার মস্ত একটা আশা ও বিশ্বাসের মেরুদণ্ড প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই সেই নিশাপতি, যাকে তারা কল্পনা করত বিরাট বনস্পতি-রূপে, কাঞ্চনজঙ্ঘার অভ্রভেদী মহিমায়। সে ষড়যন্ত্র করেছে বিদেশী বণিকের সঙ্গে, সূর্যনগরের অস্থিকঙ্কালের ভিত্তির উপর তার সুখের সৌধ গড়ে তুলবে।

সশব্দে দরজা খুলে যেতেই রমার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল। মাধব বাজার নিয়ে ফিরেছে, অনুর হাতে একটা ইলিশ মাছ। রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তার প্রিয় মাছ মাধব এনেছে। তবুও রাগের ভাণ করে সে বলল—কত দাম নিল শুনি? দু'টাকা সের নিশ্চয়।

রমার এ রূপের সঙ্গে মাধব পরিচিত। গম্ভীরভাবে সে বলল,—দুটাকা সের মাছ মাধব রায় খায় না। তবে শ্রীমতী রমা রায় নামে জনৈক ভদ্রমহিলার জন্য তিন টাকা সের দরে মাছটি ক্রয় করা হয়েছে।

রমা হেসে ফেলল, বলল,—হ্যাঁ, মশায় ত আর ইলিশ মাছ ভালবাসেন না; সেদিন আমার পাতের মাছখানা পর্যন্ত—

পাদপূরণ করল অনু, বলল,—বাবা খেয়ে ফেলল, না মা?

একসঙ্গে হেসে উঠল রমা ও মাধব। রমা বলল,—বাবার বিরুদ্ধে ওর ত অভিযোগ থাকবেই। মাছখানা তোর খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, নারে খোকা?

মাধব বলল,—এরকম বাজার করা আর চলবে না রমা, চালের মণ হয়ে গেল পনের টাকা।

আনন্দোচ্ছল রমা এক নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। মাধব তার ভাবান্তর লক্ষ্য করল না। সে আবেগের সুরে বলে চলল,—চারখানা গ্রাম রয়েছে আমাদের এই শহরকে ঘিরে। বৎসরে দুটি ঋতুতে গ্রামবাসীরা কর্মচাঞ্চল্যে সজাগ হয়ে ওঠে। সূর্যনগরের বাজারে ভারে ভারে চাল আসে। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি কোন দিন। আজ প্রথম দেখলাম চালের বাজারে পসারী নেই, গ্রামের ফসল অভিমানে আত্মগোপন করেছে।

রমা আর থাকতে পারল না। সে নিম্নস্বরে বলল,—দোষ কারও নয়, সর্বনাশের মূল আমাদের নিশাপতিদা।

চমকে উঠে মাধব বলল,—কোন্ নিশাপতি? জনরক্ষার সম্পাদক?

—হ্যাঁ, তার কীর্তি স্বচক্ষে দেখেছি আমি। রমা তার অভিযান কাহিনী সংক্ষেপে ব্যক্ত করল।

কয়েক মুহূর্ত মাধব নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কী অদ্ভুত পরিবর্তন! তার চোখে জল দেখা দিল। ভগ্নস্বরে সে বলল,—আমাকে আগে জানাও নি কেন রমা?

—এ কি একটা জানাবার মত কথা! শহরে নিশাপতিদার কতখানি সম্মান, কত উঁচুতে তাঁর স্থান। আর কাউকে নয়, সেদিন তোমাকে বললে তুমিই হয়ত হেসে উড়িয়ে দিতে।

রমার কথা মাধব শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। সে অন্যমনে কি চিন্তা করছিল।

* * * *

দুপুরে অনাদি এসে হাজির। রমার আবিষ্কার কাহিনী শুনে সেও জড়ের মত বসে রইল। বোধ হয় নিশাপতির এতখানি অধঃপতন সে আশা করেনি। পরক্ষণেই মেঝের উপর সশব্দে চপেটাঘাত করে বলল,—কিন্তু তুমি দেখে নিও মাধবদা, একটা প্রতিকার আমি করবই!

—কোন উপায় নেই ভাই। প্রতিপক্ষের অর্থসামর্থ্যের কাছে আমরা তৃণের মত ভেসে যাব। তাছাড়া জানত, নিশাপতিদা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, আর পুলিশসায়েবের জ্ঞাতিভাই।

—বলতে ভুলে গেলে, দেশত্রাণ ব্যাঙ্কের সূর্যনগর শাখার ম্যানেজার। এই ব্যাঙ্কের টাকার জোরেই নিশাপতি চাটুয্যে আজ সূর্যনগরের এতবড় সর্বনাশটি করে বসেছে। মনে আছে মাধবদা সেদিনকার কথা,—রতনবাবুর পক্ষ থেকে আমার উপর তোমাদের সমবেত আক্রমণ।

একথার উত্তর আজ মাধবের নাই। শুধু বলল,—রতনবাবুর ওখানে একবার যাওয়া দরকার তোমার। তাঁর উপর তোমার আক্রমণও হয়েছিল অতর্কিত ও রূঢ়।

—আজই চল না কেন সন্ধ্যেবেলা।

—যুগলে যাওয়া হবে কোথায়? রমার কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে উঠল।

মাধব বলল,—রতনবাবুর বাড়ি।

রমার মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। একবার তোমরা যাও তাঁর বাড়ি। ওঁর স্ত্রী সেদিন এসেছিলেন। ভারী মুস্কিলে পড়েছেন ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে নিয়ে।

অনাদি বলল,—মুস্কিল আর কি! টাকা ত উনি যোগাড় করেছেন।

—টাকা হলেই কি বিয়ে হয় ঠাকুরপো? ছেলে বেঁকে বসেছে, বেশি রোজগার না হলে বিয়ে করবে না। মেয়ের বিয়ের কলঙ্ক আজও ঘুচল না আমাদের দেশে।

মাধব বলল,—সে ছেলে ত চাকরী করে শুনেছি।

একটু হেসে রমা বলল,—সবাই কি আর তোমার মতো যে চাকরী না হতেই বিয়ে করে বসবে! ছেলে নিজেই জানিয়েছে রতনবাবুকে এক লম্বা চিঠি লিখে, ষাট টাকায় তার নিজেরই চলে না, কাজেই একটা বোঝা ঘাড়ে করে, ইত্যাদি।

অনাদি বললে,—হুঁ, তাহলে বাবুর সার্ট, সিনেমা, সিগারেটের খরচ কমিয়ে দিতে হয় যে! কী আশ্চর্য বৌদি, বিলাতি সিনেমা ও সিগারেটের প্রচণ্ড ভার যারা অক্লেশে বহন করছে, দেশের মেয়েদের ভার নিতে তারা অস্বীকার করে! বিলাসিতা ও স্বার্থপরতার মোহে গোটা দেশকেই এরা অস্বীকার করছে।

রমা বলল,—নিরুপমাকে তুমিই কেন বিয়ে কর না ঠাকুরপো।

আর্তকণ্ঠে অনাদি বলে উঠল,—না, না, সে হয় না বৌদি।

অনাদির ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমা ও মাধব বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

সূর্যনগর স্কুলের হেড মাস্টার রতনবাবু এককালে পুরোদস্তুর কংগ্রেসের লোক ছিলেন। বর্তমানে সচল রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে তিনি কংগ্রেসের একজন পূর্ণ সমর্থক। খদ্দর ব্যবহার না হলেও দেশী জিনিস ছাড়া আর কিছুর প্রবেশাধিকার নেই তার বাড়িতে। সস্তা বিদেশী জিনিসের মোহ তাঁর স্বদেশীয়ানায় একটুও চিড় ধরাতে পারেনি। সংসারে স্বদেশী জিনিস বেশী দামে কেনা ছাড়া অন্যদিকে টাকার চাহিদা তিনি যেন এক রকম ইচ্ছে করেই ভুলে ছিলেন। নিরুপমার বিবাহ ব্যাপারে গৃহিণীর অনুযোগ একদিন তাঁকে বাস্তব জগতে সচেতন করে তুলল। তিনি ছুটলেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র নিশাপতির কাছে দেশত্রাণ ব্যাংকে।

সব শুনে নিশাপতি চিন্তাকুঞ্চিত মুখে বলল,—সোনারূপো বাড়িতে নেই কিছু মাস্টার মশায়?

রতনবাবু চুপি চুপি বললেন,—দু'একখানা আছে বৈকি বাবা, তবে বিয়ের সময় শুধু গায়ে তো আর মেয়েটাকে বিদেয় দিতে পারব না! তুমি এই বাড়িটা নিয়েই আমাকে উদ্ধার কর নিশাপতি।

লেখাপড়া হয়ে যাওয়ার পর রতনবাবু বললেন,—সুদ একটু বেশী হল না?

—ও কিছু নয় মাস্টার মশায়। দেশত্রাণ ব্যাংক লাভের প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের কাজেই খাটে এর টাকা। সৎকাজে না হয় দু'টাকা বেশীই দিলেন।

লজ্জিত রতনবাবু বাড়ির পথে প্রস্থান করলেন।

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে মাধব ও অনাদির আগমনে তিনি বিস্মিত হলেন। আপনারা এই অসময়ে! ট্যুইশানিতে যাননি?

মাধব বলল,—অনেকদিন আসা হয়নি মাস্টার মশায়, এলাম একবার বেড়াতে বেড়াতে।

রতনবাবু হেসে বললেন,—মাস্টারি করে সামাজিকতা ভুলে যাননি দেখছি। ও কি, অনাদিবাবু অত সঙ্কোচ করছেন কেন?

প্রায় চীৎকারের সুরে অনাদি বলে উঠল, —আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টার মশায়, সেদিন বড় অন্যায় ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে।

রতনবাবু অনাদির দিকে এগিয়ে এলেন। তার গায়ে হাত রেখে সস্নেহে বললেন,—রাগ একটুও হয়নি অনাদিবাবু; শুধু দুঃখ হয়েছিল আপনি অকারণে আমায় দোষী করেছেন। আজ সে দুঃখও আমার নেই, নিরুপমার বিয়ে টাকার জোরেও সম্ভব হল না।

মাধব বলল,—বাড়িটা তাহলে উদ্ধার করুন মাস্টার মশায়। নিরুপমার বিয়ের ভার আমরা নিলাম।

—সম্ভব হল না, নিশাপতি রাজি নয়।

ম্লান দীপালোকে রতনবাবুর মুখ দেখে মাধব ও অনাদি বিস্মিত হল। তাঁর স্বভাবত শান্ত মুখে অশান্তির রেখা দপ্ দপ্ করছে। মাধবের এতবড় আশ্বাস বাক্যেও তাঁর মুখের কোন পরিবর্তন হল না।

ছ'মাস পরের কথা। তিনটি ঋতু পার হয়ে গেছে। বৈশাখের রুদ্র ছায়া পড়েছে ধরিত্রীর বুকে। সূর্যনগরের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে অনেক। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অনাদি যাপন করছে রাজবন্দীর জীবন। রতনবাবুর বাড়ি হয়েছে দেশত্রাণ ব্যাঙ্কের গুদাম ঘরে পরিণত। তিনি সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন মাধবের বাড়িতে। পাড়ায় লেগেছে টাইফয়েড ও কলেরার মড়ক। রাহুর মত দুশ্চিন্তা এসে সকলের মনের শান্তিটুকু নষ্ট করে দিয়েছে।

সকলেই জানে তাদের এই দুরবস্থার মূলে নিশাপতি। রতনবাবুর স্ত্রী বললেন, —লোকটার বিবেক বলে কিছু নেই রমা। বাড়ি উনি বাঁধা রাখলেন; আদালতে প্রমাণ করল নিশাপতি, বাড়ি উনি ব্যাঙ্কের কাছে বেচে দিয়েছেন।

রমা বলল,—নিশাপতিদার কথা আলোচনা করাও পাপ মাসিমা। আপনাদের পথে বসিয়েছে, পুলিশে মিথ্যা খবর দিয়ে অনাদি ঠাকুরপোকে জেলে পাঠিয়েচে। সূর্যনগরের শস্যভাণ্ডার শূন্য করে দিয়েছে এই লোকটা।

নিরুপমা অনুর সঙ্গে লুডো খেলছিল, হঠাৎ বলে ফেলল,—অনাদিদার চার মাস হয়ে গেল, না বৌদি?

রমা হেসে বলল,—আপনার মেয়ে দিন গুণছে মাসিমা। কোন ভয় নেই রে তোর। ঠাকুরপো বলে গেছে তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল নিরুপমা। অনুকে কোলে তুলে একরকম ছুটে চলে গেল পাশের ঘরে।

রতনবাবুর স্ত্রী বললেন,—অসুখ-বিসুখ যে রকম হচ্ছে, সকলে ভাল থাকলে হয়। নিরুর বিয়ের ভাবনার চেয়ে এই ভাবনাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত করেছেন উনি একমাস আগে, কিন্তু দিনের পর দিন আবর্জনার গাড়ি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই পাড়াতে। রাতে ঘুম হয় না মাসিমা। জানালা খুললেই চোখে পড়ে চিতার আগুন জ্বলছে ধু ধু করে।

বাড়ির বাইরে অনেক লোকের পায়ের শব্দে দুজনেই চমকে উঠল। পরক্ষণেই শিকল নাড়ার শব্দ। রতনবাবুর স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন। রতনবাবু ফিরে এসেছেন, সঙ্গে স্ট্রেচারে-বাহিত মাধব।

চেনা যায় না আর মাধবকে। নীল হয়ে গেছে সারা মুখ, যন্ত্রণায় কুঞ্চিত। নিমীলিত চোখ, চুপসে গেছে হাত ও পায়ের আঙুল। মাত্র চার ঘণ্টায় মাধবের দেহের কী পরিবর্তন! এশিয়াটিক কলেরা,—বলে রতনবাবু ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

রমা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বৈশাখের তপ্ত দ্বিপ্রহরে মৃত্যুর এই ভয়াবহ রূপ তাকে দিশাহারা করে দিল। মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় তার অনেকদিন আগে, ছেলেবেলায়। আশী বছরের ঠাকুরমা মারা যাচ্ছেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের এক মিনিট পূর্বেও তার বাবাকে ডাকলেন কম্পিত কণ্ঠে। মাথার উপরে নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপ, পবিত্র তুলসী-তলা আর মিলিত কণ্ঠের উদাত্ত হরিধ্বনি, —মৃত্যু যেন মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। আজ রমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে মৃত্যুর এই রুদ্র-মূর্তির শাসনে। চার ঘণ্টা আগে তার সঙ্গে শেষ কথা বলে গেছে মাধব, চারিদিকে পাগলা হাওয়ার হাহাধ্বনি আর শব্দহীন বিষাদের ছায়া।

রতনবাবু ফিরে এলেন ডাক্তার না নিয়ে। বললেন,—নিশাপতির মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠা। ডাক্তারেরা গেছে নিমন্ত্রণ খেতে, না খেয়ে আসবে না কেউ। নিশাপতিকে চটাবার মত দুঃসাহস কারুর নেই। মাধবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাক্তার এসেই বা আর কি করবে!

শ্মশানযাত্রা করতে সন্ধ্যা হয়ে এল। বিকৃত কণ্ঠের হরিধ্বনির মধ্যে রমার বুক থেকে ছিনিয়ে শ্মশানযাত্রীরা চলে গেল মাধবের শবদেহ নিয়ে। সঙ্গে চললেন রতনবাবু আর অনুকে কোলে নিয়ে নিরুপমা।

রাত গভীর হয়ে এল। শূন্য গৃহ। শুধু জানালার ধারে বসে শোকাচ্ছন্ন দুই নারী। ময়ূরাক্ষীর তীরে চিতাগ্নি জ্বলছে ধু ধু করে, তারা শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেই দিকে।

বিজ্ঞানের কথা

প্লাস্টিক

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা কয়েকটি যুগের সন্ধান পাই যেমন প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি অর্থাৎ এই সমস্ত যুগে ঐ সমস্ত ধাতু অথবা পাথরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মানুষ তখন নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং অস্ত্র শস্ত্র ঐ সমস্ত ধাতু দিয়ে তৈরী করত। বর্তমান যুগ অবশ্য কোন একটি বিশেষ ধাতুর যুগ নয় পরন্তু নানাপ্রকার ধাতু, মিশ্র ধাতু এবং কাষ্ঠের যুগ বলা যেতে পারে। কিন্তু আজকাল নতুন কয়েকপ্রকার দ্রব্যের তৈরী জিনিষ জিনিস ছাড়াও অনেক বড়ো বড়ো ও অন্যান্য নানাপ্রকার জিনিস প্লাস্টিকে তৈরী হচ্ছে, যেমন সম্পূর্ণ বাথরুম, কৃত্রিম রবার, উড়ো জাহাজের নানা অংশ, বিশেষ করে পাইলটের সামনে অর্ধ গোলাকার স্বচ্ছ আবরণী। এই সমস্ত দেখে মনে হয় যে, "প্লাস্টিক যুগ" আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ করে গত দশ বৎসরের মধ্যে প্লাস্টিকের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ব্যবহারও ক্রমশঃ বাড়ছে।

প্লাস্টিক কথাটির অর্থ হল যা নমনীয়, যাকে যেরকম ইচ্ছা আকৃতি দেওয়া যেতে



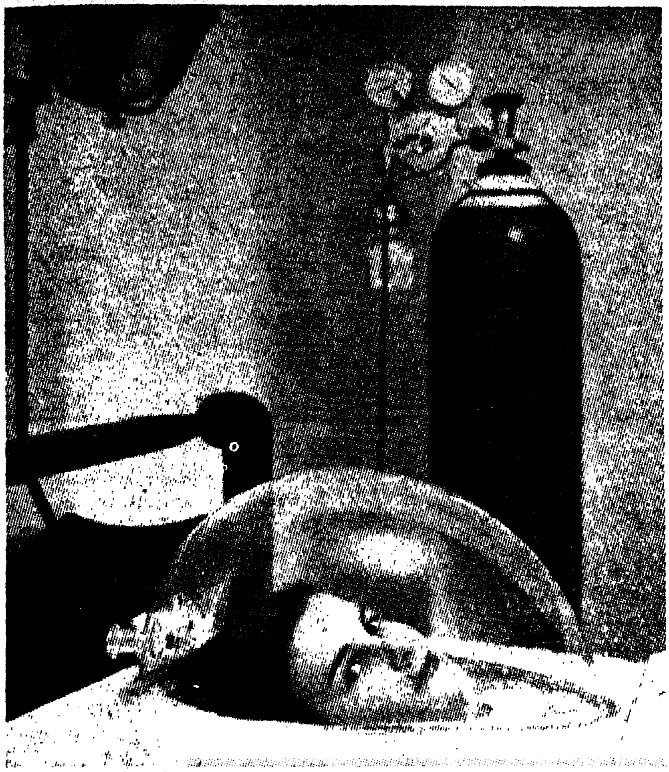
প্লাস্টিকের তৈয়ারী কয়েকটি দরকারী জিনিষ।



জলে নিমজ্জিত লোহার বড় রডটিকে তরল প্লাস্টিক মাখিয়ে নয় মাস রেখে দেওয়া হয়েছে। মরচে পড়েনি।

দেখে মনে হচ্ছে যে, ধাতু অথবা কাষ্ঠের যুগ বুঝি শেষ হয়ে এল। যে সমস্ত জিনিস এতদিন নানারকম ধাতু অথবা কাঠের দ্বারা তৈরী করা হতো আজকাল তার অনেকগুলিই ক্রমশঃ ঐ নতুন জিনিস দিয়ে তৈরী করা হচ্ছে যার নাম প্লাস্টিক। প্লাস্টিকের তৈরী নানাপ্রকার জিনিস আমরা ব্যবহার করছি যেমন রেডিও সেটের ক্যাবিনেট ইলেকট্রিক সুইচ ও অন্যান্য অংশ, কৌটা, চায়ের কাপ, ডিস প্লাস, ছাই-ফেলা দানী ইত্যাদি। প্লাস্টিকের বিশেষ বিশেষ নাম আছে যেমন, বেকলাইট, সেলুলয়েড, মইলোনাইট, সেলোফেন, প্লিও-ফিল্ম, প্লেক্সিগ্লাস, নাইলন, কোরোসিল ইত্যাদি। এইরকম অন্ততঃ ষাটটি নাম করা যেতে পারে। ছোটখাটো নিত্য প্রয়োজনীয় পারে। প্লাস্টিক যে সব সময়েই কৃত্রিম হবে তার কিছু মানে নেই; আমরা অনেক প্রাকৃতিক প্লাস্টিকও ব্যবহার করে থাকি, যেমন মোম, পিচ, প্যারাফিন, রবার, রজন, গালা ইত্যাদি। কৃত্রিম প্লাস্টিকও আমরা অনেক দিন থেকেই ব্যবহার করে আসছি যেমন কাঁচ। একদা প্রাচীন ফিনিশিয় নাবিকরা মিশর দেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে নেট্রন নিয়ে আসছিল। নেট্রন হ'ল সোডিয়াম কার্বনেটের (যাকে আমরা কাপড়কাচা সোডা বলি) অপরিশোধিত রূপ। পথে বেলুস নদীর মোহানায় তাদের জাহাজ আটকে যায়। তখন সন্ধ্যাকাল। তারা নদীর বালুময় সৈকতে সেই নেট্রনের কয়েকটি চাঙড় দিয়ে উনুন তৈরী করে রাত্রের রান্না সম্পন্ন করে। সকালে তারা দেখে যে সেই উনুনের মধ্যে অনেকগুলি গোলাকার স্বচ্ছ জিনিস দেখা যাচ্ছে যা হ'ল কাঁচের পিতা। এই স্বাধহর প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক। আজও মানুষ সোডিয়াম কার্বনেট ও বালি দিয়ে কাঁচ তৈরী করে। এ ছাড়া প্রাচীন যুগের লোকেরা গালা দিয়ে নানাপ্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতো। আধুনিক যুগে গ্রামোফোন রেকর্ড একটি পুরাতন প্লাস্টিক। নানারকমের প্লাস্টিকের ব্যবহার নানাভাবে অনেকদিন থেকে চলে আসছে এবং যে সমস্ত রসায়নগুলির সাহায্যে প্লাস্টিক তৈরী হয় তারও অনেকগুলি ক্রমশঃ বহুদিন ধরে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্লাস্টিকের আবিষ্কার হঠাৎ হয়নি, এর পশ্চাতে আছে বহুদিনের কঠিন পরিশ্রম ও একাগ্র সাধনা।

প্লাস্টিক যুগের রীতিমত আরম্ভ করেন দুইজন লোক, সেলুলয়েডের আবিষ্কারক জন ওয়েসলি হায়াট John Wesley Hyatt) এবং বেকলাইটের আবিষ্কারক ডাঃ লিও হেণ্ডরিক বেকল্যাণ্ড (Dr. Leo Hendrik Baekeland)। এঁদের কথা পর পর বলছি। আরও একজনের নাম এই সঙ্গে করা উচিত, তিনি হলেন অ্যালেকজাণ্ডার পার্কেস। তিনি 'পার্কেসাইট' আবিষ্কার



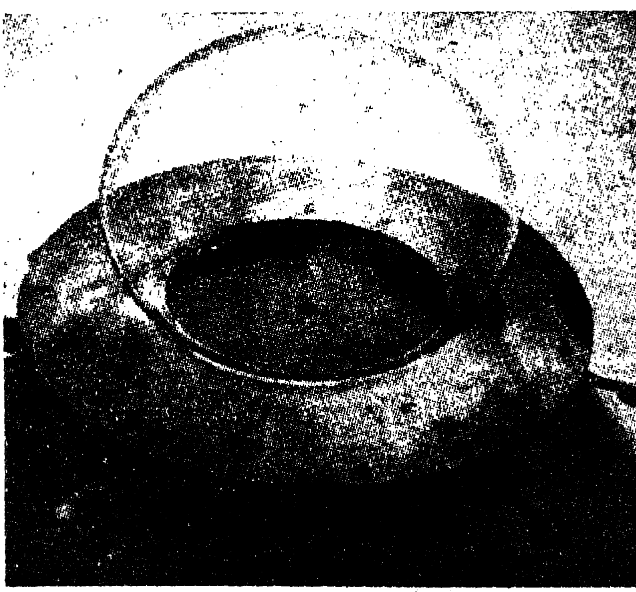
হাসপাতালে ব্যবহৃত প্লেক্সি গ্লাসের আবরণী। রোগীকে অক্সিজেন দেবার সময় এইটি ব্যবহার করা হয়।

করেন, যার আধুনিক নাম হ'ল জাইলোনাইট।

ফিল্যান ও কোলাণ্ড্যার নামে আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল তারা বিলিয়ার্ড খেলবার বল তৈয়ারী করত। এ জন্য তারা হাতীর দাঁত ব্যবহার করত। মাঝে এই হাতীর দাঁত দুষ্প্রাপ্য হয়। তখন তাঁরা হাতীর দাঁতের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারা যায় এমন কোনো জিনিস আবিষ্কার করার জন্য দশ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রতি-যোগিতায় জন হায়াট যোগদান করেন কিন্তু পুরস্কার তিনি পাননি যদিও সেই সময় থেকে প্লাস্টিক যুগের সূত্রপাত তিনিই করেন সেলুলয়েড আবিষ্কার করে। জন হায়াট আসলে ছিলেন একজন প্রিণ্টার, রাসায়নিক নন এবং সেলুলয়েড আবিষ্কার করেন ১৮৬৮ সালে। হায়াট যদিও একজন রাসায়নিক ছিলেন না কিন্তু তিনি নানা-রকম জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। তিনি রাসায়নিক ছিলেন না বলেই হয়ত নিজের আবিষ্কারের মূল্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি এমন কি যখন তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সোসাইটি অফ্ কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট 'পার্কিন মেডেল' দ্বারা ভূষিত করেন।

হায়াট ছিলেন এক গ্রাম্য কর্মকারের ছেলে উত্তর নিউইয়র্কে স্টার্ক নামক গ্রামে তাঁদের বাস ছিল। হায়াট জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৭ সালে। তিনি স্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া শিখে ষোলো বৎসর বয়সে ইলিনয় সহরে এসে ছাপাখানার কাষ শিখতে আরম্ভ করেন। ছাপাখানার কাষ শেখা হয়ে গেলে এক খবরের কাগজের অফিস থেকে আর এক খবরের কাগজের অফিসে চাকুরী করতে করতে তাঁর দশ বৎসর কেটে গেল। অবশেষে তিনি অ্যাল-বানিয়ায় এসে উপস্থিত হয়ে ফিলান ও কোল্যাণ্ডার কোম্পানীর বিলিয়ার্ড বলের পুরস্কার ঘোষণার কথা জানতে পারেন।

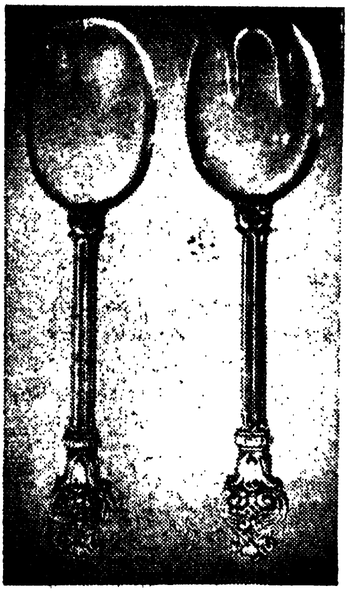
ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকটি ছোটখাটো জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন, যেমন ছুরী ধার দেবার একপ্রকার কল; কাগজের মণ্ড ছেঁড়া ন্যাকড়া, রজন, গালা, কলোডিয়ন ইত্যাদি মিশিয়ে একপ্রকার প্লাস্টিক এবং সেই প্লাস্টিক থেকে নানাপ্রকারের পুতুল তিনি তৈরী করেছিলেন। তিনি তিন বৎসর ধরে কঠিন পরিশ্রম করে কাগজের মণ্ড, প্যাত গালা ও কলোডিয়ন মিশিয়ে আর একরকম প্লাস্টিক তৈরী করেন এবং এই প্লাস্টিক দিয়েই তিনি বিলিয়ার্ড বল তৈরী করে দেন। কিন্তু সেই বিলিয়ার্ড বল যদিও প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি কিন্তু তার পেটেণ্ট সেই ফিলান ও কোলাণ্ড্যার কোম্পানী কিনে নিলেন অবশ্য দশ হাজার ডলারের অনেক কম মূল্যে।



প্লেক্সি গ্লাসের তৈয়ারী স্বচ্ছ গোলাকার আবরণী। কাচের মতো সহজে ফেটে যায় না।

তিনি জল পরিশোধিত করবার একপ্রকার কৌশলও আবিষ্কার করেন। এ সব ছাড়া তিনি নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী আবিষ্কার করেন।

সেল্লয়েড তৈরী হয় উদ্ভিদ জগতের উপাদান সেল্লোজ, এবং কর্পূরকে অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল অথবা অ্যামাইল অ্যাসিটেটে দ্রবীভূত করে এবং তার সংগে অন্য জিনিস মিশিয়ে ও আর কিছু প্রক্রিয়ার দ্বারা। তবে শোনা যায় হায়াট সেল্লয়েড তৈরী করেছিলেন কর্পূরের সংগে একটু অ্যালকোহল যোগ করে নাইট্রো সেল্লোজের সংগে মিশিয়ে।



প্লাস্টিকের তৈরি চামচে

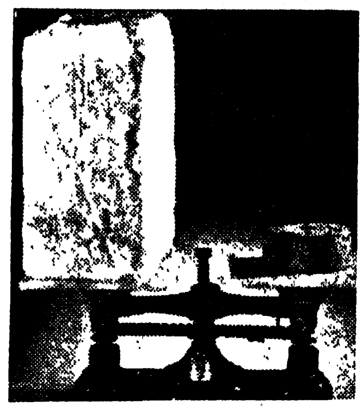
এইখানে সেল্লোজ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ এইটিই হ'ল সেল্লয়েড নির্মাণের প্রধান উপাদান। একটি বাড়ি যেমন ইঁটের সমষ্টি, তেমনি উদ্ভিদও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলির গা সেল্লোজের তৈরী। কোষগুলির মধ্যে থাকে জৈবনিক অথবা প্রোটোপ্লাজম নামক জটিল পদার্থ। সেল্লোজ এই প্রোটোপ্লাজম থেকেই তৈরী হয় এবং এতে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। কাগজ, ব্যাণ্ডেজ করবার তুলো ইত্যাদি সেল্লোজের উদাহরণ। এই সেল্লোজ ও নাইট্রিক অ্যাসিডের একত্রে প্রতিক্রিয়া হ'লে নাইট্রো সেল্লোজ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই সেল্লোজ থেকে সেল্লোজ অ্যাসিটেট তৈরী করা যায়। সেল্লোজ অ্যাসিটেট থেকে 'লুমারিথ' এবং 'টেনাইট' নামে প্লাস্টিক তৈরী করা যায়। সেল্লোজ অ্যাসিটেট থেকে 'সিলানিজ' নামে একপ্রকার সিল্কের ন্যায় সুতো তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া আমরা আজকাল একপ্রকার স্বচ্ছ পাতলা অথচ কাগজের মতো জিনিস দেখি যা দিয়ে অনেক প্রসাধনী দ্রব্যের আধার, গন্ধসারের শিশি ইত্যাদি মোড়া থাকে। এই কাগজের মতো জিনিসটি সেল্লোজ অ্যাসিটেট থেকে তৈরী যার নাম 'সেলোফেন' এবং যাকে আমরা ভুলক্রমে সেলোফেন 'পেপার' বলি। বাস্তবিকই এটি কাগজ নয়। সেলোফেনের মত আর একপ্রকার প্লাস্টিক আজকাল খুব ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষতঃ খাদ্যদ্রব্য প্যাক করতে, যার নাম 'প্লিওফিল্ম'।

এ সমস্ত ব্যতীত সেল্লয়েডের নানা ব্যবহার আমরা জানি। সিনেমা ফিল্ম তৈরী করতেই বোধহয় সেল্লয়েড সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন সেল্লয়েড প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছে, অবশ্য তার ক্ষমতা এখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয়নি। যাইহোক প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সেল্লয়েডের প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কৃত হয় যার নাম 'বেকলাইট'। আমরা আজকাল বেকলাইটের তৈরী নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেখি যেমন ইলেকট্রিকের সুইচ, প্লাগ, হোল্ডার, নানাপ্রকার বুরুষের বাঁট, দোয়াত ও কলমদানী, টেলিফোন ও রেডিওর ক্যাবিনেট ও আরও নানারকম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বেকলাইট আবিষ্কার করেন ডক্টর লিও হেণ্ডরিক বেকল্যাণ্ড। আমরা অনেক ফোটোগ্রাফের উল্টোদিকে 'ভেলক্স' এই কথাটি পড়েছি। ভেলক্স হ'ল কোডাক কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত ফোটোগ্রাফের ছবি ছাপাবার একপ্রকার কাগজ। এই ভেলক্স কাগজও ডক্টর বেকল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন।

১৮৬৩ সালের নবেম্বর মাসের চৌদ্দ তারিখে বেলজিয়ামের বিখ্যাত ঘেণ্ট নামক সহরে লিও হেণ্ডরিক বেকল্যাণ্ড (Leo Hendrik Backland) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখাপড়ার দিকে তাঁর বাবা এবং মার কড়া নজর ছিল, আর বেকল্যাণ্ডও খুব বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে তিনি ঘেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। এই সময়ে ছেলে পড়িয়ে এবং রসায়নের অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে বেয়ারার কায করে তিনি নিজের পড়বার খরচ চালাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করেন আর দু' বছর পরে ১৮৮৪ সালে। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ।

এইবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন কিন্তু বেতন অত্যন্ত অল্প থাকায় সেই সংগে একটি স্কুলের শিক্ষকতাও গ্রহণ করলেন। এইরকম করে তিন বছর কাটল। এই সময় তিনি বেলজিয়ামের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'লরিএট' নির্বাচিত হলেন ও সেই সংগে পুরষ্কার লাভ হল একটি সোনার মেডেল ও দু' বৎসরের জন্য বাইরে কোথাও পড়বার জন্য একটি বৃত্তি। ঠিক এই সময়ে তিনি তাঁর ভূতপূর্ব রসায়নের অধ্যাপকের কন্যা সিলিন সোয়ার্টের প্রেমে পড়েন কিন্তু অল্প আয়ের জন্য তখন বিবাহ সম্ভব হয়নি। যাইহোক তিনি বৃত্তি নিয়ে বার্লিনের একটি বিখ্যাত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং তাঁর নিজের কথাতেই এখন থেকেই তাঁর যথার্থ শিক্ষা শুরু হল। তিনি বলেছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার পর থেকেই আমার আসল শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে কারণ তখন থেকেই নানাপ্রকার সমস্যার সমাধান করবার জন্য আমাকে স্বাধীনভাবে কায করতে হয়েছে যার ফলে অনেক সময়ে ভুল করলেও শেষ পর্যন্ত ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছি। আমি যেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত একজন ছাত্র হয়েই থাকতে পারি।'



সোনার চেয়েও হালকা প্লাস্টিক। ওজনে বাঁ-ধারের প্লাস্টিক-খণ্ডটি ডান-ধারের সোনার টুকরার এক সপ্তমাংশ মাত্র।

কিন্তু বার্লিনে তাঁর নির্ধারিত সময় সম্পূর্ণ হবার আগেই তিনি ঘেণ্টে ফিরে এলেন ও সিলিনকে বিবাহ করে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যাত্রা করলেন। এই সময়ে বাস্তবিকই তাঁর অর্থের অভাব ঘটেছিল এবং ভাগ্য পরিবর্তনের আশা নিয়েই আমেরিকা যাত্রা করেন।

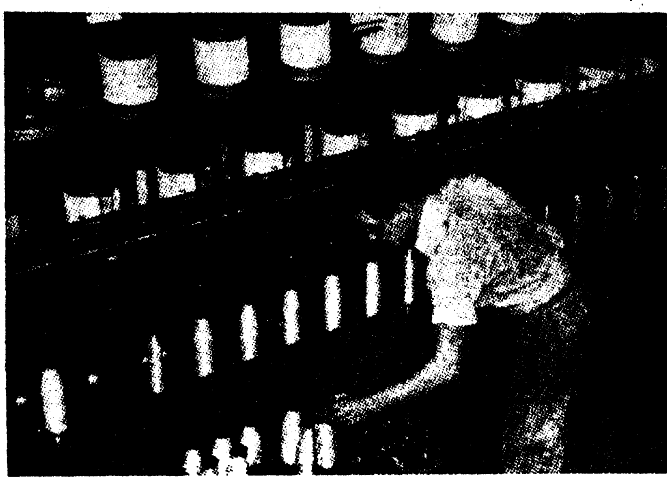
ফোটো তোলা তাঁর সখ ছিল এবং এর উন্নতির জন্য তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। ক্রমে এই চেষ্টার ফলেই তিনি ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ থেকে ছবি ছাপবার কাগজ 'ভেলক্স' আবিষ্কার করেন। এই ভেলক্স কাগজ তৈরী করবার কৌশল ও তার

স্বত্ব বেকল্যাণ্ডের কাছ থেকে ইস্টম্যান কোডাক কোম্পানী দশ লক্ষ ডলার দিয়ে কিনে নেন। এতদিন যে কাগজে ছবি ছাপা হ'ত তা কেবল দিনের আলোতেই সম্ভব হত এবং তার জন্য অনেক সময় ও সব দেশে প্রায়ই সূর্যের মুখ চেয়ে থাকতে হ'ত। ভেলক্স আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে তখনকার প্রচলিত গ্যাসের আলোয় ছবি ছাপা যেত; তাই ভেলক্স জাতীয় কাগজের আর একটি নাম 'গ্যাসলাইট পেপার।'

এইবার বেকল্যাণ্ড একটি কৃত্রিম রজন প্রস্তুত করতে মনস্থ করলেন যার ফলে আমরা পেয়েছি 'বেকলাইট' নামক প্লাস্টিক। ফোটো অবশ্য ইচ্ছামতো সহজ ছিল না এবং তার জন্য বেকল্যাণ্ডকে একাগ্রমনে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল।

বহুদিন আগে, সে প্রায় ১৮৭১ সালে বিখ্যাত জার্মাণ রাসায়নিক অ্যাডলফ ফন বায়ার যিনি কৃত্রিম নীল (indigo) রং প্রস্তুত করেছিলেন, কার্বলিক অ্যাসিড ও ফর্মাল্ডিহাইড জাতীয় রসায়ন নিয়ে নানা-প্রকার পরীক্ষা করেছিলেন ও সেই সমস্ত পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ক্লীবার্গ নামক একজন রাসায়নিকও কিছু কিছু পরীক্ষা করেছিলেন। এই সমস্ত পরীক্ষার ফল পাঠ করে বেকল্যাণ্ডের ধারণা হয় যে, তিনি কৃত্রিম রজন প্রস্তুত করতে পারবেন। তিনি যে সক্ষম হয়েছিলেন তা অবশ্য আমরা জানি। তিনি ফর্মাল্ডিহাইড ও কার্বলিক অ্যাসিড একত্রে মিশিয়ে ও প্রায় দুশো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপ প্রয়োগ করে 'বেকলাইট' নামে কৃত্রিম রজন প্রস্তুত করেন। বেকলাইট আবিষ্কারের তারিখ হল ইংরাজী ১৯০৯ সাল।

এইবার দেখা যাক কারখানায় কি করে বেকলাইট জাতীয় প্লাস্টিক তৈরী করা হয়। একটি বড়ো জালার মতো পাত্রে ইউরিয়া নেওয়া হ'ল তাতে ঢালা হ'ল ফার্মাল্ডিহাইড এবং পাত্রের ঢাকাটি বন্ধ করে দেওয়া হল। এইবার খুব গরম বাষ্প দ্বারা পাত্রটিকে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে উত্তপ্ত করা হল, যে পর্যন্ত না ভিতরের জিনিস গলে জলের মতো (কিন্তু কিছু চটচটে) হয়ে, বাইরে একটি নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। এইবার সেই জলীয় জিনিসটিতে একটি 'পরিপূরক' (filler) দেওয়া হয় যেমন করাতের গুঁড়োর পাউডার, সয়া বীনের ছাতু, ভুট্টা অথবা ওটের তুষের গুঁড়ো, পাটের খুব সূক্ষ্ম টুকরো ইত্যাদি। এখন এইগুলিকে ভাল করে মেশাবার জন্য আর একটি ইস্পাতের তৈরী মেশিনে চালান দেওয়া হয়। সেই মেশিনের ভেতর আছে দুটি ইলেকট্রিক পাখা যারা খুব জোরে বিপরীত দিকে ঘোরে এবং ঐ গলিত রজন ও পরিপূরক দুটিকে একত্রে খুব ভাল করে মিলিয়ে দিয়ে একটি থক্‌থকে কাদার মতো পিণ্ডে পরিণত করে। কিন্তু যখন এই মিশ্রিত অর্থাৎ অপরিণত প্লাস্টিককে সেই মেশিন থেকে বার করে আনা হয় তখন সেগুলি সাবানের কুঁচির মতো অংশের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কুঁচিগুলি তখনও শুকোয়নি। এদের শুকোবার জন্যে আবার আর একটি যন্ত্রে পাঠানো হয়। এই যন্ত্রটিকে দেখে মনে হয় কে যেন একটা জাহাজের চোং বাইরে থেকে এনে কার-খানার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই চোং-এর মধ্যে আছে পর পর বসানো বারোটি ইস্পাতের থালা। সব চেয়ে ছোটো থালা থাকে সবার উপরে, আর ক্রমশঃ



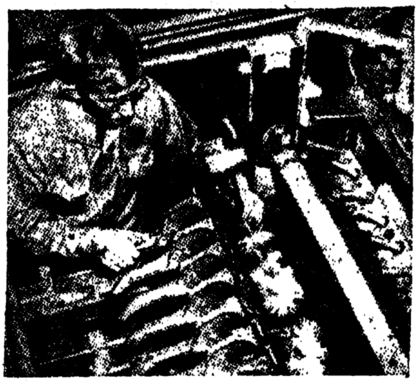
প্লাস্টিকের কারখানার একটি দৃশ্য।

বড়ো হতে হতে সবার বড়ো থালা থাকে সবার নীচে। এই থালাগুলির মাঝখান দিয়ে একটি ইস্পাতের রড চলে গিয়েছে উপর থেকে নীচে এবং এই রডটির সাহায্যে থালাগুলিকে ঘোরানো হয়।

এইবার সব উপরের ছোট থালাটির উপর সেই চটচটে প্লাস্টিকের কুঁচি-গুলিকে ঢালতে হয় যে পর্যন্ত না সেই কুঁচি উপচে নীচের থালায় এবং পরে তারও নীচের থালায় এবং এইরকম করে সব নীচের থালায় পড়ে। ইতিমধ্যে সেই চোং-এর ভিতর গরম হাওয়া চালানো হয়। থালাগুলিকে সর্বদা ঘোরানো হয়। ঠিক-ভাবে কায চলছে কিনা দেখবার জন্যে চোং-এর গায়ে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের জানালা আছে। গরম হাওয়া কুঁচিগুলিকে একে-বারে শুকিয়ে দেয় এবং শুকোবার ফলে সেগুলি আকারে কিছু ছোট হয়ে যায়। সব শেষে কুঁচিগুলিকে কাঠের একটি পাত্রে সংগ্রহ করা হয়। এইবার এই কুঁচিগুলিকে আরো একটি যন্ত্রে গুঁড়ো করা হয়। যন্ত্রটি একটি লম্বা পিপের মতো, মেজের সংগে সমান্তরাল করে' ঝুলিয়ে রাখা হয়। এই পিপেটিও ইস্পাতের তৈরী, ভেতরটা ফাঁপা কিন্তু তার মধ্যে থাকে পোর্সিলেন-নির্মিত শত শত বল। বলগুলির আকার, লিচুর মতো থেকে ন্যাসপাতি অথবা তার থেকেও বড়ো হয়। বলগুলি পোর্সিলেনের করা হয় এই জন্য যে পোর্সিলেন সহজে টুকরো হয়ে ভেঙে যায়না। এক একটি পিপে এত বড়ো হয় যে-তাতে দু'টন পর্যন্ত পোর্সিলেন বল থাকে এবং এক টন পর্যন্ত প্লাস্টিকের কুঁচি গুঁড়ো করবার জন্য দেওয়া যায়। প্লাস্টিকের কুঁচি ও ইচ্ছামত রং এক সংগে পিপেতে ভরে পিপের দরজা বন্ধ করে' খুব জোরে ঘোরানো হয়। ভিতরে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত পোর্সিলেনের বলের আঘাতে কুঁচিগুলি একেবারে পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে যায়। এই গুঁড়োকে পিপে থেকে বার করে' নিয়ে সিল্কের কাপড়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। পরে এই গুঁড়ো প্লাস্টিকের যন্ত্রের সংগে ধাতুর তৈরী পাত্রে রক্ষা করা হয়। পরে এই পাউডারকে তাপ দিয়ে গলিয়ে ইচ্ছামতো ছাঁচে ফেলে ইচ্ছা-মতো জিনিষপত্র তৈরী করা হয়।

আমরা আগে দেখেছি যে, ডক্টর বেকল্যাণ্ড যে প্লাস্টিক তৈরী করে' ছিলেন তাতে ফর্মাল্ডিহাইডের সংগে কার্বলিক অ্যাসিড মিশিয়েছিলেন। কার্বলিক অ্যাসিডের একটি অসুবিধা এই যে এর সাহায্যে ঘোর বাদামী অথবা কালো রং-এর প্লাস্টিক তৈরী হয়। কিন্তু ইউরিয়ার সাহায্যে সাদা অথবা হালকা রং-এর প্লাস্টিক তৈরী করা হয়।

হরেক রকমের প্লাস্টিক আছে, স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ কঠিন কালো অথবা রঙীন যাই হোক না কেন, এদের মাত্র দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাদের তাপ দিয়ে আকৃতির পরিবর্তন করা যায়, যথা সেলুলয়েড, সেলো-



কারখানায় কর্মরত জনৈক ব্যক্তি।

ফেন, নাইনল, প্লেক্সি গ্লাস ইত্যাদি এদের ইংরাজীতে বলা হয় থার্মো প্লাস্টিক। আর অপর রকমের প্লাস্টিক হ'ল, যে একবার তৈরী হয়ে গেলে তাদের আকৃতির পরিবর্তন করা যায়না। বেশী তাপ প্রয়োগ করলে গলে' যায়। এদের ইংরাজী নাম হ'ল থার্মোসেটিং। উদাহরণস্বরূপ নাম করা যেতে পারে বেকলাইট, ডুরাইট, মার্বলেট ইত্যাদি।

প্লাস্টিকের নানারকম সামগ্রী ছাড়া আরও নানারকম জিনিষ তৈরী হয়েছে যেমন রেয়নের অথবা নাইলনের সুতো, সেলোফেন নামক স্বচ্ছ পাতলা কাগজের মতো পাত, একরকমের আঠা ইত্যাদি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রস এবং বিভ্যান নামে দুজন রাসায়নিক তুলা জাতীয় সেলুলোজের সুতোকে কস্টিক সোডা আর কার্বন ডাইসালফাইডের সাহায্যে গলিয়ে ফেলতে সক্ষম হ'ন। পরে গলিত সেলুলোজকে খুব সরু কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে চালনা করে' অ্যাসিডের দ্রাবণে প্রবেশ করালে আবার সুতো হয়ে' ফিরে আসে। এই সুতোকে আবার উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রেশমের মতো মসৃণ ও চিক্কণ করা যায়। এই সুতোর নাম রেয়ন অথবা ভিসকস সিল্ক (Viscose Silk) এই ভিসকস সিল্ককে সুতোয় রূপান্তরিত করবার আগে যে গলিত সেলুলোজ অবস্থা থাকে তাতে গ্লিসারিণ অথবা অন্য দ্রাবণ প্রয়োগ করলে সেলোফেন পাওয়া যায়। সেলোফেনকে ইচ্ছামতো রঙ করে নেওয়া যায়। প্লাস্টিকের যে আঠা তৈরী হয়েছে তার সাহায্য কাঠ এরকম জুড়ে যায় যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায়না। মস্কুইটো নামক বিখ্যাত বিমানগুলির কাঠের অংশ সমূহ এই প্লাস্টিকের আঠা দিয়ে জোড়া হয়। কাঠের অংশগুলি এত শক্ত হয়ে' জুড়ে যায় যে, তাদের কিছুতেই খোলা যায়না।

আর একটি ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের ব্যবহার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে ব'লে সম্প্রতি জানা গেল। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ প্লাস্টিক দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করবার যে উদ্ভাবন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাতে তাঁরা সফলতা লাভ করেছেন। এই রেকর্ড সব দিক দিয়েই সম্পূর্ণতা লাভ করেছে ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে পাত-গালার তৈরি যে সমস্ত গ্রামোফোন রেকর্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার অনেক ত্রুটি আছে, যেমন এই সব রেকর্ড চালাবার সময় পিনের সংস্পর্শে একটা খস্ খস আওয়াজ হয়; তা' ছাড়া এগুলি অত্যন্ত ঠুনকো, সামান্য আঘাতে, চাপে কিংবা অল্প উঁচু থেকে পড়লেই ভেংগে যায়। প্লাস্টিকের তৈরি রেকর্ডে এই সব দোষ-ত্রুটিগুলি একেবারে থাকবে না, পিনের খোঁচায় আর খস্ খস্ আওয়াজ হবে না, সামান্য কারণেই রেকর্ড ভাংগার দরুণ আর কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে না।

প্লাস্টিকের তৈরি এই গ্রামোফোন রেকর্ডের নমুনা এক হাজার জন সংগীত-সমালোচকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা এই রেকর্ডের উপর বসে চাপ দিয়ে হাতুড়ির ঘা দিয়ে এবং উঁচু থেকে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করে এর অভংগুরত্ব প্রমাণ করেছেন।

আর একটি কথা, পাত-গালার তৈরি গ্রামোফোন রেকর্ড ভারী, পক্ষান্তরে প্লাস্টিকের তৈরী রেকর্ড খুব হালকা। ওজনের দিক দিয়েও এটা বড় রকমের একটা সুবিধা।

প্লাস্টিকের তৈরি গ্রামোফোন রেকর্ড এখনও বাজারে বেরোয় নি। তবে তা যে অদূর ভবিষ্যতে বাজারে বেরিয়ে রেকর্ড-নির্মাণ শিল্প থেকে এ পর্যন্ত যে পাত-গালা ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তার নির্বাসনের ব্যবস্থা করবে এবং আমরা এ-দেশে বসেও যে গ্রামোফোন-রেকর্ড নির্মাণে প্লাস্টিকের ব্যবহারের আর একটি পরিচয় লাভ করব, তা আশা করতে পারি।

আজব ছড়া

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

পাঁচ যে রাজার চলছে সভা সাত সমুদ্র পারে;
বিষয় হচ্ছে এইঃ
হঠাৎ যেন তাল ঠুকে কেউ বিদ্রোহ না করে—
তুচ্ছ লোভেতেই।
পাঁচটি দেশের পঞ্চ প্রভুর নেই কো মাথার ঠিক্—
সংঘ করা তাই;
বন্দী-দ্বীপের দুষ্ট লোকের হাংগামা-উৎপাত
বন্ধ করা চাই।
নইলে ফসল ফলবে কি,
হাজার দাস আর মিলবে কি,
স্বর্ণ-মাণিক দুলবে কি!

পাঁচ যে রাজা ভাবছে ব'সে আকাশ-পাতাল কতোঃ
"কাজ কি কিছু মেনে!
বন্দী-দ্বীপের সোণার খনি দখল করাই চাই—
অগ্নিবাণও হেনে।"
সেই দ্বীপেরই প্রধান মানুষ ছল-চাতুরীহীন,
নেই আস্থা বলে;
পাঁচটি দেশের সভার খবর কানে আসতে তাঁর
চক্ষু ভরে জলে।
হায় গো ফসল ফলবে না,
হাজার দাস আর মিলবে না,
স্বর্ণ-মাণিক দুলবে না!

সাঁওতালী আত্মীয়তা

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

আমাদের আর্যত্বের অহমিকায় আমরা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অজ্ঞ। শ্বেতকায়, দীর্ঘনাসা, ঋজুদেহ আর্যদের অভ্যুদয়ের পূর্বে এদেশে কত দস্যু, দৈত্য, দেব দানব রামায়ণ মহাভারতের পাতায় পাতায় চোখে পড়ে তারা কি নিছক কবি-কল্পনা না ইতিহাসসম্মত মানব-গোষ্ঠীরই বিভিন্ন অঙ্গ, যারা আর্যদের উন্নত খড়্গের সামনে পলাইয়া আত্মগোপন করিয়াছে নিবিড় অরণ্যে বা দাসত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের পদতলে আত্মরক্ষা করিয়াছে! নৃতত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দীক্ষিত হইয়া আমাদের আদিবাসীদের পুরাতত্ত্ব, তাহাদের আচার বিচার আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের সম্মুখে এমন সব তথ্যাবলী উপস্থিত করিয়াছে যে এখন আদিবাসী ও আর্যদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আর প্রমাণ সাপেক্ষ নয়।

ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-পূর্ব সমাজের মধ্যে মুণ্ডা বীরহড়, খাড়িয়া, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিই আমাদের বাঙালীর চোখে বেশী পড়ে। ইহাদের মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে এক গন্দ জাতি ছাড়া ইহারাই আদিবাসীদের মধ্যে অধিকসংখ্যক। বিহারে সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর, মুঙের, মানভূম হাজারীবাগ সিংভূম; উড়িষ্যা ময়ূরভঞ্জ, বাঙলাদেশে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি এই জাতির প্রধান আবাসভূমি। ইহাদের জীবন-যাত্রা ও সামাজিক মনোভাব যে চিত্তাকর্ষক ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহ।

সাঁওতাল সমাজে আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার বিশিষ্ট আইন-কানুন আছে, তাহা সাধারণের জানা না থাকিতে পারে। আজকাল আমাদের নিকট প্রতিবেশী সাঁওতালদের সম্বন্ধে আমরা পূর্বেকার তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার ভাব ত্যাগ করিয়াছি ও অনুসন্ধিৎসু হইয়াছি,—এই সাহসে এ প্রবন্ধে তাহাদের গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ আত্মীয়তা বিধান (Kinship organisation) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নানাপ্রকার বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, সাধারণত আমরা যে সকল আত্মীয়কে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি, সাঁওতালদেরও সেই শ্রেণীর আত্মীয়দের উপর ব্যবহার একই প্রকার। এই সাঁওতালী পল্লী-গীতিটি যে কোন হিন্দু-স্ত্রীর মুখে শোভা পাইত :—
(ভাবানুবাদ)

পিতা মাতা দেবতা সম
(কিন্তু) স্বামীর কাছে আছে কে?
জীবনের যত সুখ, যত তারি দুঃখ রাশি
বরণ করে নেন গো স্বামী,
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে।
(ওগো) সবটা জীবন কাটবে আমার,
এই সহকার জড়িয়ে।

নিষিদ্ধ আত্মীয়

আমাদের মত সাঁওতালদের কয়েক শ্রেণী নিষিদ্ধ আত্মীয় আছে। তাহাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক'ত দূরের কথা, সামান্য স্পর্শও পাপ বিবেচনা হয়। সাঁওতাল স্ত্রীলোকের কাছে ভাসুর এই শ্রেণীর। কিন্তু আপনারা বোধ হয় একটু অবাক হইবেন শুনিয়া যে, স্ত্রীর বড় ভগ্নী অর্থাৎ বড় শ্যালিকা এত সম্মানার্হা যে একেবারে ভাসুরবৎ অস্পৃশ্যা। ঘটনাটি এইরূপ দাঁড়ায় যে, যদি বসন্ত-উৎসবের সময় কোন সাঁওতাল জল ছোড়াছুড়ির কালে দৈবাৎ এক ফোঁটা তার বড় শালীর উপর ফেলে, সামাজিক আইন অনুসারে তাহার বিচার হয়। কনের পিতা, বরের মাতা অর্থাৎ আমাদের বৈবাহিক বৈবাহিকা হাসি ঠাট্টা করা ত দূরের কথা, ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্বন্ধ বজায় রাখিতে বাধ্য। বরের পিতা ও কনের মাতাও এই একই দলের।

ঠাট্টার সম্বাদ

তবে আমাদের মত তাহাদের ঠাট্টার সম্বাদও আছে; এ শ্রেণীতে দেবর প্রধান। সুগ্রীব-তারা, মন্দোদরী-বিভীষণের মত বিবাহ সাঁওতাল সমাজে বেশ চলে, তাই এই হাসি তামাসার মধ্যে বাস্তবও মাঝে মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় ভ্রাতৃবধূর বৈধব্য অবস্থায়। ঠাকুরদাদা, নাতী, নাতনী ভগ্নীপতি ছোট শালী, বর কনের ভাই বোনের ফষ্টি-নষ্টি, ঠাট্টা ইয়ার্কি সাঁওতাল সমাজ শুধু বরদাস্ত করে না, উপভোগও করে। বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহকে সাঁওতাল বলে "ধাউলিয়া সাগাই"। এ সম্বন্ধে একটি পল্লী-গীতির ভাবানুবাদ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে।

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চা-বাগানে
ঢুকছি মোরা,
এই ডাকছ মোরে "হিলি" (বৌদি) বলে,
এই ডাকছ অন্য কিছু;
মনে রেখো, সাক্ষী আছে "সাতী"
গাছের পাতা।



একটি সাঁওতাল কুটির

বন্ধুত্ব ও সখীত্ব স্থাপন

আত্মীয়-গোষ্ঠীর বাহিরে বন্ধুত্ব সৃষ্টির স্বাভাবিক ঝোঁক সাঁওতালদের মধ্যে খুব বেশী। আমাদের বন্ধুত্ব ও সই পাতানর মত প্রথা তাহাদের মধ্যে খুব প্রচলিত। এরূপ সখীকে সাঁওতাল মেয়েরা কোন ফুলের নামে ডাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে "ফুল পাতাও" আখ্যা দেওয়া হয়। সাধারণত এক বয়সী দুই তরুণী এইরূপ ভাবে চির জীবন সখীত্ব পণে আবদ্ধ হয়। খাওয়া দাওয়া, সাড়ী উপহার দেওয়ার পর দুই বন্ধু দুজনার খোঁপায় কোন একটা প্রিয় ফুল গুঁজিয়া দেয়। ইহার পর তাহারা [illegible]

কারুর নাম ধরিয়া ডাকে না, ফুলের নামেই তাহাদের সম্বোধন করে। কারাম ফুল, কারাম পাতা, কেয়া ফুল, আকর ফুল—এসব নামের সখীত্বই বেশী প্রচলিত। পুরুষদের মধ্যেও বন্ধুত্ব পাতান খুব চলে, তবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহার সংখ্যা অধিক। প্রতিবেশীদের মধ্যে পাতান সম্পর্কের খুব প্রচলন। ছোটরা বয়োজ্যেষ্ঠকে কাকা বা জ্যাঠা, মেয়েরা বড়দের বড়্‌বোন বলিয়া ডাকিয়া সম্মান দেখায়। সমান-সংখ্যক সন্তানের মাতারাও এক প্রকার বন্ধুত্ব পাতায়। এইরূপ আত্মীয়তা স্থাপন উপলক্ষেও খাওয়া-দাওয়া উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বিবাহের গণ্ডী

এখন আমরা সাঁওতালদের সামাজিক বিবাহ-গণ্ডী সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। এ সম্পর্কে তাহাদের সমাজ "জাতিয়া-পেড়া" ও "বন্ধু-পেড়া" নামে দুই ভাগে বিভক্ত। উদাহরণছলে তাহাদের "মুরমু" উপজাতির কথাই ধরা যাক। সাধারণ ভাবে সব "মুরমু"-রাই "জাতিয়া-পেড়া" অর্থাৎ এক গোত্রীয়, বাকী সব সাঁওতালরা "বন্ধু-পেড়া" অর্থাৎ মুরমু-দের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ যোগ্য। এই গোত্র-সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে সমগোত্রের কাহারো মৃত্যু হইলে, সাঁওতালদের অশৌচ হয় এবং যদি কেহ এক গোত্রে বিবাহ করিতে চায়, তাহার সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধিকরণ হয়। গোত্রের বাহিরেও কিস্কু ও মারাণ্ডি; টুডু ও বেসরা উপজাতির মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ। "বন্ধু-পেড়া"-দের ভিতরেও মামাত ভাই বোনের, মাসতুত ভাই বোনের, ভিন্ন গোত্রীয় হইলেও মামীর সঙ্গে বিবাহ শুধু অচল নয়, একেবারে অচিন্তনীয়।

সাঁওতালদের পুত্র সন্তান তাহার পিতার গোত্রের অধিকারী হইয়া পিতার সঙ্গেই বসবাস করে। পিতাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। মাতার আইনত কোন অধিকার নাই, কারণ সে অর্থ দ্বারা ক্রীত; কাজেই গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে সাঁওতাল পিতার কর্তৃত্বাধীনে।

আত্মীয়-কুটুম্বের কর্তব্য ও অধিকার

সাঁওতাল সমাজে পিতাই গৃহের কর্তা। সাধারণতঃ সন্তানেরা বেশ পিতৃভক্ত ও পিতৃপূজা ইহাদের ধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ। পুত্রের জন্ম হইলে জাতক অশৌচ অন্তে সাঁওতালদের "ছাটিয়ার" নামক অনুষ্ঠান হয়; সে সময়ে পিতার হাতে একটা তেলের বাটি থাকে তাহা হইতে তেল লইয়া গাত্র মর্দন করিয়া জ্ঞাতিদের অশৌচান্ত হয়।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শবদাহের পূর্বে পিতার মুখাগ্নি করে। "ভায়াদ" নামে জ্ঞাতিরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সময় আত্মীয় বাড়ীতে "হাঁড়িয়া" মদ, কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন দিয়া গৃহস্বামীর ব্যয় লাঘব করে।

সাঁওতালদের গার্হস্থ্য কর্তৃত্ব করিতে পিতার পরেই জ্যাঠা বা কাকা। তাহাদের অবর্তমানে স্থান পান মামা। বরের পিতা বাঁচিয়া না থাকিলে, মামা বিবাহের সময় "মামা-পণ" নামে কিছু উপহার পাইয়া থাকেন।

পূজা-পার্বণে বাড়ির জামাই পশু বলি দিয়া থাকেন ও বিবাহের সময় তিনি কনেকে যে ঝুড়িতে বসান হয়, তাহা ধরিয়া থাকেন।

উপসংহারে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ময়ূরভঞ্জ সাঁওতাল সমাজে পিতা মাতার স্থান অতি উচ্চে। ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে বেশ মায়া মমতার সম্বন্ধ বর্তমান এবং স্ত্রী স্বামীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

চাঁদা

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য বারের মতন এ বৎসরও আমাদের গ্রামে শ্রীশ্রীসার্বজনীন দুর্গাপুজো হইয়া গিয়াছে; কল্যাণ মতেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রবল বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও সন্ধ্যারতির সময় তরুণগণ দমসামর্থে নাচিয়াছে; নৃত্যানন্দে মাতোয়ারা একটি যুবকের নিজ হস্তে ধুনুচি উল্টাইয়া তাহার নিজের গায়েই যে দাহক্ষত হইয়াছে সেটা গুরুতর নহে। প্রতিমা নিরঞ্জনের মিছিলে মোড়ের মাথার মসজিদ হইতে যে ব্যাহতি সম্ভাবনা করা গিয়াছিল, মহামায়া মহিষমর্দিনীর ইচ্ছায় তাহাও ঘটে নাই। পুজোর বোধন হইতে নিরঞ্জন পর্যন্ত সকল ব্যাপার নিরাপদেই সমাধা হইয়াছে।

বিপদ যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বোধনের আগে। সর্বজনীন আনন্দের কথা এই যে, ফাঁড়াটা একা আমার উপর দিয়াই গিয়াছে। ঘটনাটি মহাপুজোর চাঁদা আদায় সম্পর্কিত।

পুজো সমিতি হইতে সকলের মতো আমাকেও পঁচিশ পাতার একটি চাঁদার খাতা দেওয়া হইয়াছে। আমার সময়-সুযোগের একান্ত অভাব; বলিয়াছি আমাদের পাড়ার এই কয়টি ঘরের চাঁদা আমি তুলিব, তাহার বেশি পারিব না।

সকলে বলিয়াছে, 'আচ্ছা'।

সকলের নিকটই চাঁদা পাইলাম—যাঁহার যাহা সামর্থ্য দিলেন; নিজেদেরই গ্রামের পুজো, দিবেনই জানা কথা. প্রতি বৎসরই দিয়া আসিতেছেন—কেবল ওই কুণ্ডুদের বাড়িতে মথুরবাবু নামে যে নূতন ভদ্রলোক সপরিবারে ভাড়া থাকিতেছেন তাঁহার চাঁদাটা আদায় করা হয় নাই। ভদ্রলোক এখানেই পাটকলে চাকরি করেন। ভোরে উঠিয়া কাজে চলিয়া যান, দুপুরবেলা যখন খাইতে আসেন. তখন আমি থাকি অফিসে; সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া অত দূর যাইতে আলস্য বোধ করি।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন যাইয়া শেষে পুজো একেবারে যখন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল. তখন রবিবার সকালে তাঁহার বাসার সামনে গিয়া হাঁক দিলাম। রাস্তাঘাটে কয়েকবার দেখা সাক্ষাতে তাঁহার সঙ্গে মুখ পরিচয়টা মাত্র হইয়াছে। কিন্তু আদায় করিতে গিয়াছি. বয়সেও বড়ই হইবেন, দরাজ কণ্ঠে 'মথুরদা' বলিয়া হাঁক পাড়িলাম। কয়েকবার ডাকিতে একটি ছোট ছেলে আসিয়া জানাইল. যে, তাহার পিতা সকালে উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন সে সংবাদ বাসার কেহই জানে না।

বিপদে পড়িলাম, কিন্তু বিরক্ত হইতে পারিলাম না;—রবিবারের সকালে কোথায় আড্ডা মারিতে যাওয়া হইবে তাহা পূর্ব হইতে কয়জনের ঠিক থাকে যে বাড়িতে সঠিক বলিয়া যাইবেন? এই যে চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইয়া এই বিপাকে পড়িয়া আমাকেই নিকটস্থ বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা মারিতে যাইতে হইতেছে তাহা কি বাড়ির লোকে জানে?

আড্ডা মারিয়া ফিরিবার পথে আবার ডাকিলাম, শুনিলাম, তখনও ফিরেন নাই। আচ্ছা মুশকিলেই পড়িয়াছি ভাবিয়া যখন নিজেই বাড়ি ফিরিয়া চলিলাম, পথে বাদামতলার মোড়ে মথুরদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল।

নমস্কার জানাইয়া প্রতি নমস্কার পাইলাম; কেমন আছেন জানিতে চাহিলে, আজকাল যে ভালো থাকার প্রশ্নই উঠে না সে সম্বন্ধে রসালো কয়েকটি বাক্য বলিয়া, আমি কেমন আছি তাহা জানিতে চাহিলেন। রসিক ব্যক্তি, খানিকক্ষণের মধ্যেই বেশ জমাইয়া তুলিলেন। ভাবিলাম, ক্ষেত্র উর্বর। অবিলম্বে বীজ বপন করিলাম,—যেমন করিয়া পাড়িতে হয় সেইভাবে চাঁদার কথাটা পাড়িলাম।

শুনিয়াই দুই হাত জোড় করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'ওটা মাফ্ করতে হবে দাদা, চাঁদা আমি দেবো না।'

বীজ যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া আমার নিজের কপালে নুড়ি হইয়া বাজিল।

উষ্মাভরে জানাইলেন, চাঁদা আদায়ের যে উপদ্রব তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্ম না হইলে আর নাকি চলিতেছে না।

হাসিয়া বলিলাম, আমাদের অফিসের বড়সাহেব খাঁটি ইংরেজ—তায় খৃস্টান-পাদ্রীর ছেলে. তিনিই দুই টাকা চাঁদা দিয়াছেন, ব্রাহ্ম তো হিন্দু।

আমার কথায় হাসিতে কসুর করিলেন না, কিন্তু নিজের কথা বলিলেন উত্তেজিতভাবে। বলিলেন : 'সার্বজনীন সার্বজনীন সার্বজনীন মশাই সারা দেশ জুড়ে সার্বজনীন, সবাই এসে বলে চাঁদা দাও। একটি মাসের মাইনে পেয়েছি পুজো-বোনাস, সে যদি চাঁদা দিতে দিতেই কাবার হয়ে যায়—'

'ক্ষেপেছেন নাকি?' বলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া নিজের কথা কহিলাম, 'আমাদের অফিসেই এপর্যন্ত তেরোজন চেয়েছে চাঁদা, অফিসের বাইরে তো আছেই—আশের গাঁ, পাশের গাঁ, অমুক সংঘ, তমুক সংঘ—সতেরো গণ্ডা সর্বজনীন পুজোর পাণ্ডারা ওঁত পেতে। আমি কি পলিসি ধরেছি জানেন? যে-ই আসে, গরমাগরম বলে দিই যে মশাই, এপর্যন্ত ছাব্বিশ জায়গায় চাঁদা দিতে হয়েছে, আর একটি পয়সা দিতে আমি অক্ষম। ব্যস, মুখ চূণ করে চলে যায়। এই করে এপর্যন্ত এক পয়সাও আমি চাঁদা দিইনি কোথাও; কিন্তু—'

বলিয়া গম্ভীর হইলাম, হইয়া বললাম, 'নিজের গ্রামে নিজেদের পুজো, সেখানে চাঁদা দিতেই হবে; দিয়েছি যা ক্ষমতায় কুলিয়েছে।

ঈষৎ নরম হইয়া পড়িলেন, চক্ষুলজ্জা তো আছে; ভাড়া থাকেন বলিয়াই আমাদের গ্রামকে তিনি নিজের বলিয়া মনে করেন না, এমন অনুযোগ দিব তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

বলিলাম, 'আমার-আপনার কথা ছেড়ে দিন, তিনটি দিন যাদের পুজোর ছুটি তাদের আবার দুর্গাপুজো; কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো আছে, বাড়ির মেয়েরা আছেন,—তাঁদের মুখ চেয়েই তো নিজেদেরই গ্রামে এই পুজোর ব্যবস্থা—যা হয় দরিদ্র-সামর্থ্যে।

মথুরদা ভিজিলেন। ঝাড়া এক ঘণ্টা আমাকে বকাইয়া তবে ভিজিলেন। বকুনিটা অসার্থক হইল না, এই ভাবিয়াই পুলকিত হইলাম। চাঁদার খাতার জন্য পকেটে হাত দিতেই বলিলেন, 'এখন তো দাদা, খুচরো নেই সঙ্গে—দশ টাকার নোট ছাড়া আর কিছু নেই।'

বলিলাম, 'চলুন না, আপনার বাসায় যাচ্ছি।'

কিন্তু বাসায়ও নাকি ভাঙানি নাই। বিনয় সহকারে বলিলেন যে, নোট ভাঙাইয়া তিনি চাঁদা যাহা দিতে পারেন তাহা বাসাতেই রাখিয়া যাইবেন, অনুগ্রহপূর্বক আমি যেন কষ্ট করিয়া একসময় চাহিয়া নিয়া যাই। তিনি বাসায় না থাকিলেও আমার অসুবিধা হইবে না, পাড়ার বারোয়ারী পুজোর চাঁদার কথা বলিলেই বাসার 'উহারা' চাঁদা দিয়া দিবেন।

অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল। অনেক কষ্টে 'না'-কে 'হ্যাঁ' করিয়াছি, সেই 'হাঁ' পাছে আবার 'না' হইয়া

দাঁড়ায় সে-ভয়েই আমাকে রাজি হইতে হইল।

কিন্তু তাঁহার চাঁদা আনিতে যাইব কখন। সকালে তো নয়ই, সন্ধ্যায়ও অফিস হইতে বাড়ি ফিরিতে আমার রাত দশটা বাজিতে লাগিল। পুজোর বাজার করিতে হইতেছে। সাবেক দিনের বাজার তো আর নয় যে, একটা ছুটির দিন দেখিয়া, দিবা-নিদ্রার পরে বিকালের দিকে ঢুলু ঢুলু দেহে বাহির হইয়া মনের মতো জিনিসগুলি জলের দামে কিনিয়া 'ঠকিলাম' 'ঠকিলাম' বলিতে বলিতে খুশি মুখে সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরিয়া আসিব। এ বাজারে বড়ছেলের একটা প্যাণ্ট কিনিতেই বড়বাজার হইতে শিয়ালদহ এবং বউবাজার হইতে শ্যামবাজার পর্যন্ত পাক্কা চারটি ঘণ্টা ঘুরিয়া মরিতে হইয়াছে।

পরের রবিবারের জন্য অপেক্ষা করিবার উপায় নাই, কেননা সেদিন মহাষ্টমী। একদিন দৈবাৎ একটু ভোরে উঠিয়া পড়িলাম এবং আলস্য না করিয়া জামাটি গায়ে গলাইয়া মথুরাবাবুর উদ্দেশে ছুটিলাম।

তাঁহার বাসায় গিয়া বহু হাঁকডাক করিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না। দেরি করিবারও উপায় নাই, নাহিয়া খাইয়া সাজিয়া নিজেকে আবার আটটার গাড়িতে অফিসে যাইতে হইবে। ক্ষুণ্ণমনে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

আর যাইব না বলিয়া রাগ করিয়া থাকিলেও একটু দায়িত্ব নিতে হয়,—চাঁদার খাতায় মথুরবাবুর নামে রসিদ লিখিয়া রাখিয়াছি—শুধু টাকার অঙ্কটা বাদ দিয়া। তাহা ছাড়া, ব্যর্থতায় মানুষের জেদ চাপিয়া যায়; অতএব পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যাবেলা অফিস ফেরত বাড়ি না ঢুকিয়া একেবারে তাঁহার বাসাতেই গেলাম। ডাকিয়া ডাকিয়া কোন সাড়া পাওয়া যায় না। অবশেষে অনেক গলা ফাটাইয়া জানিতে পারা গেল যে, মথুরবাবু তাঁহার কর্মস্থানে 'ওভার-টাইম' খাটিতেছেন এবং তাঁহার গৃহিণী পাড়ায় বোনঝির বাড়ি বেড়াইতে গিয়া এখনও ফিরেন নাই।

ধেত্তোর বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং পরদিন—ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় অফিস ফেরত আবার গিয়া হানা দিলাম; মনে মনে প্রতিজ্ঞা রহিল, বাসায় না পাইলে পাটকলে তাঁহার অফিসে গিয়া হাজির হইব।

কিন্তু দেখা পাইলাম। বাসার সামনে গিয়া 'মথুরদা' বলিয়া হাঁক দিতেই, 'আ-সু-ন' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ভিতর হইতে সাড়া দিয়া তিনি হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেন। কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাইয়া বাড়ির ভিতর টানিয়া লইয়া চলিলেন, কোনো ওজর আপত্তিতে কর্ণপাতই করিলেন না।

ভিতরে একেবারে শয়নকক্ষে নিয়া বসাইলেন। নিজের পকেট হইতে বিড়ির আধার লইয়া, খুলিয়া সবিনয়ে তাহা সামনে ধরিলেন; বিড়ি খাই না জানিয়া আমার সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

চাঁদার কথাটা বলিতে হইল না, নিজেই তুলিলেন, বলিলেন, 'চাঁদা আমি কপালে ঠেকিয়ে সেদিনই রাত্তিরে তুলে রেখেছি।'

রসিদ বহিটি বাহির করিয়া টাকার ঘরটি পূরণ করিয়া ফেলার জন্য কলম উদ্যত করিয়া বলিলাম, 'তাহলে কত লিখব?'

বলিলেন, 'লিখুন—চার আনা।'

'চার আনা!'

আমাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। জোড়হাত করিয়া জানাইলেন, তাহার অধিক আর সাধ্য নাই। চার আনা দিতেই যে তাঁহার পরিস্থিতি কিরূপ প্রাণান্তকর হইয়া উঠিয়াছে তাহার করুণ বর্ণনা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া আমাকে সংকুচিত করিতে লাগিলেন। অতিষ্ঠ হইয়া বাক্যে এবং ভঙ্গীতে ভদ্র করিয়া যাহা বলিলাম—তাহার নগ্ন অর্থ করিলে দাঁড়ায়—মশাই, খুব হই-য়াছে, এখন যাহা দিতে হয় ফেলিয়া দিন, আমি পালাই। রসিদে চার আনাই লিখিলাম।

'ওগো!' বলিয়া তিনি হাঁক দিলেন তাহার গৃহিণী বোধকরি রান্নাঘরে ছিলেন, কপাল ঢাকা ঘোমটা টানিয়া স্বামীর আদেশ প্রতীক্ষায় দ্বারবর্তিনী হইলেন। মথুরদা বলিলেন, 'বারোয়ারী দুর্গাপুজোর চাঁদাটা কোথায় রেখেছ, দাও দেখি।'

গৃহিণী প্রবেশ করিলেন, দেওয়ালের কাছে জলচৌকি রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইলেন, গোড়ালি তুলিয়া উঁচু হইয়া তাকের উপর হইতে লক্ষ্মীর চুপড়ি পাড়িয়া নিলেন এবং তাহার ভিতর হাতড়াইতে লাগিলেন। অনুসন্ধান আর ফুরায় না।

অনেকক্ষণ পর তিনি নামিয়া আসিলেন। আমি হাত পাতিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তাঁহার মুখে সরমজড়িত হাসি দেখিয়া আত্মসংবরণ করিলাম। মথুরদা উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন, 'কি হল, পেলে না?'

গৃহিণী তেরো আনা স্পষ্টতায় তিন আনা লজ্জার খাদ ভেজাল দেওয়া কণ্ঠে কহিলেন, 'এর মধ্যেই তো রেখেছিলাম।' আমাদের সামনে আসিয়া রেড়ির-তৈলসেবিত মৃৎ-প্রদীপের সামনে চুপড়ি উপুড় করিলেন। লক্ষ্মীর চুপড়ি ঢের দেখিয়াছি, নিজেদের ঘরেও আছে, কিন্তু তাহাতে কি কি জিনিস থাকে সে সম্বন্ধে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সিকি-উদ্দেশের চেষ্টায় তিনি শাঁখা, নোয়া, কাঠের চিরুণি, টিনের আরশি, লালসুতো, হরিতকী, সুপারি, কাগজের পুরিয়া প্রভৃতি নানা রকমের জিনিস একটি একটি করিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন; দ্রব্যের প্রকারাতিশয্য দেখিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল সকল জিনিস হয়তো বা ঠিক ঠিক শাস্ত্রীয় তালিকাভুক্ত নাও হইতে পারে।

কিন্তু সিকি পাওয়া গেল না।

মথুরদা এদিক হইতে গলা উঁচাইয়া উত্তেজিত মুখ আগাইয়া দিয়া অর্ধরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কি হল!'

গৃহিণী বিস্মিত বিপন্নভাবে আমার দিকে আড় চোখে চাহিয়া পরক্ষণেই পূর্ণ-দৃষ্টি চুপড়িতে নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'এখানেই তো রেখেছিলাম!

আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তাব করিলাম, 'বেশ তো, আর একটা সিকি দিয়ে দিন-না আমায়, তারপর এটা পাওয়া গেলে—'

কথা শেষ করিতে না দিয়া মথুরদা বলিলেন, 'পাওয়া গেলে কি করব? মায়ের নামে তুলে রেখেছি, সেটা আর কোন্ কাজে লাগবে? লাভের মধ্যে আমার আট আনা কপালদণ্ড।'

হাঁ করিয়া রহিলাম।

মথুরদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা গর্জন করিয়া উঠিলেন, 'কি হল সিকি?'

সে শব্দে আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। কিন্তু গৃহিণী অটলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঝনঝনিত শ্লেষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি হল, আমি খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়েছিসই তো!' মথুরদার দন্ত-নিষ্পেষণে কড়কড় করিয়া শব্দ উঠিল, তিনি মুখস্থের মতো বলিলেন, 'সিকি আধুলি টাকা করে করে সব তো তুইই খাচ্ছিস—খেতে খেতে যে সংসার খেতে বসেছিস।'

চিলের আওয়াজের মতো তীক্ষ্ণকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন,—'আ-হা-হা-হা-হা! কি আমার ভাড়াডেরার সংসারের—'

'চু-উ-উ-প!' বলিয়া একটা বজ্রধমকে মথুরদা তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন।

সে শব্দে তাঁহাদের ঘুমন্ত মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া বিছানার উপর হাত-পা ছড়াইয়া তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং পাঠরত ছেলেটি বহি ফেলিয়া আমার দিকে এমনভাবে চাহিল যেন সেই অঘটনের জন্য আমিই দায়ী।

আমি একেবারে বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলাম, উঠিয়া পলায়ন করিব এমন বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত মাথায় আসিল না। একটা সিকি হারানোর ঘটনা যে এমন মারাত্মক পরিণতি পরিগ্রহ করিতে পারে এ আমার স্বপ্নের অতীত।

মথুরদার ধমকের উত্তরে নিঃশব্দে গৃহিণী যে মুখঝামটা মারিলেন তাহার আঘাতের তীব্রতা দাদার মুখে লক্ষ্য করিয়া

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অস্ত্র হানিরাই গৃহিণী রণস্থল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মথুরদা শার্দুলবিক্রমে প্রতিপক্ষের প্রতি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, কিন্তু তড়িৎ ক্ষিপ্রতায় লম্ফ মারিয়া আমি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। বহি-পত্রে খবরের কাগজে নারী নির্যাতনের বিবরণ পড়িয়া ব্যথিত হইয়াছি, তাহার প্রত্যক্ষ রূপ দেখিয়া একেবারে ঘাবড়াইয়া গেলাম।

মথুরদা আমাকে ঠেলিয়া গৃহিণীকে ধরিতে চাহিতেছেন, আমি কিছুতেই তাঁহাকে তাহা করিতে দিতেছি না—উভয়ের এই চেষ্টায় এবং প্রচেষ্টায় একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধিয়া গেল। অবাঞ্ছিত সেই মল্লরণের কি করিয়া সমাপ্তি ঘটিবে সে চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম; এই নরপশুকে কিছুতেই ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, দিলেই সে নারীর উপর পতিত হইয়া নির্যাতন শুরু করিবে। প্রাণ থাকিতে তাহা আমি হইতে দিব না।

হঠাৎ ফ্যাস করিয়া একটা আওয়াজ হইল। সেই শব্দের করুণ শক্তিতে আমাদের মল্লযুদ্ধ থামিয়া গেল। শব্দটা ঊর্ধ্বদেহের দিকেই উঠিয়াছে। নিঃশব্দে ত্বরিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অবিলম্বেই পাওয়া গেল আমারই জামার বুকের কাছটাতে প্রায় দুই ইঞ্চি জায়গা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নিষ্প্রভ হতভম্ব দৃষ্টিতে মথুরবাবু চাহিয়া রহিলেন এবং কাঁদিয়া ফেলার ভয়েই আমি রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম।

আমার সেই জামা, যাহার মুখ চাহিয়া ভবিষ্যত তিন মাসের জন্য আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, এই ঐতিহাসিক বস্ত্র সমস্যার দিনে ছিঁড়িয়া গেল আমার সেই জামা!

সারারাত ঘুম হয় নাই। রাত্রি যতই প্রভাতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই এ ধারণাটা মনে দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল যে, একটা সিকি অপচয়ের ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ওই সমগ্র বিবাদটাই উহাদের স্বামী-স্ত্রীর পূর্ব-পরামর্শসম্ভূত। জামা ছিঁড়িয়া আমি পলাইয়া আসার পরে তাহারা হয়তো গলাগলি করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে, হয়তো সিকি বাঁচাইতে পারার আনন্দে নাচিয়া হয়রাণ হইয়াছে।—নহিলে একটা সিকির জন্য কি এতটা সম্ভব!

বঞ্চনাবিমূঢ় অন্তরে, শোকার্ত চিত্তে জামাটি পাড়িয়া লইলাম এবং সযত্ন সূচিচালনায় তাহার উপর রিপুকর্ম করিতে লাগিলাম।

ভাবনা হইয়াছে, মথুরবাবুকে ভবিষ্যতে মুখ দেখাইব কেমন করিয়া?......আমাকে কখনও দেখিয়া ফেলিলে মথুরবাবুর সহধর্মিণী কি রকম ভাবে হাসিবেন!

শ্রীযুত মথুরানাথ দাসের নামে যে রসিদ লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার চার আনা নিজের ট্যাঁক হইতেই দিয়াছি। আশা করিয়া একটু তৃপ্তি পাইতেছি যে, আগামী বৎসর পূজোর আগে যখন চাঁদা-দাতাদের নামতালিকা ছাপা হইয়া বিতরিত হইবে, তাহাতে নিজের নামটি দেখিতে পাইয়া মথুরানাথ লজ্জিত হইবেন।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২৪

যাদবচন্দ্রের দ্রব্যাদি দ্বিতলে যাদবচন্দ্রের কক্ষে স্থাপন করিয়া বিনোদ প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। যাদবচন্দ্রের স্তব্ধনির্বাক কঠিন মূর্তি দেখিয়া নিজ হইতে কোনো কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না।

গভীরস্বরে যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু কোথায় বিনোদ? কলেজে?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!"

"কখন্ আসবে?"

"আজ্ঞে মহারাজ, আসতে সাড়ে দশটা এগারোটা হবে।"

হাতের রিস্ট-ওয়াচ ঘুরাইয়া যাদবচন্দ্র দেখিল বেলা তখন মাত্র সাড়ে আটটা। শক্তি নামে যে অজ্ঞাতকুলশীলা রহস্যাবৃতা মেয়েটার সংবাদ পাইয়া ক্রোধ, বিস্ময়, অপমান এবং বিশেষ করিয়া কৌতূহলের দ্বারা পীড়িত হইয়া সে বাজিতপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে, সে এখনও এই গৃহেই বাস করিতেছে অথবা ইতিমধ্যে স্থানান্তরে গিয়াছে, একজন পরিচারকের নিকট সে প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে প্রবৃত্তি হইল না; বলিল, "আচ্ছা এখন তুই কাজে যা।"

সসংকোচে ঈষৎ দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আপনার কাপড়-জামা-তোয়ালে চান-ঘরে রেখে যাই মহারাজ?"

বিরক্তিকটু কণ্ঠে যাদবচন্দ্র বলিল, "দেরি আছে তার, এখন তুই যা!"

ইহার পর আর কোনও কথা বলিতে সাহস না করিয়া বিনোদ নিচে গিয়া শক্তিকে যাদবচন্দ্রের আগমন সংবাদ জানাইল।

ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটা ইজি-চেয়ার ছিল। তাহার উপর নিজের রোষ-বিক্ষুব্ধ দেহ ঢালিয়া দিয়া যাদবচন্দ্র বোধ-করি আসন্ন সংঘর্ষের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। ল' কলেজ হইতে অশোকের ফিরিবার পূর্বেই শক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবে, অথবা তাহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে; অপরাধের কৈফিয়ৎ তলব করিবে এক নম্বর আসামী অশোকের নিকট হইতে প্রথমে, অথবা তৎপূর্বেই দুই নম্বর আসামী সেই অজানা-অপরিচিত মেয়েটার উপস্থিতি সম্ভব হইলে খানিকটা সওয়াল-জবাব করিয়া রাখিবে,—সেই সকল কথাই হয়ত' মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে কর্ণে প্রবেশ করিল সুমিষ্ট তরুণ কণ্ঠস্বর,—

"বাবা!"

মুখ তুলিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল শক্তির আরক্ত-সুন্দর মূর্তি; চকিতবিস্ময়ে যাদবচন্দ্র মুহূর্তকাল নির্বাক হইয়া রহিল; পরক্ষণেই কিন্তু তাহার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"আমি শক্তি,—আপনার মেয়ে।" বলিয়া যাদবচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে দেহ ঈষৎ নত করিয়া শক্তি যাদবচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্রুতবেগে পদদ্বয় চেয়ারের উপর তুলিয়া লইয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "ছুঁয়োনা আমাকে! তুমি আমার মেয়ে নও, কেউ নও তুমি আমার! আমি যা জিজ্ঞাসা করি, দূরে দাঁড়িয়ে তার জবাব দাও।"

সহসা শক্তির মাথা হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহের মধ্যে একটা কঠিনতা জাগিয়া উঠিল। দুই-চার পা পিছাইয়া গিয়া সংযত মনের গভীর কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার মেয়ে নই, কিন্তু অস্পৃশ্যও নই আমি। কি আপনার জিজ্ঞাসা করবার আছে, বলুন।"

শক্তির মুখচক্ষের এবং কণ্ঠস্বরের পরিবর্তিত ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া যাদবচন্দ্র বুঝিয়াছিল যে, শক্তি ঠিক সেই হেলে-ঢোঁড়া শ্রেণীর প্রাণী নহে যাহাকে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে খেলা করা চলে। তথাপি, একজন আঠার-উনিশ বৎসর বয়সের মেয়ে, সে তাহারই গৃহে বাস করিতেছে, এবং যাহাকে সে অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিচারাধীন করিয়াছে,—সে যে এমন অবলীলার সহিত তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারে তাহা দেখিয়া তাহার বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "তুমি এ-বাড়িতে বাস কর?"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, করি।"

"কতদিন করছ?"

"মাস দেড়েক।"

"তার আগে কোথায় ছিলে?"

"খুলনা জেলার শিবানীপুর গ্রামে।"

"সেখান থেকে কার সংগে এখানে এলে?

"আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নবগোপাল চাটুয্যের সংগে।"

"এখানে আসবার কারণ কি হল?"

"মা মারা গেলেন, জেঠাইমার অত্যাচার শুরু হল, সেই অত্যাচার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।

"কি সে অত্যাচার?"

"সে কথা আমার গোপন কথা, আপনার ত সে কথা শুনে কোনো লাভ নেই।"

উত্তর শুনিয়া যাদবচন্দ্রের ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া বলিল, "এ বাড়িতে এলে কোন্ অধিকারে?"

"অধিকার বলতে কোনো অধিকারেই নয়; পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে আশ্রিত রূপে।"

"অশোকের সংগে তোমার কতদিনের পরিচয়?"

"ছ-সাত বছরের।"

"সে পরিচয় আরম্ভ হয় কোথায়!"

"কলকাতায়, তখন আমরা কলকাতায় বাস করতাম।"

শক্তির সীমন্তের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "তুমি অবিবাহিতা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"অশোকের সংগে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই?"

"বলেছি ত, পূর্ব পরিচয়ের সম্পর্ক।"

এক মুহূর্ত গভীর ভাবে কি চিন্তা করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "অশোককে তুমি কি বলে ডাকো?"

"এতদিন অশোকদাদা বলে ডাকতাম, আজ যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি অশোকবাবু বলে ডাকব।"

আজ যতক্ষণ এ বাড়িতে আছি মানে? আজ তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না কি?"

"যাব।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ আপনি এসে জানালেন, আমি আপনার কেউ নই,—তাই হঠাৎ।"

"আমি না এলে তুমি আজ যেতে না?"

"না, নিশ্চয় যেতাম না।"

"তবে আজই বা যাবে কেন? এতদিন যার জোরে ছিলে, এখনও ত' তারই জোরে থাক্‌তে পার।"

"না, তা পারিনে। আর তাঁর কোনো জোর নেই।"

"বল কি! এই একটু আগেও ছিল, এরই মধ্যে গেল কোথায়?"

"আপনি তাঁর জোর হরণ করেছেন। আপনি কোনো লোককে অস্বীকার করলে এ-বাড়ির কেউ আর তাকে স্বীকার করতে পারে না।"

"তবুও যদি করে, সে স্বীকারের কি মূল্য তুমি দেবে?"

"এক কানা-কড়িও নয়।"

যাদবচন্দ্রের ললাটের কুঞ্চন খানিকটা যেন মিলাইয়া গেল; বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে ত' তুমি এই দেড়মাস ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছ।"

"তখন মনে করেছিলাম আপনার দেখা পেলে সম্মতি নিশ্চয় পাব।"

"আগেই সে সম্মতি চেয়ে নাও নি কেন?"

"সাহস হয়নি। এখন দেখছি ভুল করেছিলাম।"

"আজ তুমি কোথায় যাবে?"

শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শক্তি বলিল, "সে কথা জেনে আপনার কি লাভ হবে? সে কথা তো আপনার পক্ষে অবান্তর কথা।"

শুনিয়া যাদবচন্দ্রের মুখ পুনরায় একটু কঠিন হইয়া উঠিল; বলিল "এ কথা তুমি অবশ্য বলতে পার, কিন্তু কোথায় যাবে তা বলতেই বা কি এমন আপত্তি আছে। তোমার?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "আপাতত আজ প্রণববাবুদের বাড়ি যাব, তারপর দেশ থেকে লোক আনিয়ে কয়েকদিন পরে যাব দেশে। প্রণববাবু অশোকবাবুর বিশেষ বন্ধু, পার্ক সার্কাসে বাড়ি।"

"দেশে ফিরে যাবে সেই জেঠাইমার অত্যাচারের মধ্যে?"

"তা ছাড়া আর কি করতে পারি বলুন?"

প্রণবদের সহিত যাদবচন্দ্রের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে; এমন কি যাদবচন্দ্র কলিকাতায় আসিলে প্রণবের জননী যোগমায়া কোনোবারই তাঁহাকে দুই তিনদিন নিমন্ত্রণ করিয়া না খাওয়াইয়া ছাড়ে না।

যাদবচন্দ্র বলিল, "প্রণবদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?"

শক্তি বলিল, "কোনো সম্পর্কই নেই, শুধু পরিচয়ের সম্পর্ক।"

"তবে তোমার দায়িত্ব বহন করতে তাঁরা রাজি হবেন কেন?"

"তা হবেন। বিনোদকে দিয়ে কাপড়ের দোকান থেকে ফোন করিয়ে দিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে প্রণববাবুর বোন মালতী এসে হাজির হবে।"

তাহার পর সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া শক্তি বলিল, "ছি, ছি, এ আমার কিন্তু ভারি অন্যায় হচ্ছে! আপনি গাড়িতে এসেছেন, রাত্রে বোধহয় ভাল ঘুম হয়নি, চা-টা খেয়ে কোথায় একটু বিশ্রাম করবেন, তা নয় আমি আপনার সঙ্গে কেবল তর্ক করেই চলেছি! আর যদি কোনো কথা থাকে পরে না হয় হবে, এখন আপনি বাথরুমে যান। আমি চললাম আপনার চা-খাবারের উয্যুগ করতে।" বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনরায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কিন্তু আপনি আমার হাতের ছোঁওয়া খাবেন ত? তবে আমি নীচ বংশের মেয়ে নই। লক্ষ্মীই না হয় ছেড়ে গেছেন, কিন্তু এখনও শিবানীপুরের মুখুজ্জে জমিদার বংশকে বড় ঘর বলে সম্মান করে না এমন লোক খুলনা জেলায় নেই।"

যাদবচন্দ্র বলিল, "তোমার হাতের ছোঁওয়া খাব কি খাব না সে কথা পরে হবে, তার জন্যে তাড়া নেই; কিন্তু তাড়া আছে তোমার কথা শেষ করবার। অশোক আসবার আগে আমি তোমার কথা শেষ করতে চাই।"

যাদবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্ত ভাবে শক্তি বলিল, "বলুন।"

"প্রণবদের বাড়ি তোমার যাওয়া হবে না।"

"কেন মহারাজ?"

"তাতে আমার সম্মানের হানি হবে।"

"কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে না গেলে আমারও ত সম্মানের হানি হবে মহারাজ!"

মাথা নাড়িয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "না, হবে না। কাল তুমি আমার সঙ্গে বাজিতপুরে যাবে।"

তাহার পর শক্তি তাঁহাকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে সহসা খেয়াল করিয়া বিস্মিত গভীর কণ্ঠে বলিল, "তুমি আমাকে মহারাজ বলে কেন ডাকছ?"

মহারাজ ডাকটা যৎপরোনাস্তি অভ্যস্ত ডাক বলিয়া প্রথম ডাকটা বোধহয় যাদবচন্দ্রের শ্রুতিগম্য হয় নাই।

শক্তি বলিল, "তবে কি বলে ডাকব বলুন? বিনোদ আপনাকে মহারাজ বলে ডাকে, তাই আমিও ডাকছি।"

"বিনোদ আর তুমি সমান না-কি?"

পাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শক্তি বলিল, "তা ত বলতে পারিনে।"

আমি বলতে পারি, তা তুমি নও। কাছে এস, কি বলে আমাকে ডাকবে তোমাকে আমি জানিয়ে দিই। এস, কাছে এস!"

দৃষ্টি ফিরাইয়া শক্তি একবার যাদবচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল।

"বোসো।"

হাঁটু গাড়িয়া শক্তি উপবেশন করিল।

শক্তির ঘন-কেশভার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া যাদবচন্দ্র নত হইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বাবা বলে ডাকবে। বুঝলে?—বাবা বলে ডাকবে।"

ক্ষণিকের জন্য একবার আনত-আর্তমুখ তুলিয়া শক্তি যাদবচন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর কি তথায় দেখিতে পাইল বলা কঠিন, সহসা চিত্তের সমস্ত সংযম হারাইয়া যাদবচন্দ্রের ক্রোড়ের উপর ভাঙিয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষণকাল যাদবচন্দ্র চিত্তবিক্ষোভের এই অপরূপ অভিব্যঞ্জনের প্রতি নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল; তাহার পর শক্তির রোদন-কম্পিত পৃষ্ঠের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, "ভয় নেই মা, ভয় নেই! স্থির হও, চুপ করো!" দুই চার ফোঁটা তপ্ত অশ্রুও যাদবচন্দ্রের চক্ষু হইতে শক্তির অগোচরে তাহার মাথার উপর ঝরিয়া পড়িল।

বয়লারের দেহে কোনো এক স্থানে ছিদ্র পথ পাইয়া বোধকরি অনেকখানি বাষ্পই নির্গত হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। প্রকৃতির অনতিবর্তনীয় নিয়মে সঞ্চয়ের ক্ষমতা যে বস্তু যতটা রাখে, ত্যাগের ক্ষমতাও সেই বস্তুকে ঠিক ততটা রাখিতেই দেখা যায়। উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইবার ক্ষমতা পাথরের যেমন আছে সেই উত্তাপ ত্যাগ করিয়া অতি শীঘ্র শীতল হইবার ক্ষমতারও তেমনি তাহার অভাব নাই।

মুখ তুলিয়া শক্তি দুই চক্ষু অঞ্চলে মার্জিত করিল, তৎপর যাদবচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অদূরে একটা টুল ছিল, তাহা দেখাইয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "বোসো। কথা এখনও শেষ হয়নি।"

টুলের উপর উপবেশন করিয়া শক্তি জিজ্ঞাসুনেত্রে যাদবচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। যাদবচন্দ্র বলিল, "এবার তোমাকে যে-কথা জিজ্ঞাসা করব তা যেমন দরকারি, তেমনি গুরুতর। তোমার সঙ্গে এই দশ-পনেরো মিনিটের পরিচয়ে যেটুকু তোমাকে বুঝেছি, তাতে আশা হয় যথার্থ উত্তর দিতে তুমি সঙ্কুচিত হবে না।"

মনের মধ্যে উগ্র ঔৎসুক্য দমন করিয়া রাখিয়া শক্তি বলিল, "বলুন?"

কোনো প্রকার উপক্রমণিকা না করিয়া যাদবচন্দ্র একেবারে সোজাসুজি কথাটা শক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল; বলিল, "অশোক কি তোমার কাছে কোনো রকম বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ আছে?—লুকিয়ো না, সত্যি কথা বল।"

প্রশ্ন শুনিয়া শক্তির মুখ প্রভাত-সূর্যের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত

নির্বাক থাকিয়া নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না বাবা!"

যাদবচন্দ্রের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল, বলিল, "কেন? বলতে নিষেধ আছে না-কি?" পরমুহূর্তেই কিন্তু সে হাস্য-রেখা অন্তর্হিত হইয়া গভীর উদ্বেগে ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; কতকটা যেন নিজ-মনে-মনেই বলিল, "অনুমানে অবশ্য ভুল হয়নি, কিন্তু বিপদে পড়ে গেলাম!"

এই স্বগতোক্তিকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শঙ্কিত মুখে শক্তি বলিল, "কেন বাবা, কি বিপদ?"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া লইয়া যাদবচন্দ্র কহিল, তোমাকে দেখে-শুনে আমার দৃঢ়-বিশ্বাস হয়েছে শক্তি, তোমার মতো একটি আত্মমর্যাদাশালী মেয়ে এর চেয়ে কম সর্তে কখনই এ বাড়িতে অশোকের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে না। তা ছাড়া, একথা ভেবেও আমি বরাবর আশ্চর্য হচ্ছিলাম যে, অশোকের মত শিক্ষিত আর চরিত্রবান ছেলে তোমার বয়সের একজন অনাত্মীয় অবি-বাহিত মেয়েকে দেড় মাস এ বাড়িতে কি কারণে স্থান দিতে পারে। কিন্তু সে যেন হল, ওদিকের এখন কি করা যায়! ওদিকের ত' আমি কোনো উপায়ই দেখছি নে!"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে বাবা?"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "কেন, নিরঞ্জনপুরের জমিদার ভুবন চক্রবর্তীর মেয়ের কথা তুমি কিছু জানো না?"

প্রশ্ন শুনিয়া শক্তির মুখ পাংশু হইয়া উঠিল; মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।"

"অশোক কিছু বলেনি তোমাকে?"

"না, বলেন নি।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া মৃদু-গভীর স্বরে কতকটা যেন স্বগত ভাবে যাদবচন্দ্র বলিল, "আশ্চর্য! সখ আছে অথচ সাহস নেই।" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "নিরঞ্জনপুরের সেই মেয়ের সঙ্গে অশোকের বিয়ে দোবো ব'লে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে সব রকম চেষ্টা-চরিত্র ছেড়ে দিয়ে ভুবন চক্রবর্তী তাঁর মেয়েকে অবি-বাহিত রেখেছেন।"

যে সমস্যা সমাধানের চিন্তা অশোক নিজে গ্রহণ করিয়া শক্তিকে নিশ্চিন্ত থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল, আর তাহার রহস্য অস্পষ্ট রহিল না। মুহূর্তের জন্য মাথাটা গেল ঘুরিয়া, মনে হইল টুলের নীচের মাটি যেন তলতল করিতেছে। দুই হাত দিয়া শক্তি টুলের দুই পাশ সজোরে চাপিয়া ধরিল। পরমুহূর্তেই কিন্তু তাহার সবল অন্তরের দুর্মদ পরাক্রমকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়া এই সদ্যলব্ধ প্রচন্ড আঘাতের মর্মন্তুদ চোটকে সে প্রাণপণে প্রতিরুদ্ধ করিল। দুর্জয় অভিমানের চাপে সমস্ত মনটা করিয়া লইল কঠিন।

"বাবা!"

শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "কি?"

"এ সমস্যা ত' কঠিন সমস্যা নয় বাবা! আপনার প্রতিশ্রুতিই পালিত হবে।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে শক্তির দিকে চাহিয়া থাকিয়া যাদবচন্দ্র বলিল, "আর, তোমার গতি কি হবে?"

শক্তির মুখে দিবালোকে বিদ্যুৎ-প্রভার ন্যায় ক্ষীণ-হাস্য দেখা দিল; বলিল, অদৃষ্টে যার দুর্গতি লেখা আছে, তার আর গতি কি হবে বাবা!"

সহসা একটা কথা মনে হইয়া যাদবচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "একটা উপায় আছে শক্তি।"

"কি উপায় বাবা?"

যাদবচন্দ্র প্রণবের কথা উত্থাপিত করিল। প্রণব যে অশোক অপেক্ষা কোনো অংশেই অবাঞ্ছনীয় পাত্র নহে, তদ্বিষয়ে শক্তিকে নানারূপে আশ্বস্ত করিয়া সে বলিল, "আমি গিয়ে প্রণবের মাকে চেপে ধরলে নিশ্চয়ই তিনি রাজি হবেন। ঠিক আমার নিজের একটি মেয়ের মতো সব ভার সব দায়িত্ব নিয়ে বাজিতপুরের বাড়ি থেকে আমি তোমার বিয়ে দেবো।"

এত লোভনীয় প্রস্তাবেও কিন্তু শক্তি সম্মত হইল না; ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "না বাবা, ওখানে আপনি কোনো কথা কইবেন না। আপনি অনুরোধ করলে প্রণববাবুর মা নিশ্চয় রাজি হবেন—কিন্তু ওখানে আমার একটুও ইচ্ছে নেই।"

গভীর বিস্ময় সহকারে যাদবচন্দ্র বলিল, "কেন বল দেখি?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "আপনার আশ্রয়ই যখন অদৃষ্টে জুটল না, তখন আর বড়মানুষের বাড়িতে কাজ নেই বাবা। আমরা গরীব মানুষ, গরীবের ঘরই আমাদের পক্ষে ভাল। দেশে একটি ভাল পাত্র আছে, বললেই তাঁরা রাজি হবেন।"

যাদবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "দেশে কোথায়? তোমাদের নিজের গ্রামে?"

"না, আমাদের গ্রাম থেকে অল্প দূরে, দক্ষিণ হরিপুরে।"

"সেখানে কখনো তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল?"

"হয়েছিল।"

"তাঁরা রাজি ছিলেন?"

"ছিলেন।"

"পাত্রের বাপ কি করেন?"

"কিছু পেন্সন পান, আর চাষবাস করেন।"

"পাত্র কি করে?"

"বোধহয় চাষবাসই দেখেন।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছে?"

"খুব বেশি নয়।"

"কি পাশ?"

"পাশ কিছু করেননি।"

"দেখতে কেমন?"

"মন্দ নয়।"

"অবস্থা?"

"খাওয়া-পরার কষ্ট নেই।"

"পাত্রের নাম কি?"

"নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়।"

"এই নবগোপালেরই সঙ্গে এখানে তুমি এসেছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এ বিয়েতে তোমার মত আছে?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া শক্তি বলিল, "আছে।"

"বিয়ে অঘ্রাণ মাসে হতে পারবে ত?"

"তা পারবে।"

"ততদিন বাজিতপুরে আমার কাছে থাকতে তোমার আপত্তি হবে না ত?"

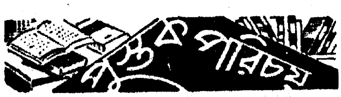
"না, নিশ্চয় হবে না।"

"বিয়ে যদি সেখান থেকেই আমি দিই?"

"সে আপনি যেমন ইচ্ছা করবেন তাই হবে।"

শক্তির উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রীত হইয়া যাদব-চন্দ্র বলিল, "উপস্থিত আর আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। এবার তুমি নীচে গিয়ে বিনোদকে পাঠিয়ে দাও, আমার স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাক্।"

মেঘমসীলিপ্ত আকাশের মত উদাস এবং মলিন হৃদয় লইয়া শক্তি নীচে নামিয়া গেল। (আগামীবারে সমাপ্য)



কাব্য পরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থমালা, বিশ্বভারতী সংস্করণ কার্তিক ১৩৫১। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতের রবীন্দ্র-সাহিত্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থপীঠ। সে তীর্থ-পরিক্রমণে দেশবিদেশের রসতৃষার্ত পথিক পূর্বে এসেছেন, বর্তমানে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও দলে দলে আসবেন। আমাদের এই পরম গৌরবের দায়িত্বটুকু কিন্তু সর্বদা আমরা স্মরণ রাখি না। তীর্থ-পথিকদের পথের আলো জেলে রাখার গুরুদায়িত্বও আমাদেরই। সে আলো আলেয়ার আলো হয়ে ভ্রান্ত পথের নির্দেশ যেন না দেয়—সেদিকেও সর্বদা সচেতন দৃষ্টি রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

অত্যন্ত আশার এবং আনন্দের কথা— বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে এই গুরুদায়িত্বটিও পরম ধৈর্য এবং বিচার সহকারে আমাদের সকলের হয়ে সম্পাদন করছেন। **"রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থমালা"** তাদের এই শুভপ্রয়াসের অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথের এতকাল গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংগ্রহ করে তাঁরা রবীন্দ্র-পরিচয় গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ **'আত্ম-পরিচয়'** কিছুকাল পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। গত বৎসর প্রকাশিত হয়েছে উক্ত গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ **'কাব্যপরিক্রমা'**; লেখক, স্বনামধন্য রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচক পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্তী। একথা স্মরণীয় যে আধুনিক রুচিসম্মত রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার অজিতকুমারই এদেশে প্রথম পথপ্রদর্শক। সম্প্রতি তৃতীয় রবীন্দ্র পরিচায়ক গ্রন্থ বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন—বাঙলার সেরা ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-এর লেখা **'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'**।

'কাব্যপরিক্রমা'য় "জীবনস্মৃতির" আলোচনা শেষে অজিতকুমার আক্ষেপ করেছেন :

"কবির অন্তরতর জীবনের "ভাঙাগড়া-জয়পরাজয়ে'র ভিতর দিয়া যে একটি বড়ো অভিপ্রায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন কবি ভিন্ন কে করিবে? আমদরবারে এই কালের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ একরকম করিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, কিন্তু খাস দরবারে তাঁহার অন্তরের মধ্যে তিনি আপনাকে আপনি না দেখাইলে সেখানকার দরজা হয়তো চিরকাল বন্ধ থাকিয়া যাইবে।" (পৃঃ ৭২) এ আক্ষেপ আমাদের সকলের আক্ষেপ। জীবনস্মৃতির ভিত্তির উপর একটি সম্পূর্ণ আত্মজীবনী রবীন্দ্রনাথ রচনা করে গেলে তবেই আমাদের এ আক্ষেপ মিটতে পারতো। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থটিতে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ আমাদের সেই নিষ্ফল আক্ষেপ মেটাতে তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। 'জীবনস্মৃতি'র পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে 'আত্মপরিচয়' অপরিহার্য, কারণ একমাত্র এই গ্রন্থেই অজিতকুমারের ভাষায় 'কবির অন্তরতর জীবনের পূর্ণতর অভিপ্রায়টির ক্রমবিকাশের কথা' আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে শুনতে পাই। 'কড়ি ও কোমলে'র পরের যুগের রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখার একমাত্র মায়াদর্পণ বিশ্বভারতী প্রকাশিত এই নতুন রবীন্দ্র গ্রন্থ 'আত্মপরিচয়'।

কবির চোখে কবিকে দেখা সারা হলে তখন তাঁকে দেখা দরকার দরদী সমালোচকের দৃষ্টি

দিয়ে। অজিতকুমার সার্থক রবীন্দ্র-সমালোচক। জ্ঞানের ব্যাপকতায় এবং রসানুভূতির গভীরতায় বিচারের অতি দুর্লভ সুসঙ্গতি ছিল তাঁর রচনায়। রবীন্দ্রনাথকে অনেকেই অসম্পূর্ণ করে জানেন, কারণ তাঁকে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর রচনার অক্ষর দিয়েই জানবার চেষ্টা করেন। জীবনশিল্পী কবিকে জীবন দিয়ে জানবার ঐকান্তিকতা না থাকায় তাঁদের আলোচনায় কাঠ-খড়ের আয়োজনই বিপুল হয়ে ওঠে, অন্তরের আলোটি জ্বলে ওঠে না। অজিতকুমার তাঁর অন্তরের গভীরে রবীন্দ্রনাথকে লাভ করেছিলেন বেদনার চরম মূল্য সমর্পণ করে—জীবন দিয়ে কবির জীবনের বাণীটি লাভ করেছিলেন। ফলে, তিনি বাজারী সমালোচকদের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মতো লেখক নন একেবারেই। দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে অজিতকুমার অসাধারণ মেধাবী ছিলেন, তবু তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্‌টেলেক্ট ইন্‌টুইশনকে কণ্ঠ রোধ ক'রে মেরে ফেলেনি কোনোদিন, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাই তাঁর সমালোচনার স্বরূপ-বিচারে।

"কবির সৃষ্টির যে আনন্দ তাহাই পুনরায় নিজের মধ্যে সৃজন করিয়া তোলা, ইহারই নাম সমালোচনা। কবি যে ফুল ফোটান, সমালোচক ঠিক তারই পাশে তারই অনুরূপ আরেকটি ফুল ফোটান, ভালো সমালোচনা সেইজন্যই একরকমের সৃষ্টি।" (পৃঃ ৪৭)।

অজিতকুমারের রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা সমালোচকের আন্তরিক আনন্দের সেই প্রসাদ-গুণে সাহিত্য সৃষ্টিরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আর একটি অধুনাবিস্মৃত কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—আধুনিক কালের দুই ভারতীয় যুগ-মানবের অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছিলেন অজিতকুমার তাঁর নিজের মানসপটে—তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' ও বিশেষ করে 'কাব্য পরিক্রমা'য় তিনি সেই দুর্লভ যুগ্মরশ্মি বিম্বিত করে গেছেন আশ্চর্য শিল্পকৌশলে। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের বিচারের এবং কল্পনার আলোক ও রস-সম্পাতে চিরন্তন মূল্য লাভ করেছে অজিতকুমারের এই রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থগুলি। রবীন্দ্র রসতীর্থের পথিকদের পক্ষে সেই কারণেও 'কাব্যপরিক্রমা' নিত্যকালের পথপ্রদর্শক হবার দাবী রাখে। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির তালিকা দেওয়া গেল : জীবন-দেবতা, রাজা, ডাকঘর, জীবন-স্মৃতি, ছিন্নপত্র, ধর্মসঙ্গীত, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য—দেখা যায় রবীন্দ্র সাহিত্যের দুরূহতম প্রধান সমস্যাগুলি প্রায় সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে। বিচারের এই দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়ালে নবীন সাহিত্যিকরা রবীন্দ্র সমালোচনা-সাহিত্য রচনার অব্যর্থ প্রেরণা ও শুভনির্দেশ নানাভাবে নানাদিক থেকে যুগে যুগেই পাবেন। গ্রন্থের উৎসর্গে অজিতকুমার সেই আগ্রহেই 'অনাগত কালে'র পথিকদের বিশেষ করে স্মরণ করেছেন।

গ্রামীণ সংস্কৃতি—সুবোধ ঘোষ প্রণীত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ, সি ৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

নাগরিক সভ্যতা ভাঙ্গে গড়ে। আবহমানকাল স্রোতধারার মত বয়ে চলবার ক্ষমতা তার নেই। সে যখন ভেঙ্গে পড়ে নিঃশেষে প্রাণ তার মুছে যায় জগত থেকে। তখন তার পরিচয় দেয় কতকগুলি প্রাণহীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য।

কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতার মূল আশ্রয় মানুষ। এই মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্মেষই গ্রামীণ সভ্যতার মাপকাঠি এবং এই মানবত্বের বিকাশের মধ্য দিয়েই গ্রামীণ সভ্যতার চিরন্তনী গতি।

নাগরিক সভ্যতার পথ কেন্দ্রীকরণ ও গ্রামীণ সভ্যতার ধারা বিকেন্দ্রীকরণ এবং এই গ্রামীণ সভ্যতাই ভারতের বৈশিষ্ট্য। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রভৃতি ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এই গ্রামের পথেই আহ্বান করেছেন। এটা ফিরে যাওয়া বা back to village নয়, এটা ঘরে আসা বা home coming.

পাঠকগণ লেখকের এই বিশ্লেষণে বিশ্ব-মানবের সমাজ, সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্রমবিকাশের একটা সঠিক চিত্র না পেলেও লেখকের সংযত ও শান্ত প্রকাশভঙ্গী এবং সুসম্বন্ধ বিচারশক্তি পাঠককে মুগ্ধ করবে।

জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধীজীর অর্থনীতি—অনাথগোপাল সেন প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ক্যাপিটালিজম, মার্কসীয়, কম্যুনিজম, ডিমক্র্যাটিক, সোসালিজম এবং ফ্যাসিজম-এর বিশ্লেষণ ও তাহাদের ব্যর্থতা এবং গান্ধীজম বা গান্ধীয়ান সোসালিজম-এর পথে প্রপীড়িত বিশ্বমানবের মুক্তির নির্দেশ এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী এবং অতি গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গেও হাল্কা রসের বহুল প্রক্ষেপ পুস্তকখানিকে সুখপাঠ্য মনোরঞ্জক করেছে।

লেখকের মতে উল্লিখিত চার ইজমের (লেখকের ভাষায় চারি মকারের) ব্যর্থতার কারণ তাহাদের যন্ত্রবাদ। "যন্ত্রদানবের রাক্ষসী ক্ষুধাই" দরিদ্রের শোষণ ও সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধের কারণ। এমন কি মহাযন্ত্রের প্রয়াসই সোভিয়েট রাশিয়াকে বিপথগামী করেছে এবং তাকে মহাযুদ্ধের ধ্বংসপথে চালিত করেছে।

এই বিশ্লেষণের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ সামঞ্জস্য না থাকলেও গত মহাযুদ্ধের প্রতি যে তীব্র প্রতিক্রিয়া মানব মনকে আলোড়িত করেছে এটা তার একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন।

পুস্তকের শেষাংশে লেখক গান্ধীবাদের একটা মোটামুটি রূপ বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন। তাহার মতে উৎপাদন ও রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণই গান্ধীবাদের মূল নীতি এবং প্রকৃত ডিমক্রেসী ও সোসালিজম একমাত্র এই পথেই সম্ভবপর। তবু লেখকের মনে প্রশ্ন জেগেছে "গান্ধীনীতি অবলম্বনে যুদ্ধ কি নির্মূল হয়েছে?" তিনি মনে করেন "যদি গান্ধীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে পৃথিবীর সভ্য ও শক্তিশালী জাতিসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করে, তাহা হইলে যুদ্ধকে হয়ত একেবারেই বাদ দেওয়া সম্ভবপর হইবে।" লেখক স্পষ্টই স্বীকার করছেন যে এই আদর্শ ও অবস্থার বিকাশ ও স্থিতি নির্ভর করছে মানব মনের ও তার সামাজিক সম্বন্ধের (social relationship) আমূল পরিবর্তনে। ইহা সময় সাপেক্ষ এবং এখনো বহুকাল মানুষকে বহু বাধা এবং বিঘ্নের পথেই এই নূতন সমাজ গড়ে তোলবার আয়োজন করতে হবে। লেখক যদি সেই

অনাগত কালের জন্য ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করতেই প্রস্তুত থাকেন তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের বিচারকালে তাঁর অধৈর্যের প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। কোন ইজমএর হাতেই যাদু মন্ত্র নেই। মানুষ তার সামাজিক ও বাস্তব সংস্কার ও পরিবেষ্টনের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত। এই পরিবেষ্টনের পরিবর্তন দ্বারা মানব মনের পরিবর্তন সাধন করাই সমাজতন্ত্রবাদের বিজ্ঞানসম্মত পথ।

পুস্তকখানা বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও বিচারের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও লেখকের আন্তরিকতায় পাঠকগণ সাড়া দেবেন।

শরৎ সাহিত্যে নারী চরিত্র—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম এ। ভূমিকা—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রাপ্তিস্থান—বুক স্টাণ্ড, ১।১।১এ বংকিম চাটুর্য্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ২১৫ পৃষ্ঠা—তিন টাকা চার আনা।

আমাদের দেশে সমালোচনা সাহিত্যের অপ্রাচুর্য এখনও বর্তমান। উৎকর্ষমূলক পুস্তক তো বিরল বলিলেই চলে। এরূপ ক্ষেত্রে 'শরৎ সাহিত্যে নারী চরিত্র' সুধীজন মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বিভিন্ন নারী চরিত্রের বিকাশ বিস্ময়কর; বস্তুত, শরৎ সাহিত্য নারী চরিত্রেরই সাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্ষীরোদবাবু শরৎচন্দ্রের প্রধান ও অপ্রধান প্রায় সকল নারী চরিত্রেরই সমালোচনা করিয়াছেন। এই সংস্করণে রাজলক্ষ্মী ও কিরণময়ী সংযোজিত হইয়াছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী নূতন, বিচারবুদ্ধি সূক্ষ্ম ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বইখানি সুধী পাঠক-পাঠিকা ও বি-এ এম-এ ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

দার্জিলিং সাথী—অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার এম, এস-সি প্রণীত। ২য় সংস্করণ, মূল্য ২৷৷০ টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, শ্রীগুরু লাইব্রেরী প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকখানি যে দার্জিলিং সম্বন্ধে কেবল একখানি সাধারণ গাইড পুস্তক তাহা নহে, ইহাতে এতদঞ্চলের পার্বত্য জাতিসমূহের সামাজিক, ঐতিহাসিক, কৃষ্টি এবং দার্জিলিং-হিমালয়ের টপোগ্রাফি (বন্ধুরতা) প্রভৃতি বিষয়ক বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। এ ছাড়া নিকটস্থ পার্বত্য অঞ্চলে 'উড়ো-পাখীদের' (Wonder Vogel—জার্মানীর ভ্রাম্যমান তরুণ দলের) প্রিয় পাহাড়-পর্যটনের কয়েকটি মনোরম বর্ণনাও আছে। মোট কথা বাঙলার উত্তরস্থ হিমালয় সম্বন্ধে বইখানি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রথম সংস্করণের ন্যায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

জাগরণ—শারদীয়া। সম্পাদক শ্রীনিশিকান্ত পাত্র, কুষ্ঠিয়া হইতে প্রকাশিত। দাম ৷৵০। কয়েকটি গল্প, কবিতা ও বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

নন্দিতা—শারদীয়া। সম্পাদক শ্রীব্রজলাল চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ৷৷০। হাওড়া হইতে প্রকাশিত। কয়েকটি গল্প, প্রবন্ধ কবিতা ও একটি নাটকে নন্দিতার পূজো সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

বাঙালী—শারদীয়া। সম্পাদক শ্রীবিশ্বেশ্বর নন্দী এম-এ ও মোঃ সালাহউদ্দিন। মূল্য আট আনা। নানা বিষয়ের বহু প্রবন্ধ ও কয়েকটি গল্প এই সংখ্যাটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত।

১। আনন্দমঠ, ২। কপালকুণ্ডলা—সংক্ষেপিত বংকিম-গ্রন্থমালা, ১, ২ সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য প্রতি খণ্ড এক টাকা।

এই সংক্ষেপিত বংকিম গ্রন্থমালা সম্বন্ধে নানারূপ অনুকূল প্রতিকূল সমালোচনা শোনা যাইতেছে। ইহার প্রতিকূলে প্রধান বক্তব্য, এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পড়িলে কেহ আর মূল গ্রন্থ পড়িবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থমালা প্রকাশের পূর্বে যথেষ্টসংখ্যক লোকে পড়িত কি? বংকিমচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সভা-সমিতিতে আমরা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করি, তাহার রচনা এখন আর সে অনুপাতে পঠিত হয় না, একথা সকলেরই জানা আছে। এই সংস্করণের প্রচার হইলে সে হিসাবে লাভ বই ক্ষতি নাই। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে, সম্পাদক বংকিমচন্দ্রের ভাষাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, গল্পের ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনো কোনো স্থানে নিজে লিখিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সংস্করণ কিশোর পাঠকদের জন্যই অভিপ্রেত (অন্তত তাহাই হওয়া উচিত; তদূর্ধ্ববয়সীরা বংকিমচন্দ্রের মূল রচনাই পড়িবেন এবং পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন, আমরা এই আশা রাখি)—একালেও অনেক বাড়িতে নাটক-নভেল পড়িতে মানা আছে, তাহাদের অভিভাবকেরা হয়ত এই সংক্ষেপিত সংস্করণ পাশ করিবেন—সেটাও একটা লাভ—যদিচ, যে সকল কিশোর-কিশোরী (আমাদের বালক বয়সে যেরূপ হইত) প্রয়োজন হইলে গোপনে, মূল বই পড়িবেন তাঁহারা আরও লাভবান হইবেন।

আশা করি সম্পাদক ও প্রকাশক শীঘ্রই এই গ্রন্থমালাটির প্রকাশ সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিবেন।

মীরা—শ্রীঅপূর্বকুমার চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক হাসি মজুমদার, ১০, দয়াল সোম লেন, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা। মীরা, সেবক, কল্লোল, রাতের কলকাতা, ধার্মিক, এই কয়টি ছোট গল্প লইয়া এই ১২ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানি রচিত।

পূরবী—শারদীয় সংখ্যা। দাম ৷৷৵০ আনা চিত্রশিল্প সম্বন্ধীয় কয়েকটি রচনা, কার্টুন চিত্র এবং চিত্রনটীদের কয়েকখানা ছবি লইয়া এই সংখ্যাখানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

উইলের খেয়াল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

ছয়

এবার সেদিন শ্রীমতী গৌরী সেনের বাড়ি বন্ধু-বান্ধব সম্মিলন হল, তাদের মধ্যে চারটি কুমারী সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছে—চিত্রা, বিচিত্রা, অণিমা এবং গৌরী। কাজেই আনন্দ এবার উদ্দাম।

আরও ক'টা কাণ্ড ঘটেছিল। শ্রীচিত্রা রায় বি-এ যুদ্ধের মাল সরবরাহের আসনে দেড়শত টাকার চাকুরি পেয়েছিল; শ্রীঅণিমা বসু বি-এ লিখিত এক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল অর্চনা মাসিক পত্রিকায়। আর বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকা শ্রীবিচিত্রা মণ্ডলের 'কঙ্কাল' নামক একটি কবিতা 'স্থানাভাব' বশত ফেরত দিয়েছিল।

বান্ধবীদের বিদ্রূপ-বাণ হল বিচিত্রার শরশয্যা।

গৌরী বল্লে—যে চোদ্দ গুণতে হাঁফিয়ে যায় তার পক্ষে কবিতা লেখা বিড়ম্বনা।

যথাসাধ্য বেচারা প্রতিরোধ করছিল তাদের বিদ্রূপের অভিযান। সে বল্লে—ওজনে তুমি যে আমার চেয়ে কম, তা নও।

অণিমা বল্লে—আকাশভরা আলো, বাগান ভরা ফুল আর তার ওপর প্রাণভরা আবেগ থাকতে বিচিত্রা কেন যে 'কঙ্কালটা' বঙ্গলক্ষ্মীকে পাঠালো ভাববার কথা।

বিজয়া বল্লে—ভাই তোমরা বি-এ, আমার বিয়ের কথা হচ্ছে, বুদ্ধিশুদ্ধি কম। তবে একথা মনে হয় যে, বিচিত্রার নামকরণটা হয়েছে ঠিক। ওর কাজ-কর্ম, রুচি-অরুচি একটু বিচিত্র।

এ-চোটটা একটু অধিক হল। চিত্রা আর নিজেকে মৌন রাখতে পারলে না। সে সরকারী কর্মচারিণী, যুদ্ধের আয়োজনের অনুষ্ঠানের একটা যা-হক কিছু।

সে বল্লে—আমি কঙ্কাল পড়েছি। আমার দাদা উকিল। এ কবিতা রাজদ্রোহিতামূলক এবং যুদ্ধের আয়োজন-বিরোধী। তাই ভদ্রভাবে স্থানাভাবের অজুহাতে পত্রিকা কঙ্কাল ফেরত পাঠিয়েছে। বঙ্গলক্ষ্মীই কঙ্কাল ছাপাবার বিশেষ অধিকারী—কারণ তার ক্রোড় আজ কঙ্কালে ভরা।

এর পর বিচিত্রা অভিনন্দিত হল। আইন যাকে রাজদ্রোহ বলে, সমাজ তাকে তা বলে না।

তখন তারা একমত হল যে, বিচিত্রা ভাবী সরোজিনী নাইডু হতে পারে। সবই কালের খেলা।

কিন্তু প্রশংসায় বন্ধুত্বের আসর জমে না। ধনীর বৈঠকখানার সে প্রাণ। শত বিরোধীতার মাঝে মনের মিত্রতা। তাই একাধিক বন্ধু একত্র জুটলেই তর্ক ওঠে। একজন বললে—অণিমা হবে ভবিষ্যতের মেয়ে শরৎচন্দ্র। কারণ ওর গল্পের এক এক স্থানে শরৎবাবুর ভাষা ফুটে উঠেছে। গল্পাংশটা আপাতত সৌরেণ মুখুজ্যের।

অণিমা বল্লে—নকল করার চেয়ে তোষামোদ আর বেশী হতে পারে না। সুতরাং মহাজনের মোসাহেবী করেছি মন্দ কি।

কিন্তু যে লোক রাগে তাকে নিয়ে রঙ্গ চলে না। বিজলী মোটে অণিমার চক্রভেদ গল্পটা পড়ে নি। সে বল্লে—না না অনেক জায়গায় ওর নিজেরও লেখা আছে। অবশ্য তাই মাঝে মাঝে কাশ্মীরী শালে গুণছুঁচের রিপুর দাগ পড়েছে। সেটা ব্যবহার করতে করতে মিলিয়ে যাবে।

অণিমা বল্লে—আমাদের পাড়ায় একজনকে গোঁ বাবু বল্লে চোটে যেত। তাই সেই রকমের একজন লোককে দেখে এক দিন পাড়ার ছেলেরা গোঁ বাবু, গোঁ বাবু বলে চীৎকার করতে লাগলো। ভদ্রলোক ফিরে বল্লেন—ও কথায় চোটব নারে বাবা চোটব না। যদি রাগাতে চাও তো বাড়ি থেকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল আনো। ওরা ভদ্রলোককে জল খাইয়ে মাপ চেয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করলে।

অতঃপর তার হাতে এক গ্লাস ঘোলের সরবত দিয়ে বিজয়া বললে—অণিমা অভদ্র। একটু রাগলে কী আর হতো।

এর পর হাসির হিল্লোল তরঙ্গায়িত হয়ে বহু দূর গেল। সৌজন্যর জন্য রামনবমীবাবু সেদিকে আসছিলেন। কিন্তু হাসির তরঙ্গে তিনি ভেসে গেলেন নিজের ঘরে। আহা! কুমারীরা আনন্দ করছে, তাঁকে দেখলে এখনি গম্ভীর হবে।

চিত্রা একটু অন্যমনস্ক ছিল। অণিমা বললে—যুদ্ধের আয়োজনে চিত্রা গম্ভীর হয়েছে। বোধ হয় বড় সাহেব একটু বাক্য-বাণ ছেড়েছে।

সে বল্লে—আর যা বল কর্ণেল ম্যাগপাই ভদ্রলোক। প্লিজ-টাকনা দিয়ে সব কথা বলে।

বিজলীর দিকে তাকিয়ে শান্তি বল্লে—পোষাক পরিচ্ছদ বোধ হয় ভাল পরে।

বিচিত্রা বল্লে—আর ভিন্ন জাতীয়, যে জিনিসটা প্রেমের দরবারে প্রেয়।

বিজয়া বল্লে—আর নিশ্চয়ই বন্ধু—সেটা শ্রেয়।

কিন্তু চিত্রাও আজ তেল মাখানো মাগুর মাছের মত ফসকে গেল। কারণ সে বল্লে—কর্ণেল ম্যাগপাই শীঘ্রই স্যার হবেন। ওর তরুণী ভার্যা হবে লেডী ম্যাগপাই।

আর এক কিস্তি দুরন্ত হাসির লহর তুলে তারা সভাভঙ্গ করলে। রহিল কেবল চিত্রা।

গৌরী তাকে পিতার পড়বার ঘরে নিয়ে গেল।

এই যে চিত্রা মা। বেশ নূতন সখ তোমার। কাজ নিয়েছে—বল্লেন ব্যবহারজীবী সেন মশায়।

সে বল্লে—সখের জন্য কেরাণীগিরি করতে যাই নি। পেটের দায়ে।

রামনবমীবাবু গম্ভীর হলেন। মেয়েটির মুখের প্রচ্ছন্ন কাতরতা তাঁকে ব্যথিত করলে। কী ব্যাপার। চিত্রা ধীরে ধীরে বল্লে—আমাদের দেশে কিছু বিষয়সম্পত্তি আছে, তার আয় থেকে আমাদের সংসার চলে। এখন খবর পেলাম, দশ বছর পূর্বে বাবা পঁচিশ হাজার টাকা দায় সংযুক্ত করে সম্পত্তি কট কোবালা করে গেছেন। পহেলা জানুয়ারীর মধ্যে টাকা না দিলে, তারা এমন কি ভদ্রাসন বাড়ি অবধি দখল নেবে।

সেন মশায় বল্লেন—তোমার কে আছে?

—মাত্র মা আর এক ভাই—দাদা।

—দাদা কি করেন?

চিত্রা উত্তেজিত না হয়ে বল্লে—তিনি এম এ, বি এল আলীপুরে প্র্যাকটিস করেন। বিশেষ কিছু হয় না।

রামনবমীবাবু স্বয়ং আলীপুরের অ্যাডভোকেট। মাত্র বল্লেন—ওঃ! আচ্ছা টাকাকড়ি কত আছে?

—কিছুই নাই। ওদিকে আমাদের কোন আশা নাই। দুজনে পরিশ্রম করে সংসার চালাবো। কিন্তু মুস্কিল মাকে নিয়ে। তিনি মুখে সাহস—

হ্যাঁ বুঝেছি।—বল্লেন বিচক্ষণ ব্যক্তি।

তার পর বল্লেন—তোমার দাদার আপত্তি হবে আমার সঙ্গে দেখা করতে?

এবার চিত্রা হাসলে—ম্লান হাসি, পিতৃস্থানীয়দের স্নেহ লোট্‌বার হাসি। সে বল্লে—কী বলছেন? দাদা আপনার গর্ব সর্বদা করে। সাহস করে কাছে যেতে

পারে না। আপনি ওদের দলের নবীন উকীলদের আদর্শ। আপনি—

—হ্যাঁ। থাক। হেসে বল্লেন মিঃ সেন। তারপর বল্লেন—কাল যেন সকালে সে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করে।

রামনবমীবাবু প্রফুল্লর মুখ চিনতেন। কারণ সে মুখে ছিল বুদ্ধি এবং নম্রতার ছাপ। অনেক সময় সে পিছনে বসে বড় মামলার সওয়াল জবাব শুনতো। এক এক যুবক বক্তৃতার প্লাট নিত। প্রফুল্ল সে কর্ম কর্ত না। তার ধারণা ছিল বিদ্যার অন্যান্য শাখার মত আইন মানুষের মনকে প্রশস্ত করে না। সে অর্থকরী বিদ্যা। মামলা পেলে নজীর খোঁজা যায়। তার অন্তরাত্মা বলতো, বড় বড় ব্যবহারজীবীরা যেন ভাড়াটিয়া গুণ্ডা। রামের বিষয় শ্যাম অধিকার করলে, যে ক্ষেত্রে মানুষের সহজ বুদ্ধি বলে, শ্যাম দোষী, বারের হোমরা চোমরারা অনেক টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে তর্ক করে যে, আইন এবং নজীরের দৃষ্টিতে শ্যামই লুণ্ঠিত ধনের অধিকারী, রাম কেহ নয়।

রামবাবু বল্লেন—তুমি আইন ভালবাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব বেশী।

চিরকাল যখন অভিনয় করতে হবে, এ অভিনয়ে পাপ নাই, ভেবে রেখেছিল প্রফুল্ল। বিশেষ যখন অন্নচিন্তার সম্মুখে সে সমাসীন।

প্রবীণ বল্লেন, বেশ বেশ। দেখ প্রফুল্ল এই ব্যবসায়, কেবল এই ব্যবসায় কেন, সব ব্যবসায় মানুষ অকৃতকার্য হয়, কারণ তারা নিজের ব্যবসাকে ভালবাসে না।

প্রফুল্ল বল্লে—আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকে ওকালতীর সঙ্গে আলুর চাষ করে।

তার সরলতা রামনবমীকে মুগ্ধ করলে। তিনি বল্লেন—তাতে ওকালতীও হয় বিড়ম্বনা আর আলুও ফলে না গাছে।

প্রফুল্ল মনে মনে বুঝলে প্রসিদ্ধ এডভোকেটের কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা অমনোযোগিতা। কাজেই আলু গাছের কোথায় আলু গজায় সে গবেষণা স্থগিত রেখে বল্লে—আর স্যার আমার মনে হয় যে, পরিশ্রমটা, বিশেষ নবীনদের পক্ষে, একান্ত প্রয়োজন।

এবার আলোচনা পড়েছিল রামনবমীর চিন্তাধারার গন্তব্যপথে।

—মাত্র নবীনদের পক্ষে? নবীন, প্রবীণ সবার পক্ষে। আজ এক হাইকোর্ট এক নজীর দিলে অন্য হাইকোর্ট একেবারে উল্টো রায় দিলে। তাদের দুজনকে উল্টে পাল্টে প্রিভিকাউন্সিল একবারে ন'কড়া ছ'কড়া করলে। আজকাল আবার ফেডারেল কোর্ট। সমস্ত আপ-টু-ডেট রুলিঙ কি মেহনত না করলে আয়ত্ত হয়?

এ-সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব প্রফুল্ল বিদিত। কিন্তু তাদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তার স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। সে দেখতো বড় বড় নথিপত্র থেকে দলিল দস্তাবেজ, সাক্ষীর কথা আর তাদের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিয়ে উকীলরা ভীষণ আন্দোলন করে।

সে ভরসা করে বল্লে—আর স্যার ফ্যাক্ট। দলিলের এবং সাক্ষ্যের বাক্যের ঐক্য—

—বাস বাস, তুমি পারবে। তুমি মোকদ্দমা বুঝেছ। কাল থেকে প্রত্যহ সাতটার সময় এখানে আসবে।

কৃতজ্ঞ প্রফুল্ল বল্লে—যে আজ্ঞে।

সাত

অফিস অফ্ ডাইরেকটারেট অফ ওয়ার মেটিরিয়ালসের এক শাখায় শ্রীমতী চিত্রা মাত্র কেরাণী। নূতন অফিস, কার্যক্রম শৃঙ্খলিত হয়নি। বহু কর্মী, কিন্তু নিজ নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে কারও কোন স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। বাঙালীর সংখ্যা অতি অল্প। কুলোকে সেই সংখ্যালঘুতা সম্বন্ধে বহু কু-কথা বলতো। কেহ বলতো বাঙালী সরকারের বিশ্বাস হারিয়েছে, তাই মাত্র অতি হীনপদ ব্যতীত অন্য পদ লাভ কর্তনা। কেহ বলত অ-বাঙালীর একজন কোন দায়িত্বপূর্ণ চাকুরী পেলে, সুর সুর করে তার দেশের লোক অফিসে প্রবেশ করে। উচ্চপদে একজন ব্যতীত সব বিদেশী। আড়াই শত টাকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে মাত্র একজন ছিল বাঙালী। অফিসে মহিলা ছিল সাতজন—ছ'জন ফিরিঙ্গী, একজন বাঙালী।

চিত্রার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল মিঃ আয়ার। অফিসের অফিসার একজন প্রৌঢ় সাহেব, সি হেসিং। এই শ্রেণীর ৬ জন সাহেবের উপর কর্ণেল ম্যাগপাই।

চিত্রার কাজ আয়ারের সঙ্গে। সে তাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিত। ভুল হলে দেখিয়ে দিত। দোষের মধ্যে ছিল এক একবার বলত—মাদ্রাজীরা খুব ভালো কাজ করে। বাঙালীরা কর্মবিমুখ।

একদিন চিত্রা বল্লে—মিঃ আয়ার আপনি জানেন আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে পারব না, কারণ এটা অফিস। আপনার পদ বড়। আপনি আমার ভায়ের সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা করবেন? তা হলে মাদ্রাজী প্রতিভার বিচার হবে।

আয়ার তার মুখের দিকে তাকালো। বল্লে—আপনি রাগ করছেন কেন?

—আপনার উপর দরদ ক'রে।

তার সুর বদলে দিল—সে বল্লে, আমার উপর দরদ করে?

—হ্যাঁ। শিক্ষিত লোকের কাপুরুষতা অশোভন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে হেসিঙ্ সাহেব সব কথা শুনেছিল।

এর পর আয়ারের আচরণ পরিবর্তিত হল বাহিরে। সে তাকে কোন শিক্ষা দেয় না, মুখে কিছু রূঢ় কথা বলে না।

চিত্রা কলেজে ছাত্রদের দেখেছে, একত্র পড়েনি। তেমন অনেক বাঙালীর ছেলে এ দপ্তরে কাজ কর্ত। চিত্রা তাদের সঙ্গে মেশে না। কার্য গতিকে কারও সম্পর্কে এলে তারা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করে কথা কয়।

এই রকম করে দুমাস কাটলো। আগস্টের শেষভাগে এক কাণ্ড হল যার ফলে অনেক কিছু নূতন রকমের ব্যাপার ঘটলো।

মেসোপোটেমিয়া ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে কিছু দ্রব্য চেয়ে পাঠিয়েছিল। সে অনুরোধ এসেছিল আগস্টের দোসরা। চিত্রার অফিস ঠিক করে কত দামে মাল কেনা হবে কার কাছে কেনা হবে। বিভাগের খবর যথা কি অযথা এ বিচার করে প্রতি বিভাগের সংলগ্ন ফিনানসিয়াল এডভাইজার। হেসিঙ্ সাহেব এই মাল সম্পর্কে দুজন কণ্ট্রাক্টরের দর এবং কত দিনে মাল দিতে পারবে, সে সব বিচার করে খরচের একটা এষ্টিমেট করেছিলেন। আর্থিক পরামর্শদাতা মিঃ মুদালিয়ার সে খরচের হার অধিক বলে নির্দেশ করেছিলেন। মেজর হেসিঙ্ সে কথায় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রস্তাব পুনর্বিচার করবার জন্য আর্থিক পরামর্শদাতার নিকট আবার ফাইল পাঠানো হয়েছিল। মিঃ মুদালিয়ার আবার লিখলেন যে, নিশ্চয়ই চেষ্টা করলে আরও কতক মাল পাওয়া যাবে।

আগস্টের শেষে ফাইল ফেরত এলো। পহেলা অক্টোবর বোম্বাই হতে জাহাজ ছাড়বে। তার মধ্যে কণ্ট্রাক্টার মাল তৈরী করবে। ইছাপুর তাকে পরীক্ষা করবে পঁচিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রেলগাড়িতে মাল তুলতে হবে। বড় বড় কণ্ট্রাক্টররা বলেছে, অন্ততঃ এক মাসের সময় চাই। মল্লিক কোম্পানী নামক এক কণ্ট্রাক্টর পনেরো দিনে মাল সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু তাদের দাম বেশী। ত্রিশ হাজার টাকার মালে প্রায় দু' হাজার টাকা অধিক লাগবে।

চিত্রার হাতে এলো ফাইল। তার কাজ সব কথা সংক্ষেপে লিখে সাহেবের কাছে পাঠানো। সে ফাইলের উপর লিখলে আর্থিক পরামর্শদাতার সমালোচনার ফলে, মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট হয়েছে। সময়ে মাল পাঠাতে গেলে, এখনি মল্লিক কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া আবশ্যক। তাতে গভর্নমেণ্টের দু'হাজার টাকা অধিক যাবে।

বলা বাহুল্য, এ ফাইল মুদালিয়ারের কাছেই যাবে। সে নিশ্চয় লিখবে দোষ হেসিঙের। তার ওপর কেরাণীর এ মন্তব্য শেষোক্ত ব্যক্তি পছন্দ করবে না। ফলে চিত্রার যা হক কিছু হবে। অন্য সময় হলে আয়ার তাকে সাবধান করে দিয়ে নোটটা পরিবর্তন করাত। সে অমনই ফাইল পাঠিয়ে দিলে হেসিঙের কাছে।

হেসিঙের প্রথমটা লাগলো ভাল। তারপর বুঝলে কুরুক্ষেত্র বাধবে। মুদালিয়ার তার

ওপর দোষ চাপাবে, টাকা দেবে না। পরে ব্যাপারটা দিল্লী যাবে, মেসোপোটেমিয়া মাল পাবে না। আয়ারের ডাক পড়লো।

সে দোষ চাপালে চিত্রার ঘাড়ে, একটু আভাস দিলে যে বাঙালী ঠিকাদারকে কাজটা পাওয়াবার জন্য মহিলা কেরাণী এমন কথা লিখেছে।

—তাকে ডেকে আনো।

নির্ভীক চিত্রা সশ্রদ্ধভাবে এসে সাহেবকে অভিবাদন কল্লে।

টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে আয়ার।

সাহেব বল্লে—এ মন্তব্য তোমার, মিস?

—হ্যাঁ স্যার।

—এতে মিঃ মুদালিয়ারের অসম্মান হতে পারে। তিনি এ অফিসের এক বিভাগের কর্তা।

চিত্রা অপ্রস্তুত হল। সে বল্লে—আজ্ঞে আমি সে দৃষ্টি ভঙ্গিতে ব্যাপারটা দেখিনি। সত্যের খাতিরে লিখেছিলাম। আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করুন।

সুন্দর চেহারা। স্পষ্ট স্পষ্ট ইংরাজি কয়। শ্রদ্ধাবতী। ভালো মেয়ে।

সাহেব মনে মনে তার চরিত্র বিচার করলে। বল্লে—তুমি মল্লিক কোম্পানীকে চেনো।

—ওদের অনেক কোটেসান পাই। কবার কাজও করেছে।

সাহেব বল্লে—ওরা বাঙালী।

চিত্রা আপন মনে বল্লে—মল্লিক! মল্লিক! বি বি মল্লিক। তার পর সাহেবকে বল্লে—হ্যাঁ স্যার বোধ হয় বাঙালী। ঠিকানা পাইকপাড়া বাঙালী পাড়া। হ্যাঁ বাঙালী নিশ্চয়।

সাহেব তাকে লক্ষ্য করছিল। বুদ্ধিমতী মহিলা। তারপর বল্লে—বাঙালী বলে তুমি তাকে এ কাজটা দিতে চাইছ।

কপাল কুঁচকে চিত্রা বল্লে—বাঙালী বলে কাজ দিচ্ছি? কাজ তো সরকারী—সেখানে পারদর্শিতা এবং ব্যয় সংক্ষেপ মাত্র বিবেচ্য। আমি কাজ দেবার কে? কাজ তো দেবেন আপনি। আমি ক্ষুদ্র কেরাণী।

সাহেব আয়ারের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—মিঃ আয়ার তোমার উচিত ছিল মিস রায়ের মন্তব্য দেখে দেওয়া। ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়।

মিঃ আয়ার একদিকে মাথা নেড়ে বল্লে—নো স্যার। আবার তখুনি দুদিকে মাথা নেড়ে বল্লে—ইয়েস স্যার।

সাহেব বল্লে—আমি অফিসে প্রাদেশিকতা চাইনা, আর কাপুরুষতা।

সাহেব হেসে চিত্রাকে বল্লে—ওপরটা কেটে দাও। মাত্র লেখো আর সময় নাই, অর্ডার মল্লিক কোম্পানীকে দেওয়া হক।

চিত্রা বল্লে—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমার অভিজ্ঞতার অভাব।

সাহেব বল্লে—অভিজ্ঞতায় কি শিখবে জান মিস্ রায়—সত্য গোপন করতে। গুড আফ্‌টারনুন।

সাত দিন বাদে আবার চিত্রার ডাক পড়লো হেসিঙের ঘরে।

সে বল্লে—বড়সাহেব তোমায় ডাকচেন। ভয় কোরচে?

চিত্রা বললে—একটু নার্ভাসনেস হচ্চে।

সাহেব বল্লে—তিনি জানতে চান তুমি সত্য ভুলতে পারবে কিনা।

তার নার্ভাসনেস বাড়লো। এ আবার কি পরীক্ষা।

শ্রীমান প্রফুল্লকুমার রায় এম এ, বি এল এখন ভিন্ন মানুষ। সে ভোরে উঠে যায়, প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুত রামনবমী সেন মশায়ের বাড়ি। তাঁর সুবৃহৎ পুস্তকালয়ে বসে আইন অধ্যয়ন করে। তার মোটা মোটা কাগজের নথি পড়ে তাদের সারাংশ লেখে। যখন রামনবমীবাবু মক্কেলদের সঙ্গে বা অন্য উকীলদের সঙ্গে আলোচনা করেন, সে মন দিয়ে সকল কথা শোনে। সে এক বৎসর আলীপুরে যাওয়া আসা করে কিছুই শেখেনি। কিন্তু জমি তৈরী হচ্ছিল তা বোঝেনি। তার উপর আগ্রহ। আজ দু মাসে সে ভিন্ন মানুষ।

দুপুরে সে কোর্টে যায়। রামনবমীবাবুর সকল মামলায় বসে, তাঁর সহকারিতা করে। অপ্রত্যক্ষভাবে তার পকেটে অর্থ আসে। কাজ শেখাটাকেই সে বড় ভাবে।

একদিন এক বড় মামলা জিতে এসে মিঃ সেন বল্লেন—এ মামলা জিতলাম প্রফুল্লর জন্য, সমস্ত আইনটা ও বেচারা খুঁজে বার করেছিল।

তার ফলে প্রফুল্ল উৎফুল্ল হল। কিন্তু তার সমবয়সী উকীলরা তার কাছে দশ টাকা আদায় করে মিষ্টিমুখ করলে।

দু' মাসে মেয়ে মার হাতে তিন শত টাকা এনে দিলে, ছেলে এনে দিলে প্রায় দুশো টাকা। প্রকাশ্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু রাত্রে ভেঙ্গে পড়লেন।

এই দু' মাসে তাদের জননীরও বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল; এ সত্য তারা উপেক্ষা করতে পারলে না। তিনি অধিকাংশ সময় পূজার ঘরে থাকতেন। বার ব্রতর উপবাসের হাঙ্গামা বেড়েছিল। প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের মাথায় হাত বুলোতেন। তাদের সামনে সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। কিন্তু দেহের দেবতা ভণ্ডামীর উপচার গ্রাহ্য করলে না। তিনি দিন দিন কৃশ হতে কৃশতর হলেন।

একদিন তাঁর গলা ধরে চিত্রা বল্লে—মা এসব হাড়গুলো ত্যো আগে তোমার ছিল না।

মা বল্লেন—সরকারী অফিস এই বিদ্যেতে এ মাস হতে এক শ' টাকা মাহিনা বাড়াবে? হাড় না থাকলে দেহ হয়?

মেয়ে বল্লে—মানে হাড়গুলো মাংসে ঢাকা ছিল। সে মাংসগুলো কোথায় গেল?

যিনি দিয়েছিলেন তিনি নিয়েছেন।

চিত্রা বল্লে—তিনি এখন দান করা জিনিস ফিরে নিলেন কেন?

মা বল্লেন—অন্যের মনের কথা আমি কি করে বলব চিতলু। বাজে কথা বকিস নি। বড়সাহেব কি বলে মাহিনা বাড়িয়ে দিল বল।

চিত্রা বল্লে—আমরা যে বড় হয়েছি মা। তুমি তো আমাদের সরিয়ে রেখে মানুষ করনি মা। আমরা বুঝি কিন্তু যা অনিবার্য—

মা তার মুখখানি তুলে ধরলেন। বল্লেন—অনিবার্য। তাঁর মেয়ে পেটের দায়ে চাকুরি করছিস্। সেও তো অনিবার্য চিতলু।

—তবে লেখাপড়া শিখিয়েছিলে কেন? স্বাধীন হব বলে তো। আরও তো তিন মাস আছে। ভাগ্যচক্র কোনদিকে ফিরবে কে বলতে পারে?

মার বাঁধ ভাঙ্গলো। বল্লেন—ভাগ্যচক্র! চাকা পাঁকে পোড়েছে মা এই অভাগিনীর পাপে। পাশ করিয়েছিলাম কি পেটের দায়ে? তুই যদি পঁচিশ টাকা দক্ষিণা নিয়ে মেয়ে স্কুলের শিক্ষক হতিস, আমি তোরই পয়সায় দেবতার প্রসাদ খেতাম। এ অন্ন যে আমার বিষের লাড়ু মা। তাঁর মেয়ে চাকুরী করছে, এই পোড়া পেট ভরাবার জন্য। হা! কৃষ্ণ।

আট

সেদিন অনেক বিলম্ব হল কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে।

রামবাবু বল্লেন—প্রফুল্ল এখানে খেয়ে যাও।

সে বল্লে—আমার মা আর বোন অপেক্ষা করে বসে থাকবেন। এ বিষয়ে চিত্রাও একটু সেকেলে।

উকীল হাসলেন। বল্লেন—তোমার জন্য রোজ আমি ধকুনি খাই। তুমি বাড়ি যাও আর উনি বলেন—যা তা বলেন। আজ মনে পড়লো। আচ্ছা কাল শনিবার এখানে খাবে বল।

—নিশ্চয়।

—আর চিত্রা মাকে আসতে হবে। চিঠি দোব?

প্রফুল্ল বল্লে—বিলক্ষণ। এখানে খাবে তার আবার চিঠি কি? একটা ভালো হল—এবার আর বাড়ি গিয়ে জাঁক দেখাতে পারবে না।

পরদিনের ভোজে বিজয়া ছিল। বিজয়া গৌরীর মাসতুতো বোন। মেয়েটি হাস্যমুখ, রসিকা এবং সুন্দরী।

গৌরী ও বিজয়া প্রফুল্লর সঙ্গে এদিনের পূর্বে বাক্যালাপ করেনি। আজ তাকে পেয়ে তাদের আনন্দ হল।

বিজয়া বল্লে—মিঃ রায়, আপনার বোন চিত্রা আমাদের বন্ধু। আপনি এতদিন এ বাড়িতে আসেন দয়া করে, লুকিয়ে থাকেন কেন?

সে বল্লে—লুকিয়ে থাকি মিস ঘোষ? মোটেই নয়। আমার অবস্থাটা বিসর্গের মত। সে আশ্রয় স্থান ভাগী কিন্তু লুকিয়ে থাকে না।

চিত্রা অগ্রজের পক্ষ নিয়ে বল্লে—তবে বিসর্গ নিজে উচ্চারণ হয় না, অন্যের উচ্চারণ এবং মাত্রা গতি নির্ণয় করে। আর মাঝে মাঝে কলেবর বদলে শ, স হয়।

গৌরী বল্লে—এক জায়গায় নিজের প্রাণ দিয়ে তালব্য শ হয় জানি। কিন্তু সেটা করে স্ত্রী জাতির চরিত্রর চাপে। যেমন স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম।

এবার বিজয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বল্লে—কেহ এলে নিশ্চয় বলবে এটা পাগলা গারদ। লোকগুলো যাতা বকবে।

গৌরী বল্লে—কথাটা কেন উঠলো আর তার কি অর্থ সে পাগলামী—মানে—মাপ করবেন মিঃ রায়—

মিঃ রায় বল্লেন—মোটেই নয়।

বিজয়া বল্লে—মোটেই মাপ করবেন না? এ অন্যায় কথা। ক্ষমা মহতের ধর্ম।

চিত্রা বল্লে—তা হলে কি আমার দাদা মহৎ নয়?

ঠিক সেই সময় সেন গৃহিনী এলেন।

তিনি ভাইবোনকে সরল অনাড়ম্বর আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করলেন। তাঁর এক পুত্র এক কন্যা। পুত্র বিলাতে বিদ্যালাভ করে দিল্লীতে বড় কাজ পেয়েছিল। পূজার ছুটিতে তাঁরা এলাহাবাদ যাবেন। সেখানে পুত্র বদলি হয়েছে।

আহারান্তে আবার একবার রহস্য বিদ্রূপ আরম্ভ হল, কারণ রামবাবু ও প্রফুল্ল কাজ করতে গেলেন এবং চিত্রা-জননীও কর্মান্তরে মনোনিবেশ করলেন।

প্রফুল্লর সমালোচনা হল।

গৌরী বল্লে—চিত্রার দাদা লজ্জাশীলা মহিলার মত অধিকাংশ সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিজয়া বল্লে—কিন্তু ওরই মধ্যে এদিক ওদিক দেখে, যখন সকলে অন্যদিকে তাকায়, উনি গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নেন।

গৌরী বল্লে—ঠিক উল্টা কথা। আমি অন্তত ছবার দেখেছি, প্রফুল্লবাবু তৃষিত চকোরের মত বিজয়ার মুখ-চন্দ্র পান করছেন।

বিজয়া রসিকা। তার সহজ স্ফূর্তি সকলকে আনন্দিত করে। সে বল্লে—মাত্র প্রফুল্ল কেন ভাই, এমন কোন যুবক এমন কি বৃদ্ধ দেখিনি যে আমার রূপে মুগ্ধ না হয়। আমি সেদিন সিনেমায় গিয়েছিলাম যেমনি আলো জ্বললো সকল আঁখি কার-দিকে তাকিয়েছিল বল দেখি?

চিত্রা বল্লে—শ্রীমতী বিজয়া ঘোষের পদ্ম আঁখির দিকে।

গৌরী বল্লে—একটু ভুল হল। যুবারা ওর দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু বৃদ্ধদের সর্বজনীন লক্ষ্য ছিল—শ্রীমতী চিত্রা রায়ের বাঁশরী নাকের ডগা।

চিত্রা বল্লে—তবু আমি বড় চাকুরী পাওয়ার গল্প বলিনি।

অতএব গল্প পৌঁছিল যুদ্ধের মাল সরবরাহ দপ্তরে। সে মাদ্রাজী কেরাণীর বাঙালী বিদ্বেষের গল্পর শেষে হেসিঙ্ সন্দর্শন বার্তা গ্রামোফোনের মত তাদের শোনালে। তারপর কেমন করে হেসিঙ তাকে কর্ণেল ম্যাগপাইর সম্মুখে নিয়ে গেল, পথে তার কি রকম ভয় হচ্ছিল, সে সব কথার পর বল্লে—বড় সাহেবের কাঁচা পাকা গোঁপ, তেমনি মোটা ভ্রূ, নীল চোখ। আমার দিকে তাকিয়েই হাতের কাগজের দিকে তাকালে। মুখের কোণে মোটা পাইপ। কাজেই দাঁতে দাঁত দিয়ে বল্লে—দ্যাঁ হেসিঙ এই বালিকা।

হেসিঙ বল্লে—ইয়েস স্যার।

সটান আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—তুমি মল্লিককে জানো?

আবার সেই মল্লিক! সে বিজলী ঘণ্টার সুইস টিপলে। পাঠান জমাদার এলে তাকে বল্লে—মল্লিকবাবু।

জমাদার একটি যুবককে নিয়ে এলো। হাতকাটা সার্ট, ধবধবে পেণ্টুলান পরা। আমাকে কর্ণেল বল্লেন—এই মল্লিকবাবু। বাবু মিস রায়ের সুপারিশে তুমি সে অর্ডারটা পেয়েছিলে।

মল্লিক আমাকে অসভ্যর মত দেখলে। তারপর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বল্লে—আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

তাকে বাহিরে বসতে বলে, সাহেব বল্লে—তোমার নামে উড়ো চিঠির নালিশ হয়েছে যে, তুমি ওর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছ।

আমার মুখের কি রকম চেহারা হয়েছিল জানি না। কিন্তু একটা মহা ঘৃণা আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি বল্লাম—ভগবান জানেন, জীবনে ঐ লোকটিকে এই প্রথম দেখলাম। মিথ্যা—

কর্ণেল হেসে হাত তুলে বল্লে—বাস্ বাস্ বাস। উত্তেজিত হয়োনা।

আমি নিজেকে শান্ত রাখতে পারলাম না। বল্লাম—আমি এ অফিসে কে? মাত্র কেরাণী।

এবার হেসিঙ আমার কাঁধে হাত দিলে। চোখ টিপে ইসারা করলে আসতে। আমি বল্লাম—ক্ষমা করুন। আমি জোরে কথা কয়েছি।

কর্নেল বল্লে—হেসিঙ, এ মেয়েকে আয়ারের তাঁবে রেখোনা। আমার যে নূতন সেক্সন হচ্ছে, তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হবে মিস রায়। ওকে বুঝিয়ে দাও সে অফিসের কোন কথাও চুপি চুপি ওর বেড়ালকেও বলবে না।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে—এই হবে। মিস্ রায়। তোমার নোট আমাদের মান বাঁচিয়েছে। ঐ মল্লিক লোকটা খুব যত্ন করে অল্প সময়ের মধ্যে সে অর্ডার মত মাল দিয়েছে।

আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিলাম। সে কাগজের দিকে চেয়ে বল্লে—এখন তুমি হাসছ। অল রাইট্। খুব মন দেবে কাজে।

পথে হেসিঙ বল্লে—বুড়ো খ্যাকশেয়ালের তোমার মত একটা মেয়ে আছে। ওকে খুসী রেখো। যখন কিছু দরকার হবে আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো।

সব শুনে বিজলী বল্লে—কে ওসমান আর কে জগৎসিংহ।

গৌরী বল্লে—থেলমার বুড়ো প্রেমিক থেলমার মেয়েকে বিয়ে করেছিল।

নয়

ট্রামে ভীষণ ভীড়। আগস্টের হাঙ্গামায় কতকগুলো লোক ট্রাম গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে গভর্নমেণ্ট পেট্রোল বিক্রী নিয়ন্ত্রণ করেছে। যারা বিশ বৎসর ট্রামে চড়েনি, তারাও কাছারী বা কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করছে ট্রাম গাড়িতে। লাল-দীঘির ধারে না আসতে আসতে ট্রাম ভর্তি হয়। কারণ লোকে লালবাজার থেকে আগন্তুক গাড়িতে চড়ে ফিরে যাবার জন্য।

চিত্রা থাকে শ্যামবাজার। তাকে নিত্যই ট্রামের জন্য কষ্ট পেতে হয়। লোকে ট্রামের পাদানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এক দল গাড়ির লোহা ধরে নিজেদের স্থির রাখে, এক দল আবার তাদের কোমর ধরে দাঁড়ায়। মহিলা দেখলে তারা স্থান দেয়; কিন্তু ভিতর যদি নূতন দেশলায়ের বাক্সর মত ঠাসা থাকে, তার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা বৃথা।

সেদিন চিত্রা এবং তারই অফিসের এল্সী মোড়ে অপেক্ষা করছিল। দু'খানা গাড়ি চলে গেল, তারা স্থান পেলে না। এল্সী বৌবাজারে থাকে। সে বল্লে—আমি একটু পরিষ্কার পোষাকপরা বাবু দেখলে তার কাঁধ ধরে চলে যাব। যথেষ্ট ক্ষুধা পেয়েছে। তুমিও চল না।

চিত্রা বল্লে—আমার ক্ষিধে পায়নি। আর এলসী তোমার মত আমি বাস্কেট বল খেলিনি।

সত্যই এলসী লাফিয়ে ছোট আদালতের এক উকীলের কাঁধ ধরলে। বেচারা ভয়ে নেমে পড়লো, এলসী তার পরিত্যক্ত স্থানে রেলিঙ্ ধরে দাঁড়িয়ে বল্লে—বাই বাই চিট্রা।

চিত্রা হাসলে। উকীল বেচারা পথে দাঁড়িয়ে অনাথ বালকের মত চারিদিকে তাকালে। সকল মুখেই দেখলে, আমাদের

হাসি। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। যাবার সময় চিত্রার কানের চাকার মত মাকড়ি এবং হাতের সাড়ির রঙের ভ্যানিটি ব্যাগের মনে মনে মুণ্ডপাত করলে।

ঠিক সেই সময় এক সপ্রশ্ন যুবক এসে চিত্রাকে নমস্কার করলে। জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কোথায় থাকেন মিস রায়?

চিত্রা তাকে দেখলে—সাদা প্যাণ্ট, হাত-কাটা সার্ট, প্রসন্ন গোল মুখ, উজ্জ্বল চোখ। ওঃ! মল্লিক কোম্পানীর বীরেন্দ্র মল্লিক।

চিত্রা বল্লে—ওঃ! শ্যামবাজার।

মল্লিক বল্লে—আমি থাকি টালায়। যদি আপত্তি না থাকে, আমার গাড়িতে—

চিত্রা বল্লে—না থাক।

সে বল্লে—এখন তো আর আমার কাজ আপনার সেক্‌শনে নাই। আর ও মাদ্রাজীটাও জব্দ হয়েছে। বদনাম দেবে না।

বদনাম! চিত্রা রায় বদনামের ভয় করে না। সে নির্ভীকতা প্রতিপন্ন করবার জন্য বল্লে—বেশ চলুন।

চিত্রা ফোর্ডের ভিতরে বসলো। নিজে চালাচ্ছিল মল্লিক। রাইটারস বিল্ডিংয়ের সামনে পেঁছাবা মাত্র বৃষ্টি এলো।

চিত্রা বল্লে—আপনার গাড়িতে না এলে জলে ভিজতাম।

বীরেন্দ্র একটু অমায়িকভাবে হাসলে। কিছু বল্লে না।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে চিত্রা বল্লে—আমি এইখানে নামব।

গাড়ি থামিয়ে মল্লিক জিজ্ঞাসা করলে—কোন বাড়িটা?

—পাশের রাস্তায়। এটুকু আমি হেঁটে যাব। বৃষ্টি ছেড়ে গেছে।

মল্লিক বল্লে—বিলক্ষণ। আপনি দয়া করে আমার সংগে এলেন, আর আমি পথের মাঝে আপনাকে নামিয়ে দোব।

চিত্রা কিছু বল্লে না। হাত দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলে। বিভূতি বাড়ির সম্মুখে নেমে গাড়ি খুলে দিলে।

তার অগ্রজের নাম ছিল বাড়ির দরজায় পাথরে খোদা। ঠিক সেই সময় কাছারী থেকে ফিরে এলো প্রফুল্ল। তাদের পরিচয় করে দিয়ে চিত্রা গৃহে প্রবেশ করলে।

মল্লিক বল্লে—আপনি আলীপুরে যান? আমার দুটো মামলা করতে হবে—চুক্তি ভাঙ্গার।

প্রফুল্ল বল্লে—আমি আলীপুরেই যাই। আমি মিঃ রামনবমী সেনের জুনিয়ার।

শেষ কথা কটা উচ্চারণ করতে প্রফুল্ল একটু গর্ব বোধ করতো।

মল্লিক অভিভূত হল। সে রবিবারে কাগজপত্র নিয়ে আসবে বলে বিদায় নিলে।

ছেলেমেয়ের আগমন প্রতীক্ষা করে জননী জানালার ধারে বসে থাকতেন। তিনি দেখলেন, একটা নধর চেহারা যুবকের মোটর গাড়ি হতে কন্যা নামলো। এতে মন্দ কিছু নাই। কিন্তু পারিবারিক যশ এমন সব কাজে মলিন হয়। কোন অসুর ধীরে ধীরে যেন বিধবার মুখের সামনে দিনের পর দিন বিষপাত্র ধরে চোখ রাঙিয়ে বলছিল—পান কর। বিধবা অনন্যোপায়। কিন্তু দেহের প্রদাহ অপেক্ষা মনের জ্বালা বিরাট। তিনি পরলোকগত পতির নির্দেশে নবীন যুগের একটা বিধান মেনেছিলেন—কন্যার উচ্চশিক্ষা। কিন্তু সে বিধানের অনিবার্য পরিণাম তাঁর স্থিতিশীল মন বিচার করেনি।

দশ

রামনবমীবাবু আশ্চর্য হলেন যুবক প্রফুল্লকুমারের কর্মে অনুরাগ দেখে। সে তাঁর সকল মামলার নথিপত্র গুছিয়ে রাখে, তাদের সারাংশ লেখে, মামলা সংক্রান্ত নজির খুঁজে বার করে। তাতে রামবাবুর যথেষ্ট উপকার হয়। তিনি কোন কেস অন্য জুনিয়ার না থাকলে নিতেন না। কিন্তু একজন ঘরের সহকারী থাকলে প্রবীণের শ্রম লঘু হয়। কাজেই প্রফুল্লর মূল্য দিন দিন বাড়ছিল সেন মশায়ের দৃষ্টিতে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রামনবমীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—প্রফুল্ল পূজার ছুটিতে তুমি কি করবে?

সে বল্লে—যতদূর পারি মার কাছে থাকব আর মনে করছি ফৌজদারী আদালতে যাব, কারণ ওদিকটা মোটেই এগুচ্চে না।

রামবাবু কিছু বল্লেন না। প্রফুল্ল বল্লে—পূজার ছুটির পর তো নিশ্চিন্তপুরের রাজাদের মামলা উঠবে। আপনাকেও বোধ হয় ছুটীর মধ্যে কাজ করতে হবে।

—ইচ্ছা তো ছিল না। তবে উপায়ও নাই। আমি তাদের বলেছি। ও-মামলায় তুমিও থাকবে।

এক অনির্বচনীয় সুখ অনুভব করলে প্রফুল্লকুমার। ও-মামলার সংগে নামটা জড়ানো থাকলে, ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল। আর কলিকাতার বড় বড় উকীল কৌন্‌সুলী সবাই কোন না কোন পক্ষে থাকবে। ইংরাজি প্রথায় থ্যাঙ্ক ইউ বলতে পারলে না প্রফুল্ল। অথচ কৃতজ্ঞতা না জানানোও অন্যায়। কাজেই সে সরলভাবে বল্লে—এ সৌভাগ্যের জন্য আমার বন্ধু বান্ধবেরা কিছু খেতে চাইবে। সত্যি আপনার কাছে আসবার আগে আমি এ ব্যবসাটা যে কি তা জানবারও অবসর পাইনি।

ওসব কথা শোনবার বা বোঝবার অবকাশ নাই শ্রীরামনবমী সেন মশায়ের। নিজের খেয়ালে তিনি বল্লেন—ওরা কাগজ পড়বার জন্য তোমাকে দুশো টাকা দেবে। আমার সংগে এলাহাবাদ যেতে পারলে ভাল হয়। তারও ভাড়া রাজারা দেবে। বোধ হয় ওখানেও ডাঃ সেনের সংগে পরামর্শ করতে হবে। তোমার কি যাবার সুবিধা হবে না?

সে বল্লে—নিশ্চয় হবে। কাজে আমার মা উৎসাহ দেন প্রাণ থেকে।

প্রফুল্ল স্ব-শ্রেণীর ব্যবহারজীবীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। তার ব্যবসা জীবনের ভালো মন্দ মাপবার মাত্র একটা পরিমাপ ছিল—তার সমবয়সীরা ঘটনাটা কি চক্ষে দেখবে। তারা যখন নিজ নিজ রুচি অনুসারে কেহ তাকে অভিনন্দিত করলে, কেহ চোখের চাহনীতে প্রাণের ঈর্ষা প্রকট করলে, প্রফুল্ল তুষ্ট হল। সত্যই তো এমন অবকাশ মেলে কজনের।

সে গৃহে ফিরে জননী ও ভগ্নীকে নিজের সৌভাগ্যের কথা অবগত করলে।

প্রফুল্ল-জননীর মনে পুত্র কন্যার অভ্যুদয়ের প্রতিক্রিয়া এখন একই ভাবধারা বহাতো। জগদীশ্বরের চরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন আর তাঁর স্বর্গত স্বামীর কল্পিত রূপ দর্শন মনের চোখে। তাঁর হাতের রোপিত গাছে সুফল ফলছে, এ সত্য স্বামীকে না জানিয়ে তাঁর পক্ষে জল স্পর্শও অসম্ভব। কিন্তু এ রকম উৎসবের দিনে বিধবা নিজের কথা বিস্মৃত হতেন। স্বামীর রোপিত বৃক্ষে তাঁর হাতের জল না পড়লে গাছ শুকিয়ে যেত এ সত্যকে তিনি মনের ত্রিসীমায় উঁকি মারতে দিতেন না।

চিত্রা আনন্দ গোপন করে বল্লে—আমিও ইচ্ছা করলে দিল্লী যেতে পারি।

অগ্রজ বুঝলে তার মনোভাব। সুখের দিনে কোঁদল করা তাদের স্বভাব। সুতরাং সে বল্লে—আমি পরে এই কেস নিয়ে দিল্লী তো যাবই, পরে প্রিভিকৌন্‌সিলের আপীলের সময় বিলাত যাব।

জননী যখন গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন, চিত্রা বল্লে—বিলেত থেকে আসবার সময় একটা দাসী বিয়ে করে নিয়ে এসো।

কিন্তু অবশেষে যেদিন প্রফুল্ল এলাহাবাদ যাত্রা করলে চিত্রা আপনাকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে করলে। (ক্রমশ)

অনুবাদ সাহিত্য

জামা কাপড়

আল্‌ফা অব্‌ দি প্লাউ

এই যুদ্ধটা একটা ব্যাপারে আমাদের বেশ নিশ্চিন্ত করে তুলেছে। এখন আর রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে জামাকাপড় করানোর কথা ভাবতে হয় না। অবশ্য এখনো অনেকে ওসব ভাবতে ভালইবাসেন। তাঁরা অনেকটা কাপড়ের দোকানের পুতুলগুলোর মত। নানান ফ্যাশনের সব জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ান। আর মুখে খালি ওই এক কাপড়ের কথাই লেগে রয়েছে। ও ছাড়া অন্য কথা উঠলেই তাঁরা চুপ মেরে যান। কোন কথাই আর বেরোয় না তাঁদের মুখ দিয়ে। সেদিন বাসে করে আসছি, আমার পেছনেই দুজন ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তা কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম। খুব গম্ভীর ভাবেই কথা বলছিলেন, যেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। একজন আরেকজনকে বলছেন, "না না, ওরকম ঝুঁকে পড়া টুপী আমার ভালো লাগে না। ......সেদিন Kensingtonএ—'র মাথায় একটা টুপী দেখলাম, চমৎকার টুপীটা, মাত্র ২৫ শিলিং; সেটা......হ্যাঁ, ওর পছন্দ সত্যিই খুব সুন্দর......না, ..."একটানা বলেই চলেছেন। কোথাও থামেন না।

সাধারণত মেয়েরা আজকাল আর জামা-কাপড়ের কারুকার্যের দিকে তেমন নজর দেয় না। আপনি যদি সারাদিন ট্রামে বাসে নীল রঙের জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ান কি একটা ম্যাকিন্টস গায়ে চড়িয়ে, মাথায় নাবিকদের সেই বিরাট টুপী চাপিয়ে ঠ্যালাগাড়ি ঠেলতে সুরু করেন, তাহলে সে সম্বন্ধে কেউ কিছুই বলবে না। আমরা আর সুন্দর জামাকাপড় চাইনা, দরকারীটুকু পেলেই হল। স্পেন্সারেরে মতে সেইটেই হল চালাকের লক্ষণ। তিনি বলেন যে জঙলী লোকেরাই পোষাকের কারুকার্যের দিকে নজর দেয় বেশী। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমাদের ক্যাপ্টেইন স্পেকির কয়েকটি নিগ্রো ঝি ছিল। তারা বেশ সুন্দর সুন্দর সব ছাগলের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বৃষ্টি নামলেই তারা চামড়াগুলো বাক্সে পুরে খালি গায়ে বসে শীতে কাঁপত।"

বাসের সেই মহিলা যে ধরণের কথা বলছিলেন, সে রকম কথা কোন ছেলের পক্ষে বলা একেবারেই অসম্ভব। তবে ছেলেরাও পোষাকের সৌন্দর্যের মোহ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাদের মুখে ওসব কথা মানায় না, এই যা। তারাও ও ব্যাপারে মেয়েদের মতই মাথা ঘামায়। কিন্তু তা বলে মেয়েদের মত অতক্ষণ একটানা ভাবতে পারে না।

পেপীর ডায়েরীটা দেখুন, "আজ সকালে লোমওয়ালা সুন্দর একটা বড় কোট তৈরী হয়ে এসেছে। তার বোতামগুলো সোনার। একটা রেশমী স্যুটও এসেছে। সেটারও দাম অনেক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন শীগ্গিরই টাকাটা দিয়ে দিতে পারি।" দেখেছেন মজাটা; জামাগুলো তৈরী করবার আগে টাকার কথা মনে ছিল না। এখন যত ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু হয়েছে। আরে প্রার্থনাটাও ত আগে সেরে রাখতে হয়!

গোল্ডস্মিথ অনেকটা এই ধরণের লোক ছিলেন। তিনিত সাদা কাপড়-চোপড় পরতে হবে বলে চার্চ-এ যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। জমকালো পোষাক না হলে তাঁর চলত না।

এখানে একটা কথা বলে রাখি কেউ যেন মনে না করেন যে, যাঁরা ভাল ভাল জামা কাপড় পরে বেশ ফিটফাট থাকেন তাঁদের আমি অসম্মান করছি। তবে যাঁরা অত্যন্ত বেশী সাজগোজ করেন, তাঁদের আমি তেমন সম্মান করি না। সাজ-সজ্জা ভাল-রকম করতে জানলে অবশ্য করতাম, কিন্তু ভগবান আমায় সে বিদ্যে দেননি। বেশীর ভাগ সময়েই নতুন ফ্যাশন আমার পছন্দ হয় না, ওগুলো যেন আমাকে খোঁচা মারে। মনটাকে ভীষণ রকম ঝাঁকিয়ে দেয়। অবশ্য সব সময়েই বলি, "আমূল সংস্কার চাই।" কিন্তু একেবারে উদার হতে পারিনি। আমার এখনো স্বর্গীয় শান্তিতে পূর্ণ ঘুমের গুহাটাই ভাল লাগে। সে গুহার ফটক হচ্ছে আমার অভ্যেসগুলো, শুকনো ঘাসে ভর্তি।

স্পার্জিয়নও ছিলেন "উদারমতাবলম্বী।" তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলেন, "আপনার ভেতরের ওই পুরনোপন্থী বুড়োটাকে মেরে ফেলা উচিত।" তার উত্তরে স্পার্জিয়ন বল্লেন, "হ্যাঁ তাকে ত আমি মেরে ফেলেছি। দেখলে না 'টোরী'দের দলের এই বুড়োটাকে দিয়ে 'লিবারেল' দলে ভোট দেওয়ালাম।" আমার মধ্যেও এই দ্বন্দ্বটা রয়েছে, আর সেখানে জামা কাপড়ের বেলায় 'টোরী'দের বুড়োটাই বার বার জিতে যাচ্ছে। কার্লাইলের বেলাতেও তাই হয়েছিল। তিনি দেশের রাজনৈতিক দিকটা একেবারে নতুন করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নতুন স্যুটের দরকার হলেই তিনি তাঁর গ্রামের পুরনো দর্জিকে লিখে দিতেন, "আরেকটা 'ঠিক আগের মত' স্যুট পাঠিয়ে দিও।" পুরনো ফ্যাশনের মায়া আমি কাটাতে পারলাম না। টাইগুলো সেই ৪।৫ বছরের পুরনো কায়দায় তৈরী। জামা-কাপড়েও কোন আধুনিকত্ব নেই। বুট দুটোর চেহারাটা অত্যন্ত পুরনো আর বিচ্ছিরি। আমি চাই দরকারী জিনিস, তার আকৃতি প্রকৃতির দিকে তেমন নজর দিই না। আমার জামার বিরাট বিরাট পকেটগুলো সব সময়েই গাদা গাদা চিঠিতে আর বই-পত্তরে ভর্তি থাকে। বন্ধুরা প্রায়ই মনে করিয়ে দেন যে, আমার ওয়েস্ট কোটের ওপরের বোতামটা লাগান নেই। 'ফিটফাট' লোকেদের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি বেশ থাকি। ওদের দেখলেই মনে হয়, ওরা যেন বেশ ভেবে-চিন্তে সাজ-গোজ করে এসেছে। যেন সাজ-গোজ সম্বন্ধীয় একটা কবিতা হঠাৎ মানুষ হ'য়ে গিয়েছে। একদিন ওই রকম একজন ফিটফাট লোকের সঙ্গে খাচ্ছিলাম। ভদ্রলোক আমার বেশভূষার দিকে তাকিয়ে খালি খালি চমকে উঠছিলেন। বেসুরো গান শুনলে হঠাৎ যেমন চমকে যাইনা, অনেকটা সেইরকম। চমকাবার যে কি ছিল জানি না।

যুদ্ধটা লেগে যাওয়ায় এই একটা বেশ সুবিধা হয়ে গেছে। এখন যেরকম জামাই করি না কেন কেউ কিছু বলবে না, বরং ভাল জামাকাপড় পরলেই খেতে হবে গালা-গালি। যত সব পুরনো জামা কাপড় এই বেলা পরে নিন। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "পুরনো টুপী কেন পরেছেন?" ওমনি বলে দেবেন, "কাইজারের কফিনের এটা একটা পেরেক।"

সেদিন পার্লামেন্টের একজন মাননীয় সদস্য বেশ গর্ব করে বলেছিলেন যে, যুদ্ধ লাগার পর তিনি একটাও নতুন জামা কেনেননি। যুদ্ধের কল্যাণে, এতদিন পরে আমি বেশ কায়দাদুরস্ত, ফ্যাশনমাফিক হতে পেরেছি। এতে খরচও কম ভাবনাও কম। যুদ্ধের পরেও যদি এই ফ্যাশনটা চলতে থাকে, তাহলে বেশ হয়। আমার মত ফ্যাশন-ছাড়া লোকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারে।

অনুবাদক—**শ্রীশুভময় ঘোষ**

[Alpha of the Plough'র লেখা Leaves In the Wind বইটির On Clothes লেখাটির অনুবাদ।]

অঙ্গামি নাগা

শ্রীস্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

আসাম সীমান্তে জাপানের আক্রমণের ফলে আসামের পার্বত্য জাতি সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। নাগা-পাহাড় আসামের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চলে নাগা জাতির বাস। নাগা জাতির সাতটি শাখার মধ্যে অঙ্গামি প্রধান। অঙ্গামি আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত:—ইহাদের মধ্যে অঙ্গামি-কেজামি, লোটা ও সেমা প্রধান। সম্ভবত নগ্ন (উলঙ্গ) শব্দ হইতে নাগা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সার জর্জ গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে ভাষা অনুযায়ী নাগা জাতি তিব্বত-বর্মা পরিবারভুক্ত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চীনের ইয়ানু-সি-কিয়াঙ ও হো-আঙ-হো নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ হইতে ইহারা আসিয়াছে। বোর্নিও ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি জাতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্যও দেখা যায়। অঙ্গামি জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষার মধ্যেই বিস্তর পার্থক্য আছে।

অঙ্গামিরা ক্রীড়াপ্রিয় জাতি। ইহাদের চেহারা সুন্দর। অন্যান্য পার্বত্য জাতির তুলনায় অঙ্গসৌষ্ঠবে ইহারা বিশেষ উন্নত। ইহাদের চোখ বাদামী রঙের, ঠোঁট পুরু ও নাক বোঁচা; কিন্তু আর্যজনোচিত সুনাসা ও সুন্দর ওষ্ঠও বিরল নহে। ইহাদের চুল ছোটবেলায় লালচে রঙের ও ক্রমে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। অন্যান্য পার্বত্য জাতির ন্যায় ইহারাও বিরল শ্মশ্রু। ইহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি অত্যন্ত প্রখর। ইহারা কষ্ট-সহিষ্ণু ও বলশালী। পার্বত্য অঞ্চলে ইহারা দৈনিক কমপক্ষে ৩০।৪০ মাইল ভ্রমণ করিয়া থাকে। খাড়া পাহাড়ে আরোহণ করিতে অঙ্গামিরা বিশেষ পটু; কপালের সহিত বেতের ফিতা দিয়া সংলগ্ন প্রকাণ্ড ঝুড়ি ইহারা পিঠে লইয়া মালপত্র বহন করে।

অঙ্গামি নারীরা বিশেষ সুশ্রী। ইহাদের কণ্ঠস্বর অতিশয় সুমিষ্ট। আলাপ-ব্যবহারও অত্যন্ত অমায়িক। অঙ্গামি-নাগা অঞ্চল মণিপুরের সন্নিহিত। মণিপুরের সহিত মহাভারত বর্ণিত বভ্রুবাহনের কাহিনীর সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য এই সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তথাপি মণিপুরীরা ইহা বিশ্বাস করে। এই সূত্রে বভ্রুবাহন মাতা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের অন্য পত্নী নাগ-কন্যা উলুপীর যোগাযোগ বিচার করিয়া নাগা-জাতিকে অনেকে মহাভারত বর্ণিত নাগ-জাতি বলিয়া নির্দেশ করেন। যাহাই হউক না কেন, উভয় জাতির আকৃতি-প্রকৃতি বিচার করিলে কোন উন্নত জাতির সংশ্রবে যে ইহারা আসিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অঙ্গামি নারীরা অন্যান্য পার্বত্য নারীর ন্যায় নোংরা নহে; ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ভাল করিয়া গাত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান করে। বন্য লতা-পাতার রস হইতে ইহারা একপ্রকার সাবান প্রস্তুত করে এবং তাহার সাহায্যে গায়ের ময়লা দূর করে। ইহারা পার্বত্য সরিৎ ও ঝরণা প্রভৃতির জল বাঁশের চোঙে করিয়া লইয়া আসে ও গৃহস্থিত প্রস্তর নির্মিত চৌবাচ্চায় রক্ষা করিয়া থাকে।

অধিকাংশ নাগাই উলঙ্গ থাকে বা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করে। কিন্তু অঙ্গামিরা কাপড়চোপড় পরিয়া থাকে। অঙ্গামি পুরুষেরা মাথায় বড় বড় চুল রাখে; ইহাদের চুল খাড়া কিংবা ঢেউখেলান কিন্তু কুঞ্চিত হয় না। অঙ্গামি নারীরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখে। বিবাহের পর হইতে ইহারা মস্তকে চুল গজাইতে দেয়। ইহাদের বিশ্বাস নববিবাহিতা পত্নীর মুণ্ডিত মস্তকের কণ্টকপ্রায় কেশ-দ্বারা স্বামী অলৌকিক শক্তি লাভ করে।

পুরুষদের বেশভূষা বিচিত্র। ইহারা বড় বড় চুলে চূড়া করিয়া তাহার মধ্যে ফুটন্ত কার্পাস গুঁজিয়া দেয়। উৎসবাদির সময় ফুটন্ত কার্পাস ও পাখীর পালকে সজ্জিত বিচিত্র মুকুট ইহারা পরে। কোন কোন পুরুষ মাথায় কোনরূপ ভূষণ পরে না, লম্বা লম্বা চুল বাউরী কাটিয়া সাজাইয়া দেয়। ভল্লুকের লোমের মালাও ইহারা মাথায় পরে। চুলে জমকাল কলপও কেহ কেহ দিয়া থাকে। অঙ্গামি পুরুষেরা সাধারণত প্রস্থে এক হাত ও দৈর্ঘে আড়াই হাত ছোট কাপড় ধড়ার ন্যায় পরিয়া থাকে। এই ধড়ার আঁচলে তিন চারি পংক্তি কড়ি সেলাই করিয়া আঁটা থাকে। কড়ির পংক্তি অনুযায়ী ইহাদের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হইয়া থাকে। এখন অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাধারণ লোকে দুই পংক্তির অধিক কড়ি ধারণ করিতে পারিত না। যোদ্ধারা তিন পংক্তি ধারণ করিত। চারি পংক্তি খ্যাতনামা ব্যক্তি বা নরমুণ্ড-শিকারীরা ধারণ করিত। ইহাদের নাচ ও যুদ্ধের সাজ অন্যরূপ। নরমুণ্ড শিকারও এখন বন্ধ হইয়াছে। যুদ্ধ অথবা নৃত্যগীতের সময়ে অঙ্গামিরা লালরঙের জাঙিয়া এবং কখন কখন তাহার সম্মুখে একটি থলিয়া পরিধান করিয়া থাকে। গাঢ় নীল বর্ণের চাদর কাঁধের উপর দিয়া বুকে বাঁধা থাকে। চাদরের দুই আঁচলে ঝালরদার হাশিয়া এবং তাহার দুই ধারে লাল ও হলদে রঙের পাড় থাকে। অঙ্গামি নারীরা কাল কাপড়ে লাল ও হলদে রঙের পাড় ভালবাসে। তাহারা উজ্জ্বল ডোরাকাটা খাট ঘাগড়া পরে এবং গায়ে রঙীন ছোট শাল বা চাদর জড়াইয়া রাখে; ঘাগরা প্রায়ই হাঁটুর নীচে নামে না। ইহারা পায়ে কোন গহনা পরে না; বাহুতে একপ্রকার তাগা এবং কাঁসার বালা হাতে পরে। কাঁসার অনেকগুলি চুড়ি এক সঙ্গে পরিতেও দেখা যায়। ইহারা কড়ির হার পরিয়া থাকে। সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত নারীরা শঙ্খ ও কাঁসার আংটি কর্ণে পরিতে পারে। মস্তকে ইহারা কোন ভূষণ বা অলঙ্কার পরে না। খেনোমা ও কোহিমা অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা সাধারণত পিঠে চুল ফেলিয়া গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়া রাখে। পূর্বাঞ্চলের অঙ্গামি নারী পৃষ্ঠদেশে চুল ফেলিয়া রাখে।

অঙ্গামি পুরুষেরা নানারূপ কর্ণভূষণ পরিয়া থাকে। ধবধবে কার্পাসের গোছা, পাখীর পালক ও কাঁসার মাকড়ি সাধারণত কর্ণভূষণের কাজ করে। বাহুতেও ইহারা নানা অলঙ্কার পরিয়া থাকে। সাধারণত হাতীর দাঁতের ও পিতলের বালা, হাতীর দাঁতের পদক এবং বেতের তাড় ইহারা বাহুতে পরে। পায়ে ইহারা বেতের মল পরে। কাঁচ, শঙ্খ, কড়ি ও হাড়ের বড় বড় মালার হার ইহাদের কণ্ঠে শোভা পায়। পদদ্বয়ে রঙীন বেতের জঙ্ঘাত্রাণ, হস্তে হস্তিদন্ত অথবা পিত্তল নির্মিত বলয়ও ইহারা ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে বর্শাই প্রধান। বল্লম ও দাও ইহারা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে।

অঙ্গামিরা সাধারণত পর্বতের চূড়ার উপর গ্রাম নির্মাণ করিয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে শ্রেণীগত বিরোধ খুব প্রবল। এক-সময়ে ইহাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। গ্রামগুলি দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা; শত্রুপক্ষ যাহাতে গ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য ইহারা গ্রামের রাস্তা-গুলি দুর্গম করিয়া রাখে। অঙ্গামিদের বাড়ির অংশ তিনটি। সম্মুখের বড় এক-খানি ঘরের একাংশে ইহারা শস্যাদি সঞ্চিত রাখে, অপর অংশ বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। বাড়ির মধ্যভাগে রন্ধনাদির ও শুইবার

ঘর থাকে। বাড়ির পশ্চাতের অংশে মদ বা তাড়ি রক্ষিত হয়। কোন কোন বাড়িতে এই অংশে মদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অঙ্গামিদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্য পৃথক ঘর থাকে। এই ঘরকে 'মোরং' বলে। দরিদ্র পরিবারে অবিবাহিত সন্তানরা মাতা-পিতার সঙ্গেই বাস করে। মোরংগুলি সাধারণত অবিবাহিত যুবকযুবতীর নৈশ আড্ডা। ইহারা গরু, শূকর, কুকুর ও মুরগী প্রভৃতি পোষে।

বাসন কোসনের মধ্যে মাটির বাসনই প্রধান। মদ্য পানের জন্য মাটি, শিঙ, বাঁশ ও কাঠের পাত্র থাকে। অবশ্য আজকাল কাঁচ ও এনামেলের পাত্রাদিও ইহারা ব্যবহার করে।

ইহারা কাঠের থালায় ভাত খায়। এতদ্ভিন্ন অঙ্গামিদের গৃহে মদ প্রস্তুতের জন্য জালা, ছাঁকিবার জন্য বেতের ঝুড়ি থাকে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বড় বড় ঢাক ও শিঙ্গা ইহাদের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাত ও মাংসই ইহাদের প্রধান আহার্য। ইহারা সকল প্রকার জন্তুর মাংসই খায়। কিন্তু মাংস গ্রহণ সম্বন্ধে কয়েকটি বিধিনিষেধ আছে। স্ত্রীলোকের বন্য জন্তু দ্বারা হত প্রাণীর মাংস, বানর; কাঠবিড়াল, বনমানুষ প্রভৃতির মাংস, মোরগ ও চিল প্রভৃতির মাংস অভক্ষ্য। শিশু বালকদিগের পক্ষে গরু, শূকর ও কুকুরের মস্তক; চিল, বাজপাখী এবং পোকাদির মাংস নিষিদ্ধ। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের পক্ষে গৃহপালিত জন্তুর মৃতজাত শাবক, অপঘাতে হত জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ। অঙ্গামিরা নিজে গরুর দুধ দোহন করিয়া পান করে না। অন্য কেহ দিলে খায়।

অঙ্গামিরা পর্বতের চাতালে ধান, আলু, জোয়ার ও গোধূম প্রভৃতির চাষ করে। অঙ্গামিরা পাকা ব্যবসায়ী। ইহারা বাহির হইতে তুলা, সূতা ও শুষ্ক মৎস্যাদি আমদানী করিয়া থাকে। সতরঞ্চির ন্যায় মোটা একপ্রকার বস্ত্র ইহারা প্রস্তুত করে। ইহাদের উত্তরাধিকার প্রথা বিশেষ উন্নত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ এবং বিবাহিত পুত্র এক অংশ পাইয়া থাকে। কনিষ্ঠ পুত্র অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পায়। মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করা যায়; কিন্তু কন্যা কখনও স্থাবর সম্পত্তি পায় না। পুত্রের বিবাহের পর তাহাকে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে বাস করিতে হয়।

স্বামী-নির্বাচনে তরুণীদের বিশেষ স্বাধীনতা আছে। তাহার অমতে বিবাহ হয় না। তরুণেরা তরুণীদের সহিত অবাধে মিশিতে পারে। অঙ্গামি তরুণ কোন তরুণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে নিজের পিতাকে অথবা অভিভাবককে জানায়। তখন পাত্রীর পিতার নিকট একজন ঘটক পাঠান হয়। পাত্রীর মত থাকিলে পাত্রীর পিতা তাহা জানাইয়া দেয়। তারপর পাত্রপক্ষ একটি মোরগের গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া ফেলে; মৃত্যুকালে মোরগটি যদি পাত্রীর গৃহের অভিমুখে পা ছুঁড়ে, তাহা হইলে বিবাহ হইবে বলিয়া ইহারা মনে করে। তারপর বিবাহের দিন স্থির হয়; এবং পাত্রীর গৃহে ভোজ হয়। সন্ধ্যার সময় পাত্রী পাত্রের গৃহে চলিয়া যায় এবং রাত্রি যাপন করে। কিন্তু পাত্র গৃহে বাস না করিয়া নৈশ আড্ডায় বাহির হইয়া যায়। এইরূপে তিনদিন কাটিয়া গেলে পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহ হয়। ইহারা একাধিক বিবাহ করিতে পারে না। বিপত্নীকেরও বিবাহের ব্যবস্থা নাই। ব্যভিচারিণী স্ত্রী পরিত্যক্তা হয়। স্বামীর ব্যভিচারের জন্য স্ত্রীও স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে।

গ্রামের মধ্যেই অঙ্গামিরা মৃতের সমাধি দেয়। মৃতদেহের সঙ্গে মদ্য ও মুরগী পুঁতিতে দেখা যায়। সমাধির উপরে বড় বড় প্রস্তর স্থাপন করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সমাধির উপরে কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বিরাট ভোজ হয় ও মাংস বণ্টন হইয়া থাকে। অঙ্গামিরা গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকে। গৃহের অগ্নি নির্বাপিত হইলে ইহারা অমঙ্গল মনে করে। ইহাদিগের দেবতার মধ্যে 'কেপেনোপফু,' রুট্‌জে, টসুখো, ডজুরাবু ও টেমি প্রধান। কেপেনোপফু-ই ইহাদের পরমেশ্বর। রুট্‌জে মৃত্যুর দেবতা। ইহারা প্রস্তর পূজা করে। গ্রামের আদিম প্রতিষ্ঠাতার বংশধরেরাই পুরোহিতের কাজ করে।

অঙ্গামিরা বিচিত্র সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিবাহাদি উৎসবের সময় নৃত্য করিয়া থাকে। তরুণ-তরুণীরা বৃত্তাকারে নাচিয়া নাচিয়া নিম্নোক্তভাবে গান করেঃ—

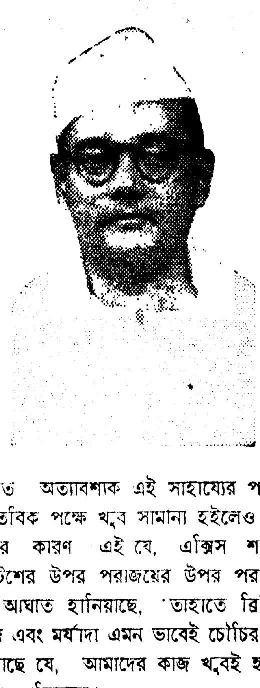
পুরুষ—"মাটিতে বীজ রহিয়াছে; মাটিতে বীজ পড়ে, মানুষ তাহা কুড়াইয়া লয়; তথাপি তাহারা জন্মায়। কিন্তু মানুষ মরে, আর ফিরিয়া আসে না।"

নারী—"আনন্দ উপভোগে দেরী করিও না তোমার চুল বড় হইলেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে; বৃদ্ধ হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে।"

উভয়ে—"চন্দ্র হ্রাস পায়; কিন্তু আবার বাড়ে; কিন্তু তোমার প্রিয়তম চলিয়া গেলে আর আসিবে না।"

কেন দেশ ছাড়িলাম

ভ্রাতৃগণ এবং ভগিনীগণ, আজ আপনারা আমাকে যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে এবং আনন্দপূর্ণভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন, সেজন্য সর্বপ্রথমে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার যেসব ভগিনী তাঁহাদের অন্তরের স্বদেশপ্রেমের অগ্নিময় প্রেরণা অভিব্যক্ত করিবার জন্য এত অধিক সংখ্যায় সাহসের সঙ্গে আগাইয়া আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আজ আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আসন্ন সংগ্রামে শোনান এবং মালয়স্থ আমার দেশবাসিগণ অগ্রণীর স্থান অধিকার করিবেন। একদিন যে স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাকারস্বরূপ ছিল, সেই স্থান আজ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্গস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। তারপর আমি কেন আমার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলাম এবং সর্বপ্রকারে বিপদসঙ্কুল এই দুর্গম পথে পদার্পণ করিলাম, সেই কথা খোলাখুলি ভাবে আপনাদের কাছে বলি, আমার এই ইচ্ছা। আপনারা জানেন, গত ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণদ্বার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর হইতেই আমি স্বাধীনতার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত আছি। বিগত কুড়ি বৎসরকাল অন্যান্য আন্দোলনের সর্বপ্রকার কার্যোদ্যমের মধ্যে আমি সর্বতোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ইহা ছাড়া, হিংসাত্মকই হউক, আর অহিংসই হউক, সকল প্রকার গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল এবং তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সন্দেহে আমাকে বারংবার বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং আমি যদি এই কথা বলি যে, স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে আমরা যেমন সকল দিক হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, ভারতের জাতীয়তাবাদী দলের আর কোন নেতাই তাহা দাবী করিতে পারেন না, তবে তাহা বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতের ভিতরে থাকিয়া আমরা যত রকমের চেষ্টাই করি না কেন, ব্রিটিশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি ভারতে থাকিয়া চেষ্টা করিলেই আমাদের দেশের লোকের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তবে আমি অনাবশ্যক বিপদের ঝুঁকি লইবার নির্বুদ্ধিতা দেখাইতাম না। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতে যে সংগ্রাম চলিতেছে, বাহির হইতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করাই আমার দেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল। বাহির হইতে এই পরিপোষক সাহায্য ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সার্থকতা লাভের পক্ষে বাহির



হইতে অত্যাবশ্যক এই সাহায্যের পরিমাণ বাস্তবিক পক্ষে খুব সামান্য হইলেও চলে। ইহার কারণ এই যে, এক্সিস শক্তিবর্গ ব্রিটিশের উপর পরাজয়ের উপর পরাজয়ের যে আঘাত হানিয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশের শক্তি এবং মর্যাদা এমন ভাবেই চৌচির হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের কাজ খুবই হাল্কা হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের স্বদেশবাসীদের যে সাহায্য আবশ্যক ছিল এবং এখনও আছে, তাহা দুই রকম—নৈতিক এবং বাহিরের তোড়জোড়ের। প্রথমত তাহাদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে যে, পরিণামে তাহাদের বিজয় সুনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত বাহির হইতে তাহাদিগকে সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে যুদ্ধের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা আবশ্যক এবং যুদ্ধের ফল কি দাঁড়াইবে তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইলে ভারতে বা বাহিরে যেসব ভারতবাসী আছে, তাহারা তাহাদের স্বদেশস্থ ভারতবর্ষকে যে সাহায্য প্রদান করিতে পারে তাহার সন্ধান লওয়া দরকার; সেই সঙ্গে ইহাও দেখা প্রয়োজন যে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারে কি না। বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে এখন একথা বলিতে পারি যে, এই উভয় উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে। বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া আমি স্বচক্ষে সব ব্যাপার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং যুযুধান শক্তিবর্গের বলাবল উপলব্ধি করিয়াছি। তারপর, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতন সুনিশ্চিত হইয়াছে, আমি আমার স্বদেশবাসীকে বাহির হইতে এই খবর জানাইয়াছি। তারপর, আমি দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি যে, আমার দেশবাসীরা জগতের যেখানে যে আছে, সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেরা যোগদানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ইহাও আনন্দের বিষয় যে, এক্সিস শক্তিবর্গও ভারতকে বিদেশীর অধীনতা হইতে মুক্ত দেখিবার জন্য বাস্তবিকই আগ্রহাকুল হইয়াছে এবং ভারতবাসীরা যদি তাহাদের সাহায্য চায়, তবে তাহারা যথাশক্তি ভারতবাসীদিগকে সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছে।

বিদেশস্থ ভারতবাসীদের মতিগতি সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস যে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যিনি ভারতের স্বাধীনতা কামনা না করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যিনি সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন। এক্সিস শক্তিবর্গের মতিগতি সম্বন্ধে যদি কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাঁহাকে আমি অপর্যাপ্ত প্রমাণের দ্বারা সহজেই বুঝাইয়া দিতে পারি যে, আমাদের দেশবাসীরা নিজেরা ছাড়া, জগতে ইহারা বর্তমানে আমাদের প্রকৃষ্ট বন্ধু। অধিকন্তু, আমি আপনাদের কাছে এই দাবী করিতে পারি যে, আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন। আমি আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারি, আমার যাহারা অতি বড় শত্রু আমার সম্বন্ধে এমন কথা বলিবার ধৃষ্টতা তাহাদেরও হইবে না এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই যখন আমার মনের শক্তি দমিত করিতে পারেন নাই, অথবা আমাকে প্রতারিত কিম্বা প্রলুব্ধ করিতে পারেন নাই, তখন জগতের অপর কোন শক্তিই তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং আমার কথা বিশ্বাস করুন, সত্যই ব্রিটিশ

লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার

পার্শ্বে :—

'লালকেল্লা'র অভ্যন্তরে আজাদ হিন
ফৌজের সেনানীবৃন্দের বিচার-গৃহ

মধ্যে : (বামদিকে) :—

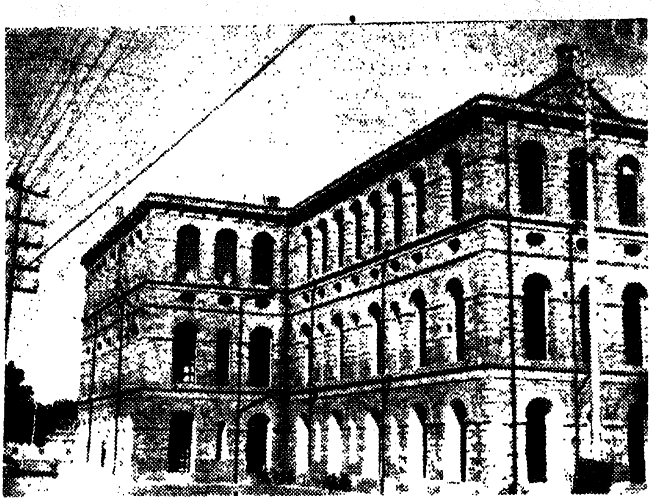
আসামী পক্ষের ব্যবহারাজীব—ডাঃ
এন কাটজু, স্যার তেজবাহাদুর স:
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ পি
সেন আদালত-কক্ষ হইতে বাহি
আসিতেছেন।

মধ্যে : (ডানদিকে) :—

আসামী পক্ষের ব্যবহারাজীব মিঃ ভুলা
দেশাই ও কুনয়ার দলিপ সিং আদাল
ভবন হইতে বাহির হইতেছেন।

নীচে :—

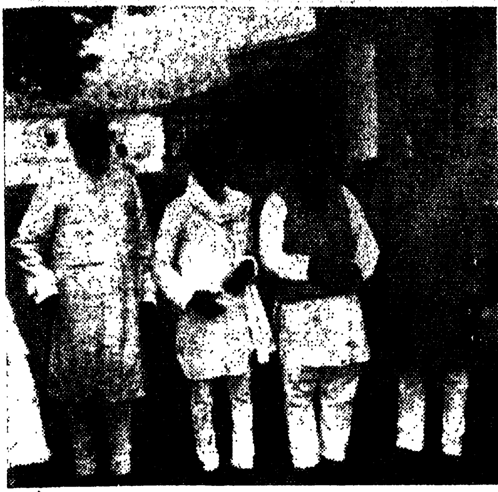
আদালত-কক্ষে পণ্ডিত নেহরু ও অন
ব্যবহারাজীবিগণ (ইঁহারা আজাদ হি
ফৌজের সেনানীদের পক্ষ সমর্থন করে











সামরিক আদালতের প্রাঙ্গণে মিঃ তারা সিং (বাম দিক হইতে তৃতীয়)



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আদালত গৃহ হইতে বাহির হইতেছেন



ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজের পরিবারের লোকগণ।



ক্যাপ্টেন সেগল ও লেঃ ধীলনের পরিবারের লোকজন।



আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের জন্য নিযুক্ত সামরিক আদালতের বিচারপতিগণ।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, যদি তাহাতে বাহিরের সাহায্য চাহেন, এক্সিস শক্তিবর্গ আপনাদের আনুকূল্য করিবে। কিন্তু এই সাহায্য আপনাদের প্রয়োজন কি না, স্থির করিবেন আপনারা এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, এই সাহায্য ব্যতীত যদি আপনারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন, তবে ভারতের পক্ষে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হইতে পারে। সেই সঙ্গে এ কথাটাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই যদি ভিক্ষাপাত্রকরে জগতের সর্বত্র সাহায্য চাহিয়া ঘুরিতে পারেন,—এমন কি, পরাধীন, ক্রীতদাসের অবস্থায় পর্যবসিত এবং দারিদ্র্যে অভিভূত ভারতের অধিবাসিগণও সে ক্ষেত্রে বাদ না যায়, তবে অবস্থার চাপে পড়িয়া আমরা যদি বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করি, তাহাতে নিশ্চয়ই দোষ হইতে পারে না।

সময় আসিয়াছে, এখন আমি খোলাখুলিই সর্বত্র জগৎকে সেই সঙ্গে আমাদের শত্রুদিগকেও আমরা দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য কিরূপ উদ্যমে অবতীর্ণ হইয়াছি, সে কথা বলিতে পারি। ভারতের বাহিরে যেসব ভারতবাসী আছেন, বিশেষ ভাবে পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ভারতবাসীরা একটি সেনাদল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সেনাদল ভারতে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী হইবে। যখন আমরা আক্রমণ করিব, বিদ্রোহ সংঘটিত হইবে; সেই বিদ্রোহ শুধু ভারতের অসামরিক জনগণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে না। ব্রিটিশ পতাকার তলে থাকিয়া এখন যাহারা সংগ্রাম করিতেছে, সেই ভারতীয় সেনাদিগের মধ্যেও সেই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িবে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তখন ভারতের ভিতর এবং বাহির দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইবে। ইহার ফলে সে গভর্নমেণ্ট এলাইয়া পড়িবে এবং তখন ভারতবাসীরা তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং আমার পরিকল্পনা অনুসারে, ভারতের সম্বন্ধে এক্সিস শক্তিবর্গের মতিগতি কিরূপ সেজন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন থাকে না। ভারতবাসীরা যদি ভারতের বাহির হইতে এবং ভিতরে থাকিয়া তাহাদের কর্তব্য পালন করেন, তবে ভারতবাসীরাই ব্রিটিশকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের ৩৮ কোটি স্বদেশবাসীকে স্বাধীন করিতে পারেন।

আমি জানি, সংশয়বাদীরা আছেন, তাঁরা বলিতে পারেন ভারতের ভিতরে থাকিয়া ৩৮ কোটি অধিবাসীরা ভারত হইতে যদি ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করিতে না পারেন, তবে বাহির হইতে ৩০ লক্ষ ভারতবাসীদের দ্বারা সে কাজ সম্ভব হইতে পারে এমন আশা করা চলে কি? কিন্তু বন্ধুগণ, আয়র্ল্যাণ্ডের ইতিহাস দেখুন। যদি ৩০ লক্ষ আইরিশ ব্রিটিশের অধীনে থাকিয়া, সামরিক আইনে বাঁধনের ভিতরে থাকিয়া মাত্র পাঁচ হাজার সশস্ত্র সিন্‌ফিন স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে গত ১৯২১ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে নতজানু করিতে সমর্থ হয়, তবে ভারতের অভ্যন্তরে পরিচালিত শক্তি জাতীয় আন্দোলনের সাহায্যলাভ করিয়া ৩০ লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষে ব্রিটিশকে ভারত হইতে বহিষ্কার করার প্রচেষ্টা দুরাশার বিষয় হইবে কেন?

তবে, একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, ভারতের বাহিরে যেসব ভারতবাসী আছেন, বিশেষভাবে যাহারা পূর্ব এশিয়ায় রহিয়াছেন, তাহারা তাহাদের সর্ববিধ শক্তি প্রয়োগ করিবেন। সেই প্রচেষ্টা সুব্যবস্থিত ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য স্বাধীন ভারতের একটি সাময়িক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা আমার রহিয়াছে। ভারতবাসীদের সকল শক্তি পুনর্গঠিত করিয়া ভারতস্থ ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা এই গভর্নমেণ্টের কার্য হইবে। এই প্রচেষ্টা যখন সার্থক হইবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, এই সাময়িক গভর্নমেণ্ট তখন স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গভর্নমেণ্টের হাতে নিজেদের কার্যভার ছাড়িয়া দিবেন। ভারতবাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ স্থায়ী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে। বন্ধুগণ, এখন আপনারা বেশই বুঝিতেছেন যে, পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ৩০ লক্ষ ভারতবাসীর পক্ষে তাহাদের সর্ববিধ শক্তি ধনবল এবং জনবল সুগঠিত করিবার সময় আসিতেছে। মন-মরা ভাব লইয়া কাজ করিলে চলিবে না। আমি সর্বাঙ্গীন শক্তি সংগ্রহ চাই—সব দিতে হইবে, একটুও কম নয়; কারণ, আমরা বারংবার আমাদের শত্রুদের মুখে পর্যন্ত একথা শুনিয়াছি যে, বর্তমানের এই সর্বাঙ্গীন যুদ্ধ।

আপনারা আজ আপনাদের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে গঠিত বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের অথবা ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের কতকটা অংশ দেখিতে পাইতেছেন। টাউন হলের সম্মুখে সেদিন ইহারা ইহাদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ করিয়াছে। তারপর, তাহারা এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে, পুরাণা দিল্লীর লালকেল্লার সম্মুখে গিয়া যতদিন পর্যন্ত তাহারা বিজয়োৎসবকালীন কুচকাওয়াজ না করিতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। 'চলো দিল্লী', 'চলো দিল্লী' তাহারা এই ধ্বনি নিজেদের মন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ, পূর্ব এশিয়াবাসী ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের কণ্ঠে আজ এই ধ্বনি উঠুক যে, সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে।

সর্বাঙ্গীন এই সমরসজ্জায় আমি এই আশা করিতেছি যে, আরও অন্তত তিন লক্ষ সেনা এবং তিন কোটি ডলার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব। মৃত্যুবিজয়ী একটি নারী বাহিনীর জন্য আমি তেজস্বিনী নারীদিগকে লইয়া গঠিত একটি নারী বাহিনীও চাই। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁসীর রাণী যে তরবারী ধারণ করিয়াছিলেন, বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে ইঁহারা সেই তরবারী ধারণ করিবেন। বন্ধুগণ, অনেকদিন হইতেই আমরা ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সম্বন্ধে এত কথা শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু ভারতে আমাদের দেশবাসীরা আজ চারিদিক হইতে পিষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহারাও এখন দ্বিতীয় ফ্রণ্টের জন্য দাবী করিতেছে। পূর্ব এশিয়ায় আমাকে ধনবল এবং জনবলের দ্বারা সর্বাঙ্গীন সমরসজ্জায় সাহায্য করুন, আমি আপনাদিগকে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট দেখাইব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাহা সত্যই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট হইবে।

*সিংগাপুরে ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

মৃত্যুঞ্জয়ী দলের আক্রমণ

[নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নিকট লিখিত লেফ্‌টন্যাণ্ট-কর্ণেল ধীলনের চিঠি। ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৫।]

এক টুকরা সমতল ভূমি; উপরে কোন আচ্ছাদন নাই, সামনে একটি জলবিহীন শুকনা পুকুর। সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন তিনটি রাস্তা তিন দিক হইতে আসিয়া মিলিয়াছে। এই সংযোগ স্থলের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ১৪২৩ ফুট উঁচু একটি পাহাড়; পাহাড়ের পিছনে ব্রিটিশের গোলন্দাজ বাহিনী সন্নিবিষ্ট থাকিয়া রাস্তা তিনটির সংযোগক্ষেত্র এবং তাহার দক্ষিণবর্তী ভূমিভাগকে রক্ষা করিতেছে। এই স্থান অধিকৃত হইলে সমর পরিকল্পনা সমগ্রভাবে বিপর্যস্ত হইতে পারে এই আশংকা। এই লাইনের একটি গুরুত্বসম্পন্ন কেন্দ্রে ২নং লেফ্‌টন্যাণ্ট জ্ঞান সিংহের নেতৃত্বে এক কোম্পানী আজাদ হিন্দ ফৌজ সন্নিবিষ্ট ছিল। জ্ঞান সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত।

এই কোম্পানীটি মাত্র ৯৮ জন সেনা লইয়া গঠিত ছিল। ইহাদের কোন মেশিন কামান ছিল না, এমন কি, ধরণের মেশিন কামানও নয়। সাবেকী ধরণের রাইফেলই তাহাদের আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র ছিল, ইহা ছাড়া দুইটি ছিল। ইহারা এই অবস্থায় ক্রমাগত দুইদিন থাকে; কিন্তু শত্রুরা অগ্রসর হয় না। ১৯৪৫ সালের ১৬ই মার্চ সকাল বেলা হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত শত্রু পক্ষের বোমারু উড়োজাহাজ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং আজাদ ফৌজ

দলের ঘাঁটির উপর মেসিন কামান হইতে গুলী চলে। উড়োজাহাজগুলিতে বড় বোমা ছিল, সব নিক্ষেপ করিয়া সেগুল চলিয়া যায়, তারপর পাহাড়ের আড়াল হইতে শত্রুপক্ষের কামানগুলি গুলী বর্ষণ করিতে থাকে।

এই গুলীবর্ষণের আড়ালে আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুরা ১৩টি ট্যাঙ্ক, ১১ খানা সাঁজোয়া গাড়ি এবং ১০ খানা ট্রাক লইয়া আগাইতে আরম্ভ করে। এই যন্ত্র চালিত বাহিনীর অর্ধেকটা সোজাসুজী পুকুরের ধারে আসিয়া পেণছে, এখানে আজাদ ফৌজ দলের পুরোবর্তী দুইটি পল্টন ছিল। সাঁজোয়া গাড়িগুলি হইতে



ক্যাপ্টেন গুরুবক্স ধীলন

ফৌজদের উপর বিস্ফোরক নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু আমাদের সেনারা তাহাতে ভয় পায় না, তাহারা তাহাদের পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষায় ট্রেঞ্চের মধ্যে অবস্থান করে।

শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়িগুলি ইস্পাতে তৈয়ারী দানবের মত অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে আগাইয়া আসে, তাহারা এত কাছে আসে যে, সোজা ট্রেঞ্চের মধ্যে অবাধও গুলী পড়িত থাকে, তাহাদের এমন জোরের সংগে আক্রমণ চলিতে থাকে, যাহাতে আমাদের সেনারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের গতি রুদ্ধ করিবার জন্য দুইটি মাইন নিক্ষেপ করা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি ফাটে না। কিন্তু তাহার ফলে গাড়িগুলি থামিয়া পড়ে, পরে সেইগুলি হইতে সর্বধ্বংসী অনল উদ্গীর্ণ হইতে থাকে।

ফৌজদের সংগে সদর অফিসের কোন যোগসূত্র বজায় ছিল না। লেফটন্যান্ট জ্ঞান সিং বুঝিলেন যে, তাহারা তাহাদের রাইফেলের গুলীর দ্বারা শত্রুপক্ষের গোলা, মেসিন কামানের গুলী, হাত বোমার আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবেন না এবং সেই অবস্থায় ফৌজের সেনাদের ট্রেঞ্চে অবস্থান করার অর্থ সুনিশ্চিত মৃত্যু অথবা বন্দী হওয়া, অথচ শত্রুপক্ষের তাহাতে কিছুই ক্ষতি ঘটিবে না। তিনি অবস্থা বুঝিয়া আক্রমণ করিবার হুকুম দিলেন।

নিজে আগাইয়া গেলেন। 'নেতাজী কি জয়', ইনক্লাব জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ' এই ধ্বনি করিতে করিতে তিনি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। সমগ্র বাহিনী তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিল; সেই শব্দ শত্রুপক্ষের কামান গর্জনকেও যেন স্তব্ধ করিয়া আকাশ মুখরিত করিল। শত্রুপক্ষের অপরিমিত শস্ত্র বলের সম্মুখে এই ধ্বনিই ছিল ইহাদের একমাত্র সম্বল। ভারতের নামে এবং ভারতের স্বাধীনতার নামে বীর দল শত্রু সেনাদলের মধ্যে আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষ তখনই গাড়িগুলি হইতে নামিয়া পড়িল এবং হাতাহাতি লড়াই সুরু হইল। এই লড়াই পুরাপুরি দুই ঘণ্টাকাল চলে; কিন্তু আমাদের বীরেরা পরাজয় স্বীকার করিবে না, তাহাদের মধ্যে ৪০ জন সমসংখ্যক শত্রু সৈন্যকে বধ করিয়া রণসজ্জা গ্রহণ করিল। ইহাদের দুর্জয় মনোবল শত্রুপক্ষকে এমনভাবে অভিভূত করিল যে, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়, লেফটন্যান্ট জ্ঞান সিং তাঁহার তৃতীয় পল্টনের কম্যাণ্ডার লেফটন্যান্ট রাম সিংকে আহ্বান করিলেন। তিনি তাঁহাকে হুকুম দিতে ছিলেন, এমন সময় শত্রুপক্ষের একটি বুলেট আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল। জ্ঞান সিং ভূমিতলে পতিত হইলেন, আদেশ দেওয়া তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ইহার পর রাম সিং স্থানীয় অবশিষ্ট সেনাদিগকে পুনরায় ব্যূহবদ্ধ করিলেন।

লেফটন্যান্ট জ্ঞান সিং তাঁহার সেনাদিগকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের সংগে প্রাণ দিবেন। তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিয়াছেন এবং জীবনে মরণে সতীর্থদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। বীরের এই স্মৃতি গৌরবময়, জগৎ যতদিন থাকিবে, ইহা ইতিহাসকে উজ্জ্বল রাখিবে। লেফটন্যান্ট জ্ঞান সিং এবং তাহার সেনাদল তাহাদের মহান নেতা নেতাজীর আদর্শের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা সম্মুখ সংগ্রামে বীরের মত প্রাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের স্মৃতি চিরন্তন গৌরব-গাথা হইয়া থাকিবে। স্বাধীন ভারতে মৃত্যুঞ্জয়ী এই সব বীরদের চিরদিন পূজা করিবে। ইহাদের মহান্ আদর্শ ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে মহান্-জীবন লাভের পথে অনুপ্রাণিত করিবে।

সাহিত্য সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত ১২ই শ্রাবণ "দেশ পত্রিকায়" ২৪ পরগণা রামচন্দ্রনগর তরুণ সমিতির সাহিত্য বিভাগ কর্তৃক যে রচনা প্রতিযোগিতা আহুত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কিশোর কিশোরীরা তাহাতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রবন্ধ:—১ম। শ্রীপুলিনবিহারী জানা (মেদিনীপুর); ২য়। শ্রীষষ্ঠী বন্দ্যোপাধ্যায় (রামচন্দ্রনগর); ৩য়। শ্রীমতী ইলা চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর);

গল্প:—১ম। শ্রীনীহার চট্টোপাধ্যায় (দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন); ২য়। শ্রীজিতেন মিত্র (বৌবাজার); ৩য়। শ্রীমতী ঝর্ণা দে (বরাহনগর)।

কবিতা:—১ম। শ্রীপ্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্কট লেন); ২য়। শ্রীঅনিলকুমার পাল (বিডন স্ট্রীট); ৩য়। শ্রীষষ্ঠী বন্দ্যোপাধ্যায় (রামচন্দ্র-নগর)।

গত ২৮শে আশ্বিন মহাষ্টমী দিবসে শ্রীযুত বিভূতিভূষণ কাঞ্চাল (রিপন কলেজের বঙ্গ-ভাষার অধ্যাপক) মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এডভোকেট এস চ্যাটার্জির প্রধান আতিথ্যে ও শ্রীযুত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কাহিনী নয় খবর ★ ★

ভবঘুরে

জওহরলাল ক্লান্ত !

১০ই নভেম্বরের বোম্বাইয়ের এক খবরে প্রকাশ, একদল সংবাদ প্রতিনিধি পণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সম্মেলনে মিলিত হন। এর উত্তরে জওহরলালজী তাঁদের জানান যে, তিনি 'দেহে ও মনে ভয়ানক ক্লান্ত'। এমন কথা পণ্ডিত জওহরলালের মুখ থেকে সর্ব প্রথম শুনতে



পেয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অবাক হয়ে গেছেন। পণ্ডিতজী বলেছেন,— "আমি মনের দিক থেকে ক্লান্ত—আমি দেহের দিক থেকে ক্লান্ত—আমার উৎসাহ যেন নেই।" জওহরলালজীর এ ক্লান্তি আসা খুবই স্বাভাবিক—কারণ, আসন্ন নির্বাচন, আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ সমর্থন ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং নিয়ে তাঁকে দিনরাত কি পরিমাণ খাটতে হচ্ছে যে তা দেশের লোকেরা সবটা টের না পেলেও সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা তো সবই জানেন, কাজেই তাঁদের অবাক হওয়াটা সবচেয়ে অবাকের কাণ্ড নয় কি!

পদবীর পদ-বৃদ্ধি !

এলাহাবাদের এক খবরে জানা গেছে, 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে মদনলাল মাহেশ্বরী নামে ১৫ বছরের একটি ছেলে তার নামের পদবী 'মাহেশ্বরী' বদলে তার যায়গায় 'আজাদ' বসিয়ে ঘোষণা করেছে—এখন থেকে তার নাম হলো 'মদনলাল আজাদ' এবং সে জয়হিন্দ' বলে সকলকে সামরিক অভিবাদন জানাবে ঠিক করেছে। ছেলেমানুষ হলেও মদনলাল পদবীর পদবৃদ্ধি করতে পেরেছে যে এটা স্বীকার করতেই হবে।

লাল কেল্লায় ভাইফোঁটা

লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের দ্বিতীয় দিনে বিচার-সভার মধ্যাহ্ন ভোজের অবসরে আইনজ্ঞদের বসবার ঘরে ক্যাপ্টেন সেগালের দুই বোন হিন্দু প্রথামত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভকামনা জানিয়ে ভাই সেগালের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন ও তাদের ভাইকে কিছু ফল—খেজুর ইত্যাদি খেতে দেন। এরপর সেগালের দুটি বোন হাতজোড় করে তাদের ভায়ের কল্যাণ কামনা করেন। পণ্ডিত জওহরলাল, ভুলাভাই দেশাই ও ডক্টর কাটজু দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখেন। সেগালের মা'ও সেখানে ছিলেন। তিনি সবশেষে তাঁর বুকের নিধির গালে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ জানালেন—তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। আইনজ্ঞদের চোখও নিশ্চয়ই ছল্ ছল্ করে উঠেছিল!

পাঠান জাতির কৃতজ্ঞতা

সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আব্দুল গফুর খাঁ সম্প্রতি পেশোয়ারের এক সভায় বলেছেন,—কেন তিনি মুসলমান হয়েও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,—'আমি দেশের স্বাধীনতার জন্যই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি এবং ঠিক ঐ একই কারণে আমি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—যেটি দেশের স্বাধীনতার জন্য সত্যই সংগ্রাম করছে। আরও যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন,—"আমরা পাঠানরা যখন বিপদে পড়ে মুসলিম লীগ ও মুসলিম কন্‌ফারেন্সের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলাম, তখন তাঁরা তা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই বিপদের সময়ে একমাত্র কংগ্রেসই আমাদের সহায় হয়েছিল। বাস্তবপক্ষে, কংগ্রেসই সাধ্যমত সাহায্য ক'রে আমাদের রক্ষা করেছিল। আমি কি সেই সময়োপযোগী সাহায্যের কথা ভুলতে পারি? আমরা কি এতদূর অকৃতজ্ঞ



হতে পারি? আমরা যারা হলাম পাঠানের জাতি—তারা তা করতে পারি না। কংগ্রেস আমাদের সহায় হয়েছিল—আমরা কংগ্রেসের সহায় হবোই।" পাঠান বীরের এই কথায় সত্যিকারের মুসলিম জাতির নবচেতনা জাগবেই।

লাভালের শেষ ক'টি দিন !

ফ্রান্সের এককালীন অধিনায়ক—পিয়ারে লাভালের মৃত্যুদণ্ডের খবর আপনারা পড়েছেন—কিন্তু তাঁর জীবনের শেষের কটি দিন কেমনভাবে কেটেছে—ও কিভাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—তার হুবহু বর্ণনাটা শুনেছেন কি? শুনুন—বিচারালয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর—শেষের কটি দিন—ফ্রান্সের ফ্রেসনে কারাগারে—তাঁকে রাখা হোল—পরতে দেওয়া হলো চটের তৈরী পোষাক। এই কটি দিনে তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী আইনজ্ঞদের কাছে ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছে শেষ বিদায়ের করুণ পত্রগুলি লিখলেন আর অনবরত সিগারেট খেলেন। তাঁর স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন—'যারা একদিন ফ্রান্সকে অসংগঠিত অবস্থায় যুদ্ধে নামিয়েছিল—তারাই আজ লাভালকে মৃত্যু দিয়ে নীরব করতে চাইলে।' ওদিকে জেনারেল চার্লস দ্য গলের কাছে লাভালের পুনর্বিচারের অনুরোধ



মাদাম লাভাল শিউরে উঠলেন!

জানালেন ফ্রান্সের একদল লোক—কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

পিয়ারে লাভাল—কদিনেই যেন দার্শনিকের মন পেলেন—তিনি আর একজন মৃত্যুপথ-যাত্রী কয়েদীকে বললেন—"Ne te'n fais pas"—মৃত্যু কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী। এই মৃত্যুদণ্ডকে মনে করোনা—প্লাস দ্য'ল অপেরা'য় বাস দুর্ঘটনায় মরে যাওয়া। লাভালের পক্ষে এ মৃত্যুদণ্ড সত্যই বাস দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার মতই আকস্মিক। মৃত্যুর দিনে তিনি তাঁর খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন—এমন সময় দেখা গেল—কর্তৃপক্ষের দলবল তাঁর ঘরের দিকে আসছেন—তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাঁরা এসে পড়ার আগেই—তিনি চট্ করে একটা বিষের বড়ি মুখে পুরে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে গড়িয়ে পড়লো তাঁর দেহ মাটিতে।

দু' ঘণ্টা ধরে বন্দিশালার ডাক্তাররা লাভালকে বিরেচক দিয়ে—পাকস্থলী পাম্প করে বিষ বার করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষের হুকুমে লাভালের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষিত সময়কে দু' ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু তাঁকে আর তাঁরা খাড়া করতে পারলেন না। শেষকালে দুজন লোক তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ্যভূমির মৃত্যুস্তম্ভে বেঁধে দাঁড় করালে। বদ্ধ অবস্থায় লাভাল—রাইফেলধারীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন—ক্ষীণ কণ্ঠে জয়ধ্বনি ক'রে বললেন—"Vive la France"—রাইফেলগুলির সমবেত শব্দে কারাগার কেঁপে উঠলো। মাদাম লাভাল শিউরে উঠলেন।

লাভালের মৃতদেহ হাঁটু মুড়ে যেন বসে পড়লো—এক সরকারী কর্মচারী তখনই দৌড়ে গেল সেই মৃত মূর্তির কাছে—মৃতের কাণে সে শেষ গুলী মারলে। পিয়ারে লাভালের জীবনে ফ্রান্সের গৌরব হয়তো বাড়েনি—কিন্তু পিয়ারে লাভালের এই মৃত্যুতে ফ্রান্সের গৌরব বাড়লো কি?

দাগ

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

দিনের নিমন্ত্রণ বলেই ভিড়টা একসঙ্গে জমেনি। পরিবেশকদেরও তাড়াহুড়ো ছিল না। তা ছাড়া, দীপকরা ছিল পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল; তাই আদর আপ্যায়নে ত্রুটি না হয়, সেদিকেই ছিল সকলের নজর। সমরেশ এসে মাঝে মাঝে লৌকিক বিনয় দেখিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছিল। দীপকরা ঠাট্টায় জর্জরিত করে তাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল।

খাওয়া শেষ হ'ল। এবার বান্ধবী দেখার পালা। সমরেশই অগ্রণী হয়ে নিয়ে গেল। সকলে ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিলে সে।

চেয়ারে বসে সমরেশের বৌ। সুসজ্জিতা তরুণী, অঙ্গে হালফ্যাশানের বিচিত্র পরিচ্ছদ আর স্বর্ণালংকার।

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সমরেশ একে একে সকলের পরিচয় দিতে লাগল প্রিয়ার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে উপহার দেওয়াও চলতে লাগল—টাকা, বই কাস্কেট প্রভৃতি। এক-জোড়া ফুলদানিতে দুটি ছোট টাটকা ফুলের তোড়া এনেছিল দীপক, দিলে।

দীপক—আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই—দুতিনটে বাড়ির পরেই থাকে। কাব্যি করে বেড়ায়। দেখছ না, চেহারা আর জামা-কাপড়ের শ্রী।—(দীপকের দিকে চেয়ে)—কী আর বলব তোকে, তুই আর মানুষ—

বাইরে থেকে ডাক পড়ল,—ওরে সমর, দরজা খোল। মেসোমশাই চলে যাবেন, গীতাকে একবার দেখতে চাইছেন। সমরেশ একটু যেন বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিলে। সমরেশের দিদি অতসী মেসোমশাইকে নিয়ে ঢুকলেন বল্লেন এরা ত সব পাড়ারই ছেলে, সন্ধ্যের পর না হয় আর একবার আসবে এখন। কিছু মনে কোর না ভাই তোমরা।

দীপকরা বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতে লাগল: অতসী বললেন, সন্ধ্যের পর তোমরা এসো কিন্তু আবার।

তাহলে আর একবার ভোজনপর্বের আশা করতে পারি কি আমরা, নইলে কি ভাল দেখাবে?—পেছন থেকে বলে উঠল দীপক। সমরেশের বৌ মৃদু হেসেই আবেশমাখা চোখ নামিয়ে নিল।

অতসী তাকিয়ে দীপককে দেখেই বলে উঠলেন, আরে, দীপু? বেশ ছেলে বাবা, তিনদিন এসেছি, একবারও দেখা নেই।

কাজের বাড়ি, আসি কি করে বলুন।

—মেসোমশাই, বৌ দেখেছ, কেমন হয়েছে? অতসী বললেন।

বধূর রূপের প্রশংসা করে এক জোড়া সোনার দুল উপহার দিয়ে মেসোমশাই বেরিয়ে পড়লেন। দীপকরাও অনুসরণ করল।

দীপু! ডাকলেন অতসী।

ফিরে দাঁড়াল দীপক। কয়েকজন ততক্ষণে নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে।

একটু যেন আনমনা হয়ে গেলেন অতসী, পরক্ষণেই বললেন, তুই এখনো সেই রকমই আছিস।

কই, আপনার চেহারা ত ফেরেনি, লাহোর ত ভাল জায়গা। বছর কয়েক আগে শোনা গেছল, অতসীর যক্ষ্মা হয়েছে।

অতসী—একা মানুষ, সংসারের খাটা-খাটনি।

ছেলেপুলে ক'টি?

তিন মেয়ে, দুটি—যাই মা। আবার আসিস, দিন তিনেক আছি এখনো। বলেই মায়ের ডাকে চলে গেলেন।

দিন তিনেক পরে।

বেলা চারটা হবে। বৈঠকখানায় একটা জরুরী লেখায় ব্যস্ত ছিল দীপক, হঠাৎ কানে গেল, আপনি দীপু মামা?

মুখ তুলে দেখে, বছর ছয়েকের একটি সুশ্রী ছেলে দাঁড়িয়ে, কোটপ্যান্ট পরা, পায়ে ডার্বি।

বললে, হ্যাঁ। কেন বলো ত, কোত্থেকে আসছ তুমি?

আপনাকে একবার মা ডাকছে। সমরেশ-বাবু আমার মামা।

তাই নাকি, চলো চলো।—বলেই কলম রেখে উঠে পড়ল দীপক। অত্যন্ত লজ্জা হচ্ছিল তার,—এই তিন দিনে দিদির সঙ্গে দেখা করার কথা একেবারেই ভুলে গেছল, ছি ছি!

দোতলার কোণের ঘরে অতসী বিছানা বাক্স গোছাচ্ছিলেন। আট-নয় বছরের একটি মেয়ে সাহায্য করছিল হাতে হাতে। আর বছর দুয়েকের একটি ছেলে দুষ্টুমির জন্যে মাঝে মাঝে ধমক খাচ্ছিল অতসীর কাছে।

একি, আজই চললেন নাকি? বলতে বলতে দিদিকে সাহায্য করতে গেল দীপক।

থাক্ থাক, বাঁধা-ছাঁদা সবই হয়ে গেছে, গুণে রাখছি শুধু। হ্যাঁ, আজই যাচ্ছি ভাই। উনি বেশি ছুটি পেলেন না কিনা।

কোথায় উনি? সেই বছর পনের আগে আপনাকে বিয়ে করে নিয়ে পালালেন, আর দেখা নেই। মাঝে আপনি একবার কলকাতায় এসেছিলেন শুনেছিলাম, আমি তখন ছিলাম না এখানে।

নীচেই কোথাও আছেন বা সমরের সঙ্গে গাড়ি ডাকতে গেছেন বোধ হয়।

এ দুটি আপনারই নিশ্চয়? বলতে বলতে ছেলেটিকে টপ্ করে কোলে তুলে নিলে দীপক।

কারা?—দীপকের মুখের দিকে তাকালেন অতসী, বললেন, ও হ্যাঁ। মেয়েটি মুখ টিপে হাসল একবার।

একটি ত আমায় খবর দিয়ে পালাল দেখছি। আর দুটি কোথায়?

বোধ হয় কোন কারণে উন্মনা হয়ে পড়েছিলেন অতসী, হঠাৎ সচেতন হয়ে জবাব দিলেন, এ্যাঁ আর দুটি? বোধ হয় মার কাছে।

পোঁটলা পুঁটলির মত ওদেরকেও কিন্তু গুণে গুণে সঙ্গে রাখবেন গাড়িতে। হেসে উঠল দীপক।

অতসী নিরুত্তর।

সীমু,—সহসা বলে উঠলেন অতসী, ওঘরে সন্দেশ আছে। চারটে সন্দেশ আর জল এনে দে ত মামাকে।

সীমা চলে গেল। আপত্তি করবার সময় পেল না দীপক।

অতসী বলে চললেন, ছেলেবেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমার থেকে পয়সা নিয়ে কত গল্পের বই কিনেছিস। সে কথা বুঝি মনে নেই, তাই ভুলে গেছিস দিদিকে? তোরঙের উপর উঠে বসলেন দীপকের দিকে মুখ করে।

বেদনা ও লজ্জায় মিথ্যে বলে ফেলল দীপক, এ কদিন একটা কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম, সত্যি বলছি।

বিয়ে ত করিস নি শুনলাম।

সমরেশের বৌ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, দীপককে দেখেই বেরিয়ে গেল।

না, করি নি বিয়ে। দীপক বললো।

কেন?

তিরিশ পেরোলুম, বুড়ো হতে আর বাকি কী। তাছাড়া, খেতেও পাই না—

ওই যে এনেছে, খা।—মৃদু হাসলেন অতসী।

এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল দীপক। অতসীর বোধ হয় খেয়াল ছিল না, তাই বসতে বলেন নি। সীমার হাত থেকে রেকাব নিয়ে দীপক এবার নিজেই বসে খেতে আরম্ভ করে দিলে।

তোর লেখা দেখতে পাব বলে প্রায় সব কাগজই রাখি। এত কম লিখিস কেন?

ভাল লাগে না।

ওই যাঃ, তোর গান ত শোনা হল না। ছেড়ে দিইছি।

লক্ষ্য করল দীপক, আবার আনমনা হয়ে পড়লেন অতসী।

হঠাৎ ডাক আরম্ভ হল, গাড়ি এসেছে। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল, উঠে পড়ল দীপক।

ঠাকুর প্রণাম সারা হলে সকলে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। অতসীর চোখে জল, তাঁর মারও। দীপকের বাড়ি থেকে দীপকের মা বেরিয়ে এলেন। অতসী প্রণাম করলেন তাঁকে।

সকলেই বিদায় পর্বে ব্যস্ত ছিল। গাড়িতে ওঠবার সময় এক ফাঁকে দীপককে ইসারায় ডাকলেন অতসী।

দীপক কাছে যেতেই মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, সমীরদা ভাল আছে ত? শুনেছি, বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে? বলেই চোখ দুটি নত করলেন, মুখখানি লাল হয়ে গেছে তাঁর।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না দীপক। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, ভালই আছে। আপনাদের ওদিকেই থাকে লায়লপুরে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত দীপক চোখ ফেরাতে পারল না।

দীপকের দাদা সমীর আর অতসী—একদা দুজনেই দুজনকে চেয়েছিলেন মনে প্রাণে।



মিঃ বারোজ বাঙলার গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ প্রকাশিত না হইলেও তাঁর বন্ধুদের মারফৎ তাঁর গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিলাম। তিনি রেলওয়ের কুলী ছিলেন। তিনি কর্মঠ। তিনি সদালাপী এবং অমায়িক। দাম্পত্য-জীবনে তিনি সুখী, পঁয়ত্রিশ বছর ঘরকন্নার পরও কোন বিচ্ছেদ হয় নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর এই নির্বাচনে আমাদের মুগ্ধ না হইয়া আর উপায় নাই! কিন্তু শুনিলাম তিনি সিংহল সংস্কারের কাজে নাকি একবার মাত্র লংকা আসিয়াছিলেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সেই তো ভাবনার কথারে বাবা, একবার লংকায় এলে কি আর এত সব গুণ থাকবে?"

* * * *

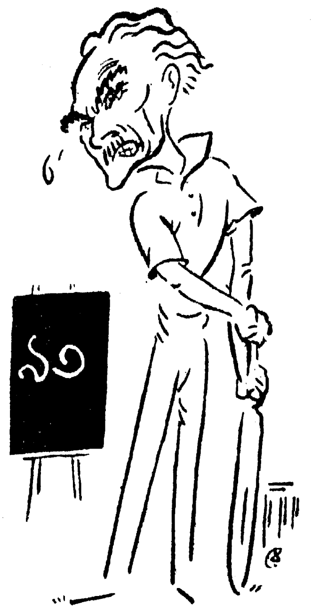
যাহা হউক, মিসেস বিয়াট্রিস হেভেন নামে জনৈকা মহিলা সহকর্মী মিঃ বারোজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমি আশা করি, স্লেভ তাঁর প্রকাণ্ড ঝাঁটাটি হাতে করে নিয়ে যাবে এবং কোলকাতার যত সব আবর্জনা



সাফ করবে।" আবর্জনার অভাব আমাদের নাই তা সত্যি এবং সে সব সাফ করার প্রয়োজনও অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের কপাল গুণে আবর্জনা সাফের ঝাঁটা যে শেষ পর্যন্ত কপালেই পড়ে।

* * * *

প্রসংগত মিঃ কেসির কথা আসিয়া পড়ে। 'অমৃতবাজারে' দেখিলাম অস্ট্রেলিয়ান টিমের ক্যাপ্টেন মিঃ হ্যাসেট ভারতীয় ক্রিকেটারদের খুব তারিফ করিয়াছেন। বাঙলার রাজনৈতিক ক্রিকেট খেলায় মিঃ কেসি সেঞ্চুরী করিতে না পারিলেও অপরাজিত থাকিয়া '৯৩' পর্যন্ত রান



তুলিয়াছেন। হ্যাসেট শুনিয়া সুখী হইবেন আমরাও সেই খেলা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াই দেখিয়াছি।

* * * *

খাদ্য সচিব স্যার শ্রীবাস্তব ঘোষণা করিয়াছেন, অচিরেই নাকি চাউলের সুব্যবস্থা করা হইবে। আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘোষণাটা কি চাউলের না 'চালের' সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশু খুড়ো আমাদিগকে আনন্দ করিতে মানা করিলেন।

* * * *

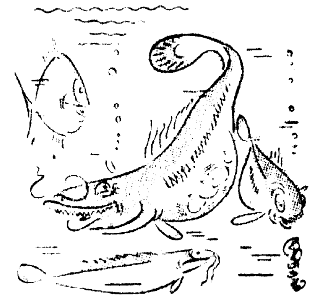
এদিকে নুনের সুব্যবস্থাও হইয়াছে। আমাদের বরাদ্দে এখন হইতে আধ সেরের জায়গায় তিন পোয়া পড়িবে। আমরা কাজে কাজেই দাতা, শত বর্ষ বাঁচিয়া থাক বলিয়া দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছি এবং সেই সংগে সতর্ক করিয়া দিতেছি ইহা অপেক্ষা বেশী বরাদ্দ যেন না করা হয়, তাহাতে নুন-পোড়া হওয়ার আশংকা আছে!

* * *

পৃথিবীর বড় বড় শক্তিপুঞ্জের কার হাতে কি কি মারণাস্ত্র আছে, সেই প্রসংগের আলোচনা করিতে গিয়া পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছেন,—"তাঁরা তাঁদের হাতের তাস চিৎ করিয়া দেখাইয়া দিন, আমরাও তাস দেখাইয়া দিতে রাজী আছি।" কিন্তু মিঃ বেভিন কি জানেন না যে, তাসের জুয়ায় "Blind" না খেলিতে পারিলে বড় রকমের 'বোর্ড' পাওয়ার কোন আশা নাই!

* * * *

আমেরিকার এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে এক ব্যক্তি ছিপে একটি মাছ ধরিয়াছেন এবং সেই মাছের পেটে একটি "বিয়ারের" বোতল পাওয়া গিয়াছে। কলি-



কাতার গংগার জলে অনেক রাঘব বোয়াল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাঁহাদের পেটে নাকি চাউলের বস্তা এবং কাপড়ের গাইট পর্যন্ত আছে বলিয়া অনেকের অনুমান। কিন্তু এ সব মাছ ছিপে বা জালে ধরা পড়ে না। বিয়ারপায়ী আমেরিকার মাছের মত তারা এত বোকা নয়।

* * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, "জীপ" গাড়ীগুলি নাকি জেলা এবং মহকুমার অফিসারদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া



দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষাৎ জ্ঞান অর্জনের জন্য এখন হইতে জীপে চড়িয়া সুদূর পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। "গাড়ি চাপার হাত থেকে দেখছি পাড়াগাঁটাও বাঁচল না"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

অ**জাদ"** খবর দিতেছেন, লক্ষ্ণৌর এক সভায় একটি সাত বৎসরের বালক নাকি লীগ নেতাদিগকে একটি 'পাকিস্তানী' তোপ উপহার দিয়াছে। তোপটি আর কিছুই নয়, একটি কামানের খেলনা মাত্র। বিশু-খুড়ো বলিতেছেন—কংগ্রেসের মত মশা মারিতে এত বড় কামান দাগা শক্তির অপচয় মাত্র। তবে হ্যাঁ, সাত বছরের বালকের শৌর্যের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। কায়েদে আজম ছেলেটির দিকে তাকাইয়া একদিন নিশ্চিন্তে চোখ বুজিতে পারিবেন।

* * * *

ম**হামান্য** আগা খাঁ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া একটি অভূতপূর্ব বিবৃতি দিয়াছেন, বলিয়াছেন—Freedom cannot be obtained as gift. অতি সত্য কথা। আমরা জানি ঘোড়দৌড়েই শুধু "Gift Race" হয়! তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে বটে, কিন্তু —It depends on how far She is willing to sacrifice!" রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরা দিয়া মাপিবার পর অতঃপর কি দিয়া মাপিলে প্রকৃত "ত্যাগ" স্বীকার করা হইবে সে কথা ভারতের মুক্তিকামীরা ভাবিয়া দেখুন।

* * * *

কা**য়দে** আজম তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় হিন্দুদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—They would not eat our food (মুসলমানরাই কি হিন্দুদের সব খানা খান?) তারপর বলিয়াছেন, If a Hindu shook hands with a Mussalman, he would wash then thereafter. কিন্তু সেটা ঘৃণায় নয়। করমর্দন করিতে গিয়া বার বার তাঁহাদের যে পরিচয় মিলিয়াছে তাহাতে তাঁদের নামে হাত ধুইয়া রাখা ছাড়া যে হিন্দুরা আর কোন পথ দেখিতেছে না!

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত কয় বৎসর বাঙলার অবস্থা যে শোচনীয় ছিল তাহা বলা বাহুল্য। রাজনীতিক কারণের সহিত সাম্প্রদায়িক কারণ যোগ দিয়াছিল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগও যেন তাহার সঙ্গে সাহায্য করিয়াছিল। প্রতীচীর যুদ্ধ যে প্রাচী পর্যন্ত প্রসার লাভ করিবে, তাহার লক্ষণ সুস্পষ্ট হইলেও ইংরেজ রাজনীতিকরা হয় সে সকল লক্ষণ লক্ষ্য করিবার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, নহে ত বুঝিয়াছিলেন—লক্ষ্য করিয়া যখন তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন না, তখন লক্ষ্য করিয়া কোন ফল নাই। গত জার্মান যুদ্ধের পরেই এশার কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—পরবর্তী যুদ্ধের ভারকেন্দ্র মধ্যপ্রাচীর দিকে আসিবে এবং তখন ইংলণ্ডকে কতকটা ভারতবর্ষকেও কতকটা ইংলণ্ডকে ঘাঁটি করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। ভারত সরকার সেই কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার নির্ধারণে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে যখন জাপান সত্যসত্যই যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন তাহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা বৃটেনের নাই এবং সে ঝড়ের মতই সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া ব্রহ্মও অধিকার করিল। ঐ সকল স্থান হইতে ইংরেজকে পলাইয়া আসিতে হইল।

জাপান যে যুদ্ধের জন্য আগ্রহশীল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ সে পূর্বেই দিয়াছিল। সে যে ইংরেজ মহিলাকে বিবস্ত্রা করিয়া খানাতল্লাস করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই, তাহাতেও বিলাতের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি তখন জার্মানিতে হিটলারকে তুষ্ট করিতে প্রচেষ্ট, আর কোন দিকে মন দিবার সময় নাই। মন দিয়াই বা কি করিবেন? জাহাজের মালিক ইংরেজদিগের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত স্থলপথ রচিত হয় নাই; ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন জন্য বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয় নাই।

জার্মানিকে তুষ্ট করা গেল না। যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর মতের অপেক্ষা না রাখিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধে রত বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কারণ ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ—সে তাহার প্রভুর মত গ্রহণ করিতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের লোকের একনায়কত্বে প্রীতি নাই—তাহারা প্রায় শতবর্ষ হইতে গণতন্ত্র দাবী করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের মতের অপেক্ষা না লইয়াই যে তাহাদিগকে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তাহাতে ভারতের রাজনীতিক আত্মসম্মান যেমন আহত হইল, তেমনই প্রতিপন্ন হইল—ভারতবাসীর অবস্থা দাসের অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কংগ্রেস দাবী করিলেন, ভারতবর্ষকে কত দিনে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা হইবে, তাহা বলিতে হইবে। ইংরেজ তাহা না বলায় কংগ্রেস যে সকল প্রদেশে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সে সকলে তাহা ত্যাগ করিলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের নেতারা গণ-আন্দোলন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাহা প্রবর্তিত করিবার পূর্বে ইংরেজ সরকারের সহিত "বুঝা-পড়া" করিবেন—স্থির করিলেন এবং সে আন্দোলন যে অহিংস হইবে, সে সংকল্পও করিলেন।

কিন্তু আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই আমলাতন্ত্র নেতৃগণকে কারারুদ্ধ করিলেন—মনে করিলেন, আন্দোলন প্রবর্তিত হইবে না—ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করা সম্ভব হইবে। নেতৃগণকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করায় দেশে পুঞ্জীকৃত অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিল এবং নেতাদিগের নির্দেশের অভাবে তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ও কল্পিত রূপ গ্রহণ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহা গণ-আন্দোলন—মুক্তিলাভের চেষ্টা। যদি ইংরেজ শাসকেরা তাহা বাহুবলে দলিত করিবার জন্য হিংসার পথ অবলম্বন না করিতেন, তবে তাহা যে দেশবাসীর ধৈর্যচ্যুতি হেতু অন্য পথ গ্রহণ করিত—কংগ্রেসের গৃহীত অহিংস নীতির পথভ্রষ্ট হইত না, এমনও হইতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসে যেমন অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়—সন্দেহে যেমন সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়—হিংসা তেমনই হিংসার বিকাশে সহায় হয়; কারণ, মানুষের মধ্যে পশু থাকে—সে আক্রান্ত হইতে যদি নখদংষ্ট্রায়ুধরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা সর্বভারতীয় অবস্থা। বাঙলার বৈশিষ্ট্য—বাঙলা জাপানের আক্রমণের প্রথম বেগ সহ্য করিবার সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য বাঙলার দুর্ভাগ্য হেতু যিনি বাঙলার গভর্নর হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই স্বল্পে বিচলিত স্যার জন হার্বার্ট রাজনীতিক অপেক্ষা সামরিক বিবেচনায় অধিক চালিত হইলেন। ব্যস্ততা-হেতু পূর্ববঙ্গ নানা স্থান হইতে সামরিক কারণে—সতর্কতার জন্য লোকদিগকে সরাইয়া লওয়া হইল, কিন্তু তাহাদিগের বাসের বা আহারের কোন ব্যবস্থা করা হইল না! আর তিনি তাঁহার সচিবদিগকে জিজ্ঞাসাও না করিয়া অপসারণ নীতি প্রবর্তিত করিলেন। বাঙলা যে মালয় নহে, তাহা বিবেচনা করিবার মত ধৈর্য বা বুদ্ধি তাঁহার ছিল না—তিনি বাঙলার বহু লোকের জীবিকার্জনের ও কৃষিকার্যের সহায় নৌকা অপসারিত করিবার আদেশ দিলেন—তিনি যখন ধরিয়া আনিতে বলিলেন, কোন কোন কর্মচারী তখন বাঁধিয়া আনিতে লাগিল—কোন কোন স্থানে নৌকা পোড়াইয়া দেওয়াও হইল।

আর চাউল অপসারণের ও সরকার কর্তৃক সংগ্রহের যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে যে দুর্নীতি প্রসারলাভ করিল, তাহার কলঙ্ক-লেপ কতদূর গিয়াছে, তাহা আজ আর বলিয়া দিতে হইবে না। এখন সরকারের নিযুক্ত কমিটি বলিতেছেন—দুর্নীতি ও অনাচার সরকারের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা সরকারের আর কি থাকিতে পারে?

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পূর্বে বাঙলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার জন্য যে বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘই প্রত্যক্ষভাবে ও গভর্নর পরোক্ষভাবে দায়ী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে কারণে তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা ভেদনীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ববঙ্গে মুসলমানদিগের অত্যাচারে সহস্র সহস্র হিন্দু বৃটিশ শাসনাধীন স্থান ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাধী মুসলমানকে দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে—এমন দৃষ্টান্ত আছে। কুলটীতে মামলার বিচার সচিবরা বন্ধ রাখিয়াছেন।

গণ-আন্দোলন দমন করিবার জন্য যে উগ্র উপায় অবলম্বিত হইল, তাহাতে দেশে বিক্ষোভ ব্যাপ্ত হইল। কলিকাতার রাজপথে পুলিশের ও সৈনিকের গুলীতে নিরীহ লোক নিহত হইল। সংবাদপত্রে প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইল।

দেশে যখন এই অবস্থা তখন মেদিনীপুরে বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস বহু লোকের জীবনান্ত ঘটাইল। কিন্তু মেদিনীপুরের লোক গণ-আন্দোলনে বিশেষরূপে দৃঢ়তা দেখাইয়াছিল। সরকারী কর্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি রুষ্ট ছিলেন। যদিও দুর্ঘটনার সংবাদ গোপন রহিল না, তথাপি প্রায় পক্ষকাল

সরকার তাহা সরকারীভাবে প্রকাশ করিলেন না। তাহাতে যে কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মেদিনীপুরে কয়জন রাজ-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাত্যার গমন সম্ভাবনা পূর্বাহ্নে জানিতে পারিয়াও তাঁহারা কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করায় সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিচার হয় নাই।

আমরা যে সকল অবস্থার কথা বলিয়াছি—সে সকল অবস্থার সমাবেশে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। যে দুর্ভিক্ষ নিবার্য ছিল, তাহা কাহারা অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সেই দুর্ভিক্ষে লোক যখন বাঙলার পথে, ঘাটে, মাঠে মরিতেছে, তখনও বড়লাট একবার বাঙলায় আসিলেন না—সময় নাই, অবশ্য ইচ্ছাও নাই। আর বিলাতে ভারত-সচিব ও এদেশে বড়লাট—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়া ভারত সরকারের দুর্ভিক্ষে লোকরক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের গুরুত্ব সম্বন্ধে হীন মিথ্যার প্রচারে ব্যস্ত হন। বাঙলায় অন্তত ৩৫ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছে।

গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের কার্যকলাপে যে সচিবরা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে না পারিয়া সেই সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া আবার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ কায়েম করেন। মিস্টার কেসির সময় কার্যত সেই মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘই কাজ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারাই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচারের জন্য দায়ী—ঘৃণ্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন।

সেই সচিবসঙ্ঘের পতনের পরে মিস্টার কেসি নিয়মানুগভাবে ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের দলপতিকে সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার জন্য আহ্বান না করিয়া স্বৈর-ক্ষমতা পরিচালনই করিয়া আসিয়াছেন।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও ভারতরক্ষা আইনের নিয়ম প্রত্যাহৃত হয় নাই—এখনও যুদ্ধকালে যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছিল, সে সকল প্রত্যাহার করিয়া সাধারণ আইনে বাঙলা শাসনের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

দুর্ভিক্ষের ও যুদ্ধের পরে বিধ্বস্ত বাঙলার পুনর্গঠন কার্য যে সরকারের কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙলা সরকার তাহার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা দেশের লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া রচিত হয় নাই—এমন কি, যখন বাঙলায় ব্যবস্থা পরিষদ বহাল ছিল, অর্থাৎ যখন তাহা বিচারের অবসর দেশের লোক পাইতে পারিত, তখনও প্রকাশিত হয় নাই। যে পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইবে, তাহা বিদেশী সরকার রচিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। বিদেশী শাসকদিগের এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়ে একটি কথা বলিলেই হইবে—গভর্নর কেসি এক-দিকে বলিয়াছেন, সরকার বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া যেরূপ গুদাম প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে শস্য রাখিলে শস্য আর বিকৃত হইবে না—আর একদিকে বলিয়াছেন, বাঙলার আবহাওয়া যেরূপ তাহাতে—বিশেষ বর্ষাকালে, শস্য অবিকৃত রাখা যায় না। কোন্ কথা গ্রাহ্য? অথচ তিনি জানেন না, সরকারী কর্মচারী ইংরেজই স্বীকার করিয়াছেন, এদেশের কৃষকরা যেভাবে শস্য রক্ষা করে, তাহাতে ২০ বৎসরেও তাহা বিকৃত হয় না।

বাঙলা যুদ্ধের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অবশ্য সে ক্ষতির সর্বাংশের জন্য যুদ্ধই দায়ী নহে। নৌকাপ-সারণ, দুর্ভিক্ষ, সরকারের জন্য চাউল ক্রয়ে এজেন্ট নিয়োগ, পাঞ্জাব হইতে বাঙলার জন্য গম ক্রয় করিয়া তাহাতেও লাভ করা, প্রচুর পরিমাণ ধান, গম ও আটা মজুদ রাখিবার দোষে নষ্ট করা—এ সকলের জন্য যুদ্ধ দায়ী নহে। যাহারা দায়ী তাহাদিগকে এক-দিন সে পাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, বাঙলা আজ দুঃখে, দারিদ্র্যে, পীড়নে, ব্যাধিতে বিপন্ন। এ অবস্থার প্রতীকারকল্পে সরকার কি করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার প্রতীকার করিতেই হইবে।

সেইজন্যই এবার কংগ্রেসের নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে—এবার নির্বাচন পরীক্ষামাত্র; ইহা সামান্য ব্যাপার; সম্মুখে যে বিরাট কার্য রহিয়াছে; তাহার জন্যই প্রস্তুত হইতে হইবে।

এবার বাঙালীকে—যাঁহারা যোদ্ধা—যাঁহারা সরকারের নিকট হইতে বাঙলার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার জন্য আবশ্যক উদ্যম প্রযুক্ত করিবেন এবং যাঁহারা বাঙলার পুনর্গঠন কার্যের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিতে পারিবেন-সেইরূপ লোককে প্রতিনিধি • নির্বাচি[ত] করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষ[দে] পাঠাইতে হইবে।

কংগ্রেসের গঠনকার্যের পরিকল্পন[া] কাহারও অজ্ঞাত নাই। যে সকল কার[ণে] আজও সেই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ-আশানুরূপ হয় নাই, সে সকলের জ[ন্য] দেশের লোক ও দেশের জননায়ক দায়[ী] নহেন। কংগ্রেসের লোকবল যেমন—তাহা[র] প্রভাবও তেমনই। তাহার কারণ, গত অর্ধ শতাব্দীকাল কংগ্রেসই দেশের মুক্তি সংগ্রা[ম] পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে। দেশে আ[জ] যে গণ-জাগরণ মুক্তির পথ নির্দেশ কর[ি]তেছে—বিদেশে যে বিরাট ফৌজ গঠন সম্ভ[ব] হইয়াছে—তাহার কারণ, কংগ্রেসের অ[র্ধ] শতাব্দীব্যাপী কার্য। আজ দেশের লো[ক] যেসকল নেতার নামে উৎসাহী হয়-তাঁহাদিগের ত্যাগে কংগ্রেস পূত [ও] শক্তিশালী হইয়াছে।

আসন্ন নির্বাচনের পরে দেশের লোকে[ক] উপযুক্ত নেতার নেতৃত্বে বাঙলার পুনর্গঠ[ন] কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সে কার্যে কেব[ল] কংগ্রেস নহে, পরন্তু সকল প্রতিষ্ঠানে[র] এক যোগে কাজ করা যেমন বাঞ্ছনী[য়] তেমনই প্রয়োজন। তাহা আমাদিগে[র] মুক্তি-সংগ্রামের অংশ।

পরিষদে নির্বাচনের সময় উত্তেজনার সময়। সে সময় শীঘ্রই শেষ হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সেই উত্তেজনার অবসান ঘটিবে এব[ং] স্থিরভাবে বিবেচনার ও ধীরভাবে কাজ করিবার সময় আসিবে। তখন বাঙলার কল্যাণকামী সকল দলকে একযোগে কাজ করিতে হইবে। বাঙলার মুসলমানরা গত দুর্ভিক্ষে বুঝিয়াছেন—মুসলীম লীগ সচি[ব] সঙ্ঘের সচিবরা আপনারা যত টাকাই কে[ন] পাইয়া থাকুন না—তাঁহারা মুসলমানদিগকে অনাহার হইতে রক্ষা করিতে কোন উল্লেখ-যোগ্য চেষ্টাই করেন নাই; বরং হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকের জীবন রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাজেই মুসলীম লীগের মত প্রতিষ্ঠান যে সে কাজে সহায় হইতে পারিবে, এমন আশা করা যায় না।

সুতরাং বাঙলার সব প্রতিষ্ঠানকে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার জন-গণকে সেই সংগঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।



দেশে শৃংখলিত সৈনিক



বিদেশে উচ্ছৃংখল বৈতনিক

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতীয় সৈনিক নিয়োগ করা হইয়াছে। —বার্তা

বৈদেশিকী

কয়েকদিন আগে খবর আসিয়াছিল যে, জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সংকটের সময় হঠাৎ এভাবে দেশের কর্ণধার থাকিতে কেন নারাজ হইলেন বিবেচনা করার বিষয়। সকলেই জানেন যে, গত সাধারণ নির্বাচনে ফ্রান্সের তিনটি দল সফল হইয়াছে ও ইহাদের মধ্যে কম্যুনিস্টরা সর্বাপেক্ষা বেশী আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর যথাক্রমে বামপন্থী ক্যাথলিক দল (MRP) ও সোসেলিস্টগণ অন্যান্য আসনগুলি দখল করিয়াছে। ক্যাথলিকরা দ্য গলের অনুগামী। মন্ত্রিসভা গঠনকালে কম্যুনিস্টরা সংখ্যায় গরিষ্ঠদল হিসাবে তিনটি প্রধান মন্ত্রী পদ অর্থাৎ পররাষ্ট্র, সমর ও আন্তরিক বিভাগের অন্তত একটির ভার গ্রহণ করিবার দাবী জানাইল। কিন্তু দ্য গল বলিলেন যে, তিনি দেশের নায়ক হিসাবে মন্ত্রী নির্বাচন করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিজের হাতে রাখিতে চান। কোন দল কোন পদ পাইবে তাহা সম্বন্ধে তিনি আগে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হইলেন না। বলা বাহুল্য ইহা আইনের কূটতর্ক মাত্র। আসল কথা হইল, দ্য গল কম্যুনিস্টদের এমন কোন ক্ষমতা দিতে চান না যাহা দ্বারা তারা ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে পারে। গুজব যে, তিনি কম্যুনিস্ট নেতা মরিস থরেজকে এই মর্মে সুস্পষ্টভাবে তাঁহার মনোভাব জানাইয়াছেন। জেনারেল দ্য গলের মতিগতি বুঝা খুব কঠিন নহে। তিনি ফ্রান্সের বিগত মহিমা ফিরাইয়া আনিতে পণ করিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, ফরাসী সাম্রাজ্য অখণ্ডভাবে ফিরাইয়া পাইতে হইলে ইঙ্গ-মার্কিনদের সাহায্য অনিবার্য। ইংরেজরাও জানে যে, ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যের লোভ দেখাইয়া নিজের দল ভারী করা যত সহজ অন্য প্রলোভনে তাহা সাধিত হইবে না। এই হেতু দ্য গল কম্যুনিস্টদের হাতে আসল ক্ষমতার চাবী না দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দরকারের সময় তিনি সোভিয়েটদের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এখন হাওয়া বদলাইয়াছে, সুতরাং তিনি ইংরেজ ও আমেরিকানদের চটাইতে চান না। দ্য গলের দুর্ভাগ্য এই যে, কম্যুনিস্ট ও সোসেলিস্ট দল উভয়েই বেশ বুঝিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলে ফ্রান্সের আসল স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। ইউরোপে বিশ্বশক্তিদের রেষারেষি এত দ্রুত বাড়িতেছে যে, সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বাড়াইলে আবার মহাযুদ্ধ আসিতে বাধ্য। আজ ফ্রান্সের প্রধান প্রয়োজন শান্তি ও দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। ইতিমধ্যে দ্য গলও বুঝিয়াছেন যে, সোসেলিস্ট কম্যুনিস্টদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার একা কিছু করা সম্ভব নহে। তাই তিনি আবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হইতে রাজী হইয়াছেন এবং সদ্যপ্রাপ্ত খবর হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহাকে ঐ পদে পুনঃ নির্বাচন করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা গিয়াছে যে, মন্ত্রিপদগুলি তিন দলের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা সুখবর, কারণ ইহাতে কেবল যে ফরাসীরা লাভবান হইবে তাহা নহে, আন্তর্জাতিক বিশেষভাবে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির উপরও ভাল ফল হইবে। ফ্রান্সের আন্তরিক সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইতে এখনও বাকী আছে। কিন্তু মোটামুটি লক্ষণ ভাল।

আণবিক শক্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি এটলি ও ট্রুম্যান যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা আরেকটা প্রমাণ যে, আন্তর্জাতিক মন কষাকষি একটা নূতন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে বৃটেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। সেখানে রক্ষণশীল দল শ্রমিক গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটা ভাঙ্গন ঘটাইবার জন্য নানা অজুহাত খুঁজিতেছে। যদি এই চেষ্টা সফল হয় তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বেশীদিন বিশ্বের শান্তি রক্ষিত হইবে না।

এই প্রসঙ্গে চীনের গৃহ বিবাদও আরেকটা ভয়ের কারণ। আগেই বলা হইয়াছে যে, এই সংঘর্ষ কেবল ঘরোয়া ব্যাপার নহে। যেভাবে আমেরিকা চিয়াং কাইশেককে সাহায্য দান করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, পুনরায় যুদ্ধ আসিলে মার্কিন নেতারা চীন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে চান। আসল মতলব সোভিয়েট রাশিয়াকে নানাদিক দিয়া বিব্রত করা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই মূল কথাটি মনে রাখিলে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক জটিল সমস্যা অতি সহজে বোধগম্য হইবে।

প্যালেস্টাইনের খবর কি? দৈনিক কাগজ পড়িলে মনে হয় যেন এখানে যাহা ঘটিতেছে তাহার মূলে কেবলমাত্র আরব ও ইহুদীদের বিরোধ। ইহুদীরা ইউরোপে নির্যাতিত হইতেছে, অতএব তাহারা প্যালেস্টাইনে বসবাস করিবার অধিকার চায়, আর অন্যদিকে আরবরা ভয় করে যে, ইহুদীদিগকে সেখানে অবাধগতিতে আসিতে দিলে ক্রমেই তাহারা নিজেদের বাসভূমে পরবাসীর সামিল হইয়া দাঁড়াইবে। প্রথম কথা হইল ইহুদীরা ইউরোপের নানা দেশে বহু শতাব্দী ধরিয়া বাস করিতেছে, তারা সেখানকার বাসিন্দা এবং অধিকাংশ ইহুদীর পক্ষে নিজের দেশ ছাড়িয়া আসা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ইংরেজদের সংখ্যায় লঘিষ্ঠদের জন্য যখন এতই দরদ তখন ইউরোপীয় সমাজে ইহুদীরা যাহাতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার পায় তার চেষ্টা করা উচিৎ। কিন্তু আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, সাম্রাজ্যবাদীদের দরদের কোন মূল্য নাই। নিজেদের স্বার্থ হিসাবে তাহারা আজ একজনের কাল আরেকজনের পৃষ্টপোষকতা করে। অনেকেই হয়ত জানেন যে, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সময় ইংরেজ ও ফরাসীরা নিজেদের অভিসন্ধি সাধনের জন্য আরবদের তুর্কীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষে তাহারা স্বাধীনতা পাইবে। কিন্তু এযাবৎ আরবদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অন্যদিকে যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য পাইবার জন্য বৃটেন ইহুদীদেরও প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধান্তে প্যালেস্টাইনে "ইহুদীদের জাতীয় বাসভূমি (Jewish National Home) সৃষ্টি করা হইবে। "ব্যালফোর প্রতিশ্রুতি" (Balfour Declaration) এমনভাবে দেওয়া হইল যে, দুই দলকেই তুষ্ট করার চেষ্টা হইল। আরব-ইহুদীদের দ্বন্দ্বের মূল কারণ হইল এই। যতদিন পর্যন্ত আরব জাতীয়তা আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া ওঠে নাই ততদিন ইংরেজরা ইহুদীদিগকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু আজ তাহাদের সেই নীতি বদলাইয়াছে। "আরব সঙ্ঘ" (Arab League) ক্রমেই সম্মিলিত আরবদের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং বৃটেনের পররাষ্ট্র বিভাগও ইহার সহিত একটা যোগসূত্র খুঁজিতেছে। ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা লাভের পূর্বে শ্রমিক নেতারা ইহুদীদের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাদের মতামত পরিবর্তিত হইয়াছে। মিঃ বেভিনের সেদিনকার বক্তৃতা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন চেষ্টা চলিতেছে, প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আমেরিকার সহিত যুক্তভাবে কিছু করা যায় কিনা। ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বলা যাইতে পারে যে, শীঘ্রই এই সম্বন্ধে একটা ইঙ্গ-মার্কিণ যুক্ত নীতি প্রবর্তিত হইবে। মিঃ এটলির ওয়াশিংটন যাওয়ার সহিত ইহার যে একটা যোগ আছে তাহা বলা বাহুল্য। এদিকে সম্প্রতি আবিষ্কার করা গিয়াছে যে, প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে যে পরিমাণ খনিজ তেল আছে, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার তৈল সম্ভার হইতেও বেশী। সুতরাং এখন কাহারও আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না কেন ইংরেজরা প্যালেস্টাইন হইতে নড়িতে চায় না। নানা অজুহাতে তাঁহারা সেখানে ঘাঁটি গাড়িতে চায়। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক তুলনা অক্ষরে অক্ষরে মেলে। হিন্দু-মুসলমান ও আরব-ইহুদী সমস্যা বাধাইয়া দিয়া ইংরেজরা সেখানে কায়েম হইতে চায়। তাহারা কাহারই বন্ধু নহে, বন্ধুত্বের ভাণ মাত্র করে।

খেলাধূলা



এ এল হ্যাসেট

ক্রিকেট

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ বোম্বাইতে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। তবে এই খেলায় ভারতীয় দলকে যে "ফলো অন" করিতে হইয়াছিল ইহা আমরা কেন অনেকেই আশা করিতে পারেন নাই। খেলার অবস্থা এক সময় এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল যে, ভারতীয় দল পরাজিত হইবে ইহাই সকলের মনে বদ্ধমূল হয়। ভারতীয় দলের সৌভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত এই পরাজয়ের প্লানি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

খেলার ফলাফল যাহা হউক ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে হইয়াছিল ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাগণ যে ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না। দল গঠন করিয়াছেন এইরূপ সকল খেলোয়াড়দের



এলিস



ক্রিস্টোফানী

লইয়া যাঁহাদের মধ্যে একজন ফাষ্ট বোলার নাই। মাদ্রাজের রঙ্গচারী খেলার সময় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকেও শেষ পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়। মুস্তাক আলীও খেলায় যোগদান করেন নাই। কেন করেন নাই সে সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা আমাদের করিবার ইচ্ছা নাই। আমরা চাই, ভারতীয় দলকে যেন দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে না হয়।

এই খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের কারমোডী ও পেটিফোর্ড উভয় শতাধিক রাণ করেন। এমনকি পেপার অল্পের জন্য শতরাণ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহা ছাড়া ওয়ার্কম্যান ও দলের অধিনায়ক হ্যাসেট অধিক রাণ করিতে সক্ষম হন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতীয় দলের বোলারগণ বিশেষ কার্যকরী হইতে পারেন নাই। উপরন্তু ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানগণও নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। একমাত্র অমরনাথ দুই ইনিংসে অর্ধশতের অধিক রাণ করিতে সক্ষম হন। খেলায় ভারতীয় দলকে পরাজয় বরণ করিতে হইত যদি শেষ সময় গুলমহম্মদ ও আমীর ইলাহি দৃঢ়তার সহিত না খেলিতেন। ইঁহাদিগের এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা প্রশংসনীয়।

খেলার বিবরণ

অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম দিনে ৬ উইকেটে ৩৩৬ রাণ করেন। কারমোডী ও পেটিফোর্ড



উইলিয়ামস



পেটিফোর্ড

শতাধিক রাণ করিতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের কিছু পূর্বে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৫৩১ রাণে শেষ হয়। বিজয় হাজারী ও সি এস নাইডুর বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। ভারতীয় দল দ্বিতীয় দিনের শেষে ১ উইকেটে ৮২ রাণ করে। তৃতীয় দিনের একরূপ শেষ সময় ভারতীয় দলের ইনিংস ৩৩৯ রাণে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া দল ১৯২ রাণে অগ্রগামী থাকায় ভারতীয় দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের কেহ আউট না হইয়া ৭ রাণ করে। চতুর্থ দিনের চা-পান পর্যন্তও ভারতীয় দলের কোন আশা ছিল না। গুলমহম্মদ ও আমীর এলাহির দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার জন্য শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংস ৩০৪ রাণে শেষ হয়। মাত্র ২০ মিনিট থাকিতে অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ১ উইকেটে ৩১ রাণ করে। খেলা অমীমাংসিত-



প্রাইস



পেপার

ভাবে শেষ হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—৫৩১ রাণ (কারমোডী ১১৩, পেটিফোর্ড ১২৪, হ্যাসেট ৫৩, পেপার ৯৫, ওয়ার্কম্যান ৭৬, বিজয় হাজারী ১০৯ রাণে ৫টি, আমীর ইলাহি ১৩৮ রাণে ২টি, সি এস নাইডু ১৪১ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস:—৩৩৯ রাণ (অমরনাথ ৬৪, বিজয় হাজারী ৭৫, বিমু মানকড় ৩৬, আর এস মোদী ৩৬, আব্দুল হাফিজ ৩৪, গুলমহম্মদ ৩৪, পেপার ৯৬ রাণে ২টি, এলিস ৯১ রাণে ২টি, প্রাইস ২৮ রাণে ২টি উইলিয়ামস ৬১ রাণে ২টি উইকেট পান)।

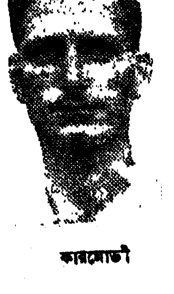
ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—৩০৪ রাণ (মার্চেন্ট ৬৯, মানকড় ২৭, অমরনাথ ৫০, হাজারী ২৩, আর এস মোদী ২৬, গুলমহম্মদ ৪৮, আমীর এলাহি ৩২, পেপার ৯০ রাণে ৩টি, প্রাইস ৫৪ রাণে ৩টি, উইলিয়ামস ২২ রাণে ১টি ও পেটিফোর্ড ৩৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংস:—১ উইঃ ৩১ রাণ (মিলার নট আউট ১৫ রাণ)।

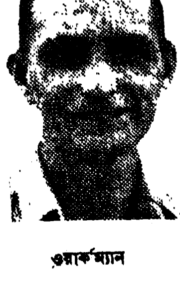
(খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ)

ছাত্র খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব

অধ্যাপক দেওধর ছাত্র খেলোয়াড়গণের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। তিনি পুণার খেলায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াও এইজন্যই ছাত্র খেলোয়াড়ের অনুকূলে ত্যাগ করেন। তাঁহার সেই ধারণা যে কতখানি সত্য তাহা ছাত্র খেলোয়াড়গণ পুণায় প্রমাণিত করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রদল অস্ট্রেলিয়ান দলকে সর্বাপেক্ষা কম রাণে ইনিংস শেষ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। এমনকি দুইজন ছাত্র শতাধিক রাণ করিয়া এক উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দলের রাণ সংখ্যা অতিক্রম করত পূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। লাহোরের ছাত্র খেলোয়াড় আবদুল হাফিজ এই খেলাতেও শতাধিক রাণ করিয়াছেন। পুণার



কারমোডী



ওয়ার্কম্যান

খেলোয়াড় রেজি এই খেলায় প্রথম অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে দ্বিশত রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রেজি ও হাফিজ দ্বিতীয় উইকেটে একত্রে ৩৪৪ রাণ সংগ্রহ করিয়া এই উইকেটের ভারতীয় রেকর্ড করিয়াছেন। ইহারা দুইজনে শেষ পর্যন্ত নট আউট ছিলেন। খেলাটি মাত্র দুই দিনব্যাপী না হইলে ইহারা কি করিতেন কেহই বলিতে পারে না। অস্ট্রেলিয়া দলকে হয়তো পরাজয়ই বরণ করিতে হইত। খেলাটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ এই খেলার ফলাফল সহজে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ছাত্র খেলোয়াড়গণই ভারতের ভবিষ্যৎ মুখোজ্জল করিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ ইহাদের উপেক্ষা করিয়া থাকেন ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—৩০০ রাণ (পেপার ৫০, হ্যাসেট ৯৫, কারমোডী ৩০, ওয়ার্কম্যান ৩১, স্ট্যানফোর্ড ৩৪, এম সিন্ধে ১১০ রাণে ৪টি, গজ্জালী ১৯ রাণে ২টি, ফাদকার ৯৮ রাণে ২টি, আর এস মোদী ৩৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল:—১ উই: ৩৮৫ রাণ (এম রেজি ২০০ নট আউট, আবদুল হাফিজ ১৬১ রাণ নট আউট, এলিস ৮৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—৩ উই: ৮৫ রাণ (উইলিয়ামস ১৪ নট আউট, প্রাইস ৪৮ রাণ ফাদকার ১৩ রাণে ১টি, সিন্ধে ২৭ রাণে ১টি উইকেট পান)।

(খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ)

পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়গণ মনোনীত

কলিকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়গণের সহিত অস্ট্রেলিয়া দলের যে খেলা হইতেছে তাহার খেলোয়াড় নির্বাচন দেখিয়া আমরা কোনরূপেই সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। প্রবীণ খেলোয়াড়কে অধিনায়ক নির্বাচন করা, বৈদেশিক খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা এই রীতি কি আমাদের নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ কোনদিনই ত্যাগ করিতে পারিবেন না? নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

কর্ণেল সি কে নাইডু (অধিনায়ক), মুস্তাক আলী, সি টি সারভাতে, সি এস নাইডু, ডেনিস কম্পটন, টি পার্থসারথী, এন চ্যাটার্জি, জে পি ফানসালকার, এন চৌধুরী, এস ব্যানার্জি। দ্বাদশ ব্যক্তি: জে এন ভায়া।

প্র-না-বি-র পাতা

গোরুর গাড়ি

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অচল প্রাচ্য এবারে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পশ্চিমের লোকের চোখে এ দেশকে যে অচল মনে হয় তার প্রধান কারণ ও দেশের চেয়ে এদেশের গতির তাল স্বতন্ত্র। এ দেশ অচল নয়, মন্থর। যে ব্যক্তি এরোপ্লেনে উড়িয়া চলিয়াছে তার কাছে মাটির গোরুর গাড়ীটাকে অচল বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু গোরুর গাড়ী তো অচল নয়—মন্থর মাত্র। এতদিনে সেই সাধের সনাতনী ভারতবর্ষীয় গোরুর গাড়ীও বুঝি লোপ পায়। যন্ত্রবাহন যন্ত্রবহুল ইউরোপের নিরন্তর কর্ম ব্যস্ততায় হাসফাস আমাদের শান্ত জীবনের মধ্যে অনেক পরিমাণে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইউরোপের মেল গাড়ীখানার পিছনে বাঁধা অনিচ্ছুক মালগাড়ীখানার মতো ছুটিতে বাধ্য হইতেছি। নাগরিক ভারতবর্ষ ইউরোপের Parody হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সত্তা এখনো আছে পল্লী ভারতের; স্বাধীন গতি এখনো আছে এদেশের গোরুর গাড়ীর; পল্লী গ্রামের ধমনীর তাল এখনো স্পন্দিত ওই গোরুর গাড়ীর গতিতে। গোরুর গাড়ীর পরিবর্তে এদেশের পল্লীর শত সহস্র অখ্যাত, জটিল, পন্থায় একবার মোটর গাড়ী চালু করিয়া দাও। বাস্, আর কিছুই করিতে হইবে না। দেখিতে দেখিতে এখনো যেটুকু ভারতবর্ষীয়ত্ব আছে তাহা লোপ পাইবে—আমরা সর্বতোভাবে ইউরোপের Parody হইয়া উঠিব। সেই আশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ উপলক্ষে যে সব মার্কিন মিস্ত্রি এ দেশে আসিয়াছে তন্মধ্যে একজন ভারতবর্ষের গোরুর গাড়ী দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছে। বোধ করি গোরুর কষ্ট দেখিয়া লোকটা গোরুর প্রতি অনুকম্পানিত হইয়া স্থির করিয়াছে শীঘ্রই এক প্রকার উন্নত-ধরণের গোরুর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আনিয়া এদেশে চালু করিবে। মানুষে যখন বিশেষ করিয়া পশুর প্রতি সমবেদনা-পরায়ণ হইয়া ওঠে তখন দেখা যায় তার ফলে পশুর দুঃখ তো কমেই না—বরঞ্চ মানুষের দুঃখ বাড়িয়া যায়—প্রকৃষ্টতম উদাহরণ পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি। এই মার্কিন মিস্ত্রীর সমবেদনার প্রস্তাবের ফলে প্রতিদিন আশঙ্কায় কাটিতেছে—কবে বা উন্নততর ধরণের গোরুর গাড়ী এদেশের সনাতনী গোরুর গাড়ীকে কোণঠাসা করিয়া পথঘাট জুড়িয়া বসে। এই উন্নততর গোরুর গাড়ী ঠিক কি রকম হইবে জানি না —তবে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বস্তুটা নিম্নতর ধরণের মোটর গাড়ী ছাড়া আর কিছু নয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ও দেশের জখমী মোটর গাড়ীগুলিকেই নূতন ধরণের গোরুর গাড়ী বলিয়া এ দেশে চালাইয়া দেওয়া হইবে—কেবল তাহাতে Horse Power-এর বদলে Bullock Power যোগ করা হইবে। এ দেশের গোরুর দুঃখ যে কমিবে এমন অনুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তবে ও দেশের কারখানার মালিকদের কিছু ঘাটতি কমিলেও কমিতে পারে। আর এ দেশের যে সব কারিগর গোরুর গাড়ী তৈয়ারী করিয়া জীবিকা-অর্জন করিত তাহাদের বৃত্তিহীন হইবার আশঙ্কা অল্প নয়।

কিন্তু এ সব তো গেল অর্থনীতির হিসাব। এ ছাড়া আর একটা হিসাব আছে যাহাকে বলা যাইতে পারে পরমার্থ নীতির হিসাব। সেই পরমার্থ বা গোরুর গাড়ীর বিশেষ তত্ত্বটি কি? এ দেশের শাসন যন্ত্রটার চালক যাহাতে ভারতবর্ষীয় লোক হয় সেজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। ভারতীয়দের দ্বারা শাসন কার্য চালিত হইলে দেশের কিছু উন্নতির আশা করা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু ইতি-মধ্যে যদি ভারতীয়দের মন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হইয়া গিয়া থাকে, অর্থাৎ এমন যদি হয় যে, তাহারা দেহে ভারতীয় আর মনে ইউরোপীয় তবে সে রকম চালকের দ্বারা শাসন যন্ত্র চালিত হইলে এমন কি লাভ হইবে? ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। চিন্তা করিবার বিষয় এই যে, আমাদের মন কি ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে না? মানুষের চেয়ে কলের উপরে আমাদের ভরসা কি ক্রমেই প্রবল আকার ধরিতেছে না? এ দেশের গোরুর গাড়ীতে যে মোহ আছে, সৌন্দর্য আছে, তাহার ধীর মন্থর গতিতে ভারতবর্ষের ধীর মন্থর জীবনের যে স্পন্দন আছে তাহা কি আর তেমন করিয়া আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করে? সংস্কারের ঝোঁকে কি আমরা সংস্কৃতিকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া তুলি নাই? ভাঙনের নেশায় কি আমরা ভাঙিবার হাতুড়িটা পর্যন্ত ভাঙিয়া বসি নাই? কালাপাহাড় আমাদের চেয়ে চতুর ছিল, সে হাতুড়িটা কখনো ভাঙে নাই।

ভারতবর্ষের প্রতীক ভারতবর্ষের সনাতন গোরুর গাড়ী। আমি যদি চিত্রকর হইতাম—আর কখনো ভারতবর্ষের একটি প্রতীকী চিত্র আঁকিবার প্রয়োজন হইত—তবে আর কিছু না আঁকিয়া একখানি গোরুর গাড়ী আঁকিতাম। উদার প্রান্তরের বুক চিরিয়া সরু একটি পথের ফালি, উচ্চাবচ তরঙ্গিত হইয়া নিরুদেশের মুখে ধাবিত, সেই পথের উপরে একখানি গোরুর গাড়ী। গাড়োয়ান মাথায় জীর্ণ গামছা বাঁধিয়া একটি বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে; তাহার মুখে চোখে কিছুমাত্র

ত্বরা নাই; গাড়ীর মন্থর তালের সঙ্গে বাঁশীর সুর মিশিয়া রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের গায়ে গায়ে সৌন্দর্যের আলোক-লতা বয়ন করিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর শ্যামল মরকতের পাত্রের উপরে রৌদ্রে-মাজা আকাশের নীলার মুখাবরণ আর তার উপরে বাঁশীর সুর আর রোদের সোনার টানা পোড়েনে-বোনা খুঞ্চাপোষটি কাহার নিপুণ হাতে সযত্নে টানিয়া দেওয়া। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রাভিষেক অতিক্রম করিয়া কোন্ সন্ধ্যার স্বর্ণ তোরণের অভ্যন্তর দিয়া নক্ষত্র ভাস্বর নিশীথের অভিমুখে সেই গোরুর গাড়ীর নিরুদ্দেশ যাত্রা। তাহার ত্বরা নাই, তাহার বিশ্রাম নাই। "without haste, without rest!" ভারতবর্ষের পরিজ্ঞাত ইতিহাস, অর্ধজ্ঞাত পুরাণ ও অজ্ঞাত কিম্বদন্তীকালের এমন প্রতীক আর কি হইতে পারে জানি না। এ গোরুর গাড়ীর আবিষ্কার কে করিয়াছিল কেহ জানে না। আর্যগণ আসিবার আগে, আর্যেতর সভ্যতা ছিল, তারও আগে হইতে ছিল এই গোরুর গাড়ী। গোরুর গাড়ী ও বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বস্তু। আর্যবংশোদ্ভূত অগস্ত্য বিন্ধ্য-পর্বতের মহিমাকে খর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু লোপ করিতে পারেন নাই। আর্য রাজাদের পুষ্পক রথ গোরুর গাড়ীকে দ্রুত অবজ্ঞায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সে পুষ্পক আজ কোথায়? বিন্ধ্যপর্বতের খর্বোন্নত অনাড়ম্বর তরঙ্গমালা ধীর মন্থর গমনে ভারতবর্ষের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত—গোরুর গাড়ীও গুজরাট হইতে আসাম পর্যন্ত আপনার চলমান অধিকার স্থাপন করিয়াছে। রেল, মোটর এরোপ্লেন তাহার রাজ্যের প্রত্যন্তে আসিয়া বাধা পায়—প্রবেশ করিতে পারে না।

এবারে তাই কি কলের গাড়ী নাম ভাঁড়াইয়া গোরুর গাড়ীর রাজত্ব আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? মোটর গাড়ী এবার গোরুর গাড়ী সাজিয়া সমুদ্র পার হইতে আসিতেছে। মার্কিনী পরিকল্পিত এই নূতন গোরুর গাড়ী যানবাহনে রাজ্যের 'পঞ্চম বাহিনী'। এবারে তাহার হাতে রক্ষা পাওয়া ভার!

ইতিহাসের যাত্রা পথে ভারতবর্ষের আর একটি সঙ্গী আছে চীনদেশ। চীনেরও প্রতীক গোরুর গাড়ী। পৃথিবীর ইতিহাসে দুইখানি গোরুর গাড়ী পাশাপাশি চলিয়াছে চীন আর ভারতবর্ষ। গোরুর গাড়ীর মানদণ্ডে দুইটি সভ্যতম দেশ। আবার মোটর গাড়ীর মানদণ্ডে দুইটি অসহায়তম, পশ্চাদগামীতম দেশ। মোটর গাড়ীর প্রচুর ধূলি উড়াইয়া পাশ দিয়া ধাবিত। ওই ধূলি জালে গোরুর গাড়ী আচ্ছন্ন, কাহারো চোখে পড়ে না। ওই ধূলি জালে গোরুর গাড়ী অর্ধাচ্ছন্ন—বিকৃতভাবে চোখে পড়িতেছে। এরোপ্লেন বিদ্যুৎগতিতে উড়িয়া যায়—ওই গতির দ্রুতিই গোরুর গাড়ীকে দেখিবার অন্তরায়; ওই গতির দ্রুতিতেই গোরুর গাড়ীকে অচল বলিয়া মনে হয়। এই মানদণ্ডেই ভারতবর্ষ এবং চীন অসভ্য।

চীন এবং ভারতবর্ষ যত দুর্গতি সহ্য করিয়া জীবিত আছে এমন আর কোন জাতি নয়। এর চেয়ে অনেক কম দুর্দশায় অনেক জাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই চিরজীবিতা সভ্যতার প্রধান প্রমাণ। আর এই চিরজীবিতার কারণ চীন ও ভারতবর্ষ গোরুর গাড়ীর তত্ত্বকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। গোরুর গাড়ী প্রস্তুত করা সহজ; নষ্ট হইলে মেরামত করা কঠিন নয়, আর তাহাকে চালনায় কোনরূপ কৌশলের প্রয়োজন নাই। ক্ষেতের একটা গাছ আর খামারের দুটা গোরু এই তো তার সরঞ্জাম। এই দুই প্রাচ্য দেশ জীবন যাত্রার 'গর্ডন গ্রন্থি' গোড়া ঘেঁষিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছে, সেই জন্যই বহু আততায়ী জাতি এই দেশকে জয় করিয়াছে, কিন্তু কেহই বশ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ তাহার প্রাণকে সাত লক্ষ ভাগে দেশের সাত লক্ষ গ্রামে ছড়াইয়া দিয়াছে। সে প্রাণ পুরুষকে পুঞ্জীভূত করিয়া নগর গড়ে নাই। ভারত-বর্ষের সভ্যতার লক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ; তাহার প্রাণ গ্রামে, আর গোরুর গাড়ীতে গ্রামের রক্ত চলাচল করে।

ইউরোপ সভ্যতাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শহর গড়িয়াছে। একটি শহরে দেশের প্রাণ পুঞ্জিত সমস্ত দেশ সেখানে পেঁছিতে চায়, কাজেই আবশ্যক তার দ্রুতি। আর এই চাহিদার ফলেই দ্রুত বাহনের সাধনায় সে রেল, মোটর, এরোপ্লেন আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু এই ঐকান্তিক কেন্দ্রী-করণই তার মৃত্যুর কারণ। একটি শহরের পতন হইলেই কেন যে একটা দেশের পতন হইবে তা ভারতবর্ষ বুঝিতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধে লণ্ডন ও দুই চারটা শহরের পতন ঘটিলেই ইংলণ্ড জার্মান কবলিত হইত। প্যারিসকে রক্ষা করিতে গিয়াই ফ্রান্স গেল। বার্লিনের পতনের পরে আর জার্মানীকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না। নেপোলিয়ান মস্কো অধিকার করিয়াও রাশিয়াকে পদানত করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তারপর হইতে রাশিয়া কেন্দ্রীকরণের সাধনায় নিরত। এবারে মস্কো অধিকৃত হইলে যে তাহার পতন ঘটিত না, এমন মনে করিবার কি হেতু আছে? একথা আর কেহ জানুক বা না জানুক স্টালিন বিলক্ষণ জানিতেন। তাই জার্মানীর মস্কো অভিযান সমস্ত পণে তিনি ঠেকাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সমস্তের মূলেই ওই কেন্দ্রী-করণের আতিশয্য। কেন্দ্রীকরণ কাচের ন্যায় কঠিন, কিন্তু ভঙ্গুর। কেন্দ্রীকরণ দেশকে প্রবল করে, কিন্তু ভাঙে যখন তখন আর রক্ষা নাই। বিকেন্দ্রীকরণ রবারের মতো, নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক। তাহা দেশকে প্রবল করে না, কিন্তু সহিষ্ণুতার বল দান করে। মোটর দৌড়ায় খুব, কিন্তু একবার ভাঙিলে তাহাকে ঘাড়ে করিয়া বহন ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর মন্থর গোরুর গাড়ী ভাঙিতে পারে সত্য, কিন্তু সারাইতে কতক্ষণ!

পাঠক এ সব কথা হয় তো তোমার ভালো লাগিবে না, খুব সম্ভব বুঝিতেও পারিবে না। কিন্তু এত গোলযোগে প্রয়োজন কি? শীতের রাত্রে দীর্ঘপথ গোরুর গাড়ীতে কখনো গিয়াছে কি? প্রচুর খড়ের গদির উপরে বিছানাপাতা, দুদিকে মোটা পর্দা টানিয়া দিয়া পথের তালে তালে দুলিতে দুলিতে যদি কখনো যাত্রা করিয়া থাকো—তবে বুঝিবে গোরুর গাড়িতে কি আরাম! তার কাছে রেল, মোটর তুচ্ছ। গোরুর গাড়ির মন্থরতায় এক প্রকার নবাবী আছে যাহার অধিকাংশই দিল্লীর বাদশাহী, অম্বুরি তামাক প্রভৃতির সঙ্গে গত হইয়াছে। এই নবাবী প্রাচ্যের স্বভাবসিদ্ধ। বাস্তবাগীশ পশ্চিম এরো-প্লেনে চড়ে তো চড়ুক। এসো পাঠক আমরা উদ্দেশ্যহীন গোরুর গাড়ির লক্ষ্য-হীন যাত্রায় বাহির হইয়া পড়ি। প্রচুর অবকাশের ঢিলে-জামা-টা গায়ে জড়াইয়া আসর জমাইয়া বসি। পশ্চিমের অচলতার অপবাদের উত্তরে আমরা বলিব—ওরা চঞ্চল, ওরা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এত হাসফাসের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ত্বরা নাই, আবার বিরামও নাই। "without haste, without rest" ইহাই গোরুর গাড়ির বাণী।

রঙ্গজগৎ

ফিল্মের ওপর থেকে লাইসেন্স উঠবেই ডিসেম্বরের ১৫ই থেকে। কতজন যে এই সরকারী ঘোষণার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে সময় কাটাচ্ছিল তার ইয়ত্তা নেই। প্রায় অর্ধশত নতুন প্রতিষ্ঠান আগেই গঠিত হয়ে আছে, আর নিয়ন্ত্রণ উঠে গেলে যে আরও কত শত গঠিত হবে হিসেব করে বলা মুস্কিল, তবে বর্তমানে যত সংখ্যক চিত্র-নির্মাণ, পরিবেশন ও প্রদর্শন প্রতিষ্ঠান আছে বছরখানেকের মধ্যে তা যে দ্বিগুণে অনায়াসেই গিয়ে পেঁছিবে তাতে কেউই সন্দেহ করে না। নতুন আসাটা শিল্পের পক্ষে আমরা শুভ লক্ষণ বলেই মনে করি, কারণ লক্ষ্য ক'রে দেখে আসচি যে ভারতীয় চলচ্চিত্রক্ষেত্রে শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত কিছু কীর্তি স্থাপিত হতে পেরেছে তা নবাগত ব্যক্তি বা নবগঠিত প্রতিষ্ঠানদের দ্বারাই হয়েছে—একটু হাত পাকলেই সবাই যেন নিতান্তই অযোগ্য হয়ে ওঠে—এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায়; ব্যক্তির বিচারে সকলের সম্পর্কেই একথা খাটে, তবে প্রতিষ্ঠানের বিচারে কেবল নিউ থিয়েটার্সের ক্ষেত্রেই এর যা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে কথা যাক্। এখন নতুনরা আসছে বলে সব রকম সুবিধা তারা পাবে এটা আশা করা যায় না, কারণ পুরাতনরা তাদের প্রতিষ্ঠানকে বজায় রাখতে যা কিছু দরকার সবই করতে তৎপর হবেই: তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, স্টুডিওগুলি সবই পুরণোদেরই হাতে, নবাগতদের শব্দযন্ত্র পাওয়া সহজ না হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া পুরণোরা এতদিন যাদের নিয়ে কাজ করেছে তারা যাতে নবাগতদের দলে না ভিড়তে পারে সে বিষয়ে যতটা সম্ভব প্রভাব খাটাতে কেউ পেছপাও হবে না—তা হচ্ছেও ইতিমধ্যেই। সুতরাং সব বাধা বিপত্তি বিচার করে দেখলে যত নতুন প্রতিষ্ঠান বর্তমানে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে তার অর্ধেককেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। পুরণোদের সঙ্গে প্রভাব বিস্তারে বা টাকা খাটানোয় যারা সক্ষম হবে শুধু তারাই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। অর্থাৎ প্রভূত মূলধন নিয়ে এটাকে রীতিমত একটা বড় ব্যবসা হিসেবে ধরেই যে আসবে সেই টিকে থাকবে, নয়তো বিলাসক্ষেত্র হিসেবে যারা ধরবে তারা শুধু ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া কোন কাজই করতে পারবে না।

আগামী ও নূতন আকর্ষণ

এ সপ্তাহে নূতন আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে নিউ সিনেমা ও শ্রীতে নবযুগ চিত্র 'দিন-রাত'। 'পান্না'র অভাবনীয় সাফল্যের পর সেই নবযুগেরই একখানি ছবি লোকের মনে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই। ছবিখানির প্রধান ভূমিকায় আছেন স্নেহপ্রভা ও পরেশ ব্যানার্জী; অন্যান্য ভূমিকায় সুলোচনা চ্যাটার্জী; বসন্ত ঠেঙড়ী ও দার কাশ্মীরি; পরিচালনা করেছেন শোরে দৌলতভী।

* * * * *

রূপশ্রী লিমিটেডের 'মৌচাকে ঢিল' বাঙালী চিত্রপ্রিয়দের উৎসুক করে তুলেছে নিশ্চয়ই। ছবিখানি সম্পর্কে প্রণিধান করার কটি বিষয় হচ্ছে—প্রথমত, প্র-শা-বি রচিত কাহিনীটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রচলিত এবং চিত্রপ্রিয়রা দেখায় অভ্যস্ত কাহিনীর সঙ্গে একেবারে পৃথক; দ্বিতীয়ত এর পরিচালক নামকরা সাংবাদিক ও সমালোচক মনুজেন্দ্র ভঞ্জেরও স্বাধীনভাবে এই প্রথম ছবি; তার ওপর ছবির প্রধান প্রায় সবকয়টি ভূমিকাতেই একেবারে নতুন শিল্পীদের অবতরণ করানো হয়েছে। প্রযোজক ও পরিচালক দুপক্ষই বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

* * * * *

মুক্তি আসন্ন এমন ছবি ক'খানির মধ্যে নাম পাওয়া যাচ্ছে মিনার্ভার 'একদিনকা সুলতান' যার প্রধান ভূমিকায় মেহতাব ও ওয়াস্তি। ছবিখানি সোরাব মোদীর পরিচালনায় তোলা বম্বে বছরের একখানি শ্রেষ্ঠ অবদান হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

বিবিধ

ভারত সরকারের গেজেট মারফৎ জানা গেল যে, আগামী ১৫ই ডিসেম্বর থেকে কাঁচা ফিল্মের ওপর থেকে লাইসেন্স প্রথা রদ হয়ে যাবে। অতঃপর প্রতিদিন কয়েকটি করে নতুন চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান গঠিত হবার আর কোন বাধা থাকবে না।

* * * * *

ফিল্মিস্তানের চার নম্বর ছবিখানিতে শ্রীমতী স্নেহলতা সিং নামের রাওলপিণ্ডির এক সম্ভ্রান্ত মহিলা নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন তার সঙ্গে অভিনয় করার জন্য কানু রায়কে নায়কের পদে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। ছবিখানি পরিচালনা করবেন বিভূতি মিত্র এবং প্রযোজনা জ্ঞান মুখার্জী।

* * * * *

নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে নবাব বম্বেতে চলে গিয়েছেন এবং ফেমাস ফিল্মসের 'মোগল-ই আজম্' ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তি করেছেন। বম্বেতে গিয়ে খাজা আহমদ আব্বাস পরিচালিত 'ধরতী কী বাচ্চো' ছবিখানির চিত্রগ্রহণ দেখে মুগ্ধ হয়ে নবাব বিনা পারিশ্রমিকে ছবিখানিতে অভিনয় করতে চেয়েছেন। ঠিক নবাবী চালই হলো!

* * * * *

বম্বের অজিত পিকচার্স নামক একটি প্রতিষ্ঠান তাদের পরবর্তী ছবির জন্যে সাধারণের কাছ থেকে হিন্দী, উর্দু, মারাঠি গুজরাটি বা ইংরাজীতে লেখা গল্প চাইছে

প্রচুর পুরস্কারের বদলে। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যভূমি ভারতেরই একটি প্রদেশে বাঙলা ভাষায় গল্প লেখা হয়— এ খবর অজিত পিকচার্সের কাছে অজ্ঞাত কি?

'সারারাৎ' ছবিখানিতে প্রতিমা দাশগুপ্তাকে পাঠান মেয়ের মত দেখতে হয়েছে বলে মন্তব্য করাতেই বোধহয় প্রতিমা তার নিজের পরিচালনায় তোলা ছবির পূর্ব-বিজ্ঞাপিত 'পাঠান নাম বদলে রাখওয়ালা' রেখেছেন। এতে নায়িকার ভূমিকায় তিনি নিজেই আছেন এবং নায়ক হয়েছেন আসল পাঠান শা নওয়াজ।

কালী ফিল্মস স্টুডিওতে নিউ মহারাষ্ট্র পিকচার্সের ফণী মজুমদার প্রযোজিত 'ইরাণ কি একরাত' নামক একখানি ছবি তোলার কথা শোনা যাচ্ছে যার ভূমিকায় থাকবেন বড়ুয়া, চন্দ্রাবতী, নীলা নাগিনী ও নারাঙ এবং সুরযোজনা করবেন কমল দাশগুপ্ত।

কলিকাতা হাইকোর্ট

সুবিখ্যাত ট্রেড মার্কের জাল অনুকরণ

সুবিখ্যাত ট্রেড মার্কসমূহের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাল অনুকরণের হাত হইতে সর্বসাধারণকে রক্ষা করার জন্য কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক আর একবার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বত হইয়াছে।

সুবিখ্যাত "সানলাইট সোপ"-এর প্রস্তুতকারক লিভার ব্রাদার্স (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্ কর্তৃক "এম্পায়ারলাইট সোপ"-এর প্রস্তুতকারক কালকাতার নিউ এম্পায়ার সোপ্ ওয়ার্কস্-এর বিরুদ্ধে আনীত এক মোকদ্দমায় কোর্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, "এম্পায়ারলাইট সোপ" নামে, সাবানের চাকতির আকার ও সাজ-সজ্জায় এবং মোড়কের ব্যবস্থা ও রংএর পরিকল্পনায় "সানলাইট সোপের" জাল অনুকরণ। "এম্পায়ারলাইট সোপ" বা "সানলাইট সোপের" অন্য কোনরূপ হুবহু জাল অনুকরণ প্রস্তুত করা বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করিয়া নিউ এম্পায়ার সোপ ওয়ার্কস-এর বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদালত মঞ্জুর করিয়াছেন। "এম্পায়ারলাইট সোপ" যাহা মজুত আছে এবং ঐ সাবান প্যাক করায় ব্যবহৃত মোড়ক ও ইহা প্রস্তুতে ব্যবহৃত ছাঁচ যাহা মজুত আছে তাহা সমস্ত বিনষ্ট করার আদেশও কোর্ট দিয়াছেন।

প্রতিবাদীকে তাঁহাদের বর্তমান জাল অনুকরণের জন্য বিনাসর্তে ক্ষমা প্রার্থনাও করিতে হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা ভবিষ্যতে আর কখনও জাল অনুকরণ করিবেন না বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

দেশী সংবাদ

১৩ই নবেম্বর—কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড কেন্দ্রীয় পরিষদের বর্ধমান-প্রেসিডেন্সী বিভাগ মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে মৌলবী ওয়ালিউর রহমান এবং রাজসাহী বিভাগ মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে মহাউদ্দিন খানের মনোনয়ন অনুমোদন করিয়াছেন।

কার্সিয়াং হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতিতে বলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করিবেন বলিয়া তিনি যে আশংকা করিতেছিলেন, তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীযুত বসু বলেন যে, যাঁহারা মিত্রশক্তি সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, ইন্দোচীন, জাভা ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ঘটনাবলী নিশ্চয়ই তাহাদের মোহমুক্তি ঘটাইবে।

তমলুকের এক সংবাদে প্রকাশ, ক্ষুধার তাড়নায় একটি রমণী তাহার শিশু সন্তানটিকে ৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে অদ্য পাটনা ও দিল্লীতে বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় দশ সহস্র ছাত্র ধর্মঘট করেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পক্ষে ৩১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। বাঙলার বণিক নির্বাচন কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় নির্বাচিত আনন্দমোহন পোদ্দার এবং যুক্তপ্রদেশ জমিদার কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত বিজয় নগরের মহারাজ কুমার কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

১৫ই নবেম্বর—কুচবিহারে স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে ভিক্টোরিয়া কলেজের ঘটনা সম্পর্কে অভিযুক্ত স্টেট বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। মোট ১০২ জন আসামীর মধ্যে অদ্য ১০১ জন আসামীকে আদালতে হাজির করা হয়। তন্মধ্যে দুইজন অফিসার এবং বাকী ৯৯ জন সিপাহী ও হাবিলদার। ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ২১শে আগস্ট ছাত্রদের সহিত স্টেট বাহিনীর কয়েকটি লোকের এক বচসা হয়। পরে আসামীরা কলেজ স্কুল ও ছাত্রাবাসে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি ছাত্রী সহ অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে প্রহার করে। ফলে ৫০ জনের অধিক ছাত্র আহত হয়।

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শকচন্দ্রনাথ চোপরা, ভাগবত উপাধ্যায়, সর্দার কনোয়াল সিং, সর্দার কর্তার সিং এবং রামদুলারী দুবে নামক পাঁচ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। শত্রুচর অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাদের বিচার হয়। ফাঁসি দিবার জন্য তাঁহাদিগকে দিল্লী জেলে রাখা হইয়াছিল।

১৬ই নবেম্বর—টালিগঞ্জ থানার এলাকাধীন বেদিয়াডাঙ্গা গ্রামে এক শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। গতকল্য ভোর বেলা জনৈক ধোপার গৃহে তিনটি শিশু সহ ছয়জন লোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং অপর সাতজনকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৃহ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বদ্ধ ঘরে জমাট কয়লার গ্যাসই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

বোম্বাই এবং বাঙলার আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডার কমিটি গঠনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দার্জিলিংয়ে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বলেন যে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চাষী মজুররাই কংগ্রেস পক্ষের প্রকৃত যোদ্ধা।

ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, চরনিকলার (কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত) মহম্মদ সদু সরকারের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিলে উভয় পক্ষে গুলী ছোড়াছুড়ি চলে। ফলে গৃহস্থ পক্ষের ২ জন এবং দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজন নিহত হয়।

১৭ই নবেম্বর—কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডারের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত ভাণ্ডারের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীযুত অমিয়নাথ বসু ঘোষণা করেন যে, আগামী ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতায় "আজাদ হিন্দ সপ্তাহের" উদ্বোধন হইবে ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র দেশপ্রিয় পার্কের এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। বঙ্গীয় আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ফরোয়ার্ড ও লিবার্টির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সীকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।

আগামী ৭ই ও ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় যথাক্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের অধিবেশন হইবে।

১৮ই নবেম্বর—মহাত্মা গান্ধী আগামী ১লা ডিসেম্বর কলিকাতা পৌঁছিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

এলাহাবাদের এক গ্রামের বিমান ঘাঁটিতে পরীক্ষামূলকভাবে বিমান চালনার সময় একটি কাঁচা বাড়ীতে ধাক্কা লাগার ফলে একটি রমণী ও তাহার শিশু সন্তান নিহত হইয়াছে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অবিলম্বে সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী জানাইয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন।

জগদ্দলে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয়। সভায় সদ্যমুক্ত কংগ্রেস ও শ্রমিক নেতা শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার দেশের বর্তমান সংকটক্ষণে সকল দলাদলি ভুলিয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইবার আবেদন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পুনরায় কংগ্রেসের চার আনার সদস্য তালিকাভুক্ত হইয়াছেন।

১৯শে নবেম্বর—১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক মহকুমায় গভর্নমেণ্ট যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আগস্ট আন্দোলন দমনকল্পে পুলিশ ও সৈন্যদল মোট ২২টি স্থানে গুলী চালাইয়াছিল। গুলী চালনার ফলে মোট ৪৪ জন নিহত, ১৯৯ জন আহত হয়। মোট ৬৩ জন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হইয়াছিল। ৪২২৬ জন লোককে প্রহার করা হয় এবং ১৪৬৮ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, আগস্ট আন্দোলনের পর তমলুক মহকুমায় জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুন্টুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে সমগ্র জেলায় আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস উপলক্ষে জনসভা ও শোভাযাত্রাদির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া—বিধ্বস্ত সুরাবায়ার অভ্যন্তরে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। চরমপন্থীদের তীব্র প্রতিরোধের মুখে সুরাবায়ার ভিতর দিয়া সামান্য অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়।

১৫ই নবেম্বর—অদ্য ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হয় যে, আণবিক বোমা সম্পর্কে ছয়দিন ব্যাপী যে ঐতিহাসিক আলোচনা চলিতেছিল, তাহাতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান, মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলী এবং মিঃ ম্যাকেঞ্জি কিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, আণবিক বোমার কলা-কৌশল গোপন রাখা হইবে।

প্যালেস্টাইনের তেল-আভিভে গুলীবর্ষণের ফলে ৩ জন ইহুদী নিহত ও ২৪ জন আহত হইয়াছে।

জাভার সর্বত্র উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর ডাঃ ভ্যানমুক ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদীদের সহিত পুনরায় আপোষ-আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে জরুরী আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

১৭ই নভেম্বর—রেঙ্গুনের সংবাদে প্রকাশ, ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর অধিনায়িকা লক্ষ্মীর গতিবিধি রহ্মরক্ষা বিধান অনুযায়ী শান রাজ্যের কালাও-এ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

জেনারেল দ গলের নেতৃত্বে ফ্রান্সে ত্রিদলীয় গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে।

বৃটেনের স্বতন্ত্র শ্রমিকদলের সভাপতি মিঃ ফ্রেনার ব্রকওয়ে পার্লামেণ্টের ৩৯৩ জন শ্রমিক সদস্যের নিকট একখানি খোলা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে বৃটিশ নীতি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে কলংকস্বরূপ।

১৮ই নবেম্বর—ইন্দোনেশিয়া—বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ সামান্য প্রতিরোধের মুখে সুরাবায়া দখলের সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ান জাতীয়তাবাদীদের একটি বেতার ঘাঁটি এই মর্মে এক ঘোষণা প্রচারিত করে যে, "অদ্য শান্তিপূর্ণ শেষ রজনী। আগামীকল্য হইতে আমরা ইংরাজদের ধ্বংস করিব না হয় জাভা হইতে বিতাড়িত করিব।" বেতারে উপরোক্ত সংবাদ প্রচার করিয়া ব্যাপক অভ্যুত্থানের হুমকী প্রদর্শন করা হয়।

১৯শে নবেম্বর—উত্তর [illegible] বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] এক সংবাদে প্রকাশ, সিমানে [illegible] স্টেশন দখল করার পর [illegible] আজারবাইজান [illegible] রেলপথ ধরিয়া [illegible] রাজধানী তেহেরাণের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।